রবীন্দ্র রচনাবলী

একবিংশ খণ্ড

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র-রচনাবলী

একবিংশ খণ্ড

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা

সূচী

চিত্রসূচী

কবিতা ও গান

খাপছাড়া

সহজ কথায় লিখতে আমায় কহ যে,
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।

লেখার কথা মাথায় যদি জোটে
তখন আমি লিখতে পারি হয়তো।
কঠিন লেখা নয়কো কঠিন মোটে,
যা-তা লেখা তেমন সহজ নয় তো।

আত্মপ্রতিকৃতি

নন্দিতা কৃপালনীর সৌজন্যে

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু

বন্ধুবরেষু

যদি দেখ খোলসটা
খসিয়াছে বৃদ্ধের,
যদি দেখ চপলতা
প্রলাপেতে সফলতা
ফলেছে জীবনে সেই ছেলেমিতে-সিদ্ধের,
যদি ধরা পড়ে সে যে নয় ঐকান্তিক
ঘোর বৈদান্তিক,
দেখ গম্ভীরতায় নয় অতলান্তিক,
যদি দেখ কথা তার
কোনো মানে-বোঝার
হয়তো ধারে না ধার, মাথা উদ্‌ভ্রান্তিক,
মনখানা পৌঁছয় খ্যাপামির প্রান্তিক,
তবে তার শিক্ষার
দাও যদি ধিক্কার—
শুধাব, বিধির মুখ চারিটা কী কারণে।
একটাতে দর্শন
করে বাণী বর্ষণ,
একটা ধ্বনিত হয় বেদ-উচ্চারণে।
একটাতে কবিতা
রসে হয় দ্রবিতা,
কাজে লাগে মনটারে উচাটনে মারণে।
নিশ্চিত জেনো তবে,
একটাতে হো হো রবে
পাগলামি বেড়া ভেঙে উঠে উচ্ছ্বাসিয়া।

তাই তারি ধাক্কায়
বাজে কথা পাক খায়,
আওড় পাকাতে থাকে মগজেতে আসিয়া।
চতুর্মুখের চেলা কবিটিরে বলিলে
তোমরা যতই হাস, রবে সেটা দলিলে।
দেখাবে সৃষ্টি নিয়ে খেলে বটে কল্পনা,
অনাসৃষ্টিতে তবু ঝোঁকটাও অল্প না।

[শান্তিনিকেতন]
৩ ভাদ্র ১৩৪৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকা

ডুগডুগিটা বাজিয়ে দিয়ে
ধুলোয় আসর সাজিয়ে দিয়ে
পথের ধারে বসল জাদুকর।
এল উপেন, এল রূপেন,
দেখতে এল নৃপেন, ভূপেন,
গোঁদলপাড়ার এল মাধু কর।
দাড়িওয়ালা বুড়ো লোকটা,
কিসের-নেশায়-পাওয়া চোখটা,
চার দিকে তার জুটল অনেক ছেলে।
যা-তা মন্ত্র আউড়ে, শেষে
একটুখানি মুচকে হেসে
ঘাসের 'পরে চাদর দিল মেলে।
উঠিয়ে নিল কাপড়টা যেই
দেখা দিল ধুলোর মাঝেই
ছুটো বেগুন, একটা চড়ুইছানা,
আমের আঁঠি, ছেঁড়া ঘুড়ি,
একটিমাত্র গালার চুড়ি,
ধুঁইয়ে-ওঠা ধুমুচি একখানা,
টুকরো বাসন চিনেমাটির,
মুড়ো ঝাঁটা খড়কেকাঠির,
নলছে-ভাঙা হুঁকো, পোড়া কাঠটা—
ঠিকানা নেই আগুপিছুর,
কিছুর সঙ্গে যোগ না কিছুর,
ক্ষণকালের ভোজবাজির এই ঠাট্টা।

শান্তিনিকেতন
১৬ পৌষ ১৩৪৩

বর এসেছে বীরের ছাঁদে

কবিতাসংখ্যা ২৪

ক্ষান্তবুড়ি

কবিতাসংখ্যা ১

খাপছাড়া

১

কাস্তবুড়ির দিদিশাশুড়ির
পাঁচ বোন থাকে কাল্‌নায়,
শাড়িগুলো তারা উনুনে বিছায়,
হাঁড়িগুলো রাখে আলনায়।
কোনো দোষ পাছে ধরে নিন্দুকে
নিজে থাকে তারা লোহাসিন্দুকে,
টাকাকড়িগুলো হাওয়া খাবে ব'লে
রেখে দেয় খোলা জালনায়—
নুন দিয়ে তারা ছাঁচিপান সাজে,
চুন দেয় তারা ডালনায়।

অল্পেতে খুশি হবে
দামোদর শেঠ কি।
মুড়কির মোয়া চাই,
চাই ভাজা ভেটকি।

আনবে কটকি জুতো,
মটকিতে ঘি এনো,
জলপাইগুঁড়ি থেকে
এনো কই জিয়োনো—
চাঁদনিতে পাওয়া যাবে
বোয়ালের পেট কি।

চিনেবাজারের থেকে
এনো তো করমচা,
কাঁকড়ার ডিম চাই,
চাই যে গরম চা,
নাহয় খরচা হবে
মাথা হবে হেঁট কি।
মনে রেখো বড়ো মাপে
করা চাই আয়োজন,
কলেবর খাটো নয়—
তিন মোন প্রায় ওজন।
খোঁজ নিয়ো ঝড়িয়াতে
জিলিপির রেট কী।

৩

পাঠশালে হাই তোলে
মতিলাল নন্দী।
বলে, 'পাঠ এগোয় না
যত কেন মন দি।'
শেষকালে একদিন
গেল চড়ি টঙ্গায়,
পাতাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে
ভাসালো মা-গঙ্গায়,
সমাস এগিয়ে গেল,
ভেসে গেল সন্ধি—
পাঠ এগোবার তরে
এই তার ফন্দি।

৪

কাঁচড়াপাড়াতে এক
ছিল রাজপুত্তর,

রাজকন্যারে লিখে
পায় না সে উত্তর।
টিকিটের দাম দিয়ে
রাজ্য বিকাবে কি এ,
রেগেমেগে শেষকালে
বলে ওঠে— ছুত্তোর!
ডাকবাবুটিকে দিল
মুখে ডালকুত্তোর।

৫

দাড়ীশ্বরকে মানত ক'রে
গোঁপ-গাঁ গেল হাবল—
স্বপ্নে শেয়ালকাঁটা-পাখি
গালে মারল খাবল।

দেখতে দেখতে ছাড়ায় দাড়ি
ভদ্র সীমার মাত্রা—
নাপিত খুঁজতে করল হাবল
রাওলপিণ্ডি যাত্রা।
উর্দু ভাষায় হাজাম এসে
বকল আবল-তাবল।

তিরিশটা খুর একে একে
ভাঙল যখন পটাৎ,
কামারটুলি থেকে নাপিত
আনল তখন হঠাৎ
যা হাতে পায় খাঁড়া বঁটি
কোদাল করাত শাবল।

৬

নিধু বলে আড়চোখে 'কুছ নেই পরোয়া'—
স্ত্রী দিলে গলায় দড়ি বলে, 'এটা ঘরোয়া।'
দারোগাকে হেসে কয়,
'খবরটা দিতে হয়'—
পুলিস যখন করে ঘরে এসে চড়োয়া।
বলে, 'চরণের রেণু
নাহি চাহিতেই পেনু'—
এই ব'লে নিধিরাম করে পায়ে-ধরোয়া।

নিধু বাঁকা ক'রে ঘাড় ওড়নাটা উড়িয়ে
বলে, 'মোর পাকা হাড়, যাব নাকো বুড়িয়ে।
যে যা খুশি করুক-না,
মারুক-না, ধরুক-না,
তাকিয়াতে দিয়ে ঠেস দেব সব তুড়িয়ে।'
গালি তারে দিলে লোকে
হাসে নিধু আড়চোখে;
বলে, 'দাদা, আরো বলো, কান গেল জুড়িয়ে।'

পিসে হয় কুলদার, ভুলুদার কাকা সে—
আড়চোখে হাসে আর করে ঘাড় বাঁকা সে।
যবে গিয়ে শালিখায়
সাহেবের গালি খায়,
'কেয়ার করি নে' ব'লে তুড়ি মারে আকাশে।
যেদিন ফয়জাবাদে
পত্নী ফুঁপিয়ে কাঁদে,
'তবে আসি' বলে হাসি চলে যায় ঢাকা সে।

৭

দু-কানে ফুটিয়ে দিয়ে
কাঁকড়ার দাঁড়া
বর বলে, 'কান ছুটো
ধীরে ধীরে নাড়া।'
বউ দেখে আয়নায়,
জাপানে কি চায়নায়
হাজার হাজার আছে
মেছুনীর পাড়া—
কোথাও ঘটে নি কানে
এত বড়ো ফাঁড়া।

৮

পাখিওয়ালা বলে, 'এটা
কালোরঙ চন্দনা।'
পানুলাল হালদার
বলে, 'আমি অন্ধ না—
কাক ওটা নিশ্চিত,
হরিনাম ঠোঁটে নাই।'
পাখিওয়ালা বলে, 'বুলি
ভালো করে ফোটে নাই-
পারে না বলিতে বাবা,
কাকা নামে বন্দনা।'

৯

রসগোল্লার লোভে
পাঁচকড়ি মিত্তির
দিল ঠোঙা শেষ করে
বড়ো ভাই পৃথ্বীর।

সইল না কিছুতেই,
যকৃতের নিচুতেই
যন্ত্র বিগড়ে গিয়ে
ব্যামো হল পিত্তির।
ঠোঙাটাকে বলে, 'পাজি
ময়রার কারসাজি।'
দাদার উপরে রাগে—
দাদা বলে, 'চিত্তির!
পেটে যে স্মরণসভা
আপনারি কীর্তির।'

১০

হাতে কোনো কাজ নেই,
নওগাঁর তিনকড়ি
সময় কাটিয়ে দেয়
ঘরে ঘরে ঋণ করি।
ভাঙা খাট কিনেছিল,
ছ পয়সা খরচা—
শোয় না সে হয় পাছে
কুঁড়েমির চর্চা।
বলে, 'ঘরে এত ঠাসা
কিঙ্কর কিঙ্করী,
তাই কম খেয়ে খেয়ে
দেহটারে ক্ষীণ করি।'

১১

মেছুয়াবাজার থেকে
পালোয়ান চারজন
পরের ঘরেতে করে
জঞ্জাল-মার্জন।

ডালায় লাগিয়ে চাপ
বাক্সো করেছে সাফ,
হঠাৎ লাগালো গুঁতো
পুলিসের সার্জন।
কেঁদে বলে, 'আমাদের
নেই কোনো গার্জন,
ভেবেছিনু হেথা হয়
নৈশবিদ্যালয়—
নিখরচা জীবিকায়
বিদ্যা-উপার্জন।'

১২

টেরিটি বাজারে তার
সন্ধান পেনু—
গোরা বোষ্টমবাবা,
নাম নিল বেণু।
শুদ্ধ নিয়ম-মতে
মুরগিরে পালিয়া,
গঙ্গাজলের যোগে
রাঁধে তার কালিয়া—
মুখে জল আসে তার
চরে যবে ধেনু।
বড়ি ক'রে কৌটায়
বেচে পদরেণু।

১৩

ইতিহাসবিশারদ গণেশ ধুরন্ধর
ইজারা নিয়েছে একা বম্বাই বন্দর।
নিয়ে সাতজন জেলে
দেখে মাপকাঠি ফেলে—

সাগরমথনে কোথা উঠেছিল চন্দর,
কোথা ডুব দিয়ে আছে ডানাকাটা মন্দর

১৪

মুচকে হাসে অতুল খুড়ো,
কানে কলম গোঁজা।
চোখ টিপে সে বললে হঠাৎ,
'পরতে হবে মোজা।'
হাসল ভজা, হাসল নবাই—
'ভারি মজা' ভাবল সবাই—
ঘরসুদ্ধ উঠল হেসে,
কারণ যায় না বোঝা।

১৫

স্বপ্নে দেখি নৌকো আমার
নদীর ঘাটে বাঁধা ;
নদী কিম্বা আকাশ সেটা
লাগল মনে ধাঁধা।
এমনসময় হঠাৎ দেখি,
দিক্‌সীমানায় গেছে ঠেকি
একটুখানি ভেসে-ওঠা
ত্রয়োদশীর চাঁদা।
'নৌকোতে তোর পার করে দে'
এই ব'লে তার কাঁদা।
আমি বলি, 'ভাবনা কী তায়,
আকাশপারে নেব মিতায়—
কিন্তু আমি ঘুমিয়ে আছি
এই যে বিষম বাধা,
দেখছ আমার চতুর্দিকটা
স্বপ্নজালে ফাঁদা।'

১৬

বউ নিয়ে লেগে গেল বকাবকি
যোগা ফণী আর মোটা পঙ্কিতে,
মণিকর্ণিকা-ঘাটে ঠকাঠকি
যেন বাঁশে আর সরু কঞ্চিতে।
দুজনে না জানে এই বউ কার,
মিছেমিছি ভাড়া বাড়ে নৌকার,
পঙ্কি চেঁচায় শুধু হাউহাউ,—
'পারবি নে তুই মোরে বঞ্চিতে।'
বউ বলে, 'বুঝে নিই দাউদাউ
মোর তরে জলে ঐ কোন্‌ চিতে।'

১৭

ইদিলপুরেতে বাস নরহরি শর্মা,
হঠাৎ খেয়াল গেল যাবেই সে বর্মা।
দেখবে-শুনবে কে যে তাই নিয়ে ভাবনা,
রাঁধবে বাড়বে, দেবে গোরুটাকে জাবনা—
সহধর্মিণী নেই, খোঁজে সহধর্মা।
গেল তাই খণ্ডালা, গেল তাই অণ্ডালে,
মহা রেগে গাল দেয় রেলগাড়ি-চণ্ডালে,
সাথি খুঁজে সে বেচারা কী গলদ্‌ঘর্মা—
বিস্তর ভেবে শেষে গেল সে কোডর্মা।

১৮

ঘাসে আছে ভিটামিন, গোরু ভেড়া অশ্ব
ঘাস খেয়ে বেঁচে আছে, আঁখি মেলে পশ্য।
অনুকূল বাবু বলে, 'ঘাস খাওয়া ধরা চাই,
কিছুদিন জঠরেতে অভ্যেস করা চাই—
বৃথাই খরচ ক'রে চাষ করা শস্য।

গৃহিণী দোহাই পাড়ে মাঠে যবে চরে সে,
ঠেলা মেরে চলে যায় পায়ে যবে ধরে সে—
মানবহিতের ঝোঁকে কথা শোনে কস্তু!

ছুদিন না যেতে যেতে মারা গেল লোকটা,
বিজ্ঞানে বিঁধে আছে এই মহা শোকটা,
বাঁচলে প্রমাণ-শেষ হ'ত যে অবশ্য।

১৯

ভয় নেই, আমি আজ
রান্নাটা দেখছি।
চালে জলে মেপে, নিধু,
চড়িয়ে দে ডেকচি।
আমি গনি কলাপাতা,
তুমি এসো নিয়ে হাতা,
যদি দেখ, মেজবউ,
কোনোখানে ঠেকছি।

রুটি মেখে বেলে দিয়ো,
উনুনটা জেলে দিয়ো,
মহেশকে সাথে নিয়ে
আমি নয় সেঁকছি।

২০

মন উড়ু উড়ু, চোখ ঢুলুঢুলু,
ম্লান মুখখানি কাঁদুনিক—
আলুথালু ভাষা, ভাব এলোমেলো,
ছন্দটা নির্বাধুনিক।
পাঠকেরা বলে, 'এ তো নয় সোজা,
বুঝি কি বুঝি নে যায় না সে বোঝা।'
কবি বলে, 'তার কারণ, আমার
কবিতার ছাঁদ আধুনিক।'

২১

কালুর খাবার শখ সব চেয়ে পিষ্টকে।
গৃহিণী গড়েছে যেন চিনি মেখে ইষ্টকে।
পুড়ে সে হয়েছে কালো,
মুখে কালু বলে 'ভালো',
মনে মনে খোঁটা দেয় দগ্ধ অদৃষ্টকে।
কলিক্‌-ব্যথায় ডাকে ক্রুসে-বেঁধা খৃস্টকে।

২২

রাজা বসেছেন ধ্যানে,
বিশজন সর্দার
চীৎকাররবে তারা
হাঁকিছে— 'খবরদার'।

সেনাপতি ডাক ছাড়ে,
মন্ত্রী সে দাড়ি নাড়ে,
যোগ দিল তার সাথে
ঢাকঢোল-বর্দার।

ধরাতল কম্পিত,
পশুপ্রাণী লম্ফিত,
রানীরা মূর্ছা যায়
আড়ালেতে পর্দার।

২৩

নাম তার সন্তোষ,
জঠরে অগ্নিদোষ,
হাওয়া খেতে গেল সে পচম্বা।

নাকছাবি দিয়ে নাকে
বাঘনাপাড়ায় থাকে
বউ তার বেঁটে জগদম্বা।

ডাক্তার গ্রেগ্‌সন
দিল ইনজেক্‌শন—
দেহ হল সাত ফুট লম্বা।

এত বাড়াবাড়ি দেখে
সন্তোষ কহে হেঁকে,
'অপমান সহিব কথম্‌ বা।
শুন ডাক্তার ভায়া,
উঁচু করো মোর পায়া,
স্ত্রীর কাছে কেন রব কম বা।
খড়ম জোড়ায় ঘষে
ওষুধ লাগাও কষে—
শুনে ডাক্তার হতভম্বা।

২৪

বর এসেছে বীরের ছাঁদে,
বিয়ের লগ্ন আটটা।
পিতল-আঁটা লাঠি কাঁধে,
গালেতে গালপাট্টা।

শ্যালীর সঙ্গে ক্রমে ক্রমে
আলাপ যখন উঠল জমে,
রায়বেঁশে নাচ নাচের ঝোঁকে
মাথায় মারলে গাঁট্টা।
শ্বশুর কাঁদে মেয়ের শোকে,
বর হেসে কয়— 'ঠাট্টা'।

২৫

নিষ্কাম পরহিতে কে ইহারে সামলায়—
স্বার্থেরে নিঃশেষে-মুছে-ফেলা মামলায়।

চলেছে উদারভাবে সম্বল-খোয়ানি—
গিনি যায়, টাকা যায়, সিকি যায় দোয়ানি,
হল সারা বাঁটোয়ারা উকিলে ও আমলায়।

গিয়েছে পরের লাগি অন্নের শেষ গুঁড়ো—
কিছু খুঁটে পাওয়া যায় ভুষি তুঁষ খুদকুঁড়ো
গোরুহীন গোয়ালের তলাহীন গামলায়।

২৬

জামাই মহিম এল, সাথে এল কিনি—
হায় রে কেবলই ভুলি ষষ্ঠীর দিনই।

মেয়েটা কাহিল বড়ো রাঁধবার নামে,
কে জানে কেন রে বাপু, ভেসে যায় ঘামে।
বিধাতা জানেন আমি বড়ো অভাগিনী।
বেয়ানকে লিখে দেব, খাওয়াবেন তিনি।

২৭

ঘাসি কামারের বাড়ি সাঁড়া,
গড়েছে মন্ত্রপড়া খাঁড়া।
খাপ থেকে বেরিয়ে সে
উঠেছে অট্টহেসে ;
কামার পালায় যত
বলে, 'দাঁড়া দাঁড়া।'
দিনরাত দেয় তার
নাড়ীটাতে নাড়া।

২৮

যখনি যেমনি হোক জিতেনের মর্জি
কথায় কথায় তার লাগে আশ্চর্যি।

অডিটর ছিল জিতু হিসাবেতে টঙ্ক,
আপিসে মেলাতেছিল বজেটের অঙ্ক ;
শুনলে সে, গেছে দেশে রামদীন্ দর্জি,
শুনতে না-শুনতেই বলে 'আশ্চর্যি'।

যে দোকানি গাড়ি তাকে করেছিল বিক্রি
কিছুতে দাম না পেয়ে করেছে সে ডিক্রি,
বিস্ময় ভেবে জিতু উঠল সে গর্জি—
'ভারি আশ্চর্যি'।

শুনলে, জামাইবাড়ি ছিল বুড়ি ঝিনাদায়,
ছ বছর মেলেরিয়া ভুগে ভুগে চিনা দায়,
সেদিন মরেছে শেষে পুরোনো সে ওর ঝি,
জিতেন চশমা খুলে বলে 'আশ্চর্যি'।

২৯

'শুনব হাতির হাঁচি'
এই ব'লে কেষ্টা
নেপালের বনে বনে
ফেরে সারা দেশটা

শুঁড়ে সুড়্‌সুড়ি দিতে
নিয়ে গেল কঞ্চি,
সাত জালা নস্যি ও
রেখেছিল সঞ্চি,
জল কাদা ভেঙে ভেঙে
করেছিল চেষ্টা—
হেঁচে ছ-হাজার হাঁচি
মরে গেল শেষটা।

৩০

আধা রাতে গলা ছেড়ে
মেতেছিনু কাব্যে;
ভাবি নি পাড়ার লোকে
মনেতে কী ভাববে।
ঠেলা দেয় জানলায়,
শেষে দ্বার-ভাঙাভাঙি,
ঘরে ঢুকে দলে দলে
মহা চোখ-রাঙারাঙি—
শ্রাব্য আমার ভোবে
ওদেরই অশ্রাব্যে।
আমি শুধু করেছিনু
সামান্ত ভনিতাই,
সামলাতে পারল না
অরসিক জনে তাই—
কে জানিত অধৈর্য
মোর পিঠে নাববে!

৩১

গুপ্তিপাড়ায় জন্ম তাহার;
নিন্দাবাদের দংশনে
অভিমানে মরতে গেল
মোগলসরাই জংসনে।
কাছা কোঁচা ঘুচিয়ে গুপি
ধরল ইজের, পড়ল টুপি,
দু হাত দিয়ে লেগে গেল
কোফ্তা-কাবাব-ধ্বংসনে।
গুরুপুত্র সঙ্গে ছিল—
বললে তারে, 'অংশ নে।'

৩২

বেণীর মোটরখানা
চালায় মুখুর্জে।
বেণী ঝেঁকে উঠে বলে,
'মরল কুকুর যে!'
অকারণে সেরে দিলে
দফা ল্যাম্-পোস্‌টার,
নিমেষেই পরলোকে
গতি হল মোষটার।
যে দিকে ছুটেছে সোজা
ওদিকে পুকুর যে—
আরে চাপা পড়ল কে?
জামাই খুকুর যে।

৩৩

নাম তার ডাক্তার ময়জন।
বাতাসে মেশায় কড়া পয়জন।
গনিয়া দেখিল, বড়ো বছরের
একখানা রীতিমত শহরের
টিঁকে আছে নাবালক নয়জন।
খুশি হয়ে ভাবে, এই গবেষণা
না জানি সবার কবে হবে শোনা,
শুনিতে বা বাকি রবে কয়জন।

৩৪

খ্যাতি আছে সুন্দরী বলে তার,
ত্রুটি ঘটে নুন দিতে ঝোলে তার;
চিনি কম পড়ে বটে পায়সে
স্বামী তবু চোখ বুজে খায় সে—
যা পায় তাহাই মুখে তোলে তার,
দোষ দিতে মুখ নাহি খোলে তার

৩৫

ঘোষালের বক্তৃতা
করা কর্তব্যই,
বেঞ্চি চৌকি আদি
আছে সব দ্রব্যই।

মাতৃভূমির লাগি
পাড়া ঘুরে মরেছে,
একশো টিকিট বিলি
নিজহাতে করেছে।
চোখ বুজে ভাবে, বুঝি
এল সব সভ্যই।
চোখ চেয়ে দেখে, বাকি
শুধু নিরেনব্বই।

৩৬

কুঁজো তিনকড়ি ঘোরে
পাড়া চারিদিককার,
সন্ধ্যায় ঘরে ফেরে
নিয়ে ঝুলি ভিক্ষার।

বলে সিধু গড়গড়ি
রাগে দাঁত কড়মড়ি,
'ভিখ্ মেগে ফেরো, মনে
হয় না কি ধিক্কার?'
ঝুলি নিজে কেড়ে বলে,
'মাহিনা এ শিক্ষার।'

৩৭

মুরগি-পাখির 'পরে
অন্তরে টান তার,

জীবে তার দয়া আছে
 এই তো প্রমাণ তার।
বিড়াল চাতুরী ক'রে
পাছে পাখি নেয় ধরে
এই ভয়ে সেই দিকে
 সদা আছে কান তার—
শেয়ালের খলতায়
 ব্যথা পায় প্রাণ তার।

৩৮

সন্ধেবেলায় বন্ধুঘরে
 জুটল চুপিচুপি
 গোপেন্দ্র মুস্তফি।

রাত্রে যখন ফিরল ঘরে
সবাই দেখে তারিফ করে—
পাগড়িতে তার জুতোজোড়া,
 পায়ে রঙিন টুপি।

এই উপদেশ দিতে এল—
সব করা চাই এলোমেলো,
'মাথায় পায়ে রাখব না ভেদ'
 চেঁচিয়ে বলে গুপি।

৩৯

সভাতলে ভুঁয়ে
 কাৎ হয়ে শুয়ে
নাক ডাকাইছে সুল্‌তান,
 পাকা দাড়ি নেড়ে
 গলা দিয়ে ছেড়ে
মন্ত্রী গাহিছে মুলতান।

এত উৎসাহ দেখি গায়কের
জেদ হল মনে সেনানায়কের—
কোমরেতে এক ওড়না জড়িয়ে
নেচে করে সভা গুলতান।
ফেলে সব কাজ
বরকন্দাজ
বাঁশিতে লাগায় ভুল তান।

৪০

নাম তার ভেলুরাম ধুনিচাঁদ শিরথ,
ফাটা এক তম্বুরা কিনেছে সে নিরর্থ।
সুরবোধ-সাধনায়
ধুরপদে বাধা নাই ;
পাড়ার লোকেরা তাই হারিয়েছে ধীরত্ব—
অতি-ভালোমানুষেরও বুকে জাগে বীরত্ব।

৪১

ইটের গাদার নীচে
ফটকের ঘড়িটা।
ভাঙা দেয়ালের গায়ে
হেলে-পড়া কড়িটা।
পাচিলটা নেই, আছে
কিছু ইট সুরকি।
নেই দই সন্দেশ,
আছে খই মুড়কি।
ফাটা হুঁকো আছে হাতে,
গেছে গড়গড়িটা।
গলায় দেবার মতো
বাকি আছে দড়িটা।

৪২

নিজের হাতে উপার্জনে
সাধনা নেই সহিষ্ণুতার।
পরের কাছে হাত পেতে খাই,
বাহাদুরি তারি গুঁতার।
কৃপণ দাতার অন্নপাকে
ডাল যদি বা কমতি থাকে
গাল-মিশানো গিলি তো ভাত—
নাহয় তাতে নেইকো সুতার।
নিজের জুতার পাত্তা না পাই,
স্বাদ পাওয়া যায় পরের জুতার।

৪৩

আদর ক'রে মেয়ের নাম
রেখেছে ক্যালিফর্নিয়া,
গরম হল বিয়ের হাট
ঐ মেয়েরই দর নিয়া।

মহেশদাদা খুঁজিয়া গ্রামে গ্রামে
পেয়েছে ছেলে ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ নামে,
শাশুড়ি বুড়ি ভীষণ খুশি
নামজাদা সে বর নিয়া—
ভাটের দল চেঁচিয়ে মরে
নামের গুণ বর্ণিয়া।

৪৪

কন্‌কনে শীত তাই
চাই তার দস্তানা;
বাজার ঘুরিয়ে দেখে
জিনিসটা সস্তা না।

কম দামে কিনে মোজা
বাড়ি ফিরে গেল সোজা—
কিছুতে ঢোকে না হাতে,
তাই শেষে পস্তানা।

৪৫

খবর পেলেম কল্য,
তাঞ্জামেতে চ'ড়ে রাজা
গাঞ্জামেতে চলল।
সময়টা তার জলদি কাটে;
পৌঁছল যেই হলদিঘাটে
একটা ঘোড়া রইল বাকি,
তিনটে ঘোড়া মরল।
গরানহাটায় পৌঁছে সেটা
মুটের ঘাড়ে চড়ল।

৪৬

'সময় চলেই যায়'
নিত্য এ নালিশে
উদ্‌বেগে ছিল ভুপু
মাথা রেখে বালিশে।

কব্‌জির ঘড়িটার
উপরেই সন্দ,
একদম করে দিল
দম তার বন্ধ—
সময় নড়ে না আর,
হাতে বাঁধা খালি সে,
ভুপুরাম অবিরাম
বিশ্রাম-শালী সে।

ঝাঁ-ঝাঁ করে রোদ্দুর,
তবু ভোর পাঁচটায়
ঘড়ি করে ইঙ্গিত
জালাটার কাঁচটায়—
রাত বুঝি ঝক্‌ঝকে
কুঁড়েমির পালিশে।
বিছানায় প'ড়ে তাই
দেয় হাততালি সে।

৪৭

উজ্জ্বলে ভয় তার,
ভয় মিট্‌মিটেতে,
ঝালে তার যত ভয়
তত ভয় মিঠেতে।

ভয় তার পশ্চিমে,
ভয় তার পূর্বে,
যে দিকে তাকায় ভয়
সাথে সাথে ঘুরবে।
ভয় তার আপনার
বাড়িটার ইঁটেতে,
ভয় তার অকারণে
অপরের ভিটেতে।

ভয় তার বাহিরেতে,
ভয় তার অন্তরে,
ভয় তার ভূত-প্রেতে,
ভয় তার মন্তরে।
দিনের আলোতে ভয়
সামনের দিঠেতে,
রাতের আঁধারে ভয়
আপনারি পিঠেতে।

৪৮

কনের পণের আশে
 চাকরি সে ত্যেজেছে।
বারবার আয়নাতে
 মুখখানি মেজেছে।
হেনকালে বিনা কোনো কসুরে
যম এসে ঘা দিয়েছে শশুরে,
 কনেও বাঁকালো মুখ—
 বুকে তাই বেজেছে।
 বরবেশ ছেড়ে হায়
 দরবেশ সেজেছে।

৪৯

বরের বাপের বাড়ি
 যেতেছে বৈবাহিক,
সাথে সাথে ভাঁড় হাতে
 চলেছে দই-বাহিক।
 পণ দেবে কত টাকা
 লেখাপড়া হবে পাকা,
দলিলের খাতা নিয়ে
 এসেছে সই-বাহিক।

৫০

আয়না দেখেই চমকে বলে,
 'মুখ যে দেখি ফ্যাকাশে,
বেশিদিন আর বাঁচব না তো—'
 ভাবছে বসে একা সে।
ডাক্তারেরা লুটল কড়ি,
খাওয়ায় জোলাপ, খাওয়ায় বড়ি,
 অবশেষে বাঁচল না সেই
 বয়স যখন একাশি।

৫১

বাদশার মুখখানা
গুরুতর গম্ভীর,
মহিষীর হাসি নাহি ঘুচে।
কহিলা বাদশা-বীর—
'যতগুলো দস্তীর
দন্ত মুছিব চেঁচে-পুঁছে।'

উঁচু মাথা হল হেঁট,
খালি হল ভরা পেট,
শপাশপ্ পিঠে পড়ে বেত।
কভু ফাঁসি কভু জেল,
কভু শূল কভু শেল,
কভু ক্রোক দেয় ভরা খেত।
মহিষী বলেন তবে—
'দন্ত যদি না র'বে
কী দেখে হাসিব তবে, প্রভু।
বাদশা শুনিয়া কহে—
'কিছুই যদি না রহে
হসনীয় আমি র'ব তবু।

৫২

আপিস থেকে ঘরে এসে
মিলত গরম আহার্য,
আজকে থেকে রইবে না আর
তাহার জো।
বিধবা সেই পিসি ম'রে
গিয়েছে ঘর খালি করে,
বদ্দি স্বয়ং করেছে তার
সাহায্য।

৫৩

গব্বুরাজার পাতে
ছাগলের কোর্মাতে
যবে দেখা গেল তেলা-
পোকাটা
রাজা গেল মহা চ'টে,
চীৎকার করে ওঠে—
'খানসামা কোথাকার
বোকাটা।'

মন্ত্রী জুড়িয়া পাণি
কহে, 'সবই এক প্রাণী।'
রাজার ঘুচিয়া গেল
ধোঁকাটা।
জীবের শিবের প্রেমে
একদম গেল থেমে
মেঝে তার তলোয়ার
ঠোকাটা।

৫৪

নামজাদা দাহুবাবু
রীতিমত খর্‌চে,
অথচ ভিটের তার
ঘুঘু সদা চর্‌ছে।
দানধর্মের 'পরে
মন তার নিবিষ্ট,
রোজগার করিবার
বেলা জপে 'শ্রীবিষ্ণু',
চাদার খাতাটা তাই
ঘারে ঘারে ধরছে।

এই ভাবে পুণ্যের
খাতা তার ভরছে।

৫৫

বহু কোটি যুগ পরে
সহসা বাণীর বরে
জলচর প্রাণীদের
কণ্ঠটা পাওয়া যেই
সাগর জাগর হল
কতমতো আওয়াজেই।
তিমি ওঠে গাঁ গাঁ করে ;
চিঁ চিঁ করে চিংড়ি ;
ইলিস বেহাগ ভাঁজে
যেন মধু নিংড়ি ;
শাঁখগুলো বাজে, বহে
দক্ষিণে হাওয়া যেই ;
গান গেয়ে শুশুকেরা
লাগে কুচ-কাওয়াজেই।

৫৬

আমার পাচকবর গদাধর মিশ্র,
তারি ঘরে দেখি মোর কুন্তলবৃষ্য।
কহিনু তাহারে ডেকে—
'এ শিশিটা এনেছে কে,
শোভন করিতে চাও হেঁশেলের দৃশ্য ?'

সে কহিল 'বরিষার
এই ঋতু ; সরিষার
তেলে ক'রে যায় খাত, বেড়ে যায় কৃশ্য।'

কহে, 'কাঠমুণ্ডার
নেপালের গুণ্ডার
এই তেলে কেটে যায় জঠরের গ্রীষ্ম।
লোকমুখে শুনেছি তো, রাজা-গোলকুণ্ডার
এই সাত্ত্বিক তেলে পূজায় হবিষ্য।
আমি আর তাঁরা সবে চরকের শিষ্য।'

৫৭

রান্নার সব ঠিক,
পেয়েছি তো নুনটা—
অল্প অভাব আছে,
পাই নি বেগুনটা।
পরিবেষণের তরে
আছি মোরা সব ভাই,
যাদের আসার কথা
অনাগত সব্বাই।
পান পেলে পুরো হয়,
জুটিয়েছি চুনটা—
একটু-আধটু বাকি,
নাই তাহে কুণ্ঠা।

৫৮

সর্দিকে সোজাসুজি
সর্দি ব'লেই বুঝি
মেডিকেল বিজ্ঞান না শিখে।
ডাক্তার দেয় শিখ,
টাকা নিয়ে পঁয়ত্রিশ
ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বলে কাশিকে।

ভাবনায় গেল ঘুম,
ওষুধের লাগে ধুম,
শঙ্কা লাগালো পারিভাষিকে।

আমি পুরাতন পাপী,
Hanging শুনেই কাঁপি,
ভরিনেকো সাদাসিধে ফাঁসিকে

শূন্য তবিল যবে,
বলে 'পাচনেই হবে'—
চেতাইল এ ভারতবাসীকে।
নবুস্‌কে ঠেকিয়ে দূরে
যাই বিক্রমপুরে,
সহায় মিলিল খাড়ুমাসিকে।

৫৯

হাস্যদমনকারী গুরু—
নাম যে বশীশ্বর,
কোথা থেকে জুটল তাহার
ছাত্র হসীশ্বর।
হাসিটা তার অপর্যাপ্ত,
তরঙ্গে তার বাতাস ব্যাপ্ত,
পরীক্ষাতে মার্কা যে তাই
কাটেন মসীশ্বর।
ডাকি সরস্বতী মাকে—
'ত্রাণ করো এই ছেলেটাকে,
মাস্টারিতে ভর্তি করো
হাস্যরসীশ্বর।'

ধুনিচাঁদ শিরথ

কবিতাসংখ্যা ৪০

স্ত্রীর বোন

কবিতাসংখ্যা ৬২

৬০

ত্রিজটার প্ল্যান দিল
বড়ো এন্‌জিনিয়ার
ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের
সবচেয়ে সীনিয়ার।
নতুন রকম প্ল্যান
দেখে সবে অজ্ঞান,
বলে, 'এই চাই, এটা
চিনি নাই-চিনি আর।'

ব্রিজখানা গেল শেষে
কোন্‌ অঘটন দেশে,
তার সাথে গেছে ভেসে
ন হাজার গিনি আর।

৬১

স্ত্রীর বোন চায়ে তার
ভুলে ঢেলেছিল কালি,
'শ্যালী' ব'লে ভর্ৎসনা
করেছিল বনমালী।

এত বড়ো গালি শুনে
জ্ব'লে মরে মনাগুনে,
আফিম সে খাবে কিনা
সাত মাস ভাবে খালি,
অথবা কি গঙ্গায়
পোড়া দেহ দিবে ডালি

৬২

ননীলাল বাবু যাবে লঙ্কা ;
শ্যালা শুনে এল, তার
ডাক-নাম টঙ্কা ।

বলে, 'হেন উপদেশ তোমারে দিয়েছে সে কে,
আজও আছে রাক্ষস, হঠাৎ চেহারা দেখে
রামের সেবক ব'লে করে যদি শঙ্কা ।

আকৃতি প্রকৃতি তব হতে পারে জম্‌কালো,
দিদি যা বলুন, মুখ নয় কভু কম কালো—
খামকা তাদের ভয় লাগিবে আচমকা ।
হয়তো বাজাবে রণডঙ্কা ।'

৬৩

ভোলানাথ লিখেছিল,
তিন-চারে নব্বই—
গণিতের মার্কায়
কাটা গেল সর্বই ।

তিন-চারে বারো হয়,
মাস্টার তারে কয় ;
'লিখেছিনু ঢের বেশি'
এই তার গর্বই ।

৬৪

একটা খোঁড়া ঘোড়ার 'পরে
চড়েছিল চাটুজ্জে,

পড়ে গিয়ে কী দশা তার
হয়েছিল হাঁটুর যে !
বলে কেঁদে, 'ব্রাহ্মণেরে
বইতে ঘোড়া পারল না যে
সইত তাও, মরি আমি
তার থেকে এই অধিক লাজে—
লোকের মুখের ঠাট্টা যত
বইতে হবে টাটুর যে !'

৬৫

থাকে সে কাহালগাঁয় ;
কলুটোলা আফিসে
রোজ আসে দশটায়
একায় চাপি সে ।
ঠিক যেই মোড়ে এসে
লাগাম গিয়েছে ফেঁসে,
দেখি হয়ে গেল ব'লে
ভয়ে মরে কাঁপি সে—
ঘোড়াটার লেজ ধ'রে
করে দাপাদাপি সে ।

৬৬

বটে আমি উদ্ধত,
নই তবু ক্রুদ্ধ তো,
শুধু ঘরে মেয়েদের সাথে মোর যুদ্ধ তো ।
যেই দেখি গুণ্ডায়
কমি হেঁটমুণ্ডায়,
দুর্জন মানুষেরে ক্ষমেছেন বুদ্ধ তো ।
পাড়ায় দারোগা এলে দ্বার করি রুদ্ধ তো—
সাত্ত্বিক সাধকের এ আচার শুদ্ধ তো ।

৬৭

ভূত হয়ে দেখা দিল
বড়ো কোলাব্যাঙ,
এক পা টেবিলে রাখে,
কাঁধে এক ঠ্যাঙ।

বনমালী খুড়ো বলে—
'করো মোরে রক্ষে,
শীতল দেহটি তব
বুলিয়ো না বক্ষে।'
উত্তর দেয় না সে,
বলে শুধু 'ক্যাঙ'।

৬৮

পেঁচোটাকে মাসি তার
যত দেয় আস্কারা,
মুশকিল ঘটে তত
এক সাথে বাস করা।
হঠাৎ চিমটি কাটে
কপালের চামড়ায়—
বলে সে, 'এমনি ক'রে
ভিমরুল কামড়ায়।'
আমার বিছানা নিয়ে
খেলা ওর চাষ-করা—
মাথার বালিশ থেকে
তুলোগুলো হ্রাস-করা।

৬৯

কেন যায়' সিঁধ-কাটা ধূর্তে।
কাজ ওর দেয়ালটা খুঁড়তে।

তোমার পকেটটাকে করেছ কি ডোবা হে—
চিরদিন বহমান অর্থের প্রবাহে
বাধা দেবে অপরের পকেটটি পুরতে ?
আর, যত নীতিকথা সে তো ওর চেনা না—
ওর কাছে অর্থনীতিটা নয় জেনানা ;
বদ্ধ ধনেরে তাই দেয় সদা ঘুরতে,
হেথা হতে হোথা তারে চালায় মুহুর্তে।

৭০

যে মাসেতে আপিসেতে
হল তার নাম ছাঁটা
স্ত্রীর শাড়ি নিজে পরে,
স্ত্রী পরিল গামছাটা।
বলে, 'আমি বৈরাগী,
ছেড়ে দেব শিগ্‌গির,
ঘরে মোর যত আছে
বিলাস-সামিগ্‌গির।'
ছিল তার টিনে-গড়া
চা-খাওয়ার চাম্‌চাটা,
কেউ তা কেনে না সেটা
যত করে দাম-ছাঁটা।

৭১

জমল সতেরো টাকা—
সুদে টাকা খেলাবার
শখ গেল, নবু তাই
গেল চলি ম্যালাবার।
ভাবনা বাড়ায় তার
মুনফার মাত্রা,

পাঁচ মেয়ে বিয়ে ক'রে
বাঁচল এ যাত্রা।
কাজ দিল কন্তারা
ঠেলাগাড়ি ঠেলাবার,
রোদ্দুরে ভার্যার
ভিজে চুল এলাবার।

৭২

বেদনায় সারা মন
করতেছে টনটন্‌
শ্যালী কথা বলল না
সেই বৈরাগ্যে।
মরে গেলে ট্রাস্‌টিরা
করে দিক বণ্টন
বিষয়-আশয় যত—
সব-কিছু যাক গে।
উমেদারি-পথে আহা
ছিল যাহা সঙ্গী—
কোথা সে শ্যামবাজার
কোথা চৌরঙ্গি—
সেই ছেঁড়া ছাতা চোরে
নেয় নাই ভাগ্যে—
আর আছে ভাঙা ঐ
হ্যারিকেন লণ্ঠন,
বিশ্বের কাজে তারা
লাগে যদি লাগ্‌ গে।

৭৩

ইস্কুল-এড়ায়নে
সেই ছিল বরিষ্ঠ,

ম্যালাবারের কন্যা

কবিতাসংখ্যা ৭১

দাঁয়েদের গিন্নিটি

কবিতাসংখ্যা ৭৪

ফেল-করা ছেলেদের
সবচেয়ে গরিষ্ঠ।
কাজ যদি জুটে যায়
দুদিনে তা ছুটে যায়,
চাকরির বিভাগে সে
অতিশয় নড়িষ্ঠ—
গলদ করিতে কাজে
ভয়ানক দ্রঢ়িষ্ঠ।

৭৪

দাঁয়েদের গিন্নিটি
কিপ্‌টে সে অতিশয়,
পান থেকে চুন গেলে
কিছুতে না ক্ষতি সয়।
কাঁচকলা-খোবা দিয়ে
পচা মহুয়ার ঘিয়ে
ছেঁচকি বানিয়ে আনে—
সে কেবল পতি সয়;
একটু করলে 'উহুঁ'
যদি এক-রতি সয়!

৭৫

আধখানা বেল
খেয়ে কানু বলে—
'কোথা গেল বেল
একখানা।'
আধা গেলে শুধু
আধা বাকি থাকে,
যত করি আমি
ব্যাখ্যানা,

সে বলে, 'তা হলে মহা ঠকিলাম,
আমি তো দিয়েছি ষোল-আনা দাম।'
হাতে হাতে সেটা করিল প্রমাণ
ঝাড়া দিয়ে তার
ব্যাগখানা।

৭৬

পাড়াতে এসেছে এক
নাড়ীটেপা ডাক্তার,
দূর থেকে দেখা যায়
অতি উঁচু নাক তার।
নাম লেখে ওষুধের,
এ দেশের পণ্ডদের
সাধ্য কী পড়ে তাহা
এই বড়ো জাঁক তার।
যেথা যায় বাড়ি বাড়ি
দেখে যে ছেড়েছে নাড়ী,
পাওনাটা আদায়ের
মেলে না যে ফাঁক তার।
গেছে নির্বাক্‌পুরে
ভক্তের ঝাঁক তার।

৭৭

ইয়ারিং ছিল তার দু কানেই।
গেল যবে স্যাকরার দোকানেই
মনে প'ল, গয়না তো চাওয়া যায়,
আরেকটা কান কোথা পাওয়া যায়—
সে কথাটা নোটবুকে টোকা নেই।
মাসি বলে, 'তোর মতো বোকা নেই

৭৮

লটারিতে পেল পীতু
হাজার পঁচাত্তর,
জীবনী লেখার লোক
জুটিল সে-মাত্তর।

যখনি পড়িল চোখে
চেহারাটা চেক্‌টার
'আমি পিসে' কহে এসে
ড্রেন্‌ইন্‌স্‌পেক্‌টার।
গুরু-ট্রেনিঙের এক
পিলেওয়ালা ছাত্তর
অযাচিত এল তার
কন্যার পাত্তর।

৭৯

চিন্তাহরণ দালালের বাড়ি
গিয়ে
একশো টাকার একখানি নোট
দিয়ে
তিনখানা নোট আনে সে
দশ টাকার।

কাগজ-গন্‌তি মুনফা যতই
বাড়ে
টাকার গন্‌তি লক্ষ্মী ততই
ছাড়ে,
কিছুতে বুঝিতে পারে না
দোষটা কার।

৮০

জিরাফের বাবা বলে—
'খোকা তোর দেহ
দেখে দেখে মনে মোর
ক'মে যায় স্নেহ।
সামনে বিষম উঁচু,
পিছনেতে খাটো,
এমন দেহটা নিয়ে
কী করে যে হাঁটো।'

খোকা বলে, 'আপনার
পানে তুমি চেহো,
মা যে কেন ভালোবাসে
বোঝে না তা কেহ।'

৮১

যখন জলের কল
হয়েছিল পুলতায়
সাহেবে জানালো খুদু,
ভরে দেবে জল তায়।
ঘড়াগুলো পেত যদি
শহরে বহাত নদী,
পারে নি যে সে কেবল
কুমোরের খলতায়।

৮২

মহারাজা ভয়ে থাকে
পুলিসের থানাতে,
আইন বানায় যত
পারে না তা মানাতে।

চর ফিরে ডাকে ডাকে—
সাধু যদি ছাড়া থাকে
খোঁজ পেলে নৃপতিরে
হয় তাহা জানাতে,
রক্ষা করিতে তারে
রাখে জেলখানাতে।

৮৩

বাংলাদেশের মানুষ হয়ে
ছুটিতে ধাও চিতোরে,
কাঁচড়াপাড়ার জলহাওয়াটা
লাগল এতই তিতো রে?

মরিস ভয়ে ঘরের প্রিয়ার,
পালাস ভয়ে ম্যালেরিয়ার,
হায় রে ভীরু, রাজপুতানার
ভূত পেয়েছে কী তোরে।
লড়াই ভালোবাসিস, সে তো
আছেই ঘরের ভিতরে।

৮৪

ডাকাতের সাড়া পেয়ে
তাড়াতাড়ি ইজেরে
চোখ ঢেকে মুখ ঢেকে
ঢাকা দিল নিজেরে।

পেটে ছুরি লাগালো কি,
প্রাণ তার ভাগালো কি,
দেখতে পেল না কালু
হল তার কী যে রে!

৮৫

গণিতে রেলেটিভিটি প্রমাণের ভাব্‌নায়
দিনরাত একা ব'সে কাটালো সে পাব্‌নায়—
নাম তার চুনিলাল, ডাক নাম ঝোড়্‌কে।
১ গুলো সবই ১ সাদা আর কালো কি,
গণিতের গণনায় এ মতটা ভালো কি।
অবশেষে সাম্যের সামলাবে তোড় কে।

একের বহর কভু বেশি কভু কম হবে,
এক রীতি হিসাবের তবুও কি সম্ভবে।
৭ যদি বাঁশ হয়, ৩ হয় খড়কে,
তবু শুধু ১০ দিয়ে জুড়বে সে জোড় কে

যোগ যদি করা যায় হিড়িম্বা কুন্তীতে,
সে কি ২ হতে পারে গণিতের গুন্‌তিতে।
যতই না কষে নাও মোচা আর থোড়কে
তার গুণফল নিয়ে আঁক যাবে ভড়কে।

৮৬

তম্বুরা কাঁধে নিয়ে
শর্মা বাণেশ্বর
ভেবেছিল, তীর্থেই
যাবে সে থানেশ্বর।
হঠাৎ খেয়াল চাপে গাইয়ের কাজ নিতে—
বরাবর গেল চলে একদম গাজ্‌নিতে,
পাঠানের ভাব দেখে
ভাঙিল গানের স্বর।

৮৭

নিদ্রা-ব্যাপার কেন
হবেই অবাধ্য,
চোখ-চাওয়া ঘুম হোক
মানুষের সাধ্য—
এম. এস্‌সি বিভাগের ব্রিলিয়ান্ট্ ছাত্র
এই নিয়ে সন্ধান করে দিনরাত্র,
বাজায় পাড়ার কানে
নানাবিধ বাদ্য,
চোখ-চাওয়া ঘটে তাহে,
নিদ্রার শ্রাদ্ধ।

৮৮

দিন চলে না যে, নিলেমে চড়েছে
খাট-টিপাই।
ব্যাবসা ধরেছি গল্পেরে কয়া
নাট্য-fy।
ক্রিটিক মহল করেছি ঠাণ্ডা,
মুর্গি এবং মুর্গি-আণ্ডা
খেয়ে করে শেষ, আমি হাড় দুটি-
চারটি পাই—
ভোজন-ওজনে লেখা ক'রে দেয়
certify।

৮৯

জান তুমি, রাত্তিরে
নাই মোর সাথি আর—
ছোটোবউ, জেগে থেকো,
হাতে রেখো হাতিয়ার।
যদি করে ডাকাতি,
পারি নে যে তাকাতেই,

আছে এক ভাঙা বেত
আছে ছেঁড়া ছাতি আর।
ভাঙতে চায় না ঘুম,
তা না হলে দুমাদুম্
লাগাতেম কিল ঘুষি
চালাতেম লাথি আর

৯০

পণ্ডিত কুমিরকে
ডেকে বলে, 'নক্র,
প্রখর তোমার দাঁত,
মেজাজটা বক্র।
আমি বলি নখ তব
করো তুমি কর্তন,
হিংস্র স্বভাব তবে
হবে পরিবর্তন
আমিষ ছাড়িয়া যদি
শুধু খাও তক্র।'

৯১

শ্বশুরবাড়ির গ্রাম,
নাম তার কুলকাঁটা,
যেতে হবে উপেনের—
চাই তাই চুল-ছাঁটা।
নাপিত বললে, 'কাঁচি
খুঁজে যদি পাই বাঁচি—
ক্ষুর আছে, একেবারে
করে দেব মূল-ছাঁটা।
জেনো বাবু, তা হলেই
বেঁচে যায় ভুল-ছাঁটা।'

৯২

খড়দয়ে যেতে যদি সোজা এস খুল্‌না
যত কেন রাগ করো, কে বলে তা ভুল না।

মালা গাঁথা পণ ক'রে আন যদি আমড়া,
রাগ করে বেত মেরে ফাটাও-না চামড়া,
তবুও বলতে হবে— ও জিনিস ফুল না।

বেঞ্চিতে বসে তুমি বল যদি 'দোল দাও',
চটে-মটে শেষে যদি কড়া কড়া বোল দাও,
পষ্ট বুঝিয়ে দেব— ওটা নয় ঝুল্‌না।

যদি বা মাথার গোলে ঘরে এসে বসবার
হাটুতে বুরুষ করো একমনে দশবার,
কী করি, বলতে হবে— ওখানে তো চুল না

৯৩

নীলুবাবু বলে, 'শোনো
নেয়ামৎ দর্জি,
পুরোনো ফ্যাশানটাতে
নয় মোর মর্জি।'
শুনে নিয়ামৎ মিঞা যতনে পঁচিশটে
সম্মুখে ছিদ্র, বোতাম দিল পৃষ্ঠে।
লাফ দিয়ে বলে নীলু, 'এ কী আশ্চর্যি!'
ঘরের গৃহিণী কয়, 'রয় না তো ধর্যি।'

৯৪

বিড়ালে মাছেতে হল সখ্য।
বিড়াল কহিল, 'ভাই ভক্ষ্য,
বিধাতা স্বয়ং জেনো সর্বদা কন তোরে—
ঢোকো গিয়ে বন্ধুর রসময় অন্তরে,
সেখানে নিজেরে তুমি সযতনে রক্ষ।

ঐ দেখো পুকুরের ধারে আছে ঢালু ডাঙা,
ঐখানে শয়তান বসে থাকে মাছরাঙা,
কেন মিছে হবে ওর চক্ষুর লক্ষ্য !'

৯৫

হরপণ্ডিত বলে, 'ব্যঞ্জন সন্ধি এ,
পড়ো দেখি, মন্টুবাবা, একটুকু মন দিয়ে।'

মনোযোগহন্ত্রীর
বেড়ি আর খন্তির
ঝংকার মনে পড়ে ; হেঁসেলের পন্থার
ব্যঞ্জন-চিন্তায় অস্থির মন তার।
থেকে থেকে জল পড়ে চক্ষুর কোণ দিয়ে।

৯৬

ঝিনেদার জানদার
ছেলেটার জন্যে
ত্রিচিনাপল্লী গিয়ে
খুঁজে পেল কন্যে।

শহরেতে সব-সেরা
ছিল যেই বিবেচক
দেখে দেখে বললে সে—
'কিবে নাক, কিবে চোখ ;
চুলের ডগার খুঁত
বুঝবে না অন্যে।'

কন্যেকর্তা শুনে
ঘটকের কানে কয়—

'ওটুকু ত্রুটির তরে
করিস নে কোনো ভয় ;
ক'খানা মেয়েকে বেছে
আরো তিনজন নে,
তাতেও না ভরে যদি
ভরি কয় পণ নে।'

৯৭

খুদিরাম ক'সে টান
দিল খেলো হুঁকোতে—
গেল সারবান কিছু
অন্তরে ঢুকোতে।
অবশেষে হাঁড়ি শেষ
করি রসগোল্লার
রোদে বসে খুদুবাবু
গান ধরে মোল্লার,
বলে, 'এতখানি রস
দেহ থেকে চুকোতে
হবে তাকে ধোঁয়া দিয়ে
সাত দিন শুকোতে।'

৯৮

প্রাইমারি ইস্কুলে
প্রায়-মারা পণ্ডিত
সব কাজ ফেলে রেখে
ছেলে করে দণ্ডিত।
নাকে খত দিয়ে দিয়ে
ক্ষয়ে গেল যত নাক,
কথা-শোনবার পথ
টেনে টেনে করে ফাঁক।

ক্লাসে যত কান ছিল
সব হল খণ্ডিত,
বেঙ্কিটেঙ্কিগুলো
লণ্ডিত ভণ্ডিত।

৯৯

জন্মকালেই ওর লিখে দিল কুষ্ঠি,
ভালো মানুষের 'পরে চালাবে ও মুষ্টি।

যতই প্রমাণ পায় বাবা বলে, 'মোদ্দা,
কভু জন্মে নি ঘরে এত বড়ো যোদ্ধা।'
'বেঁচে থাকলেই বাঁচি' বলে ঘোষগুষ্টি—
এত গাল খায় তবু এত পরিপুষ্টি।

১০০

টাকা সিকি আধুলিতে
ছিল তার হাত জোড়া;
সে-সাহসে কিনেছিল
পান্তোয়া সাত ঝোড়া।

ফুঁকে দিয়ে কড়াকড়ি
শেষে হেসে গড়াগড়ি;
ফেলে দিতে হল সব—
আলুভাতে পাত-জোড়া।

১০১

বেলা আটটার কমে
খোলে না তো চোখ সে।
সামলাতে পারে না যে
নিদ্রার ঝোঁক সে।
জরিমানা হলে বলে—
'এসেছি যে মা ফেলে,

আমার চলে না দিন
মাইনেটা না পেলে।
তোমার চলবে কাজ
যে ক'রেই হোক সে,
আমারে অচল করে
মাইনের শোক সে।'

১০২

বশীরহাটেতে বাড়ি
বশ-মানা ধাত তার,
ছেলে বুড়ো যে যা বলে
কথা শোনে যার-তার।

দিনরাত সর্বথা
সাধে নিজ খর্বতা,
মাথা আছে হেঁট-করা,
সদা জোড় হাত তার,
সেই ফাঁকে কুকুরটা
চেটে যায় পাত তার।

১০৩

নাম তার চিন্তুলাল
হরিরাম মোতিভয়,
কিছুতে ঠকায় কেউ
এই তার অতি ভয়।
সাতানব্বই থেকে
তেরোদিন ব'কে ব'কে
বারোতে নামিয়ে এনে
তবু ভাবে, গেল ঠকে।
মনে মনে আঁক কষে,
পদে পদে ক্ষতি-ভয়।

কষ্টে কেরানি তার
টিঁকে আছে কতিপয়

১০৪

হাজারিবাগের ঝোপে হাজারটা হাই
তুলেছিল হাজারটা বাঘে,
ময়মন্‌সিংহের মাসতুত ভাই
গর্জি উঠিল তাই রাগে।
খেঁকশেয়ালের দল শেয়ালদহর
হাঁচি শুনে হেসে মরে অষ্টপ্রহর,
হাতিবাগানের হাতি ছাড়িয়া শহর
ভাগলপুরের দিকে ভাগে—
গিরিডির গিরগিটি মস্ত-বহর
পথ দেখাইয়া চলে আগে।
মহিশূরে মহিষটা খায় অড়হর—
খামকাই তেড়ে গিয়ে লাগে।

১০৫

স্বপ্ন হঠাৎ উঠল রাতে
প্রাণ পেয়ে,
মৌন হতে ত্রাণ পেয়ে।
ইন্দ্রলোকের পাগ্‌লাগারদ
খুলল তারই দ্বার,
পাগল ভুবন দুর্দাড়িয়া
ছুটল চারিধার—
দারুণ ভয়ে মানুষগুলোর
চক্ষে বারিধার,
বাঁচল আপন স্বপন হতে
খাটের তলায় স্থান পেয়ে।

সংযোজন

১

পাবনায় বাড়ি হবে, গাড়ি গাড়ি ইঁট কিনি,
রাঁধুনিমহল-তরে করোগেট-শীট্ কিনি।
ধার ক'রে মিস্ত্রির সিকি বিল চুকিয়েছি,
পাওনাদারের ভয়ে দিনরাত লুকিয়েছি,
শেষে দেখি জানলায় লাগে নাকো ছিট্‌কিনি।
দিনরাত ছুড়্‌দাড়্ কী বিষম শব্দ যে,
তিনটে পাড়ার লোক হয়ে গেল জব্দ যে,
ঘরের মানুষ করে খিট্ খিট্ খিট্‌কিনি।

কী করি না ভেবে পেয়ে মথুরায় দিনু পাড়ি,
বাজে খরচের ভয়ে আরেকটা পাকাবাড়ি
বানাবার মতলবে পোড়ো এক ভিট কিনি।
তিনতলা ইমারত শোভা পায় নবাবেরই,
সিঁড়িটা রইল বাকি চিহ্ন সে অভাবেরই,
তাই নিয়ে গৃহিণীর কী যে নাক-সিট্‌কিনি।

শান্তিনিকেতন
৫ বৈশাখ ১৩৪৪

২

বালিশ নেই, সে ঘুমোতে যায় মাথার নীচে ইঁট দিয়ে।
কাঁথা নেই, সে প'ড়ে থাকে রোদের দিকে পিঠ দিয়ে।
শ্বশুর বাড়ি নেমন্তন্ন, তাড়াতাড়ি তারই জন্য
ছেঁড়া গামছা পরেছে সে তিনটে-চারটে গিঁঠ দিয়ে।
ভাঙা ছাতার বাঁটখানাতে ছড়ি ক'রে চায় বানাতে,
রোদে মাথা ঠাণ্ডা করে ঠাণ্ডা জলের ছিট দিয়ে।
হাসির কথা নয় এ মোটে, খেঁকশেয়ালিই হেসে ওঠে
যখন রাতে পথ করে সে হতভাগার ভিট দিয়ে।

৩

পাঁচদিন ভাত নেই, দুধ একরত্তি—
জ্বর গেল, যায় না যে তবু তার পথ্যি।

সেই চলে জলসাবু, সেই ডাক্তারবাবু,
কাঁচা কুলে আমড়ায় তেমনি আপত্তি।

ইস্কুলে যাওয়া নেই সেইটে যা মঙ্গল—
পথ খুঁজে ঘুরিনেকো গণিতের জঙ্গল।
কিন্তু যে বুক ফাটে দূর থেকে দেখি মাঠে
ফুটবল-ম্যাচে জমে ছেলেদের দঙ্গল।

কিঙ্করাম পণ্ডিত, মনে পড়ে, টাক তার—
সমান ভীষণ জানি চুনিলাল ডাক্তার।
খুলে ওষুধের ছিপি হেসে আসে টিপিটিপি—
দাঁতের পাটিতে দেখি, দুটো দাঁত ফাঁক তার।

জ্বরে বাঁধে ডাক্তারে, পালাবার পথ নেই;
প্রাণ করে হাঁসফাঁস যত থাকি যত্নেই।
জ্বর গেলে মাস্টারে গিঁঠ দেয় ফাঁসটারে—
আমারে ফেলেছে সেরে এই দুটি রত্নেই।

উদয়ন
শান্তিনিকেতন
১৫।৯।৩৮

৪

মানিক কহিল, 'পিঠ পেতে দিই দাঁড়াও।
আম দুটো ঝোলে, ওর দিকে হাত বাড়াও।
উপরের ডালে সবুজে ও লালে
ভরে আছে, কষে নাড়াও।
নীচে নেমে এসে ছুরি দিয়ে শেষে
ব'সে ব'সে খোসা ছাড়াও।
যদি আসে মালি চোখে দিয়ে বালি
পারো যদি তারে তাড়াও।
বাকি কাজটার মোর 'পরে ভার,
পাবে না শাঁসের সাড়াও।
আঁঠি যদি থাকে দিয়ো মালিটাকে,
মাড়াব না তার পাড়াও।

পিসিমা রাগিলে তাঁর চড়ে কিলে
বাঁদরামি-ভূত ঝাড়াও।'

৫

ভোতনমোহন স্বপ্ন দেখেন, চড়েছেন চৌঘুরি।
মোচার খোলায় গাড়িতে তাঁর ব্যাঙ দিয়েছেন জুড়ি।
পথ দেখালো মাছরাঙাটায়, দেখল এসে চিংড়িঘাটায়—
ঝুম্‌কো ফুলের বোঝাই নিয়ে মোচার খোলা ভাসে।
খোকনবাবু বিষম খুশি খিল্‌খিলিয়ে হাসে।

উত্তরায়ণ
৫।৯।৩৮

৬

গিন্নির কানে শোনা ঘটে অতি সহজেই
'গিনি সোনা এনে দেব' কানে কানে কহ যেই।
না হলে তোমারি কানে দুর্গ্রহ টেনে আনে,
অনেক কঠিন শোনা— চুপ করে রহ যেই।

৭

ধীর কহে শূন্যেতে মজো রে,
নিরাধার সত্যেরে ভজো রে।
এত বলি যত চায় শূন্যেতে ওড়াটা
কিছুতে কিছু-না-পানে পৌঁছে না ঘোড়াটা,
চাবুক লাগায় তারে সজোরে।
ছুটে মরে সারারাত, ছুটে মরে সারাদিন—
হয়রান হয়ে তবু আমিহীন ঘোড়াহীন
আপনারে নাহি পড়ে নজরে।

৮

ট্রাম্‌-কন্‌ডাক্টার,
হুইসেলে ফুঁক দিয়ে শহরের বুক দিয়ে
গাড়িটা চালায়, তার সীমা নেই ডাকটার।

বারো-আনা ফাঁকা তার মাথাটার তেলো যে,
চিরুনির চালাচালি শেষ হয়ে এল যে।
বিধাতার নিজ হাতে ঝাঁট-দেওয়া ফাঁকটার
কিছু চুল দুপাশেতে ফুটপাথ আছে পেতে,
মাঝে বড়ো রাস্তাটা বুক জুড়ে টাকটার।

৯

মাস্টার বলে, 'তুমি দেবে ম্যাট্রিক,
এক লাফে দিতে চাও হবে না সে ঠিক।
ঘরে দাদামশায়ের দেখো example,
সত্তর বৎসরও হয়নিকো ample।
একদা পরীক্ষায় হবে উত্তীর্ণ
যখন পাকবে চুল, হাড় হবে জীর্ণ।'

১০

তিনকড়ি। তোল্‌পাড়িয়ে উঠল পাড়া,
তবু কর্তা দেন না সাড়া! জাগুন শিগ্‌গির জাগুন্‌।
কর্তা। এলারামের ঘড়িটা যে
চুপ রয়েছে, কই সে বাজে—
তিনকড়ি। ঘড়ি পরে বাজবে, এখন ঘরে লাগল আগুন।
কর্তা। অসময়ে জাগলে পরে
ভীষণ আমার মাথা ধরে—
তিনকড়ি। জানলাটা ঐ উঠল জ্বলে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ভাগুন।
কর্তা। বড্ড জ্বালায় তিনকড়িটা—
তিনকড়ি। জ্বলে যে ছাই হল ভিটা,
ফুটপাথে ঐ বাকি ঘুমটা শেষ করতে লাগুন।

১১

গাড়িতে মদের পিপে ছিল তেরো-চোদ্দো,
এঞ্জিনে জল দিতে দিল ভুলে মদ্য।

চাকাগুলো ধেয়ে করে ধানখেত-ধ্বংসন,
বাঁশি ডাকে কেঁদে কেঁদে 'কোথা কাম্বু জংশন'—

ট্রেন করে মাতলামি নেহাত অবোধ্য,
সাবধান করে দিতে কবি লেখে পদ্য।

১২

রায়ঠাকুরানী অম্বিকা।
দিনে দিনে তাঁর বাড়ে বাণীটার লম্বিকা।
অবকাশ নেই তবুও তো কোনো গতিকে
নিজে ব'কে যান, কহিতে না দেন পতিকে।
নারীসমাজের তিনি তোরণের স্তম্ভিকা।
সয় নাকো তাঁর দ্বিতীয় কাহারো দম্ভিকা।

১৩

জর্মন প্রোফেসার দিয়েছেন গোঁফে সার কত যে!
উঠেছে ঝাঁকড়া হয়ে খোঁচা-খোঁচা ছাঁটা ছাঁটা—
দেখে তাঁর ছাত্রের ভয়ে গায়ে দেয় কাঁটা,
মাটির পানেতে চোখ নত যে।
বৈদিক ব্যাখ্যায় বাণী তাঁর মুখে এসে
যে নিমেষে পা বাড়ান ওষ্ঠের দ্বারদেশে
চরণকমল হয় ক্ষত যে।

১৪

হাত দিয়ে পেতে হবে কী তাহে আনন্দ—
হাত পেতে পাওয়া যাবে সেটাই পছন্দ।
আপিসেতে খেটে মরা তার চেয়ে ঝুলি ধরা
ঢের ভালো— এ কথায় নাই কোনো সন্দ।

১৫

দোতলায় ধুপ্‌ধাপ্‌ হেমবাবু দেয় লাফ,
মা বলেন, একি খেলা ভূতের নাচন নেচে?
নাকি সুরে বলে হেমা, 'চলতে যে পারি নে, মা,
সকালে সর্দি লেগে যেমনি উঠেছি হেঁচে
অমনি যে খচ্‌ করে পা আমার মচ্‌কেছে।'

১৬

কনে দেখা হয়ে গেছে, নাম তার চন্দনা ;
তোমারে মানাবে ভায়া, অতিশয় মন্দ না।
লোকে বলে, খিট্‌খিটে, মেজাজটা নয় মিঠে—
দেবী ভেবে নেই তারে করিলে বা বন্দনা।
কুঁজো হোক, কালো হোক, কালাও না, অন্ধ না।

১৭

পাতালে বলিরাজার যত বলীরামরা,
ভূতলেতে ঘাসিরাম আর ঘনশ্যামরা,
লড়াই লাগালো বেগে ; ভূমিকম্পন লেগে
চারি দিকে হাহাকার করে ওঠে গ্রামরা।
মানুষ কহিল, 'ক্রমে খবর উঠছে জমে,
সেটা খুব মজা, তবু মরি কেন আমরা।'

১৮

মাঝে মাঝে বিধাতার ঘটে একি ভুল—
ধান পাকাবার মাসে ফোটে বেলফুল।
হঠাৎ আনাড়ি কবি তুলি হাতে আঁকে ছবি,
অকারণে কাঁচা কাজে পেকে যায় চুল।

১৯

পেন্‌সিল টেনেছিনু হপ্তায় সাতদিন,
রবার ঘষেছি শেষে তিনমাস রাতদিন।
কাগজ হয়েছে সাদা ; সংশোধনের বাধা
ঘুচে গেছে, এইবার শিক্ষক হাত দিন—
কিন্তু ছবির কোণে স্বাক্ষর বাদ দিন।

২০

বলিয়াছিনু মামারে—
তোমারি ঐ চেহারাখানি কেন গো দিলে আমারে।
তখনো আমি জন্মি নি তো, নেহাত ছিনু অপরিচিত,
আগেভাগেই শাস্তি এমন, এ কথা মনে ঘা মারে।
হাড় ক'খানা চামড়া দিয়ে ঢেকেছে যেন চামারে।

২১

কাঁধে মই, বলে 'কই ভুঁইচাঁপা গাছ',
দইভাঁড়ে ছিপ ছাড়ে, খোঁজে কইমাছ,
ঘুঁটেছাই মেখে লাউ রাঁধে ঝাউপাতা—
কী খেতাব দেব তায় ঘুরে যায় মাথা।

২২

শিমুল রাঙা রঙে চোখেরে দিল ভ'রে।
নাকটা হেসে বলে, 'হায় রে যাই ম'রে।'
নাকের মতে, গুণ কেবলি আছে ঘ্রাণে,
রূপ যে রঙ খোঁজে নাকটা তা কি জানে।

২৩

আইডিয়াল নিয়ে থাকে, নাহি চড়ে হাঁড়ি।
প্র্যাক্‌টিক্যাল লোকে বলে, এ যে বাড়াবাড়ি।
শিবনেত্র হল বুঝি, এইবার মোলো—
অক্সিজেন নাকে দিয়ে চাঙ্গা ক'রে তোলো।

২৪

খুব তার বোলচাল, সাজ ফিট্‌ফাট্,
তক্‌রার হলে আর নাই মিট্‌মাট্।
চশমায় চম্‌কায়, আড়ে চায় চোখ—
কোনো ঠাঁই ঠেকে নাই কোনো বড়ো লোক।

ছড়ার ছবি

ভূমিকা

এই ছড়াগুলি ছেলেদের জন্যে লেখা। সবগুলো মাথায় এক নয়; রোলার চালিয়ে প্রত্যেকটি সমান সুগম করা হয় নি। এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত জটিল যদি কোনোটা থাকে তবে তার অর্থ হবে কিছু দুরূহ, তবু তার ধ্বনিতে থাকবে সুর। ছেলেমেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না, খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে। ওরা অর্থলোভী জাত নয়।

ছড়ার ছন্দ প্রাকৃত ভাষার ঘরাও ছন্দ। এ ছন্দ মেয়েদের মেয়েলি আলাপ, ছেলেদের ছেলেমি প্রলাপের বাহনগিরি করে এসেছে। ভদ্র-সমাজে সভাযোগ্য হবার কোনো খেয়াল এর মধ্যে নেই। এর ভঙ্গীতে এর সজ্জায় কাব্যসৌন্দর্য সহজে প্রবেশ করে, কিন্তু সে অজ্ঞাতসারে। এই ছড়ায় গভীর কথা হালকা চালে পায়ে নূপুর বাজিয়ে চলে, গাম্ভীর্যের গুমোর রাখে না। অথচ এই ছড়ার সঙ্গে ব্যবহার করতে গিয়ে দেখা গেল, যেটাকে মনে হয় সহজ সেটাই সব চেয়ে কম সহজ।

ছড়ার ছন্দকে চেহারা দিয়েছে প্রাকৃত বাংলা শব্দের চেহারা। আলোর স্বরূপ সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানে দুটো উলটো কথা বলে। এক হচ্ছে আলোর রূপ ঢেউয়ের রূপ, আর হচ্ছে সেটা কণাবৃষ্টির রূপ। বাংলা সাধুভাষার রূপ ঢেউয়ের, বাংলা প্রাকৃত-ভাষার রূপ কণাবৃষ্টির। সাধু-ভাষার শব্দগুলি গায়ে গায়ে মিলিয়ে গড়িয়ে চলে, শব্দগুলির ধ্বনি স্বরবর্ণের মধ্যবর্তিতায় আঁট বাঁধতে পারে না। দৃষ্টান্ত যথা— শমন-দমন রাবণ রাজা, রাবণদমন রাম। বাংলা প্রাকৃত ভাষায় হসন্ত-প্রধান ধ্বনিতে ফাঁক বুজিয়ে শব্দগুলিকে নিবিড় করে দেয়। পাতলা, আঁজলা, বাদলা, পাপড়ি, চাঁদনি প্রভৃতি নিরেট শব্দগুলি সাধুভাষার ছন্দে গুরুপাক।

সাধুভাষার ছন্দে ভদ্র বাঙালি চলতে পারে না, তাকে চলিতে হয়, বসতে তার নিষেধ, বসিতে সে বাধ্য।

ছড়ার ছন্দটি যেমন ঘেঁষাঘেঁষি শব্দের জায়গা, তেমনি সেই সব ভাবের উপযুক্ত— যারা অসতর্ক চালে ঘেঁষাঘেঁষি করে রাস্তায় চলে, যারা পদাতিক, যারা রথচক্রের মোটা চিহ্ন রেখে যায় না পথে পথে, যাদের হাটে মাঠে যাবার পায়ে-চলার-চিহ্ন ধুলোর উপর পড়ে আর লোপ পেয়ে যায়।

শান্তিনিকেতন
২ আশ্বিন ১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৌমাকে

ছড়ার ছবি

জলযাত্রা

নৌকো বেঁধে কোথায় গেল, যা ভাই মাঝি ডাকতে,
মহেশগঞ্জে যেতে হবে শীতের বেলা থাকতে।
পাশের গাঁয়ে ব্যাবসা করে ভায়ে আমার বলাই,
তার আড়তে আসব বেচে খেতের নতুন কলাই।
সেখান থেকে বাদুড়ঘাটা আন্দাজ তিনপোয়া,
যদুঘোষের দোকান থেকে নেব খইয়ের মোয়া।
পেরিয়ে যাব চন্দনীদ' মুন্সিপাড়া দিয়ে,
মালসি যাব, পুঁটকি সেথায় থাকে মায়ে ঝিয়ে।
ওদের ঘরে সেরে নেব দুপুরবেলার খাওয়া;
তার পরেতে মেলে যদি পালের যোগ্য হাওয়া
একপহরে চলে যাব মুখ্‌লুচরের ঘাটে,
যেতে যেতে সন্ধে হবে খড়কেডাঙার হাটে।
সেথায় থাকে নওয়াপাড়ায় পিসি আমার আপন,
তার বাড়িতে উঠব গিয়ে, করব রাত্রিযাপন।
তিন পহরে শেয়ালগুলো উঠবে যখন ডেকে
ছাড়ব শয়ন ঝাউয়ের মাথায় শুকতারাটি দেখে।
লাগবে আলোর পরশমণি পুব আকাশের দিকে,
একটু ক'রে আঁধার হবে ফিকে।
বাঁশের বনে একটি-দুটি কাক
দেবে প্রথম ডাক।
সদর পথের ঐ পারেতে গোঁসাইবাড়ির ছাদ
আড়াল করে নামিয়ে নেবে একাদশীর চাঁদ।
উস্‌খুস্‌ করবে হাওয়া শিরীষ গাছের পাতায়,
রাঙা রঙের ছোঁয়া দেবে দেউল-চূড়োর মাথায়।

বোষ্টমি সে ঠুনুঠুনু বাজাবে মন্দিরা,
সকালবেলার কাজ আছে তার নাম শুনিয়ে ফিরা।
হেলেদুলে পোষা হাঁসের দল
যেতে যেতে জলের পথে করবে কোলাহল।
আমারও পথ হাঁসের যে-পথ, জলের পথে যাত্রী,
ভাসতে যাব ঘাটে ঘাটে ফুরোবে যেই রাত্রি।
সাঁতার কাটব জোয়ার-জলে পৌঁছে উজিরপুরে,
শুকিয়ে নেব ভিজে ধুতি বালিতে রোদ্দুরে।
গিয়ে ভজনঘাটা
কিনব বেগুন পটোল মুলো, কিনব সজনেডাঁটা।
পৌঁছব আটবাঁকে,
সূর্য উঠবে মাঝগগনে, মহিষ নামবে পাঁকে।
কোকিল-ডাকা বকুল-তলায় রাঁধব আপন হাতে,
কলার পাতায় মেখে নেব গাওয়া ঘি আর ভাতে।
মাখনাগাঁয়ে পাল নামাবে, বাতাস যাবে থেমে;
বনঝাউ-ঝোপ রঙিয়ে দিয়ে সূর্য পড়বে নেমে।
বাঁকাদিঘির ঘাটে যাব যখন সন্ধে হবে
গোষ্ঠে-ফেরা ধেনুর হাম্বারবে।
ভেঙে-পড়া ডিঙির মতো হেলে-পড়া দিন
তারা-ভাসা আঁধার-তলায় কোথায় হবে লীন।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

ভজহরি

হংকঙেতে সারাবছর আপিস করেন মামা,
সেখান থেকে এনেছিলেন চীনের দেশের জামা,
দিয়েছিলেন মাকে,
ঢাকার নীচে যখন-তখন শিস দিয়ে সে ডাকে।

নিচিনপুরের বনের থেকে ঝুলির মধ্যে ক'রে
ভজহরি আনত ফড়িঙ ধরে।
পাড়ায় পাড়ায় যত পাখি খাঁচায় খাঁচায় ঢাকা
আওয়াজ শুনেই উঠত নেচে, ঝাপট দিত পাখা।
কাউকে ছাতু, কাউকে পোকা, কাউকে দিত ধান,
অসুখ করলে হলুদজলে করিয়ে দিত স্নান।
ভজু বলত, "পোকার দেশে আমিই হচ্ছি দত্যি,
আমার ভয়ে গঙ্গাফড়িঙ ঘুমোয় না একরত্তি।
ঝোপে ঝোপে শাসন আমার কেবলই ধরপাকড়,
পাতায় পাতায় লুকিয়ে বেড়ায় যত পোকামাকড়।"

একদিন সে ফাগুন মাসে মাকে এসে বলল,
"গোধূলিতে মেয়ের আমার বিয়ে হবে কল্য।"
শুনে আমার লাগল ভারি মজা,
এই আমাদের ভজা,
এরও আবার মেয়ে আছে, তারও হবে বিয়ে,
রঙিন চেলির ঘোমটা মাথায় দিয়ে।
সুধাই তাকে, "বিয়ের দিনে খুব বুঝি ধুম হবে?"
ভজু বললে, "খাঁচার রাজ্যে নইলে কি মান রবে।
কেউবা ওরা দাঁড়ের পাখি, পিঁজরেতে কেউ থাকে,
নেমন্তন্ন চিঠিগুলো পাঠিয়ে দেব তাকে।
মোটা মোটা ফড়িঙ দেব, ছাতুর সঙ্গে দই,
ছোলা আনব ভিজিয়ে জলে, ছড়িয়ে দেব খই।
এমনি হবে ধুম,
সাত পাড়াতে চক্ষে কারও রইবে না আর ঘুম।
ময়নাগুলোর খুলবে গলা, খাইয়ে দেব লঙ্কা;
কাকাতুয়া চীৎকারে তার বাজিয়ে দেবে ডঙ্কা।
পায়রা যত ফুলিয়ে গলা লাগাবে বক্‌বকম;
শালিকগুলোর চড়া মেজাজ, আওয়াজ নানারকম।

আসবে কোকিল, চন্দনাদের শুভাগমন হবে,
মন্ত্র শুনতে পাবে না কেউ পাখির কলরবে।
ডাকবে যখন টিয়ে
বরকর্তা রবেন বসে কানে আঙুল দিয়ে।"

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

পিস্‌নি

কিশোরগাঁয়ের পুবের পাড়ায় বাড়ি,
পিস্‌নি বুড়ি চলেছে গ্রাম ছাড়ি।
একদিন তার আদর ছিল, বয়স ছিল যোলো,
স্বামী মরতেই বাড়িতে বাস অসহ্য তার হল।
আর-কোনো ঠাঁই হয়তো পাবে আর-কোনো এক বাসা,
মনের মধ্যে আঁকড়ে থাকে অসম্ভবের আশা।
অনেক গেছে ক্ষয় হয়ে তার, সবাই দিল ফাঁকি,
অল্প কিছু রয়েছে তার বাকি।
তাই দিয়ে সে তুলল বেঁধে ছোট্ট বোঝাটাকে,
জড়িয়ে কাঁথা আঁকড়ে নিল কাঁখে।
বাঁ হাতে এক ঝুলি আছে, ঝুলিয়ে নিয়ে চলে,
মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠে বসে ধূলির তলে।
শুধাই যবে, কোন্ দেশেতে যাবে
মুখে ক্ষণেক চায় সকরুণ ভাবে;
কয় সে দ্বিধায়, "কী জানি ভাই, হয়তো আলম্‌ডাঙা,
হয়তো সান্‌কিভাঙা,
কিংবা যাব পাটনা হয়ে কাশী।"
গ্রাম-সুবাদে কোন্‌কালে সে ছিল যে কার মাসি,
মণিলালের হয় দিদিমা, চুনিলালের মামি—
বলতে বলতে হঠাৎ সে যায় থামি,
স্মরণে কার নাম যে নাহি মেলে।

গভীর নিশাস ফেলে
চুপটি ক'রে ভাবে,
এমন করে আর কতদিন যাবে।
দূরদেশে তার আপন জনা, নিজেরই ঝঞ্ঝাটে
তাদের বেলা কাটে।
তারা এখন আর কি মনে রাখে
এতবড়ো অদরকারি তাকে।
চোখে এখন কম দেখে সে, ঝাপসা যে তার মন,
ভগ্নশেষের সংসারে তার শুকনো ফুলের বন।
স্টেশন-মুখে গেল চলে পিছনে গ্রাম ফেলে,
রাত থাকতে, পাছে দেখে পাড়ার মেয়ে ছেলে।
দূরে গিয়ে, বাঁশবাগানের বিজন গলি বেয়ে
পথের ধারে বসে পড়ে, শূন্যে থাকে চেয়ে।

আলমোড়া
৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

কাঠের সিঙ্গি

ছোটো কাঠের সিঙ্গি আমার ছিল ছেলেবেলায়,
সেটা নিয়ে গর্ব ছিল বীরপুরুষি খেলায়।
গলায় বাঁধা রাঙা ফিতের দড়ি,
চিনেমাটির ব্যাঙ বেড়াত পিঠের উপর চড়ি।
ব্যাঙটা যখন পড়ে যেত ধম্‌কে দিতেম কষে,
কাঠের সিঙ্গি ভয়ে পড়ত বসে।
গাঁ গাঁ করে উঠছে বুঝি, যেমনি হত মনে,
"চুপ করো" যেই ধম্‌কানো আর চম্‌কাত সেইখনে।
আমার রাজ্যে আর যা থাকুক সিংহভয়ের কোনো
সম্ভাবনা ছিল না কখ্‌খোনো।
মাংস ব'লে মাটির ঢেলা দিতেম ভাঁড়ের 'পরে,
আপত্তি ও করত না তার তরে।

বুঝিয়ে দিতেম, গোপাল যেমন সুবোধ সবার চেয়ে
তেমনি সুবোধ হওয়া তো চাই যা দেব তাই খেয়ে।
ইতিহাসে এমন শাসন করে নি কেউ পাঠ,
দিবানিশি কাঠের সিঙ্গি ভয়েই ছিল কাঠ।
খুদি কইত মিছিমিছি, "ভয় করছে, দাদা।"
আমি বলতেম, "আমি আছি, থামাও তোমার কাঁদা-
যদি তোমায় খেয়েই ফেলে এমনি দেব মার
দু চক্ষে ও দেখবে অন্ধকার।"
মেজ্‌দিদি আর ছোড়্‌দিদিদের খেলা পুতুল নিয়ে,
কথায় কথায় দিচ্ছে তাদের বিয়ে।
নেমন্তন্ন করত যখন যেতুম বটে খেতে,
কিন্তু তাদের খেলার পানে চাই নি কটাক্ষেতে।
পুরুষ আমি, সিঙ্গিমামা নত পায়ের কাছে,
এমন খেলার সাহস বলো ক'জন মেয়ের আছে।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

ঝড়

দেখ্‌ রে চেয়ে নামল বুঝি ঝড়,
ঘাটের পথে বাঁশের শাখা ওই করে ধড়ফড়।
আকাশতলে বজ্রপাণির ডঙ্কা উঠল বাজি,
শীঘ্র তরী বেয়ে চল্‌ রে মাঝি।
ঢেউয়ের গায়ে ঢেউগুলো সব গড়ায় ফুলে ফুলে,
পুবের চরে কাশের মাথা উঠছে দুলে দুলে।
ঈশান কোণে উড়তি বালি আকাশখানা ছেয়ে
হু হু করে আসছে ছুটে ধেয়ে।
কাকগুলো তার আগে আগে উড়ছে প্রাণের ডরে,
হার মেনে শেষ আছাড় খেয়ে পড়ে মাটির 'পরে।
হাওয়ার বিষম ধাক্কা তাদের লাগছে ক্ষণে ক্ষণে,
উঠছে পড়ছে, পাখার ঝাপট দিতেছে প্রাণপণে।

বিজুলি ধায় দাঁত মেলে তার ডাকিনীটার মতো,
দিক্‌দিগন্ত চমকে ওঠে হঠাৎ মর্মাহত।

ওই রে, মাঝি, খেপল গাঙের জল,
লগি দিয়ে ঠেকা নৌকো, চরের কোলে চল্।
সেই যেখানে জলের শাখা, চখাচখীর বাস,
হেথা-হোথায় পলিমাটি দিয়েছে আশ্বাস
কাঁচা সবুজ নতুন ঘাসে ঘেরা।
তলের চরে বালুতে রোদ পোহায় কচ্ছপেরা।
হোথায় জেলে বাঁশ টাঙিয়ে শুকোতে দেয় জাল,
ডিঙির ছাতে বসে বসে সেলাই করে পাল।
রাত কাটাব ঐখানেতেই করব রাঁধাবাড়া,
এখনি আজ নেই তো যাবার তাড়া।
ভোর থাকতে কাক ডাকতেই নৌকো দেব ছাড়ি,
ইটেখোলার মেলায় দেব সকাল সকাল পাড়ি।

আলমোড়া
১২।৬।৩৭

খাটুলি

একলা হোথায় বসে আছে, কেই বা জানে ওকে—
আপন-ভোলা সহজ তৃপ্তি রয়েছে ওর চোখে।
খাটুলিটা বাইরে এনে আঙিনাটার কোণে
টানছে তামাক বসে আপন-মনে।
মাথার উপর বটের ছায়া, পিছন দিকে নদী
বইছে নিরবধি।
আয়োজনের বালাই নেইকো ঘরে,
আমের কাঠের নড়্‌নড়ে এক তক্তপোষের 'পরে
মাঝখানেতে আছে কেবল পাতা
বিধবা তার মেয়ের হাতের সেলাই-করা কাঁথা।
নাতনি গেছে, রাখে তারি পোষা ময়নাটাকে,
তেমনি রুচি গলায় ওকে 'দাদু' ব'লেই ডাকে।

ছেলের গাঁথা ঘরের দেয়াল, চিহ্ন আছে তারি
রঙিন মাটি দিয়ে আঁকা সিপাই সারি সারি।
সেই ছেলেটাই তালুকদারের সর্দারি পদ পেয়ে
জেলখানাতে মরছে পচে দাঙ্গা করতে যেয়ে।
দুঃখ অনেক পেয়েছে ও হয়তো ডুবছে দেনায়,
হয়তো ক্ষতি হয়ে গেছে তিসির বেচাকেনায়।
বাইরে দারিদ্র্যের
কাটা-ছেঁড়ার আঁচড় লাগে ঢের,
তবুও তার ভিতর-মনে দাগ পড়ে না বেশি,
প্রাণটা যেমন কঠিন তেমনি কঠিন মাংসপেশী।
হয়তো গোরু বেচতে হবে মেয়ের বিয়ের দায়ে,
মাসে দুবার ম্যালেরিয়া কাঁপন লাগায় গায়ে,
ডাগর ছেলে চাকরি করতে গঙ্গাপারের দেশে
হয়তো হঠাৎ মারা গেছে ওই বছরের শেষে—
শুকনো করুণ চক্ষু দুটো তুলে উপর-পানে
কার খেলা এই দুঃখসুখের, কী ভাবলে সেই জানে;
বিচ্ছেদ নেই খাটুনিতে, শোকের পায় না ফাঁক,
ভাবতে পারে স্পষ্ট ক'রে নেইকো এমন বাক্‌।
জমিদারের কাছারিতে নালিশ করতে এসে
কী বলবে যে কেমন ক'রে পায় না ভেবে শেষে।

খাটুলিতে এসে বসে যখনি পায় ছুটি,
ভাব্‌নাগুলো ধোঁয়ায় মেলায়, ধোঁয়ায় ওঠে ফুটি।
ওর যে আছে খোলা আকাশ, ওর যে মাথার কাছে
শিষ দিয়ে যায় বুলবুলিরা আলোছায়ার নাচে,
নদীর ধারে মেঠো পথে টাট্টু চলে ছুটে,
চক্ষু ভোলায় খেতের ফসল রঙের হরির-লুটে—
জন্মমরণ ব্যেপে আছে এরা প্রাণের ধন
অতি সহজ ব'লেই তাহা জানে না ওর মন।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

ঘরের খেয়া

সন্ধ্যা হয়ে আসে ;
সোনা-মিশোল ধূসর আলো ঘিরল চারিপাশে।

নৌকোখানা বাঁধা আমার মধ্যিখানের গাঙে
অস্তরবির কাছে নয়ন কী যেন ধন মাঙে।
আপন গাঁয়ে কুটীর আমার দূরের পটে লেখা,
ঝাপসা আভায় যাচ্ছে দেখা বেগনি রঙের রেখা।
যাব কোথায় কিনারা তার নাই,
পশ্চিমেতে মেঘের গায়ে একটু আভাস পাই।
হাঁসের দলে উড়ে চলে হিমালয়ের পানে,
পাখা তাদের চিহ্নবিহীন পথের খবর জানে।
শ্রাবণ গেল, ভাদ্র গেল, শেষ হল জল-ঢালা,
আকাশতলে শুরু হল শুভ্র আলোর পালা।
খেতের পরে খেত একাকার প্লাবনে রয় ডুবে,
লাগল জলের দোলযাত্রা পশ্চিমে আর পুবে।
আসন্ন এই আঁধার মুখে নৌকোখানি বেয়ে
যায় কারা ওই শুধাই, "ওগো নেয়ে,
চলেছ কোন্‌খানে।"
যেতে যেতে জবাব দিল, "যাব গাঁয়ের পানে।"
অচিন-শূন্যে-ওড়া পাখি চেনে আপন নীড়,
জানে বিজন-মধ্যে কোথায় আপন জনের ভিড়।
অসীম আকাশ মিলেছে ওর বাসার সীমানাতে,
ওই অজানা জড়িয়ে আছে জানাশোনার সাথে।
তেমনি ওরা ঘরের পথিক ঘরের দিকে চলে
যেথায় ওদের তুলসিতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলে।

দাঁড়ের শব্দ ক্ষীণ হয়ে যায় ধীরে,
মিলায় সুদূর নীরে।

সেদিন দিনের অবসানে সজল মেঘের ছায়ে
আমার চলার ঠিকানা নাই, ওরা চলল গাঁয়ে।

আলমোড়া
২৮।৫।৩৭

যোগীনদা

যোগীনদাদার জন্ম ছিল ডেরাস্মাইলখাঁয়ে।
পশ্চিমেতে অনেক শহর অনেক গাঁয়ে গাঁয়ে
বেড়িয়েছিলেন মিলিটারি জরিপ করার কাজে,
শেষ বয়সে স্থিতি হল শিশুদলের মাঝে।
"জুলুম তোদের সইব না আর" হাঁক চালাতেন রোজই,
পরের দিনেই আবার চলত ওই ছেলেদের খোঁজই।
দরবারে তাঁর কোনো ছেলের ফাঁক পড়বার জো কী—
ডেকে বলতেন, "কোথায় টুনু, কোথায় গেল খোকি।"
"ওরে ভজু, ওরে বাঁদর, ওরে লক্ষ্মীছাড়া।"
হাঁক দিয়ে তাঁর ভারী গলায় মাতিয়ে দিতেন পাড়া।
চার দিকে তাঁর ছোটো বড়ো জুটত যত লোভী
কেউ বা পেত মার্বেল, কেউ গণেশমার্কা ছবি।
কেউ বা লজঞ্জুস,
সেটা ছিল মজলিসে তার হাজরি দেবার ঘুষ।
কাজলি যদি অকারণে করত অভিমান
হেসে বলতেন "হাঁ করো তো", দিতেন ছাঁচি পান।
আপনসৃষ্ট নাতনিও তাঁর ছিল অনেকগুলি,
পাগলি ছিল, পটলি ছিল, আর ছিল জঙ্গুলি।
কেয়া-খয়ের এনে দিত, দিত কাসুন্দিও,
মায়ের হাতের জারকলেবু যোগীনদাদার প্রিয়।

তখনো তাঁর শক্ত ছিল মুগুর-ভাঁজা দেহ,
বয়স যে ষাট পেরিয়ে গেছে, বুঝত না তা কেহ।

ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি, চোখদুটি জলজলে,
মুখ যেন তাঁর পাকা আমটি, হয় নি সে থলথলে।
চওড়া কপাল, সামনে মাথায় বিরল চুলের টাক,
গোঁফ জোড়াটার খ্যাতি ছিল, তাই নিয়ে তাঁর জাঁক।

দিন ফুরোত, কুলুঙ্গিতে প্রদীপ দিত জ্বালি,
বেলের মালা হেঁকে যেত মোড়ের মাথায় মালী।
চেয়ে রইতেম মুখের দিকে শান্তশিষ্ট হয়ে,
কাঁসর-ঘণ্টা উঠত বেজে গলির শিবালয়ে।
সেই সেকালের সন্ধ্যা মোদের সন্ধ্যা ছিল সত্যি,
দিন-ভ্যাঙানো ইলেকট্রিকের হয়নিকো উৎপত্তি।
ঘরের কোণে কোণে ছায়া, আঁধার বাড়ত ক্রমে,
মিট্‌মিটে এক তেলের আলোয় গল্প উঠত জমে।
শুরু হলে থামতে তাঁরে দিতেম না তো ক্ষণেক,
সত্যি মিথ্যে যা-খুশি তাই বানিয়ে যেতেন অনেক।
ভূগোল হত উলটো-পালটা, কাহিনী আজগুবি,
মজা লাগত খুবই।
গল্পটুকু দিচ্ছি, কিন্তু দেবার শক্তি নাই তো
বলার ভাবে যে রঙটুকু মন আমাদের ছাইত।

হুশিয়াঁরপুর পেরিয়ে গেল ছন্দোসির গাড়ি,
দেড়টা রাতে সরুহরোয়ায় দিল স্টেশন ছাড়ি।
ভোর থাকতেই হয়ে গেল পার
বুলন্দশর আয়োরিসর্গায়।
পেরিয়ে যখন ফিরোজাবাদ এল
যোগীনদাদার বিষম খিদে পেল।
ঠোঙায় ভরা পকৌড়ি আর চলছে মটরভাজা
এমন সময় হাজির এসে জৌনপুরের রাজা।
পাঁচশো-সাতশো লোকলস্কর, বিশপঁচিশটা হাতি,
মাথার উপর ঝালর-দেওয়া প্রকাণ্ড এক ছাতি।

মন্ত্রী এসেই দাদার মাথায় চড়িয়ে দিল তাজ,
বললে, 'যুবরাজ,
আর কতদিন রইবে প্রভু, মোতিমহল ত্যেজে।'
বলতে বলতে রামশিঙা আর ঝাঁঝর উঠল বেজে।

ব্যাপারখানা এই—
রাজপুত্র তেরো বছর রাজভবনে নেই।
সদ্য ক'রে বিয়ে,
নাথদোয়ারার সেগুনবনে শিকার করতে গিয়ে
তার পরে যে কোথায় গেল খুঁজে না পায় লোক।
কেঁদে কেঁদে অন্ধ হল রানীমায়ের চোখ।
খোঁজ পড়ে যায় যেমনি কিছু শোনে কানাঘুষায়,
খোঁজে পিণ্ডিদাদনখাঁয়ে, খোঁজে লালামুসায়।
খুঁজে খুঁজে লুধিয়ানায় ঘুরেছে পঞ্জাবে,
গুলজারপুর হয় নি দেখা, শুনছি পরে যাবে।
চক্রামঙ্গা দেখে এল সরাই আলমগিরে,
রাওলপিণ্ডি থেকে এল হতাশ হয়ে ফিরে।

ইতিমধ্যে যোগীনদাদা হাৎরাশ জংশনে
গেছেন লেগে চায়ের সঙ্গে পাউরুটি-দংশনে।
দিব্যি চলছে খাওয়া,
তারি সঙ্গে খোলা গায়ে লাগছে মিঠে হাওয়া—
এমন সময় সেলাম করলে জৌনপুরের চর;
জোড় হাতে কয়, 'রাজাসাহেব, কঁহা আপ্‌কা ঘর।'
দাদা ভাবলেন, সম্মানটা নিতান্ত জমকালো,
আসল পরিচয়টা তবে না দেওয়াই তো ভালো।
ভাবখানা তাঁর দেখে চরের ঘনালো সন্দেহ,
এ মানুষটি রাজপুত্রই, নয় কভু আর-কেহ।
রাজলক্ষণ এতগুলো একখানা এই গায়
ওরে বাস রে, দেখে নি সে আর কোনো জায়গায়।

তার পরে মাস পাঁচেক গেছে দুঃখে সুখে কেটে,
হারাধনের খবর গেল জৌনপুরের স্টেটে।
ইস্টেশনে নির্ভাবনায় বসে আছেন দাদা,
কেমন করে কী যে হল লাগল বিষম ধাঁধা।
গুর্খা ফৌজ সেলাম করে দাঁড়ালো চার দিকে,
ইস্টেশনটা ভরে গেল আফগানে আর শিখে।
ঘিরে তাঁকে নিয়ে গেল কোথায় ইটার্সিতে,
দের কারা সব জয়ধ্বনি উর্দুতে ফার্সিতে।
সেখান থেকে মৈনপুরী, শেষে লছমন্-ঝোলায়
বাজিয়ে সানাই চড়িয়ে দিল ময়ূরপংখি দোলায়।
দশটা কাহার কাঁধে নিল, আর পঁচিশটা কাহার
সঙ্গে চলল তাঁহার।
ভাটিণ্ডাতে দাঁড় করিয়ে ঘোরালো দূরবীনে
দখিনমুখে ভালো করে দেখে নিলেন চিনে
বিন্ধ্যাচলের পর্বত।
সেইখানেতে খাইয়ে দিল কাঁচা আমের শর্বৎ।
সেখান থেকে এক পহরে গেলেন জৌনপুরে
পড়ন্ত রোদ্দুরে।

এইখানেতেই শেষে
যোগীনদাদা থেমে গেলেন যৌবরাজ্যে এসে।
হেসে বললেন, "কী আর বলব দাদা,
মাঝের থেকে মটর-ভাজা খাওয়ায় পড়ল বাধা।"
"ও হবে না, ও হবে না" বিষম কলরবে
ছেলেরা সব চেঁচিয়ে উঠল, "শেষ করতেই হবে।"
যোগীনদা কয়, "যাক গে,
বেঁচে আছি শেষ হয় নি ভাগ্যে।
তিনটে দিন না যেতে যেতেই হলেম গলদ্‌ঘর্ম।
রাজপুত্র হওয়া কি, ভাই, যে-সে লোকের কর্ম।

মোটা মোটা পরোটা আর তিন পোয়াটাক ঘি
বাংলাদেশের-হাওয়ায়-মানুষ সইতে পারে কি।
নাগরা জুতায় পা ছিঁড়ে যায়, পাগড়ি মুটের বোঝা,
এগুলি কি সহ্য করা সোজা।
তা ছাড়া এই রাজপুত্রের হিন্দি শুনে কেহ
হিন্দি বলেই করলে না সন্দেহ।
যেদিন দূরে শহরেতে চলছিল রামলীলা
পাহারাটা ছিল সেদিন ঢিলা।
সেই সুযোগে গৌড়বাসী তখনি এক দৌড়ে
ফিরে এল গৌড়ে।
চলে গেল সেই রাত্রেই ঢাকা—
মাঝের থেকে চর পেয়ে যায় দশটি হাজার টাকা।
কিন্তু, গুজব শুনতে পেলেম শেষে,
কানে মোচড় খেয়ে টাকা ফেরত দিয়েছে সে।"

"কেন তুমি ফিরে এলে" চেঁচাই চারিপাশে,
যোগীনদাদা একটু কেবল হাসে।
তার পরে তো শুতে গেলেম, আধেক রাত্রি ধ'রে
শহরগুলোর নাম যত সব মাথার মধ্যে ঘোরে।
ভারতভূমির সব ঠিকানাই ভুলি যদি দৈবে,
যোগীনদাদার ভূগোল-গোলা গল্প মনে রইবে।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

বুধু

মাঠের শেষে গ্রাম,
সাতপুরিয়া নাম।
চাষের তেমন সুবিধা নেই কৃপণ মাটির গুণে,
পঁয়ত্রিশ ঘর তাঁতির বসত, ব্যাবসা জাজিম বুনে।
নদীর ধারে খুঁড়ে খুঁড়ে পলির মাটি খুঁজে
গৃহস্থেরা ফসল করে কাঁকুড়ে তরমুজে।

ওইখানেতে বালির ডাঙা, মাঠ করছে ধু ধু,
ঢিবির 'পরে বসে আছে গাঁয়ের মোড়ল বুধু।
সামনে মাঠে ছাগল চরছে ক'টা—
শুকনো জমি, নেইকো ঘাসের ঘটা।
কী যে ওরা পাচ্ছে খেতে ওরাই সেটা জানে,
ছাগল ব'লেই বেঁচে আছে প্রাণে।
আকাশে আজ হিমের আভাস, ফ্যাকাশে তার নীল,
অনেক দূরে যাচ্ছে উড়ে চিল।
হেমন্তের এই রোদ্দুরটা লাগছে অতি মিঠে,
ছোটো নাতি মোগ্‌লুটা তার জড়িয়ে আছে পিঠে।
স্পর্শপুলক লাগছে দেহে, মনে লাগছে ভয়—
বেঁচে থাকলে হয়।
গুটি তিনটি মরে শেষে ওইটি সাধের নাতি,
রাত্রিদিনের সাথি!
গোরুর গাড়ির ব্যাবসা বুধুর চলছে হেসে-খেলেই,
নাড়ি ছেঁড়ে এক পয়সা খরচ করতে গেলেই।
কৃপণ ব'লে গ্রামে গ্রামে বুধুর নিন্দে রটে,
সকালে কেউ নাম করে না উপোস পাছে ঘটে।
ওর যে কৃপণতা সে তো ঢেলে দেবার তরে,
যত কিছু জমাচ্ছে সব মোগ্‌লু নাতির 'পরে।
পয়সাটা তার বুকের রক্ত, কারণটা তার ওই—
এক পয়সা আর কারো নয় ওই ছেলেটার বই।
না খেয়ে, না প'রে, নিজের শোষণ ক'রে প্রাণ
যেটুকু রয় সেইটুকু ওর প্রতি দিনের দান।
দেবতা পাছে ঈর্ষাভরে নেয় কেড়ে মোগ্‌লুকে,
আঁকড়ে রাখে বুকে।
এখনো তাই নাম দেয় নি, ডাক নামেতেই ডাকে,
নাম ভাঁড়িয়ে ফাঁকি দেবে নিঠুর দেবতাকে।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

চড়িভাতি

ফল ধরেছে বটের ডালে ডালে ;
অফুরন্ত আতিথ্যে তার সকালে বৈকালে
বনভোজনে পাখিরা সব আসছে ঝাঁকে ঝাঁক।
মাঠের ধারে আমার ছিল চড়িভাতির ডাক।
যে যার আপন ভাঁড়ার থেকে যা পেল যেইখানে
মালমসলা নানারকম জুটিয়ে সবাই আনে।
জাত-বেজাতের চালে ডালে মিশোল ক'রে শেষে
ডুমুরগাছের তলাটাতে মিলল সবাই এসে।
বারে বারে ঘটি ভ'রে জল তুলে কেউ আনে,
কেউ চলেছে কাঠের খোঁজে আমবাগানের পানে।
হাঁসের ডিমের সন্ধানে কেউ গেল গাঁয়ের মাঝে,
তিন কন্যা লেগে গেল রান্নাকরার কাজে।
গাঁঠ-পাকানো শিকড়েতে মাথাটা তার থুয়ে
কেউ পড়ে যায় গল্পের বই জামের তলায় শুয়ে।
সকল-কর্ম-ভোলা
দিনটা যেন ছুটির নৌকা বাঁধন-রশি-খোলা
চলে যাচ্ছে আপনি ভেসে সে কোন্‌ আঘাটায়
যথেচ্ছ ভাঁটায়।
মানুষ যখন পাকা ক'রে প্রাচীর তোলে নাই
মাঠে বনে শৈলগুহায় যখন তাহার ঠাঁই,
সেইদিনকার আল্‌গা-বিধির বাইরে-ঘোরা প্রাণ
মাঝে মাঝে রক্তে আজও লাগায় মন্ত্রগান।
সেইদিনকার যথেচ্ছ-রস আস্বাদনের খোঁজে
মিলেছিলেম অবেলাতে অনিয়মের ভোজে।
কারো কোনো স্বত্বদাবীর নেই যেখানে চিহ্ন,
যেখানে এই ধরাতলের সহজ দাক্ষিণ্য,
হালকা সাদা মেঘের নীচে পুরানো সেই ঘাসে,
একটা দিনের পরিচিত আমবাগানের পাশে,

মাঠের ধারে, অনভ্যাসের সেবার কাজে খেটে
কেমন ক'রে কয়টা প্রহর কোথায় গেল কেটে।
সমস্ত দিন ডাকল ঘুঘু জুটি,
আশে পাশে এঁটোর লোভে কাক এল সব জুটি,
গাঁয়ের থেকে কুকুর এল, লড়াই গেল বেধে—
একটা তাদের পালালো তার পরাভবের খেদে।

রৌদ্র পড়ে এল ক্রমে, ছায়া পড়ল বেঁকে,
ক্লান্ত গোরু গাড়ি টেনে চলেছে হাট থেকে।
আবার ধীরে ধীরে
নিয়ম-বাঁধা যে-যার ঘরে চলে গেলেম ফিরে।
একটা দিনের মুছল স্মৃতি, ঘুচল চড়িভাতি,
পোড়াকাঠের ছাই পড়ে রয়, নামে আঁধার রাতি

আলমোড়া
আষাঢ় ১৩৪৪

কাশী

কাশীর গল্প শুনেছিলুম যোগীনদাদার কাছে,
পষ্ট মনে আছে।
আমরা তখন ছিলাম না কেউ, বয়েস তাঁহার সবে
বছর-আষ্টেক হবে।
সঙ্গে ছিলেন খুড়ি,
মোরব্বা বানাবার কাজে ছিল না তাঁর জুড়ি।
দাদা বলেন, আমলকি বেল পেঁপে সে তো আছেই,
এমন কোনো ফল ছিল না এমন কোনো গাছেই
তাঁর হাতে রস জমলে লোকের গোল না ঠেকত— এটাই
ফল হবে কি মেঠাই।
রসিয়ে নিয়ে চালতা যদি মুখে দিতেন গুঁজি
মনে হত বড়োরকম রসগোল্লাই বুঝি।

কাঁঠাল বিচির মোরব্বা যা বানিয়ে দিতেন তিনি
পিঠে ব'লে পৌষমাসে সবাই নিত কিনি।
দাদা বলেন, "মোরব্বাটা হয়তো মিছেমিছিই,
কিন্তু মুখে দিতে যদি, বলতে কাঁঠাল বিচিই।"
মোরব্বাতে ব্যাবসা গেল জ'মে,
বেশ কিঞ্চিৎ টাকা জমল ক্রমে।
একদিন এক চোর এসেছে তখন অনেক রাত,
জানলা দিয়ে সাবধানে সে বাড়িয়ে দিল হাত।
খুড়ি তখন চাটনি করতে তেল নিচ্ছেন মেপে,
ধড়াস করে চোরের হাতে জানলা দিলেন চেপে।
চোর বললে 'উহু উহু'; খুড়ি বললেন, 'আহা,
বাঁ হাত মাত্র, এইখানেতেই থেকে যাক না তাহা।'
কেঁদে-কেটে কোনোমতে চোর তো পেল খালাস;
খুড়ি বললেন, 'মরবি, যদি এ ব্যাবসা তোর চালাস।'

দাদা বললেন, "চোর পালালো, এখন গল্প থামাই,
ছ'দিন হয় নি ক্ষৌর করা, এবার গিয়ে কামাই।"
আমরা টেনে বসাই; বলি, "গল্প কেন ছাড়বে।"
দাদা বলেন, "রবার নাকি, টানলেই কি বাড়বে।—
কে ফেরাতে পারে তোদের আবদারের এই জোর,
তার চেয়ে যে অনেক সহজ ফেরানো সেই চোর,
আচ্ছা তবে শোন্, সে মাসে গ্রহণ লাগল চাঁদে,
শহর যেন ঘিরল নিবিড় মানুষ-বোনা ফাঁদে।
খুড়ি গেছেন স্নান করতে বাড়ির দ্বারের পাশে,
আমায় তখন পূর্ণগ্রহণ ভিড়ের রাহুগ্রাসে।
প্রাণটা যখন কণ্ঠাগত, মরছি যখন ডরে,
গুণ্ডা এসে তুলে নিল হঠাৎ কাঁধের 'পরে।
তখন মনে হল, এ তো বিষ্ণুদূতের দয়া,
আর-একটুকু দেরি হলেই প্রাপ্ত হতেম গয়া।

বিষ্ণুদূতটা ধরল যখন যমদূতের মূর্তি
এক নিমেষেই একেবারেই ঘুচল আমার স্ফূর্তি।
সাত গলি সে পেরিয়ে শেষে একটা এঁধোঘরে
বসিয়ে আমায় রেখে দিল খড়ের আঁটির 'পরে।
চোদ্দ আনা পয়সা আছে পকেট দেখি ঝেড়ে,
কেঁদে কইলাম, 'ও পাড়েজি, এই নিয়ে দাও ছেড়ে।'
গুণ্ডা বলে, 'ওটা নেব, ওটা ভালো দ্রব্যই,
আরো নেব চারটি হাজার নয়শো নিরেনব্বই—
তার উপরে আর দু আনা, খুড়িটা তো মরবে,
টাকার বোঝা বয়ে সে কি বৈতরণী তরবে।
দেয় যদি তো দিক চুকিয়ে, নইলে—'পাকিয়ে চোখ
যে ভঙ্গিটা দেখিয়ে দিলে সেটা মারাত্মক।

"এমনসময়, ভাগ্যি ভালো, গুণ্ডাজির এক ভাগ্নি
মূর্তিটা তার রণচণ্ডী, যেন সে রায়বাঘ্‌নি,
আমার মরণদশার মধ্যে হলেন সমাগত
দাবানলের ঊর্ধ্বে যেন কালো মেঘের মতো।
রাত্তিরে কাল ঘরে আমার উঁকি মারল বুঝি,
যেমনি দেখা অমনি আমি রইনু চক্ষু বুজি।
পরের দিনে পাশের ঘরে, কী গলা তার বাপ,
মামার সঙ্গে ঠাণ্ডা ভাষায় নয় সে বাক্যালাপ।
বলছে, 'তোমার মরণ হয় না, কাহার বাছনি ও,
পাপের বোঝা বাড়িয়ো না আর, ঘরে ফেরৎ দিয়ো—
আহা, এমন সোনার টুকরো—' শুনে আগুন মামা;
বিশ্রী রকম গাল দিয়ে কয়, 'মিহি সুরটা থামা।'
এ'কেই বলে মিহি সুর কি, আমি ভাবছি শুনে।
দিন তো গেল কোনোমতে কড়ি বরগা গুনে।
রাত্রি হবে দুপুর, ভাগ্নি ঢুকল ঘরে ধীরে;
চুপি চুপি বললে কানে, 'যেতে কি চাস ফিরে।'

লাফিয়ে উঠে কেঁদে বললেম, 'যাব যাব যাব।'
ভাগ্নি বললে, 'আমার সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে নাবো—
কোথায় তোমার খুড়ির বাসা অগস্ত্যকুণ্ডে কি,
যে ক'রে হোক আজকে রাতেই খুঁজে একবার দেখি;
কালকে মামার হাতে আমার হবেই মুণ্ডপাত।'—
আমি তো, ভাই বেঁচে গেলেম, ফুরিয়ে গেল রাত।"

হেসে বললেম যোগীনদাদার গম্ভীর মুখ দেখে,
ঠিক এমনি গল্প বাবা শুনিয়েছে বই থেকে।
দাদা বললেন, "বিধি যদি চুরি করেন নিজে
পরের গল্প, জানি নে ভাই, আমি করব কী যে।"

আলমোড়া
১০।৬।৩৭

প্রবাসে

বিদেশমুখো মন যে আমার কোন্ বাউলের চেলা,
গ্রাম-ছাড়ানো পথের বাতাস সর্বদা দেয় ঠেলা।
তাই তো সেদিন ছুটির দিনে টাইমটেবিল প'ড়ে
প্রাণটা উঠল নড়ে।
বাক্সো নিলেম ভর্তি করে, নিলেম ঝুলি থলে,
বাংলাদেশের বাইরে গেলেম গঙ্গাপারে চ'লে।
লোকের মুখে গল্প শুনে গোলাপ-খেতের টানে
মনটা গেল এক দৌড়ে গাজিপুরের পানে।
সামনে চেয়ে চেয়ে দেখি, গম-জোয়ারির খেতে
নবীন অঙ্কুরেতে
বাতাস কখন হঠাৎ এসে সোহাগ করে যায়
হাত বুলিয়ে কাঁচা শ্যামল কোমল কচি গায়।
আটচালা ঘর, ডাহিন দিকে সবজি-বাগানখানা
শুশ্রূষা পায় সারা দুপুর, জোড়া-বলদটানা।

আঁকাবাঁকা কল্‌কলানি করুণ জলের ধারায়—
চাকার শব্দে অলস প্রহর ঘুমের ভারে ভারায়।
ইঁদারাটার কাছে
বেগনি ফলে তুঁতের শাখা রঙিন হয়ে আছে।
অনেক দূরে জলের রেখা চরের কূলে কূলে,
ছবির মতো নৌকো চলে পাল-তোলা মাস্তুলে।
সাদা ধুলো হাওয়ায় ওড়ে, পথের কিনারায়
গ্রামটি দেখা যায়।
খোলার চালের কুটীরগুলি লাগাও গায়ে গায়ে
মাটির প্রাচীর দিয়ে ঘেরা আমকাঁঠালের ছায়ে।
গোরুর গাড়ি পড়ে আছে মহানিমের তলে,
ডোবার মধ্যে পাতা-পচা পাঁক-জমানো জলে
গম্ভীর ঔদাস্যে অলস আছে মহিষগুলি
এ ওর পিঠে আরামে ঘাড় তুলি।
বিকেল-বেলায় একটুখানি কাজের অবকাশে
খোলা দ্বারের পাশে
দাঁড়িয়ে আছে পাড়ার তরুণ মেয়ে
আপন-মনে অকারণে বাহির-পানে চেয়ে।
অশথতলায় বসে তাকাই ধেনুচারণ মাঠে,
আকাশে মন পেতে দিয়ে সমস্ত দিন কাটে।
মনে হ'ত, চতুর্দিকে হিন্দি ভাষায় গাঁথা
একটা যেন সজীব পুঁথি, উলটিয়ে যাই পাতা—
কিছু বা তার ছবি-আঁকা কিছু বা তার লেখা,
কিছু বা তার আগেই যেন ছিল কখন্ শেখা।
ছন্দে তাহার রস পেয়েছি, আউড়িয়ে যায় মন।
সকল কথার অর্থ বোঝার নাইকো প্রয়োজন।

আলমোড়া
আষাঢ় ১৩৪৪

পদ্মায়

আমার নৌকো বাঁধা ছিল পদ্মানদীর পারে,
হাঁসের পাঁতি উড়ে যেত মেঘের ধারে ধারে—
জানি নে মন-কেমন-করা লাগত কী সুর হাওয়ায়
আকাশ বেয়ে দূর দেশেতে উদাস হয়ে যাওয়ায়।
কী জানি সেই দিনগুলি সব কোন্ আঁকিয়ের লেখা,
ঝিকিমিকি সোনার রঙে হালকা তুলির রেখা।
বালির 'পরে বয়ে যেত স্বচ্ছ নদীর জল,
তেমনি বইত তীরে তীরে গাঁয়ের কোলাহল—
ঘাটের কাছে, মাঠের ধারে, আলো-ছায়ার স্রোতে ;
অলস দিনের উড়্‌নিখানার পরশ আকাশ হতে
বুলিয়ে যেত মায়ার মন্ত্র আমার দেহে মনে।
তারই মধ্যে আসত ক্ষণে ক্ষণে
দূর কোকিলের স্বর,
মধুর হত আশ্বিনে রোদ্দুর।
পাশ দিয়ে সব নৌকো বড়ো বড়ো
পরদেশিয়া নানা খেতের ফসল ক'রে জড়ো
পশ্চিমে হাট বাজার হতে, জানি নে তার নাম,
পেরিয়ে আসত ধীর গমনে গ্রামের পরে গ্রাম
ঝপ্‌ঝপিয়ে দাঁড়ে।
খোরাক কিনতে নামত দাঁড়ি ছায়ানিবিড় পাড়ে।
যখন হত দিনের অবসান
গ্রামের ঘাটে বাজিয়ে মাদল গাইত হোলির গান।
ক্রমে রাত্রি নিবিড় হয়ে নৌকো ফেলত ঢেকে,
একটি কেবল দীপের আলো জ্বলত ভিতর থেকে।
শিকলে আর স্রোতে মিলে চলত টানের শব্দ ;
স্বপ্নে যেন ব'কে উঠত রজনী নিস্তব্ধ।
পুবে হাওয়ায় এল ঋতু, আকাশ-জোড়া মেঘ ;
ঘরমুখো ওই নৌকোগুলোয় লাগল অধীর বেগ।

ইলিশমাছ আর পাকা কাঁঠাল জমল পারের হাটে,
কেনাবেচার ভিড় লাগল নৌকো-বাঁধা ঘাটে।
ডিঙি বেয়ে পাটের আঁঠি আনছে ভারে ভারে,
মহাজনের দাঁড়িপাল্লা উঠল নদীর ধারে।
হাতে পয়সা এল, চাষি ভাব্‌না নাহি মানে,
কিনে নতুন ছাতা জুতো চলেছে ঘর-পানে।
পরদেশিয়া নৌকোগুলোর এল ফেরার দিন,
নিল ভরে খালি-করা কেরোসিনের টিন;
একটা পালের 'পরে ছোটো আরেকটা পাল তুলে
চলার বিপুল গর্বে তরীর বুক উঠেছে ফুলে।
মেঘ ডাকছে গুরু গুরু, থেমেছে দাঁড় বাওয়া,
ছুটছে ঘোলা জলের ধারা, বইছে বাদল হাওয়া।

আলমোড়া
৬।৬।৩৭

বালক

বয়স তখন ছিল কাঁচা; হালকা দেহখানা
ছিল পাখির মতো, শুধু ছিল না তার ডানা।
উড়ত পাশের ছাদের থেকে পায়রাগুলোর ঝাঁক,
বারান্দাটার রেলিং-'পরে ডাকত এসে কাক।
ফেরিওয়ালা হেঁকে যেত গলির ওপার থেকে,
তপসিমাছের ঝুড়ি নিত গামছা দিয়ে ঢেকে।
বেহালাটা হেলিয়ে কাঁধে ছাদের 'পরে দাদা,
সন্ধ্যাতারার সুরে যেন সুর হত তাঁর সাধা।
জুটেছি বৌদিদির কাছে ইংরেজি পাঠ ছেড়ে,
মুখখানিতে-ঘের-দেওয়া তাঁর শাড়িটি লালপেড়ে।
চুরি ক'রে চাবির গোছা লুকিয়ে ফুলের টবে
স্নেহের রাগে রাগিয়ে দিতেম নানান উপদ্রবে।
কঙ্কালী চাটুজ্জে হঠাৎ জুটত সন্ধ্যা হলে;
বাঁ হাতে তার থেলো হুঁকো, চাদর কাঁধে ঝোলে।

দ্রুত লয়ে আউড়ে যেত লবকুশের ছড়া ;
থাকত আমার খাতা লেখা, পড়ে থাকত পড়া—
মনে মনে ইচ্ছে হত, যদিই কোনো ছলে
ভর্তি হওয়া সহজ হত এই পাঁচালির দলে
ভাব্‌না মাথায় চাপত নাকো ক্লাসে ওঠার দায়ে,
গান শুনিয়ে চলে যেতুম নতুন নতুন গাঁয়ে।
স্কুলের ছুটি হয়ে গেলে বাড়ির কাছে এসে
হঠাৎ দেখি, মেঘ নেমেছে ছাদের কাছে ঘেঁষে।
আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে, রাস্তা ভাসে জলে,
ঐরাবতের শুঁড় দেখা দেয় জল-ঢালা সব নলে।
অন্ধকারে শোনা যেত রিম্‌ঝিমিনি ধারা,
রাজপুত্র তেপান্তরে কোথা সে পথহারা।
ম্যাপে যে-সব পাহাড় জানি, জানি যে-সব গাঙ
কুয়েন্‌লুন আর মিসিসিপি ইয়াংসিকিয়াং,
জানার সঙ্গে আধেক-জানা, দূরের থেকে শোনা,
নানা রঙের নানা সুতোয় সব দিয়ে জাল-বোনা,
নানারকম ধ্বনির সঙ্গে নানান চলাফেরা,
সব দিয়ে এক হালকা জগৎ মন দিয়ে মোর ঘেরা,
ভাব্‌নাগুলো তারই মধ্যে ফিরত থাকি থাকি,
বানের জলে শ্যাওলা যেমন, মেঘের তলে পাখি।

শান্তিনিকেতন
আষাঢ় ১৩৪৪

দেশান্তরী

প্রাণ-ধারণের বোঝাখানা বাঁধা পিঠের 'পরে,
আকাল পড়ল, দিন চলে না, চলল দেশান্তরে।
দূর শহরে একটা কিছু যাবেই যাবে জুটে,
এই আশাতেই লগ্ন দেখে ভোরবেলাতে উঠে
দুর্গা ব'লে বুক বেঁধে সে চলল ভাগ্যজয়ে,
মা ডাকে না পিছুর ডাকে অমঙ্গলের ভয়ে।

স্ত্রী দাঁড়িয়ে দুয়ার ধরে দুচোখ শুধু মোছে,
আজ সকালে জীবনটা তার কিছুতেই না রোচে।
ছেলে গেছে আম কুড়োতে দিঘির পাড়ে উঠি,
মা তারে আজ ভুলে আছে তাই পেয়েছে ছুটি।
স্ত্রী বলেছে বারে বারে, যে ক'রে হোক খেটে
সংসারটা চালাবে সে, দিন যাবে তার কেটে।
ঘর ছাইতে খড়ের আঁটির জোগান দেবে সে যে,
গোবর দিয়ে নিকিয়ে দেবে দেয়াল পাঁচিল মেঝে।
মাঠের থেকে খড়কে কাঠি আনবে বেছে বেছে,
ঝাঁটা বেঁধে কুমোরটুলির হাটে আসবে বেচে।
ঢেঁকিতে ধান ভেনে দেবে বামুনদিদির ঘরে,
খুদকুঁড়ো যা জুটবে তাতেই চলবে দুর্বছরে।
দূর দেশেতে বসে বসে মিথ্যা অকারণে
কোনোমতেই ভাবনা যেন না রয় স্বামীর মনে।
সময় হল, ওই তো এল খেয়াঘাটের মাঝি,
দিন না যেতে রহিমগঞ্জে যেতেই হবে আজি।
সেইখানেতে চৌকিদারি করে ওদের জ্ঞাতি,
মহেশখুড়োর মেজো জামাই, নিতাই দাসের নাতি।
নতুন নতুন গাঁ পেরিয়ে অজানা এই পথে
পৌঁছবে পাঁচদিনের পরে শহর কোনোমতে।
সেইখানে কোন্ হালসিবাগান, ওদের গ্রামের কালো,
শর্ষেতেলের দোকান সেথায় চালাচ্ছে খুব ভালো।
গেলে সেথায় কালুর খবর সবাই বলে দেবে—
তার পরে সব সহজ হবে, কী হবে আর ভেবে।
স্ত্রী বললে, "কালুদাকে খবরটা এই দিয়ো,
ওদের গাঁয়ের বাদল পালের জাঠতুত ভাই প্রিয়
বিয়ে করতে আসবে আমার ভাইঝি মল্লিকাকে
উনত্রিশে বৈশাখে।"

শান্তিনিকেতন
আষাঢ় ১৩৪৪

অচলা বুড়ি

অচলবুড়ি, মুখখানি তার হাসির রসে ভরা,
স্নেহের রসে পরিপক্ক অতিমধুর জরা।
ফুলো ফুলো দুই চোখে তার, দুই গালে আর ঠোঁটে
উছলে-পড়া হৃদয় যেন ঢেউ খেলিয়ে ওঠে।
পরিপুষ্ট অঙ্গটি তার, হাতের গড়ন মোটা,
কপালে দুই ভুরুর মাঝে উল্‌কি-আঁকা ফোঁটা।
গাড়ি-চাপা কুকুর একটা মরতেছিল পথে,
সেবা ক'রে বাঁচিয়ে তারে তুলল কোনোমতে।
খোঁড়া কুকুর সেই ছিল তার নিত্যসহচর;
আধপাগলি ঝি ছিল এক, বাড়ি বালেশ্বর।
দাদাঠাকুর বলত, "বুড়ি, জমল কত টাকা,
সঙ্গে ওটা যাবে না তো, বাক্সে রইল ঢাকা,
ব্রাহ্মণে দান করতে না চাও নাহয় দাও-না ধার,
জানোই তো এই অসময়ে টাকার কী দরকার।"
বুড়ি হেসে বলে, "ঠাকুর, দরকার তো আছেই,
সেইজন্যে ধার না দিয়ে রাখি টাকা কাছেই।"

সাঁৎরাপাড়ার কায়েতবাড়ির বিধবা এক মেয়ে,
এককালে সে সুখে ছিল বাপের আদর পেয়ে।
বাপ মরেছে, স্বামী গেছে, ভাইরা না দেয় ঠাঁই—
দিন চালাবে এমনতরো উপায় কিছু নাই।
শেষকালে সে ক্ষুধার দায়ে, দৈন্যদশার লাজে
চলে গেল হাঁসপাতালে রোগীসেবার কাজে।
এর পিছনে বুড়ি ছিল, আর ছিল লোক তার
কংসারি শীল বেনের ছেলে মুকুন্দ মোক্তার।
গ্রামের লোকে ছি-ছি করে, জাতে ঠেলল তাকে,
একলা কেবল অচল বুড়ি আদর করে ডাকে।

সে বলে, "তুই বেশ করেছিস যা বলুক-না যেবা,
ভিক্ষা মাগার চেয়ে ভালো দুঃখী দেহের সেবা।"

জমিদারের মায়ের শ্রাদ্ধ, বেগার খাটার ডাক—
রাই ডোম্‌নির ছেলে বললে, কাজের যে নেই ফাঁক,
পারবে না আজ যেতে। শুনে কোতলপুরের রাজা
বললে, ওকে যে ক'রে হোক দিতেই হবে সাজা।
মিশনরির স্কুলে প'ড়ে, কম্পোজিটরের
কাজ শিখে সে শহরেতে আয় করেছে ঢের—
তাই হবে কি ছোটোলোকের ঘাড়-বাঁকানো চাল।
সাক্ষ্য দিল হরিশ মৈত্র, দিল মাখনলাল—
ডাকলুঠের এক মোকদ্দমায় মিথ্যে জড়িয়ে ফেলে
গোষ্ঠকে তো চালান দিল সাত বছরের জেলে।
ছেলের নামের অপমানে আপন পাড়া ছাড়ি
ডোম্‌নি গেল ভিন গাঁয়েতে পাততে নতুন বাড়ি।
প্রতি মাসে অচলবুড়ি দামোদরের পারে
মাসকাবারের জিনিস নিয়ে দেখে আসত তারে।
যখন তাকে খোঁটা দিল গ্রামের শম্ভু পিসে
"রাই ডোম্‌নির 'পরে তোমার এত দরদ কিসে"
বুড়ি বললে, "যারা ওকে দিল দুঃখরাশি
তাদের পাপের বোঝা আমি হালকা করে আসি।"

পাতানো এক নাতনি বুড়ির একজরি জ্বরে
ভুগতেছিল স্বরূপগঞ্জে আপন শ্বশুরঘরে।
মেয়েটাকে বাঁচিয়ে তুলল দিন রাত্রি জেগে,
ফিরে এসে আপনি পড়ল রোগের ধাক্কা লেগে।
দিন ফুরলো, দেব্‌তা শেষে ডেকে নিল তাকে—
এক আঘাতে মারল যেন সকল পল্লীটাকে।
অবাক হল দাদাঠাকুর, অবাক স্বরূপকাকা—
ডোম্‌নিকে সব দিয়ে গেছে বুড়ির জমা টাকা।

জিনিসপত্র আর যা ছিল দিল পাগল ঝিকে,
সঁপে দিল তারই হাতে খোঁড়া কুকুরটিকে।
ঠাকুর বললে মাথা নেড়ে, "অপাত্রে এই দান!
পরলোকের হারালো পথ, ইহলোকের মান।"

শান্তিনিকেতন
[? আষাঢ়] ১৩৪৪

সুধিয়া

গয়লা ছিল শিউনন্দন, বিখ্যাত তার নাম
গোয়ালবাড়ি ছিল যেন একটা গোটা গ্রাম।
গোরু-চরার প্রকাণ্ড খেত, নদীর ওপার চরে,
কলাই শুধু ছিটিয়ে দিত পলি জমির 'পরে।
জেগে উঠত চারা তারই, গজিয়ে উঠত ঘাস,
ধেনুদলের ভোজ চলত মাসের পরে মাস।
মাঠটা জুড়ে বাঁধা হত বিশ-পঞ্চাশ চালা,
জমত রাখাল ছেলেগুলোর মহোৎসবের পালা।
গোপাষ্টমীর পর্বদিনে প্রচুর হত দান,
গুরুঠাকুর গা ডুবিয়ে দুধে করত স্নান।
তার থেকে সর ক্ষীর নবনী তৈরি হত কত,
প্রসাদ পেত গাঁয়ে গাঁয়ে গয়লা ছিল যত।

বছর তিনেক অনাবৃষ্টি, এল মন্বন্তর,
শ্রাবণ মাসে শোণনদীতে বান এল তার পর।
ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে গর্জি ছুটল ধারা,
ধরণী চায় শূন্য-পানে সীমার চিহ্নহারা।
ভেসে চলল গোরু বাছুর, টান লাগল গাছে;
মানুষে আর সাপে মিলে শাখা আঁকড়ে আছে।
বন্যা যখন নেমে গেল, বৃষ্টি গেল থামি—
আকাশ জুড়ে দৈত্য-দেবের ঘুচল সে পাগলামি।

শিউনন্দন দাঁড়ালো তার শূন্য ভিটেয় এসে—
তিনটে শিশুর ঠিকানা নেই, স্ত্রী গেছে তার ভেসে।
চুপ করে সে রইল বসে, বুদ্ধি পায় না খুঁজি।
মনে হল, সব কথা তার হারিয়ে গেল বুঝি।
ছেলেটা তার ভীষণ জোয়ান, সামরু বলে তাকে ;
এক-গলা এই জলে-ডোবা সকল পাড়াটাকে
মথন করে ফিরে ফিরে তিনটে গোরু নিয়ে
ঘরে এসে দেখলে, দু হাত চোখে ঢাকা দিয়ে
ইষ্টদেবকে স্মরণ ক'রে নড়ছে বাপের মুখ ;
তাই দেখে ওর একেবারে জ্বলে উঠল বুক—
বলে উঠল, "দেবতাকে তোর কেন মরিস ডাকি।
তার দয়াটা বাঁচিয়ে যেটুক আজও রইল বাকি
ভার নেব তার নিজের 'পরেই, ঘটুক-নাকো যাই আর,
এর বাড়া তো সর্বনাশের সম্ভাবনা নাই আর।"
এই বলে সে বাড়ি ছেড়ে পাঁকের পথে ঘুরে
চিহ্ন-দেওয়া নিজের গোরু অনেক দূরে দূরে
গোটা পাঁচেক খোঁজ পেয়ে তার আনলে তাদের কেড়ে,
মাথা ভাঙবে ভয় দেখাতেই সবাই দিল ছেড়ে।
ব্যাবসাটা ফের শুরু করল নেহাত গরিব চালে,
আশা রইল উঠবে জেগে আবার কোনোকালে।

এদিকেতে প্রকাণ্ড এক দেনার অজগরে
একে একে গ্রাস করছে যা আছে তার ঘরে।
একটু যদি এগোয় আবার পিছন দিকে ঠেলে,
দেনা পাওনা দিনরাত্রি জোয়ার-ভাঁটা খেলে।
মাল তদন্ত করতে এল ছুনিয়াচাঁদ বেনে,
দশবছরের ছেলেটাকে সঙ্গে করে এনে।
ছেলেটা ওর জেদ ধরেছে— ওই সুধিয়া গাই
পুষবে ঘরে আপন ক'রে ওইটে নেহাত চাই।

সামরু বলে, "তোমার ঘরে কী ধন আছে কত
আমাদের এই সুখিয়াকে কিনে নেবার মতো।
ও যে আমার মানিক, আমার সাত রাজার ওই ধন,
আর যা আমার যায় সবই যাক, দুঃখিত নয় মন।
মৃত্যুপারের থেকেই ও যে ফিরেছে মোর কাছে,
এমন বন্ধু তিন ভুবনে আর কি আমার আছে।"
বাপের কানে কি বললে সেই দুনিচাঁদের ছেলে,
জেদ বেড়ে তার গেল বুঝি যেমনি বাধা পেলে।
শেঠজি বলে মাথা নেড়ে, "দুই চারিমাস যেতেই
ওই সুখিয়ার গতি হবে আমার গোয়ালেতেই।"

কালোয় সাদায় মিশোল বরন, চিকন নধর দেহ,
সর্ব অঙ্গে ব্যাপ্ত যেন রাশীকৃত স্নেহ।
আকাল এখন, সামরু নিজে দুইবেলা আধ-পেটা;
সুখিয়াকে খাওয়ানো চাই যখনি পায় যেটা।
দিনের কাজের অবসানে গোয়ালঘরে ঢুকে
ব'কে যায় সে গাভীর কানে যা আসে তার মুখে।
কারো 'পরে রাগ সে জানায়, কখনো সাবধানে
গোপন খবর থাকলে কিছু জানায় কানে কানে।
সুখিয়া সব দাঁড়িয়ে শোনে কানটা খাড়া ক'রে,
বুঝি কেবল ধ্বনির সুখে মন ওঠে তার ভরে।

সামরু যখন ছোটো ছিল পালোয়ানের পেশা
ইচ্ছা করেছিল নিতে, ওই ছিল তার নেশা।
খবর পেল, নবাববাড়ি কুস্তিগিরের দল
পাল্লা দেবে— সামরু শুনে অসহ্য চঞ্চল।
বাপকে ব'লে গেল ছেলে, "কথা দিচ্ছি শোনো,
এক হপ্তার বেশি দেরি হবে না কখ্খোনো।"
ফিরে এসে দেখতে পেলে, সুখিয়া তার গাই
শেঠ নিয়েছে ছলে-বলে, গোয়ালঘরে নাই।

যেমনি শোনা অমনি ছুটল, ভোজালি তার হাতে,
ছনিচাঁদের গদি যেথায় নাজির-মহল্লাতে।
"কী রে সামরু, ব্যাপারটা কী" শেঠজি শুধায় তাকে।
সামরু বলে, "ফিরিয়ে নিতে এলুম সুধিয়াকে।"
শেঠ বললে, "পাগল নাকি, ফিরিয়ে দেব তোরে,
পরশু ওকে নিয়ে এলুম ডিক্রিজারি করে।"
"সুধিয়া রে" "সুধিয়া রে" সামরু দিল হাঁক,
পাড়ার আকাশ পেরিয়ে গেল বজ্রমন্দ্র ডাক।
চেনা সুরের হাম্বা ধ্বনি কোথায় জেগে উঠে,
দড়ি ছিঁড়ে সুধিয়া ওই হঠাৎ এল ছুটে।
দু চোখ দিয়ে ঝরছে বারি, অঙ্গটি তার রোগা,
অন্নপানে দেয় নি সে মুখ, অনশনে-ভোগা।
সামরু ধরল জড়িয়ে গলা, বললে, "নাই রে ভয়,
আমি থাকতে দেখব এখন কে তোরে আর লয়।—
তোমার টাকায় ছনিয়া কেনা, শেঠ ছনিচাঁদ, তবু
এই সুধিয়া একলা নিজের, আর কারো নয় কভু।
আপন ইচ্ছামতে যদি তোমার ঘরে থাকে
তবে আমি এই মুহূর্তে রেখে যাব তাকে।"
চোখ পাকিয়ে কয় ছনিচাঁদ, "পশুর আবার ইচ্ছে!
গয়লা তুমি, তোমার কাছে কে উপদেশ নিচ্ছে।
গোল কর তো ডাকব পুলিস।" সামরু বললে, "ডেকো।
ফাঁসি আমি ভয় করি নে, এইটে মনে রেখো।
দশবছরের জেল খাটব, ফিরব তো তার পর,
সেই কথাটাই ভেবো বসে, আমি চললেম ঘর।"

শান্তিনিকেতন
আষাঢ় ১৩৪৪

মাধো

রায়বাহাদুর কিষনলালের স্যাকরা জগন্নাথ,
সোনারুপোর সকল কাজে নিপুণ তাহার হাত।
আপন বিদ্যা শিখিয়ে মানুষ করবে ছেলেটাকে
এই আশাতে সময় পেলেই ধরে আনত তাকে ;
বসিয়ে রাখত চোখের সামনে, জোগান দেবার কাজে
লাগিয়ে দিত যখন তখন ; আবার মাঝে মাঝে
ছোটো মেয়ের পুতুল-খেলার গয়না গড়াবার
ফরমাশেতে খাটিয়ে নিত ; আগুন ধরাবার
সোনা গলাবার কর্মে একটুখানি ভুলে
চড়চাপড়টা পড়ত পিঠে, টান লাগাত চুলে।
সুযোগ পেলেই পালিয়ে বেড়ায় মাধো যে কোন্‌খানে
ঘরের লোকে খুঁজে ফেরে বৃথাই সন্ধানে।
শহরতলির বাইরে আছে দিঘি সাবেককেলে
সেইখানে সে জোটায় যত লক্ষ্মীছাড়া ছেলে।
গুলিডাণ্ডা খেলা ছিল, দোলনা ছিল গাছে,
জানা ছিল যেথায় যত ফলের বাগান আছে।
মাছ ধরবার ছিপ বানাত, সিসুডালের ছড়ি ;
টাট্টু ঘোড়ার পিঠে চড়ে ছোটাত দড়্‌বড়ি !
কুকুরটা তার সঙ্গে থাকত, নাম ছিল তার বটু—
গিরগিটি আর কাঠবেড়ালি তাড়িয়ে ফেরায় পটু।
শালিখপাখির মহলেতে মাধোর ছিল যশ,
ছাতুর গুলি ছড়িয়ে দিয়ে করত তাদের বশ।
বেগার দেওয়ার কাজে পাড়ায় ছিল না তার মতো,
বাপের শিক্ষানবিশিতেই কুঁড়েমি তার যত।

কিষনলালের ছেলে, তাকে দুলাল ব'লে ডাকে,
পাড়াসুদ্ধ ভয় করে এই বাঁদর ছেলেটাকে।
বড়োলোকের ছেলে ব'লে গুমর ছিল মনে,

অত্যাচারে তারই প্রমাণ দিত সকলখনে।
বটুর হবে সাঁতারখেলা, বটু চলছে ঘাটে,
এসেছে যেই দুলালচাঁদের গোলা খেলার মাঠে
অকারণে চাবুক নিয়ে দুলাল এলো তেড়ে ;
মাধো বললে, "মারলে কুকুর ফেলব তোমায় পেড়ে।"
উঁচিয়ে চাবুক দুলাল এল, মানল নাকো মানা,
চাবুক কেড়ে নিয়ে মাধো, করলে দুভিনখানা।
দাঁড়িয়ে রইল মাধো, রাগে কাঁপছে থরোথরো,
বললে, "দেখব সাধ্য তোমার, কী করবে তা করো।"
দুলাল ছিল বিষম ভীতু, বেগ শুধু তার পায়ে ;
নামের জোরেই জোর ছিল তার, জোর ছিল না গায়ে।

দশবিশজন লোক লাগিয়ে বাপ আনলে ধরে,
মাধোকে এক খাটের খুরোয় বাঁধল কষে জোরে।
বললে, "জানিসনেকো বেটা, কাহার অন্ন খাবিস,
এত বড়ো বুকের পাটা, মনিবকে তুই মারিস।
আজ বিকালে হাটের মধ্যে হিঁচড়ে নিয়ে তোকে,
দুলাল স্বয়ং মারবে চাবুক, দেখবে সকল লোকে।"
মনিববাড়ির পেয়াদা এল দিন হল যেই শেষ।
দেখলে দড়ি আছে পড়ি, মাধো নিরুদ্দেশ।
মাকে শুধায়, "এ কী কাণ্ড।" মা শুনে কয়, "নিজে
আপন হাতে বাঁধন তাহার আমিই খুলেছি যে।
মাধো চাইল চলে যেতে ; আমি বললেম, যেয়ো,
এমন অপমানের চেয়ে মরণ ভালো সেও।"
স্বামীর 'পরে হানল দৃষ্টি দারুণ অবজ্ঞায় ;
বললে, "তোমার গোলামিতে ধিক্ সহস্রবার।"

পেরোলো বিশ-পঁচিশ বছর ; বাংলাদেশে গিয়ে
আপন জাতের মেয়ে বেছে মাধো করল বিয়ে।
ছেলে মেয়ে চলল বেড়ে, হল সে সংসারী ;

কোন্‌খানে এক পাটকলে সে করতেছে সর্দারি।
এমন সময় নরম যখন হল পাটের বাজার
মাইনে ওদের কমিয়ে দিতেই, মজুর হাজার হাজার
ধর্মঘটে বাঁধল কোমর; সাহেব দিল ডাক;
বললে, "মাধো, ভয় নেই তোর, আলগোছে তুই থাক্।
দলের সঙ্গে যোগ দিলে শেষ মরবি-যে মার খেয়ে।"
মাধো বললে, "মরাই ভালো এ বেইমানির চেয়ে।"
শেষপালাতে পুলিস নামল, চলল গুঁতোগাঁতা;
কারো পড়ল হাতে বেড়ি, কারো ভাঙল মাথা।
মাধো বললে, "সাহেব, আমি বিদায় নিলেম কাজে,
অপমানের অন্ন আমার সহ্য হবে না যে।"
চলল সেথায় যে-দেশ থেকে দেশ গেছে তার মুছে,
মা মরেছে, বাপ মরেছে, বাঁধন গেছে ঘুচে।
পথে বাহির হল ওরা ভরসা বুকে আঁটি,
ছেঁড়া শিকড় পাবে কি আর পুরোনো তার মাটি।

শ্রাবণ ১৩৪৪

আতার বিচি

আতার বিচি নিজে পুঁতে পাব তাহার ফল,
দেখব ব'লে ছিল মনে বিষম কৌতূহল।
তখন আমার বয়স ছিল নয়,
অবাক লাগত কিছুর থেকে কেন কিছুই হয়।
দোতলাতে পড়ার ঘরের বারান্দাটা বড়ো,
ধুলোবালি একটা কোণে করেছিলুম জড়ো।
সেথায় বিচি পুঁতেছিলুম অনেক যত্ন করে,
গাছ বুঝি আজ দেখা দেবে, ভেবেছি রোজ ভোরে।
বারান্দাটার পূর্বধারে টেবিল ছিল পাতা,
সেইখানেতে পড়া চলত; পুঁথিপত্র খাতা
রোজ সকালে উঠত জমে দুর্ভাবনার মতো;

পড়া দিতেন, পড়া নিতেন মাস্টার মন্মথ।
পড়তে পড়তে বারে বারে চোখ যেত ওই দিকে,
গোল হত সব বানানেতে, ভুল হত সব ঠিকে।
অধৈর্য অসহ্য হত, খবর কে তার জানে
কেন আমার যাওয়া-আসা ওই কোণটার পানে।
ছ মাস গেল মনে আছে, সেদিন শুক্রবার—
অঙ্কুরটি দেখা দিল নবীন সুকুমার।
অন্ধ-কষার বারান্দাতে চুনসুরকির কোণে
অপূর্ব সে দেখা দিল, নাচ লাগালো মনে।
আমি তাকে নাম দিয়েছি আতা গাছের খুকু,
ক্ষণে ক্ষণে দেখতে যেতেম, বাড়ল কতটুকু।
দুদিন বাদেই শুকিয়ে যেত সময় হলে তার,
এ জায়গাতে স্থান নাহি ওর করত আবিষ্কার;
কিন্তু যেদিন মাস্টার ওর দিলেন মৃত্যুদণ্ড,
কচিকচি পাতায় কুঁড়ি হল খণ্ড খণ্ড,
আমার পড়ার ত্রুটির জন্যে দায়ী করলেন ওকে,
বুক যেন মোর ফেটে গেল, অশ্রু ঝরল চোখে।
দাদা বললেন, কী পাগলামি, শান-বাঁধানো মেঝে,
হেথায় আতার বীজ লাগানো ঘোর বোকামি এ যে।
আমি ভাবলুম, সারা দিনটা বুকের ব্যথা নিয়ে,
বড়োদের এই জোর খাটানো অন্যায় নয় কি এ।
মূর্খ আমি ছেলেমানুষ, সত্য কথাই সে তো,
একটু সবুর করলেই তা আপনি ধরা যেত।

শ্রাবণ ১৩৪৪

মাকাল

গৌরবর্ণ নধর দেহ, নাম শ্রীযুক্ত রাখাল,
জন্ম তাহার হয়েছিল সেই যে-বছর আকাল।
গুরুমশায় বলেন তারে,
"বুদ্ধি যে নেই একেবারে;

দ্বিতীয়ভাগ করতে সারা ছ'মাস ধরে নাকাল।"
রেগেমেগে বলেন, "বাঁদর, নাম দিনু তোর মাকাল।"

নামটা শুনে ভাবলে প্রথম বাঁকিয়ে যুগল ভুরু ;
তার পর সে বাড়ি এসে নৃত্য করলে শুরু।
হঠাৎ ছেলের মাতন দেখি
সবাই তাকে শুধায়, এ কী !
সকলকে সে জানিয়ে দিল, নাম দিয়েছেন গুরু—
নতুন নামের উৎসাহে তার বক্ষ দুরুদুরু।

কোলের 'পরে বসিয়ে দাদা বললে কানে-কানে,
"গুরুমশায় গাল দিয়েছেন, বুঝিস নে তার মানে !"
রাখাল বলে, "কথ্‌খোনো না,
মা যে আমায় বলেন সোনা,
সেটা তো গাল নয় সে কথা পাড়ার সবাই জানে।
আচ্ছা, তোমায় দেখিয়ে দেব, চলো তো ঐখানে।"

টেনে নিয়ে গেল তাকে পুকুরপাড়ের কাছে,
বেড়ার 'পরে লতায় যেথা মাকাল ফ'লে আছে।
বললে, "দাদা সত্যি বোলো,
সোনার চেয়ে মন্দ হল ?
তুমি শেষে বলতে কি চাও, গাল ফলেছে গাছে।"
"মাকাল আমি" ব'লে রাখাল দু হাত তুলে নাচে।

দোয়াত কলম নিয়ে ছোটে, খেলতে নাহি চায় ;
লেখাপড়ায় মন দেখে মা অবাক হয়ে যায়।
খাবার বেলায় অবশেষে
দেখে ছেলের কাণ্ড এসে—
মেঝের 'পরে ঝুঁকে প'ড়ে খাতার পাতাটায়
লাইন টেনে লিখছে শুধু— মাকালচন্দ্র রায়।

৮ ডিসেম্বর ১৯৩১

পাথরপিণ্ড

সাগরতীরে পাথরপিণ্ড ঢুঁ মারতে চায় কাকে,
বুঝি আকাশটাকে।
শান্ত আকাশ দেয় না কোনো জবাব,
পাথরটা রয় উঁচিয়ে মাথা, এমনি সে তার স্বভাব।
হাতের কাছেই আছে সমুদ্রটা,
অহংকারে তারই সঙ্গে লাগত যদি ওটা,
এমনি চাপড় খেত, তাহার ফলে
হুড়্মুড়িয়ে ভেঙেচুরে পড়ত অগাধ জলে।
ঢুঁ-মারা এই ভঙ্গীখানা কোটি বছর থেকে
ব্যঙ্গ ক'রে কপালে তার কে দিল ওই এঁকে।
পণ্ডিতেরা তার ইতিহাস বের করেছেন খুঁজি;
শুনি তাহা, কতক বুঝি, নাইবা কতক বুঝি।

অনেক যুগের আগে
একটা সে কোন্ পাগলা বাষ্প আগুন-ভরা রাগে
মা ধরণীর বক্ষ হতে ছিনিয়ে বাঁধন-পাশ
জ্যোতিষ্কদের ঊর্ধ্বপাড়ায় করতে গেল বাস।
বিদ্রোহী সেই দুরাশা তার প্রবল শাসন-টানে
আছাড় খেয়ে পড়ল ধরার পানে।
লাগল কাহার শাপ,
হারালো তার ছুটোছুটি, হারালো তার তাপ।
দিনে দিনে কঠিন হয়ে ক্রমে
আড়ষ্ট এক পাথর হয়ে কখন গেল জমে।
আজকে যে ওর অন্ধ নয়ন, কাতর হয়ে চায়
সম্মুখে কোন্ নিঠুর শূন্যতায়।
স্তম্ভিত চীৎকার সে যেন, যন্ত্রণা নির্বাক,
যে যুগ গেছে তার উদ্দেশে কণ্ঠহারার ডাক।

আগুন ছিল পাখায় যাহার আজ মাটি-পিঞ্জরে
কান পেতে সে আছে ঢেউয়ের তরল কলস্বরে।
শোনার লাগি ব্যগ্র তাহার ব্যর্থ বধিরতা
হেরে-যাওয়া সে যৌবনের ভুলে-যাওয়া কথা।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

তালগাছ

বেড়ার মধ্যে একটি আমের গাছে
গম্ভীরতায় আসর জমিয়ে আছে।
পরিতৃপ্ত মূর্তিটি তার তৃপ্ত চিকন পাতায়,
দুপুরবেলায় একটুখানি হাওয়া লাগছে মাথায়।

মাটির সঙ্গে মুখোমুখি ঘাসের আঙিনাতে
সঙ্গিনী তার শ্যামল ছায়া, আঁচলখানি পাতে।
গোরু চরে রৌদ্রছায়ায় সারা প্রহর ধরে;
খাবার মতো ঘাস বেশি নেই, আরাম শুধুই চ'রে।
পেরিয়ে বেড়া ওই যে তালের গাছ,
নীল গগনে ক্ষণে ক্ষণে দিচ্ছে পাতার নাচ।
আশেপাশে তাকায় না সে, দূরে-চাওয়ার ভঙ্গী,
এমনিতরো ভাবটা যেন নয় সে মাটির সঙ্গী।
ছায়াতে না মেলায় ছায়া বসন্ত-উৎসবে,
বায়না না দেয় পাখির গানের বনের গীতরবে।
তারার পানে তাকিয়ে কেবল কাটায় রাত্রিবেলা,
জোনাকিদের 'পরে যে তার গভীর অবহেলা।
উলঙ্গ সুদীর্ঘ দেহে সামান্য সম্বলে
তার যেন ঠাঁই ঊর্ধ্ববাহু সন্ন্যাসীদের দলে।

আলমোড়া
১৩।৬।৩৭

শনির দশা

আধবুড়ো ওই মানুষটি মোর নয় চেনা—
একলা বসে ভাবছে, কিংবা ভাবছে না,
মুখ দেখে ওর সেই কথাটাই ভাবছি,
মনে মনে আমি যে ওর মনের মধ্যে নাবছি।

বুঝিবা ওর মেঝোমেয়ে পাতা ছয়েক ব'কে
মাথার দিব্যি দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল ওকে।
উমারানীর বিষম স্নেহের শাসন,
জানিয়েছিল, চতুর্থীতে খোকার অন্নপ্রাশন—
জিদ ধরেছে, হোক-না যেমন ক'রেই
আসতে হবে শুক্রবার কি শনিবারের ভোরেই।
আবেদনের পত্র একটি লিখে
পাঠিয়েছিল বুড়ো তাদের কর্তাবাবুটিকে।
বাবু বললে, 'হয় কখনো তা কি,
মাসকাবারের ঝুড়িঝুড়ি হিসাব লেখা বাকি,
সাহেব শুনলে আগুন হবে চটে,
ছুটি নেবার সময় এ নয় মোটে।'
মেয়ের দুঃখ ভেবে
বুড়ো বারেক ভেবেছিল কাজে জবাব দেবে।
সুবুদ্ধি তার কইল কানে রাগ গেল যেই থামি,
আসন্ন পেন্‌সনের আশা ছাড়াটা পাগলামি।
নিজেকে সে বললে, 'ওরে, এবার না হয় কিনিস।
ছোটোছেলের মনের মতো একটা-কোনো জিনিস।'
যেটার কথাই ভেবে দেখে দামের কথায় শেষে
বাধায় ঠেকে এসে।
শেষকালে ওর পড়ল মনে জাপানি ঝুমঝুমি,
দেখলে খুশি হয়তো হবে উমি।

কেইবা জানবে দামটা যে তার কত,
বাইরে থেকে ঠিক দেখাবে খাঁটি রুপোর মতো।
এমনি করে সংশয়ে তার কেবলই মন ঠেলে,
হাঁ-না নিয়ে ভাবনাস্রোতে জোয়ার-ভাঁটা খেলে।
রোজ সে দেখে টাইম্‌টেবিলখানা,
ক'দিন থেকে ইস্‌টিশনে প্রত্যহ দেয় হানা।
সামনে দিয়ে যায় আসে রোজ মেল,
গাড়িটা তার প্রত্যহ হয় ফেল।
চিন্তিত ওর মুখের ভাবটা দেখে
এমনি একটা ছবি মনে নিয়েছিলেম এঁকে।

কৌতূহলে শেষে
একটুখানি উস্‌খুসিয়ে একটুখানি কেশে,
শুধাই তারে ব'সে তাহার কাছে,
"কী ভাবতেছেন, বাড়িতে কি মন্দ খবর আছে।"
বললে বুড়ো, "কিচ্ছুই নয়, মশায়,
আসল কথা, আছি শনির দশায়।
তাই ভাবছি কী করা যায় এবার
ঘোড়দৌড়ে দশটি টাকা বাজি ফেলে দেবার।
আপনি বলুন, কিনব টিকিট আজ কি।"
আমি বললেম, "কাজ কী।"
রাগে বুড়োর গরম হল মাথা;
বললে, "থামো, ঢের দেখেছি পরামর্শদাতা!
কেনার সময় রইবে না আর আজিকার এই দিন বৈ!
কিনব আমি, কিনব আমি, যে ক'রে হোক কিনবই।"

আলমোড়া
৪।৬।৩৭

রিক্ত

বইছে নদী বালির মধ্যে, শূন্য বিজন মাঠ,
নাই কোনো ঠাঁই ঘাট।
অল্প জলের ধারাটি বয়, ছায়া দেয় না গাছে,
গ্রাম নেইকো কাছে।
রুক্ষ হাওয়ায় ধরার বুকে সূক্ষ্ম কাঁপন কাঁপে
চোখ-ধাঁধাঁনো তাপে।
কোথাও কোনো শব্দ-যে নেই তারই শব্দ বাজে
ঝাঁ-ঝাঁ ক'রে সারাদুপুর দিনের বক্ষোমাঝে।
আকাশ বাহার একলা অতিথ শুষ্ক বালুর স্তূপে
দিগ্‌বধূ রয় অবাক হয়ে বৈরাগিণীর রূপে।
দূরে দূরে কাশের ঝোপে শরতে ফুল ফোটে,
বৈশাখে ঝড় ওঠে।
আকাশ ব্যেপে ভূতের মাতন বালুর ঘূর্ণি ঘোরে;
নৌকো ছুটে আসে না তো সামাল সামাল ক'রে।
বর্ষা হলে বন্যা নামে দূরের পাহাড় হতে,
কূল-হারানো স্রোতে
জলে স্থলে হয় একাকার; দমকা হাওয়ার বেগে
সওয়ার যেন চাবুক লাগায় দৌড়-দেওয়া মেঘে।
সারা বেলাই বৃষ্টিধারা ঝাপট লাগায় যবে
মেঘের ডাকে সুর মেশে না ধেনুর হাম্বারবে।
খেতের মধ্যে কল্‌কলিয়ে ঘোলা স্রোতের জল
ভাসিয়ে নিয়ে আসে না তো শ্যাওলা-পানার দল।
রাত্রি যখন ধ্যানে বসে তারাগুলির মাঝে
তীরে তীরে প্রদীপ জ্বলে না যে—
সমস্ত নিঃঝুম
জাগাও নেই কোনোখানে, কোথাও নেই ঘুম।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

বাসাবাড়ি

এই শহরে এই তো প্রথম আসা।
আড়াইটা রাত, খুঁজে বেড়াই কোন্ ঠিকানায় বাসা।
লণ্ঠনটা ঝুলিয়ে হাতে আন্দাজে যাই চলি,
অজগরের ভূতের মতন গলির পরে গলি।
ধাঁধাঁ ক্রমেই বেড়ে ওঠে, এক জায়গায় থেমে
দেখি পথের বাঁদিক থেকে ঘাট গিয়েছে নেমে।
আঁধার মুখোশ-পরা বাড়ি সামনে আছে খাড়া;
হাঁ-করা-মুখ দুয়ারগুলো, নাইকো শব্দসাড়া।
চৌতলাতে একটা ধারে জানলাখানার ফাঁকে
প্রদীপশিখা ছুঁচের মতো বিঁধছে আঁধারটাকে।
বাকি মহল যত
কালো মোটা ঘোমটা-দেওয়া দৈত্যনারীর মতো।
বিদেশীর এই বাসাবাড়ি, কেউবা কয়েক মাস
এইখানে সংসার পেতেছে, করছে বসবাস;
কাজকর্ম সাঙ্গ করি কেউবা কয়েক দিনে
চুকিয়ে ভাড়া কোন্খানে যায়, কেই বা তাদের চিনে।
সুধাই আমি, "আছ কি কেউ, জায়গা কোথায় পাই।"
মনে হল জবাব এল, "আমরা নাই নাই।"
সকল দুয়োর জানলা হতে, যেন আকাশ জুড়ে
ঝাঁকে ঝাঁকে রাতের পাখি শূন্যে চলল উড়ে।
একসঙ্গে চলার বেগে হাজার পাখা তাই
অন্ধকারে জাগায় ধ্বনি, "আমরা নাই নাই।"
আমি সুধাই, "কিসের কাজে এসেছ এইখানে।"
জবাব এল, "সেই কথাটা কেহই নাহি জানে।
যুগে যুগে বাড়িয়ে চলি নেই-হওয়াদের দল,
বিপুল হয়ে ওঠে যখন দিনের কোলাহল
সকল কথার উপরেতে চাপা দিয়ে যাই—
নাই, নাই, নাই।"

পরের দিনে সেই বাড়িতে গেলেম সকালবেলা—
ছেলেরা সব পথে করছে লড়াই-লড়াই খেলা,
কাঠি হাতে দুই পক্ষের চলছে ঠকাঠকি।
কোণের ঘরে দুই বুড়োতে বিষম বকাবকি—
বাজিখেলায় দিনে দিনে কেবল জেতা হারা,
দেনা-পাওনা জমতে থাকে, হিসাব হয় না সারা।
গন্ধ আসছে রান্নাঘরের, শব্দ বাসন-মাজার ;
শূন্য ঝুড়ি দুলিয়ে হাতে ঝি চলেছে বাজার।
একে একে এদের সবার মুখের দিকে চাই,
কানে আসে রাত্রিবেলার "আমরা নাই নাই"।

আলমোড়া
৯।৬।৩৭

আকাশ

শিশুকালের থেকে
আকাশ আমার মুখে চেয়ে একলা গেছে ডেকে।

দিন কাটত কোণের ঘরে দেয়াল দিয়ে ঘেরা
কাছের দিকে সর্বদা মুখ-ফেরা ;
তাই সুদূরের পিপাসাতে
অতৃপ্ত মন তপ্ত ছিল। লুকিয়ে যেতেম ছাতে,
চুরি করতেম আকাশভরা সোনার বরন ছুটি,
নীল অমৃতে ডুবিয়ে নিতেম ব্যাকুল চক্ষু দুটি।
দুপুর রৌদ্রে সুদূর শূন্যে আর কোনো নেই পাখি,
কেবল একটি সঙ্গীবিহীন চিল উড়ে যায় ডাকি
নীল অদৃশ্যপানে ;
আকাশপ্রিয় পাখি ওকে আমার হৃদয় জানে।
স্তব্ধ ডানা প্রখর আলোর বুকে
যেন সে কোন্ যোগীর ধেয়ান মুক্তি-অভিমুখে।
তীক্ষ্ণ তীব্র স্বর
সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম হয়ে দূরের হতে দূর

ভেদ করে যায় চলে।
বৈরাগী ওই পাখির ভাষা মন কাঁপিয়ে তোলে।

আলোর সঙ্গে আকাশ যেথায় এক হয়ে যায় মিলে
শুভ্রে এবং নীলে
তীর্থ আমার জেনেছি সেইখানে।
অতল নীরবতার মাঝে অবগাহনস্নানে।
আবার যখন ঝঞ্ঝা, যেন প্রকাণ্ড এক চিল
এক নিমেষে ছোঁ মেরে নেয় সব আকাশের নীল,
দিকে দিকে ঝাপটে বেড়ায় স্পর্ধাবেগের ডানা,
মানতে কোথাও চায় না কারো মানা,
বারে বারে তড়িৎশিখার চঞ্চু আঘাত হানে
অদৃশ্য কোন্ পিঞ্জরটার কালো নিষেধপানে,
আকাশে আর ঝড়ে
আমার মনে সব-হারানো ছুটির মূর্তি গড়ে।
তাই তো খবর পাই—
শান্তি সেও মুক্তি, আবার অশান্তিও তাই।

আলমোড়া
৯।৬।৩৭

খেলা

এই জগতের শক্ত মনিব সয় না একটু ত্রুটি,
যেমন নিত্য কাজের পালা তেমনি নিত্য ছুটি।
বাতাসে তার ছেলেখেলা, আকাশে তার হাসি,
সাগর জুড়ে গদ্‌গদ ভাষ বুদ্‌বুদে যায় ভাসি।
ঝরনা ছোটে দূরের ডাকে পাথরগুলো ঠেলে—
কাজের সঙ্গে নাচের খেয়াল কোথায় থেকে পেলে।
ওই হোথা শাল, পাঁচশো বছর মজ্জাতে ওর ঢাকা—
গম্ভীরতায় অটল যেমন, চঞ্চলতায় পাকা।
মজ্জাতে ওর কঠোর শক্তি, বকুনি ওর পাতায়—
ঝড়ের দিনে কি পাগলামি চাপে যে ওর মাথায়।

ফুলের দিনে গন্ধের ভোজ অবাধ সারাক্ষণ,
ডালে ডালে দখিন হাওয়ার বাঁধা নিমন্ত্রণ।

কাজ ক'রে মন অসাড় যখন মাথা যাচ্ছে ঘুরে
হিমালয়ের খেলা দেখতে এলেম অনেক দূরে।
এসেই দেখি নিষেধ জাগে কুহেলিকার স্তূপে,
গিরিরাজের মুখ ঢাকা কোন্ সুগম্ভীরের রূপে।
রাত্তিরে যেই বৃষ্টি হল, দেখি সকালবেলায়,
চাদরটা ওর কাজে লাগে চাদর-খোলার খেলায়।
ঢাকার মধ্যে চাপা ছিল কৌতুক একরাশি,
প্রকাণ্ড এক হাসি।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

ছবি-আঁকিয়ে

ছবি আঁকার মানুষ ওগো পথিক চিরকেলে,
চলছ তুমি আশেপাশে দৃষ্টির জাল ফেলে।
পথ-চলা সেই দেখাগুলো লাইন দিয়ে এঁকে
পাঠিয়ে দিলে দেশ-বিদেশের থেকে।
যাহা-তাহা যেমন-তেমন আছে কতই কী যে,
তোমার চোখে ভেদ ঘটে নাই চণ্ডালে আর দ্বিজে।
ওই যে গরিবপাড়া,
আর কিছু নেই ঘেঁষাঘেঁষি কয়টা কুটীর ছাড়া।
তার ওপারে শুধু
চৈত্রমাসের মাঠ করছে ধু ধু।
এদের পানে চক্ষু মেলে কেউ কভু কি দাঁড়ায়,
ইচ্ছে ক'রে এ ঘরগুলোর ছায়া কি কেউ মাড়ায়।
তুমি বললে, দেখার ওরা অযোগ্য নয় মোটে;
সেই কথাটিই তুলির রেখায় তক্ষনি যায় রটে।
হঠাৎ তখন চেঁকে উঠে আমরা বলি, তাই তো,
দেখার মতোই জিনিস বটে, সন্দেহ তার নাই তো।

ওই যে কারা পথে চলে, কেউ করে বিশ্রাম,
নেই বললেই হয় ওরা সব, পোঁছে না কেউ নাম—
তোমার কলম বললে, ওরা খুব আছে এই জেনো ;
অমনি বলি, তাই বটে তো, সবাই চেনো-চেনো।
ওরাই আছে, নেইকো কেবল বাদশা কিংবা নবাব ;
এই ধরণীর মাটির কোলে থাকাই ওদের স্বভাব।
অনেক খরচ ক'রে রাজা আপন ছবি আঁকায়,
তার পানে কি রসিক লোকে কেউ কখনো তাকায়।
সে-সব ছবি সাজে-সজ্জায় বোকার লাগায় ধাঁধাঁ,
আর এরা সব সত্যি মানুষ সহজ রূপেই বাঁধা।

ওগো চিত্রী, এবার তোমার কেমন খেয়াল এ যে,
এঁকে বসলে ছাগল একটা উচ্চৈঃশ্রবা ত্যেজে।
জন্তুটা তো পায় না খাতির হঠাৎ চোখে ঠেকলে,
সবাই ওঠে হাঁ হাঁ ক'রে সবজি-খেতে দেখলে।
আজ তুমি তার ছাগলামিটা ফোটালে যেই দেহে
এক মুহূর্তে চমক লেগে বলে উঠলেম, কে হে।
ওরে ছাগলওয়ালা, এটা তোরা ভাবিস কার—
আমি জানি, একজনের এই প্রথম আবিষ্কার।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

অজয় নদী

এককালে এই অজয়নদী ছিল যখন জেগে
স্রোতের প্রবল বেগে
পাহাড় থেকে আনত সদাই ঢালি
আপন জোরের গর্ব ক'রে চিকন-চিকন বালি।
অচল বোঝা বাড়িয়ে দিয়ে যখন ক্রমে ক্রমে
জোর গেল তার কমে,

নদীর আপন আসন বালি নিল হরণ করে,
নদী গেল পিছনপানে সরে ;
অনুচরের মতো
রইল তখন আপন বালির নিত্য-অনুগত।
কেবল যখন বর্ষা নামে ঘোলা জলের পাকে
বালির প্রতাপ ঢাকে।
পূর্বযুগের আক্ষেপে তার ক্ষোভের মাতন আসে,
বাঁধনহারা ঈর্ষা ছোটে সবার সর্বনাশে।
আকাশেতে গুরুগুরু মেঘের ওঠে ডাক,
বুকের মধ্যে ঘুরে ওঠে হাজার ঘূর্ণিপাক।
তার পরে আশ্বিনের দিনে শুভ্রতার উৎসবে
সুর আপনার পায় না খুঁজে শুভ্র আলোর স্তবে।
দূরে তীরে কাশের দোলা, শিউলি ফুটে দূরে,
শুষ্ক বুকে শরৎ নামে বালিতে রোদ্দুরে।
চাঁদের কিরণ পড়ে যেথায় একটু আছে জল
যেন বন্ধ্যা কোন্ বিধবার লুটানো অঞ্চল।
নিঃস্ব দিনের লজ্জা সদাই বহন করতে হয়,
আপনাকে হায় হারিয়ে-ফেলা অকীর্তি অক্ষয়।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

পিছু-ডাকা

যখন দিনের শেষে
চেয়ে দেখি সমুখপানে সূর্য ডোবার দেশে
মনের মধ্যে ভাবি,
অস্তসাগর-তলায় গেছে নাবি
অনেক সূর্য-ডোবার সঙ্গে অনেক আনাগোনা,
অনেক দেখাশোনা,
অনেক কীর্তি, অনেক মূর্তি, অনেক দেবালয়,
শক্তিমানের অনেক পরিচয়।

তাদের হারিয়ে-যাওয়ার ব্যথায় টান লাগে না মনে,
কিন্তু যখন চেয়ে দেখি সামনে সবুজ বনে
ছায়ায় চরছে গোরু,
মাঝ দিয়ে তার পথ গিয়েছে সরু,
ছেয়ে আছে শুকনো বাঁশের পাতায়,
হাট করতে চলে মেয়ে ঘাসের আঁটি মাথায়,
তখন মনে হঠাৎ এসে এই বেদনাই বাজে—
ঠাঁই রবে না কোনোকালেই ওই যা-কিছুর মাঝে।
ওই যা-কিছুর ছবির ছায়া দুলেছে কোন্‌কালে
শিশুর-চিত্ত-নাচিয়ে-তোলা ছড়াগুলির তালে—
তিরপূর্নির চরে
বালি ঝুর্‌ঝুর্‌ করে,
কোন্‌ মেয়ে সে চিকন-চিকন চুল দিচ্ছে ঝাড়ি,
পরনে তার ঘুরে-পড়া ডুরে একটি শাড়ি।
ওই যা-কিছু ছবির আভাস দেখি সাঁঝের মুখে
মর্তধরার পিছু-ডাকা দোলা লাগায় বুকে।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

ভ্রমণী

মাটির ছেলে হয়ে জন্ম, শহর নিল মোরে
পোষ্যপুত্র ক'রে।
ইটপাথরের আলিঙ্গনের রাখল আড়ালটিকে
আমার চতুর্দিকে।
মন রইত ব্যাকুল হয়ে দিবস রজনীতে
মাটির স্পর্শ নিতে।
বই প'ড়ে তাই পেতে হত ভ্রমণকারীর দেখা
ছাদের উপর একা।
কষ্ট তাদের, বিপদ তাদের, তাদের শঙ্কা যত
লাগত নেশার মতো।

পথিক যে জন পথে পথেই পায় সে পৃথিবীকে,
মুক্ত সে চৌদিকে।
চলার ক্ষুধায় চলতে সে চায় দিনের পরে দিনে
অচেনাকেই চিনে।
লড়াই ক'রে দেশ করে জয়, বহায় রক্তধারা,
ভূপতি নয় তারা।
পদে পদে পায় যারা হয় মাটির পরে মাটি
প্রত্যেক পদ হাঁটি—
নাইকো সেপাই, নাইকো কামান, জয়পতাকা নাহি—
আপন বোঝা বাহি
অপথেও পথ পেয়েছে, অজানাতে জানা,
মানে নাইকো মানা—
মরু তাদের, মেরু তাদের, গিরি অভ্রভেদী
তাদের বিজয়বেদী।
সবার চেয়ে মানুষ ভীষণ সেই মানুষের ভয়
ব্যাঘাত তাদের নয়।
তারাই ভূমির বরপুত্র, তাদের ডেকে কই,
তোমরা পৃথ্বীজয়ী।

[আলমোড়া]
৬ আষাঢ় ১৩৪৪

আকাশপ্রদীপ

অন্ধকারের সিন্ধুতীরে একলাটি ওই মেয়ে
আলোর নৌকা ভাসিয়ে দিল আকাশপানে চেয়ে।
মা যে তাহার স্বর্গে গেছে এই কথা সে জানে,
ওই প্রদীপের খেয়া বেয়ে আসবে ঘরের পানে।
পৃথিবীতে অসংখ্য লোক, অগণ্য তার পথ,
অজানা দেশ কত আছে অচেনা পর্বত,

তারই মধ্যে স্বর্গ থেকে ছোট্ট ঘরের কোণ
যায় কি দেখা যেথায় থাকে দুটিতে ভাইবোন।
মা কি তাদের খুঁজে খুঁজে বেড়ায় অন্ধকারে,
তারায় তারায় পথ হারিয়ে যায় শূন্যের পারে।
মেয়ের হাতের একটি আলো জ্বালিয়ে দিল রেখে,
সেই আলো মা নেবে চিনে অসীম দূরের থেকে।
ঘুমের মধ্যে আসবে ওদের চুমো খাবার তরে
রাতে রাতে মা-হারা সেই বিছানাটির 'পরে।

পতিসর
৮ শ্রাবণ ১৩৪৪

নাটক ও প্রহসন

তপতী

ভূমিকা

রাজা ও রানী আমার অল্পবয়সের রচনা, সেই আমার প্রথম নাটক লেখার চেষ্টা।

সুমিত্রা এবং বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটি বিরোধ আছে— সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধা হয়। বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করবার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হল, এইটেই রাজা ও রানীর মূল কথা।

রচনার দোষে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয় নি। কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে অসংগত প্রাধান্য লাভ করেছে তাতে নাট্যের বিষয়টি হয়েছে ভারগ্রস্ত ও দ্বিধাবিভক্ত। এই নাটকের অন্তিমে কুমারের মৃত্যু দ্বারা চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে— এই মৃত্যু আখ্যান-ধারার অনিবার্য পরিণাম নয়।

অনেকদিন ধরে রাজা ও রানীর ত্রুটি আমাকে পীড়া দিয়েছে। কিছুদিন পূর্বে শ্রীমান গগনেন্দ্রনাথ যখন এই নাটকটি অভিনয়ের উদ্‌যোগ করেন তখন এটাকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত করে একে অভিনয়যোগ্য করবার চেষ্টা করেছিলুম। দেখলুম এমনতরো অসম্পূর্ণ সংস্কারের দ্বারা সংশোধন সম্ভব নয়। তখনই স্থির করেছিলুম এ নাটক আগাগোড়া নতুন করে না লিখলে এর সদ্‌গতি হতে পারে না। লিখে এই বইটার সম্বন্ধে আমার সাধ্যমত দায়িত্ব শোধ করেছি।

পুরানো নাটককে নতুন করে যখন লেখা গেল তখন পুরাতনের মোহ কাটিয়ে তার নতুন পরিচয়কে পাকা করতে গেলে অভিনয় করে দেখানো দরকার। সেই চেষ্টা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। এই উপলক্ষে নাট্যমঞ্চের আয়োজনের কথা সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলা আবশ্যক।

আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষি। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা। সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত। কালিদাস মেঘদূত লিখে গেছেন, ওই কাব্যটি ছন্দোময় বাক্যের চিত্রশালা। রেখা-চিত্রকর তুলি-হাতে এর পাশে পাশে তাঁর রেখাঙ্ক-ব্যাখ্যা যদি চালনা করেন তা হলে কবির প্রতিও যেমন অবিচার, পাঠকের প্রতিও তেমনি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়। নিজের কবিত্বই কবির পক্ষে যথেষ্ট, বাইরের সাহায্য তাঁর পক্ষে সাহায্যই নয়, সে ব্যাঘাত; এবং অনেক স্থলে স্পর্ধা।

শকুন্তলায় তপোবনের একটি ভাব কাব্যকলার আভাসেই আছে। সে-ই পর্যাপ্ত। আঁকা-ছবির দ্বারা অত্যন্ত বেশি নির্দিষ্ট না হওয়াতেই দর্শকের মনে অবাধে সে আপন কাজ করতে পারে। নাট্যকাব্য দর্শকের কল্পনার উপরে দাবি রাখে, চিত্র সেই দাবিকে খাটো করে, তাতে ক্ষতি হয় দর্শকেরই। অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল; দৃশ্যপটটা তার বিপরীত; অনধিকার প্রবেশ ক'রে সচলতার মধ্যে থাকে সে মূক, মূঢ়, স্থাণু; দর্শকের চিত্তদৃষ্টিকে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সংকীর্ণ করে রাখে। মন যে-জায়গায় আপন আসন নেবে সেখানে একটা পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেওয়ার নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত হয়েছে, পূর্বে ছিল না। আমাদের দেশে চিরপ্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না। এই কারণেই যে-নাট্যাভিনয়ে আমার কোনো হাত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো-নামানোর ছেলেমানুষিকে আমি প্রশ্রয় দিই নে। কারণ বাস্তব-সত্যকেও এ বিদ্রূপ করে, ভাবসত্যকেও বাধা দেয়।

শান্তিনিকেতন
১৭ ভাদ্র ১৩৩৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নাটকের পাত্র ও পাত্রীগণ

সুমিত্রা	জালন্ধরের রানী
বিক্রমদেব	জালন্ধরের রাজা
নরেশ	বিক্রমের বৈমাত্র ভাই
বিপাশা	সুমিত্রার সখী
দেবদত্ত	রাজার সখা
নারায়ণী	দেবদত্তের স্ত্রী
গৌরী, কালিন্দী, মঞ্জরী	রাজবাড়ির পরিচারিকা
কুমারসেন	কাশ্মীরের যুবরাজ
চন্দ্রসেন	কুমারের পিতৃব্য
শংকর	কুমারের পুরাতন বৃদ্ধ ভৃত্য
ত্রিবেদী	জালন্ধরের রাজপুরোহিত
ভার্গব	কাশ্মীরের মার্তণ্ডমন্দিরের পুরোহিত

রত্নেশ্বর, শিখরিনী, কুঞ্জলাল, জনতা প্রভৃতি

তপতী

১

ভৈরবমন্দিরের প্রাঙ্গণ

দেবদত্ত ও একদল উপাসক

গান

সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ,
হে ভৈরব, শক্তি দাও, ভক্তপানে চাহ।
দূর করো মহারুদ্র,
যাহা মুগ্ধ, যাহা ক্ষুদ্র,
মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ।
দুঃখের মন্থনবেগে উঠিবে অমৃত
শঙ্কা হতে রক্ষা পাবে যারা মৃত্যুভীত
তব দীপ্ত রৌদ্র তেজে
নির্ঝরিয়া গলিবে যে,
প্রস্তর-শৃঙ্খলোন্মুক্ত ত্যাগের প্রবাহ।

[দেবদত্ত ব্যতীত অন্য সকলের প্রস্থান

বিক্রমের প্রবেশ

বিক্রম। এর কী অর্থ? আজ মীনকেতুর পূজার আয়োজন করেছি। ভৈরবের স্তব দিয়ে তোমরা তার ভূমিকা করলে কেন।

দেবদত্ত। রাজার এই পূজা এখনো জনসাধারণে স্বীকার করতেই পারছে না। এমন-কি, তারা ভীত হয়েছে।

বিক্রম। কেন, তাদের ভয় কিসের।

দেবদত্ত। তোমার সাহস দেখে তারা স্তম্ভিত। পঞ্চশর দগ্ধ হয়েছেন যাঁর তপোবনে, তাঁরই পূজার বনে কন্দর্পের পূজা? এর পরিণামে বিপদ ঘটবে না কি?

বিক্রম। কন্দর্প সেবার এসেছিলেন অপরাধীর মতো লুকিয়ে— এবার তাঁকে ডাকব প্রকাশ্যে, আসবেন দেবতার যোগ্য নিঃসংকোচে— মাথা তুলে ধ্বজা উড়িয়ে। বিপদের ভয় বিপদ ডেকে আনে।

দেবদত্ত। মহারাজ, আদিকাল থেকেই ওই দুই দেবতার মধ্যে বিরোধ।

বিক্রম। ক্ষতি তাতে মানুষেরই। এক দেবতা আর-এক দেবতার প্রসাদ থেকে মানুষকে বঞ্চিত করেন। ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র মিলিয়ে চিরদিন তোমরা দেবপূজার ব্যাবসা করে এসেছ তাই দেবতার তোমরা কিছুই জান না।

দেবদত্ত। সে কথা ঠিক, দেবতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় পুঁথির থেকে। শ্লোকের ভিড় ঠেলে মরি; দক্ষিণা পাই, কিন্তু ওঁদের কাছে ঘেঁষবার সময়ই পাই নে।

বিক্রম। আমার মীনকেতু অশাস্ত্রীয়; অনুষ্টুভ-ত্রিষ্টুভের বন্ধন মানেন না। তিনি প্রলয়েরই দেবতা। রুদ্রভৈরবের সঙ্গেই তাঁর অন্তরের মিল— পিনাক ছদ্মবেশ ধরেছে তাঁর পুষ্পধনুতে।

দেবদত্ত। মহারাজ, ওই দেবতাটিকে যথাসাধ্য পাশ কাটিয়ে চলবারই চেষ্টা করেছি। আভাসে যেটুকু জানাশোনা ঘটেছে তাতে ভৈরবের সঙ্গে অন্তত বেশেভূষায় ওঁর যথেষ্ট মিল দেখতে পাই নি।

বিক্রম। তার কারণ, এ পর্যন্ত রতি নিজেরই বেশের অংশ দিয়ে কন্দর্পকে সাজিয়েছে। তাঁকে রাঙিয়েছে নিজেরই কজ্জলের কালিমায়, কুঙ্কুমের রক্তিমায়, নীল কঞ্চুলিকার নীলিমায়— উনি রমণীর লালনে লালিত্যে আচ্ছন্ন আবিষ্ট, তাই তো বজ্রপাণি ইন্দ্রের সভায় উনি লজ্জিতভাবে চরের বৃত্তি করেন। রুদ্রের পৌরুষের আগুনে তাই তো ওঁকে দগ্ধ করেছিল।

দেবদত্ত। সে ইতিহাস তো চুকে গেছে। আবার সেই পোড়া দেবতাকে নিয়ে কেন এই উপসর্গ। পুনর্বার ওঁকে পোড়াতে হবে নাকি।

বিক্রম। না, তাঁকে মৃত্যুর ভিতর দিয়েই বাঁচাতে হবে— সেজন্যে বীরের শক্তি চাই। তোমাদের ভৈরবের স্তব সম্পূর্ণ হবে না আমাদের মীনকেতুর স্তব যদি তার সঙ্গে না যোগ করি।

ভস্ম-অপমানশয্যা ছাড়ো, পুষ্পধনু,
রুদ্রবহ্নি হতে লহ জ্বলদর্চি তনু।
যাহা মরণীয় যাক মরে,
জাগো অবিস্মরণীয় ধ্যানমূর্তি ধরে।

যাহা রূঢ়, যাহা মূঢ় তব,
যাহা স্থূল দগ্ধ হোক, হও নিত্য নব।
মৃত্যু হতে জাগো পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহ তনু।

তোমরা জান না, মহেশ্বর মদনকে অগ্নিবর দিয়েছিলেন, মৃত্যু দিয়েই তিনি তাকে অমর করেছেন। অনঙ্গই অমৃত দেবার অধিকারী হয়েছেন।

মৃত্যুঞ্জয় যে-মৃত্যুরে দিয়েছেন হানি
অমৃত সে-মৃত্যু হতে দাও তুমি আনি।
সেই দিব্য দীপ্যমান দাহ
উন্মুক্ত করুক অগ্নি-উৎসের প্রবাহ।
মিলনেরে করুক প্রখর,
বিচ্ছেদেরে করে দিক দুঃসহ সুন্দর।
মৃত্যু হতে ওঠো পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহ তনু।

মীনকেতুর পথ সহজ পথ নয়, সে নয় পুষ্পবিকীর্ণ ভোগের পথ, সে দেয় না আরামের তৃপ্তি।

দেবদত্ত। শুনে ভয় হয়। কিন্তু যা নিয়ে বিপদ ঘটে তার কারণ হচ্ছে অনঙ্গদেব যে-ঘরকে তাঁর পায়ের ধূলিলেপনে চিহ্নিত করে নেন, সে-ঘরে অন্য কোনো দেবতাকে প্রবেশ করতে দেন না। তাতেই পূজনীয়দের মনে ঈর্ষা জন্মায়।

বিক্রম। মনে হচ্ছে কথাটা আমাকেই লক্ষ্য ক'রে। সাহস বাড়ছে।

দেবদত্ত। রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব দুঃসাহসের চরম। ভাগ্যদোষেই রাজার বন্ধু দুর্মুখ। ইচ্ছাক্রমে নয়।

বিক্রম। তবে মুখ খোলো। স্পষ্ট করেই বলো, প্রজারা আমার নামে কী বলছে।

দেবদত্ত। তারা বলছে, অন্তঃপুরের অবগুণ্ঠনতলে সমস্ত রাজ্যে আজ প্রদোষান্ধকার। রাজলক্ষ্মী রাজ্ঞীর ছায়ায় ম্লান।

বিক্রম। দুর্মুখ, প্রজারঞ্জনে আর-একবার সীতার নির্বাসন চাই নাকি?

দেবদত্ত। নির্বাসন তো তুমিই দিতে চাও তাঁকে অন্তঃপুরে, প্রজারা তাঁকে চায় সর্বজনের রাজসিংহাসনে। তাঁর হৃদয়ের সম্পূর্ণ অংশ তো তোমার নয়, এক অংশ প্রজাদের। শুধু কি তিনি রাজবধূ। তিনি যে লোকমাতা।

বিক্রম। দেবদত্ত, অংশ নিয়েই যত বিরোধ। ওই নিয়েই কুরুক্ষেত্র। ওই তিনি আসছেন, রাজবধূর অংশ নিয়ে, না লোকমাতার ?

দেবদত্ত। আমি তবে বিদায় হই, মহারাজ। [প্রস্থান

মহিষী সুমিত্রার প্রবেশ

বিক্রম। দেবী, কোথায় চলেছ। শুনে যাও।

সুমিত্রা। কী মহারাজ।

বিক্রম। একটা সুসংবাদ আছে।

সুমিত্রা। কী, শুনি।

বিক্রম। লোকনিন্দার পরম গৌরবে আমি ধন্য হয়েছি।

সুমিত্রা। নিন্দা কিসের।

বিক্রম। লোকে বলছে, তোমার প্রেমে কর্তব্যকেও তুচ্ছ করতে পেরেছি। এতবড়ো কথা।

সুমিত্রা। যারা বলে তাদের কথা মিথ্যা হোক।

বিক্রম। অক্ষয় হোক এই সত্য, ইতিহাসে বিখ্যাত হোক, কবিকণ্ঠে আখ্যাত হোক, রসতত্ত্বে ব্যাখ্যাত হোক, ইতরলোকের নিন্দাপ্রশংসার অতীত হোক।

সুমিত্রা। মহারাজ, যে-প্রেম রাজকর্তব্যেরও উপরে, সে গ্রহণ করুন দেবতা, সে কি আমি নিতে পারি।

বিক্রম। দেবতার যা প্রাপ্য তিনি তা নেবেন তোমার মধ্যে দিয়েই। তোমার মুখে পরমাশ্চর্যকে দেখেছি। লজ্জা কোরো না, শোনো আমার কথা। যশের লোভে যারা দেশ জয় করে বেড়ায় লক্ষ্মীর তারা বিদূষক। তাদের আয়ু যায় বৃথায়, কীর্তিও চিরকাল থাকে না, লক্ষ্মী বসে বসে হাসেন। আমি তাদের দলে নই। কাশ্মীরে গিয়ে যুদ্ধ করেছিলাম তোমারই সাধনায়।

সুমিত্রা। তোমার যুদ্ধযাত্রা সফল হয়েছে। এখন আর কী চাও।

বিক্রম। পেয়েছি বীণাটিকে। সংগীত দিয়ে অধিকার হবে কোন্ শুভক্ষণে ? সুর মেলাতে পারছি নে, পেয়েও হার হচ্ছে পদে পদে। ভাগ্যের কাছে যে-দান পেয়েছি, সেই দানই আমাকে লজ্জা দিচ্ছে।

সুমিত্রা। মুঠোর মধ্যে চেপে রেখেছ আর কল্পনা করছ, পাই নি। কিন্তু তোমার কাছে আমারও কিছু চাবার নেই কি।

বিক্রম। সবই চাইতে পার, কিছু চাও না বলেই আমার রাজসম্পদ ব্যর্থ।

সুমিত্রা। আমি চাই আমার রাজাকে।

বিক্রম। পাও নি?

সুমিত্রা। না, পাই নি। সিংহাসন থেকে তুমি নেমে এসেছ এই নারীর কাছে। আমাকে কেন তুলে নিয়ে যাও না তোমার সিংহাসনের পাশে?

বিক্রম। হৃদয়ের সর্বোচ্চ শিখরে তোমার আসন দিয়েছি— তাতেও গৌরব নেই?

সুমিত্রা। মহারাজ, আমাকে নিয়ে অমন করে কথা সাজিয়ো না— এ তোমাকে শোভা পায় না। এতে আমাকেও ছোটো করে। কী হবে আমার স্তুতিবাক্য। আমার অনুরোধ রাখো। আমি এসেছি প্রজাদের হয়ে প্রার্থনা জানাতে।

বিক্রম। এই উদ্যানে? এখানে আজ ঋতুরাজের অধিকার! অন্তত আজ এক-দিনের জন্যেও সম্পূর্ণ ক'রে তাকে স্বীকার করো।

সুমিত্রা। আমি তো তোমার আদেশ পালনে ত্রুটি করি নি— উৎসব যাতে সুন্দর হয় আমি তো সেই আয়োজন করেছি। কিন্তু তোমারও কিছু করবার নেই কি? উৎসব যাতে মহৎ হয়ে ওঠে তুমি তাই করো, তোমার রাজমহিমা দিয়ে।

বিক্রম। বলো, আমার কী করবার আছে।

সুমিত্রা। কাশ্মীর থেকে যে-সব লুব্ধের দল তোমার সঙ্গে জালন্ধরে এসেছে, আজই সেই পরোপজীবীদের আদেশ করো কাশ্মীরে ফিরে যাক।

বিক্রম। আমার এই বিদেশী অমাত্যদের 'পরে তোমার মনে ক্রোধ আছে।

সুমিত্রা। তা আছে।

বিক্রম। কাশ্মীরবিজয়ে ওরা আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল এই তার কারণ।

সুমিত্রা। হাঁ মহারাজ, আমি জানি, বিশ্বাসঘাতকের শত্রুতা ভালো, তাদের মৈত্রী অস্পৃশ্য।

বিক্রম। ওদের ধর্ম ওরা বুঝবে কিন্তু আমি কৃতঘ্ন হব কী করে।

সুমিত্রা। তোমার সপক্ষে ওরা পাপ করেছে, ক্ষমা করতে হয় কোরো, কিন্তু তোমার বিপক্ষে অন্যায় করছে তাও কি ক্ষমা করতে হবে। তোমার ক্ষমার আশ্রয়ে প্রজাদের প্রতি পীড়ন হচ্ছে, তাতেও বাধা দেবে না?

বিক্রম। মিথ্যা অপবাদ সৃষ্টি করছে প্রজারা, তাদের ঈর্ষা ওরা বিদেশী ব'লে।

সুমিত্রা। তারও বিচার চাই।

বিক্রম। এ-সব ব্যাপারে তুমি যখন হস্তক্ষেপ কর, মহারানী, তখন সুবিচার কঠিন হয়। তুমি স্বয়ং আন অভিযোগ, কোনো প্রমাণকে আমি কি তার উপরে

আসন দিতে পারি। তুমি অনুরোধ করাতে যুধাজিৎকে বিনা বিচারেই পদচ্যুত করতে হল। আরো অমাত্য-বলি চাই তোমার?

সুমিত্রা। তবে সেই ভালো। বিচার কোরো না। আমারই প্রার্থনা রাখো। কাশ্মীরের পঙ্গপালগুলো যদি কোনো অপরাধ না করেও থাকে তবু ওরা আমার রাত্রিদিনের লজ্জা। আমাকে তার থেকে বাঁচাও।

বিক্রম। ওরা কলঙ্ক স্বীকার ক'রে বিপদ সামনে রেখে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। তোমার কথাতেও ওদের ত্যাগ করতে পারব না। দেখো প্রিয়ে, রাজার হৃদয়েই তোমার অধিকার, রাজার কর্তব্যে নয় এই কথা মনে রেখো।

সুমিত্রা। মহারাজ, তোমার বিলাসে আমি সঙ্গিনী, তোমার রাজধর্মে আমি কেউ নই এ কথা মনে রেখে আমার সুখ নেই। [প্রস্থান

বিক্রম। শুনে যাও মহিষী।

সুমিত্রা। (ফিরে এসে) কী, বলো।

বিক্রম। তুমি জাগছ না কেন। কিসের এই সূক্ষ্ম আবরণ। সমস্ত আমার রাজার শক্তি নিয়ে একে সরাতে পারলেম না। আপনাকে প্রকাশ করো— দেখা দাও, ধরা দাও। আমাকে এই অত্যন্ত অদৃশ্য বঞ্চনায় বিড়ম্বিত কোরো না।

সুমিত্রা। আমিও তোমাকে ওই কথাই বলছি। তুমি রাজা, আমি তোমার সম্পূর্ণ প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি নে— তোমার শক্তিকে অন্ধকারে ঢেকে রাখলে। তুমি জাগ নি। তুমি আমাকে কেড়ে নিয়ে এসেছ কাশ্মীর থেকে— সেই অপমান আমার ঘুচিয়ে দাও— আমাকে রানীর পদ দিতে হবে।

বিক্রম। আচ্ছা আচ্ছা, আমার রাজকোষ তোমার পায়ের তলায় সম্পূর্ণ ফেলে দিচ্ছি— তুমি প্রজাদের দান করতে চাও, করো দান যত খুশি। তোমার দাক্ষিণ্যের প্লাবন বয়ে যাক এ রাজ্যে।

সুমিত্রা। ক্ষমা করো মহারাজ, তোমার কোষ তোমারই থাক্। আমার দেহের অলংকার থাক্ আমার প্রজার জন্যে। অন্যায়ের হাত থেকে প্রজারক্ষায় যদি মহিষীর অধিকার আমার না থাকে তবে এ-সব তো বন্দিনীর বেশভূষা— এ বইতে পারব না। মহিষীকে যদি গ্রহণ কর সেবিকাকেও পাবে, নইলে শুধু দাসী! সে আমি নই। [প্রস্থান

মন্ত্রীর প্রবেশ

বিক্রম। যুধাজিতের নামে রানীর কাছে কে অভিযোগ করেছিল? তুমি?

মন্ত্রী। মন্ত্রগৃহের বাইরে আমি মন্ত্রণা করি নে, মহারাজ!

বিক্রম। তবে এ-সব কথা কে তাঁর কানে তুললে?

মন্ত্রী। যারা দুঃখ পেয়েছে তারা স্বয়ং।

বিক্রম। রানীর সাক্ষাৎ তারা পায় কী করে।

মন্ত্রী। করুণার যোগ্য যারা করুণাময়ী স্বয়ং তাদের সন্ধান রাখেন।

বিক্রম। আমাকে অতিক্রম করে যারা রানীর কাছে আবেদন নিয়ে আসে তারা দণ্ডের যোগ্য এ কথা যেন মনে থাকে।

মন্ত্রী। দণ্ড তারা পেয়েছে। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা তাদের পাকা ফসলের খেত জালিয়ে দিয়েছে, এ কথা সবাই জানে।

বিক্রম। মন্ত্রী, নানা কৌশলে তুমি এই অমাত্যদের নামে নিন্দা করবার সুযোগ খোঁজ, এটা আমি লক্ষ্য করেছি।

মন্ত্রী। নিন্দনীয়দের নিন্দা করে থাকি কিন্তু কৌশল করে নয়।

বিক্রম। এই বিদেশীরা আমার আশ্রিত, তোমাদের ঈর্ষা থেকে তাদের বিশেষভাবে রক্ষা করা আমার রাজকর্তব্য।

মন্ত্রী। ওদের সম্বন্ধে নীরব থাকব। কিন্তু গুরুতর মন্ত্রণার বিষয় আছে। মহারাজ, ক্ষণকালের জন্যে—

বিক্রম। এখন সময় নয়। যাও, বিপাশাকে সংবাদ দাও আজ বকুলবীথিকায় মধ্যরাত্রে তার নৃত্য। ত্রিবেদীকে বোলো মীনকেতুর পূজায় মন্ত্রোচ্চারণে তার কোনো স্খলন সহ্য করব না।

মন্ত্রী। কাশ্মীরদেশী অমাত্য সবাই উৎসবে আসবেন সংবাদ পাঠিয়েছেন।

বিক্রম। মহারানীর সঙ্গে কোনোমতে তাদের সাক্ষাৎ না হয়, সতর্ক থেকো।

[উভয়ের প্রস্থান

রাজভ্রাতা নরেশ ও সুমিত্রার সহচরী বিপাশার প্রবেশ

বিপাশা। মানব না ও কথা। কাশ্মীর জয় করেছ তোমরা! মানব না।

নরেশ। সুন্দরী, অরসিক ইতিহাস মধুর কণ্ঠের সম্মতির অপেক্ষা রাখে না।

বিপাশা। রাজকুমার, দাম্ভিক কণ্ঠের আস্ফালনের ভাষাও তার ভাষা নয়।

নরেশ। কিন্তু তলোয়ারের সাক্ষ্য তো মানতে হবে। যমরাজকে সামনে রেখে সে কথা কয়। আমাদের মহারাজ কাশ্মীর জয় করেছেন।

বিপাশা। করেন নি। আমাদের যুবরাজ ছিলেন অনুপস্থিত। মানস-সরোবর থেকে অভিষেকের জল আনতে গিয়েছিলেন। তাই যুদ্ধ হয় নি, দস্যুবৃত্তি হয়েছিল।

নরেশ। তাঁর পিতৃব্য চন্দ্রসেন ছিলেন প্রতিনিধি। যুদ্ধ করেছিলেন।

বিপাশা। যুদ্ধের ভান করেছিলেন। লুঠ-করা সিংহাসন হার-মানার ছদ্মমূল্যে নিজে কিনে নেবার জন্যে। তোমাদের সভাকবি এই নিয়ে সাত সর্গ কবিতা লিখেছেন। তোমাদের যুদ্ধ ফাঁকি, তোমাদের ইতিহাস ফাঁকি। চুপ করে হাসছ যে! লজ্জা নেই!

নরেশ। মহারানী সুমিত্রা তো ফাঁকি নন। তিনি তো পর্বত থেকে নেমে এসেছেন আমাদের জয়লক্ষ্মীর অনুবর্তিনী হয়ে।

বিপাশা। চুপ করো, চুপ করো। দুঃখের কথা মনে করিয়ে দিয়ো না। রাজকন্যা তখন বালিকা, বয়েস ষোলো। খুড়োমহারাজ এসে বললেন, বিজয়ীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে, নইলে সন্ধি অসম্ভব। রাজকুমারী আগুন জ্বালিয়ে ঝাঁপ দিয়ে মরতে গিয়েছিলেন। পুরবৃদ্ধরা এসে বললে, মা, রক্ষা করো, যে পাণি মৃত্যুবর্ষণ করছে তোমার পাণি দিয়ে তাকে অধিকার করো— শান্তি হোক।

নরেশ। কিন্তু সেদিনকার কোনো গ্লানি তো মহারানীর মনে নেই। প্রসন্ন মহিমায় সিংহাসনে তাঁর আপন স্থান নিয়েছেন।

বিপাশা। মহাদুঃখ ভোলবার মতোই মহাশক্তি তাঁর, তিনি যে সতীলক্ষ্মী। মৃত্যুর জন্যে যে আগুন জ্বলেছিল তাকে সাক্ষী করে তাঁর বিবাহ। তিনদিন কৈলাসনাথের মন্দিরে ধ্যানে বসে উপবাস করে নিজেকে শুদ্ধ করে নিয়েছেন। অসহ্য অপমানকে নিঃশেষে নিজের মধ্যে দগ্ধ করে নিয়ে তবে এলেন তোমাদের ঘরে। বীরাঙ্গনার ক্ষমা যদি না থাকত তবে আগুন ধরত তোমাদের সিংহাসনে।

নরেশ। জান বিপাশা, ওই বীরাঙ্গনা আপন মহিমাচ্ছটায় কাশ্মীরের দিকে আমাদের হৃদয়ের একটি দীপ্যমান ছায়াপথ এঁকে দিয়েছেন। জালন্ধরের যুবকদের মন তিনি উদাস করেছেন ওই কাশ্মীরের মুখে। তিনি তাদের ধ্যানের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছেন একটি অপরূপ জ্যোতির্মূর্তি। তুমি জান না, জালন্ধর থেকে কত পাগল গেছে ওই কাশ্মীরে, খুঁজতে তাদের সাধনার ধনকে।

বিপাশা। হায় রে, এ তো যুদ্ধ করা নয়। ওখানে তোমাদের অস্ত্র চলবার রাস্তা থাকতেও পারে কিন্তু হৃদয়জয়ের পথ ও দিকে বন্ধ করে দিয়েছ তোমাদের বর্বরতা দিয়ে।

নরেশ। সাধনা করতে হবে— তাতেও তো আনন্দ আছে।

বিপাশা। তা করো, কিন্তু সিদ্ধির আশা ছেড়ে দাও।

নরেশ। সিদ্ধি হবেই, আমি একলাই তা প্রমাণ করব— কাশ্মীর পর্যন্ত না গিয়ে!

বিপাশা। তোমার যত বড়ো অহংকার তত বড়োই দুরাশা।

নরেশ। দুরাশাই আমার, সেই আমার অহংকার। আমার আকাঙ্ক্ষা পর্বতের দুর্গম শিখর। সেখানে প্রভাতের দুর্লভ তারাকে দেখি, ভোরের স্বপ্নে।

বিপাশা। তোমাদের কবির কাছে পাঠ মুখস্থ করে এলে বুঝি?

নরেশ। প্রয়োজন হয় না। বাইরে যার কাছ থেকে পাই কঠোর কথা, অন্তরে সেই দেয় বাণীর বর, গোপনে। যদি সাহস দাও তার নামটি তোমাকে বলি।

বিপাশা। কাজ নেই অত সাহসে।

নরেশ। তবে থাক্। কিন্তু এই পদ্মের কুঁড়ি, একে নিতে দোষ কী। এও তো মুখ ফুটে কিছু বলে না।

বিপাশা। না, নেব না।

নরেশ। কাশ্মীরের সরোবর থেকে এর মূল এনেছিলুম। অনেকদিন অনেক দ্বিধার পরে দেখা দিয়েছে তার এই কুঁড়িটি। মনে হচ্ছে আমার সৌভাগ্য তার প্রথম নিদর্শনপত্রটি পাঠিয়েছে— এর মধ্যে একজনের অদৃশ্য স্বাক্ষর আছে। নেবে না? এই রেখে গেলাম তোমার পায়ের কাছে। [প্রস্থানোদ্যম

বিপাশা। শোনো, শোনো, আবার বলছি তোমরা কাশ্মীর জয় কর নি।

নরেশ। নিশ্চয় করেছি। সেজন্যে রাগ করতে পার, অবজ্ঞা করতে পারবে না। জয় করেছি।

বিপাশা। ছল করে।

নরেশ। না, যুদ্ধ করে।

বিপাশা। তাকে যুদ্ধ বলে না।

নরেশ। হাঁ, যুদ্ধই বলে।

বিপাশা। সে জয় নয়।

নরেশ। সে জয়ই।

বিপাশা। তবে ফিরিয়ে নিয়ে যাও তোমার পদ্মের কুঁড়ি।

নরেশ। ফিরিয়ে নেবার সাধ্য আমার নেই।

বিপাশা। এ আমি কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলব।

নরেশ। পার তো ছিঁড়ে ফেলো— কিন্তু আমি দিয়েছি আর তুমি নিয়েছ, এ কথা রইল বিধাতার মনে— চিরদিনের মতো। [প্রস্থান

সুমিত্রার প্রবেশ

সুমিত্রা। পদ্মের কুঁড়ি-হাতে একলা দাঁড়িয়ে কী ভাবছিস, বিপাশা।

বিপাশা। মনে-মনে ফুলের সঙ্গে করছি ঝগড়া।

সুমিত্রা। সংসারে তোর ঝগড়া আর কিছুতেই মিটতে চায় না। কিসের ঝগড়া। ফুলের সঙ্গে আবার ঝগড়া কিসের।

বিপাশা। ওকে বলছি, তুমি কাশ্মীরের ফুল, এখানেও তোমার মুখ প্রসন্ন কেন। অপমান এত সহজেই ভুলেছ?

সুমিত্রা। দেবতার ফুল মানুষের অপরাধ যদি মনে রাখত তা হলে মরু হত এই পৃথিবী।

বিপাশা। তুমিই সেই দেবতার ফুল, মহারানী, কিন্তু কাঁটাও দেবতারই সৃষ্টি। সত্যি করো বলো, কাশ্মীরের 'পরে যে-অন্যায় হয়েছে সে কখনো তোমার মনে পড়ে না? চুপ করে রইলে যে? উত্তর দেবে না? তোমার মাতৃভূমির দোহাই, এর একটা উত্তর দাও।

সুমিত্রা। সেই আমার মাতৃভূমিরই দোহাই, আমাকে কেবল এই একটিমাত্র কথাই মনে রাখতে দে যে, আমি জালন্ধরের রানী।

বিপাশা। আর যা ভুলতে পার ভুলো, কখনো ভুলতে দেব না যে, তুমি কাশ্মীরের কন্যা।

সুমিত্রা। ভুলি নে। তাই কাশ্মীরের গৌরব রক্ষার জন্যেই কর্তব্যের গৌরব রাখতে হবে। নইলে এখানে কি দেহে মনে দাসীর কলঙ্ক মাখব।

বিপাশা। সে-কথা প্রতিদিন বুঝতে পারছ, মহারানী। কাশ্মীরকে জয়ী করেছ এদের হৃদয়ে। আমি তো কেউ না, তবু তোমার মহিমার আলোতেই এরা আমাকে মুগ্ধ যে চোখে দেখছে কাশ্মীরের কারো চোখে তো সে মোহ লাগে নি।

সুমিত্রা। বিনয় করছিস বুঝি?

বিপাশা। বিনয় না মহারানী। আমি আপনাতে আপনি বিস্মিত। হেসো না তুমি, এরা আমাকে উদ্দেশ ক'রে যে-সব কথা আজকাল বলে থাকে কাশ্মীরের ভাষাতে সে-সব কথা আছে বলে অন্তত আমার জানা নেই।

সুমিত্রা। যে ভোরবেলায় এখানে চলে এলি তখনো তোর কানে কাশ্মীরের ভাষা সম্পূর্ণ জাগবার সময় হয় নি। তবু কাকলি একটু আধটু আরম্ভ হয়েছিল, সে কথা আজ বুঝি স্মরণ নেই? যাই হোক এখনো যে উৎসবের সাজ করিস নি।

বিপাশা। সাজ শুরু করেছিলেম, এমন সময় কে একজন এসে বললে ওরা

কাশ্মীর জয় করেছে। কবরী থেকে ফেলে দিয়েছি মালা, আমার রক্তাংশুক লুটছে শিরীষবনের পথে। হাসছ কেন রানী।

সুমিত্রা। সে জায়গাটাকে তুই বনের পথ বলিস? এখানে আসবার সময় তোর রক্তাংশুক যে একজনের মাথায় দেখলুম।

বিপাশা। ওই দেখো, মহারানী, লজ্জা নেই, এখানকার যুবকদের অভ্যাস খারাপ, ওটা চুরি!

সুমিত্রা। আমার সন্দেহ হচ্ছে চুরিবিদ্যা শেখাবার জন্যেই চোরের রাস্তায় তোর রক্তাংশুক পড়ে থাকে। শুনেছি তার বিদ্যা সম্পূর্ণ হয়েছে, এবার তার চুরির শেষ পরীক্ষা হবে, তোর উপর দিয়ে।

বিপাশা। রাজার আজ্ঞা নাকি।

সুমিত্রা। যাঁর আজ্ঞা তাঁর বেদী সাজাবি চল্‌। ওই পদ্মের কুঁড়িটিই তোর প্রথম অর্ঘ্য হোক।

বিপাশা। যেয়ো না তুমি, তবে একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, সত্য করে বলো। মকরকেতনের পূজায় আজ রাত্রে যে-উৎসব হবে তাতে তোমার উৎসাহ আছে?

সুমিত্রা। মহারাজের আদেশ।

বিপাশা। সে তো জানি কিন্তু তোমার নিজের মন কী বলে।—চুপ করে থাকবে?

সুমিত্রা। হাঁ, চুপ করেই থাকব।

বিপাশা। আচ্ছা বেশ। কিন্তু একটা প্রশ্ন এতদিন তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে সাহস করি নি— আজ জিজ্ঞাসা করবই— চুপ করে থাকলে চলবে না।

সুমিত্রা। কী প্রশ্ন তোর।

বিপাশা। সত্যই কি তুমি মহারাজকে ভালোবাস। বলতেই হবে আমাকে।

সুমিত্রা। হাঁ ভালোবাসি। উত্তর শুনে চুপ করে রইলি যে!

বিপাশা। তবে সত্য কথা বলি তোমাকে। আর কিছুদিন আগে এ প্রশ্নও আমার মনে আসত না, উত্তর শুনলেও মেনে নিতুম।

সুমিত্রা। আজ নিজের মনের সঙ্গে মনে মনে মিলিয়ে দেখছিস বুঝি।

বিপাশা। তা তোমাকে লুকোব না, সবই তুমি জানো— মিলিয়ে দেখছি বৈকি, কিন্তু ঠিক মেলাতে পারছি নে।

সুমিত্রা। কী করে মিলবে। প্রজারক্ষার কল্পনায় কাশ্মীরের অসম্মান স্বীকার

ক'রে যেদিন আমি মহারাজের কাছে আত্মসমর্পণ করতে সম্মত হয়েছিলুম তখন তিন দিন ধরে কৈলাসনাথের মন্দিরে কিসের জন্তে তপস্তা করেছি ?

বিপাশা। আমি হলে জালন্ধরের বিনিপাতের জন্তে তপস্তা করতুম।

সুমিত্রা। এই শক্তি চেয়েছিলুম, রুদ্রের প্রসাদে আমার বিবাহ যেন ভোগের না হয়। জালন্ধরের রাজগৃহে আমি কোনোদিন কিছুর জন্তেই যেন লোভ না করি ; তবেই আমাকে অপমান স্পর্শ করতে পারবে না।

বিপাশা। কোনোদিন তোমার মন বিচলিত হয় নি, মহারানী ?

সুমিত্রা। প্রতিদিন হয়েছে— হাজারবার হয়েছে।

বিপাশা। মাপ করো মহারানী, আমার সন্দেহ হয় তুমি তাঁকে অবজ্ঞা কর।

সুমিত্রা। অবজ্ঞা ! এমন কথা বলিস নে, বিপাশা। ওঁর মধ্যে তুচ্ছ কিছুই নেই। প্রচণ্ড ওঁর শক্তি— সে-শক্তিতে বিলাসের আবিলতা নেই, আছে উল্লাসের উদ্দামতা। আমি যদি সেই কূল-ভাঙা বন্তার ধারে এসে দাঁড়াতুম, তা হলে আমার সমস্ত কোথায় ভেসে যেত, ধর্মকর্ম, শিক্ষাদীক্ষা। ওই শক্তির দুর্জয়তাকে অহরহ ঠেকাতে গিয়েই আমার মন এমন পাষাণ হয়ে উঠল। এত অজস্র দান কোনো নারী পায় না— এই দুর্লভ সৌভাগ্যকে প্রত্যাখ্যান করবার জন্তে নিজের সঙ্গে আমার এমন দুর্বিষহ দ্বন্দ্ব। মহারাজকে যদি অবজ্ঞা করতে পারতুম তা হলে তো সমস্তই সহজ হত। অন্তরে বাহিরে আমার দুঃখ যে কত দুঃসহ তা তিনিই জানেন যাঁর কাছে ব্রত নিয়েছিলুম।

বিপাশা। ব্রত যেন রাখলে, মহারানী, কিন্তু ভালোবাসা !

সুমিত্রা। কী বলিস, বিপাশা। এই ব্রতই তো আমার ভালোবাসাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, নইলে ধিক্কারের মধ্যে তলিয়ে যেত সে। প্রেম যদি লজ্জার বিষয় হয় তবে তার চেয়ে তার বিনাশ কী হতে পারে। আমার প্রেমকে বাঁচিয়েছেন তপস্বী মৃত্যুঞ্জয়। বিবাহের হোমাগ্নি থেকে আমার এ প্রেম গ্রহণ করেছি— আহুতির আর অন্ত নেই।

বিপাশা। নিষ্ঠুর তোমার দেবতা, আমি কিন্তু তাঁকে মানতে পারতুম না।

সুমিত্রা। কী করে জানলি। তিনি ডাক দিলেই তোকেও মানতে হত। কিন্তু বিপাশা, ব্রতের কথা প্রকাশ করা অপরাধ, আজ অন্তায় করলুম, ক্ষমা করুন আমার ব্রতপতি।—

বিপাশা। আমাকে ক্ষমা করো, মহারানী। কিন্তু কোথায় চলেছ।

সুমিত্রা। দেবদত্ত ঠাকুরের কাছে শুনলুম উৎসব উপলক্ষে দূরের থেকে প্রজারা

এসেছে। আজ মন্দিরের বাগানে তারা দর্শন পাবে। রাজা সেই সংবাদ পেয়ে শুনছি দ্বার রুদ্ধ করবার আদেশ করেছেন।

বিপাশা। তুমি কি সে দ্বার খোলাতে পারবে?

সুমিত্রা। হয়তো পারব না। তবুও দেখতে যাব যদি কোনোখানে তার কোনো ফাঁক থাকে।

বিপাশা। দ্বার রোধ করবার বিদ্যায় এরা এত নিপুণ যে, তার মধ্যে কোনো ত্রুটিই তুমি পাবে না— এ আমি বলে দিচ্ছি। [উভয়ের প্রস্থান

দেবদত্তের প্রবেশ। রত্নেশ্বরের দ্রুত প্রবেশ

রত্নেশ্বর। ঠাকুর, দেবদত্ত ঠাকুর।

দেবদত্ত। আমাকে ডাক পেড়ে আমাকে স্বদ্ধ বিপদে ফেলবে দেখছি। কেন, কী হয়েছে।

রত্নেশ্বর। রাজার কাছে অপরাধী। তাঁর প্রহরীকে প্রহার করে এখানে এসেছি।

দেবদত্ত। প্রহার করেছ? শুনে শরীর পুলকিত হল। এমন উগ্র পরিহাসের ইচ্ছা হঠাৎ কেন তোমার মনে উদয় হল।

রত্নেশ্বর। উৎসবে রাজার দর্শন মিলবে আশা করেই বহু কষ্টে রাজধানীতে এসেছি। দ্বারী বললে উৎসবের দ্বার বন্ধ। তাই তাকে মারতে হল। অভিযোগ করতে এলে যদি সাক্ষাৎ না মেলে অপরাধ করলে অন্তত সেই উপলক্ষে তো রাজার সামনে পৌঁছব।

দেবদত্ত। কোথাকার মূর্খ তুমি। তুমি কি মনে কর, বুধকোটের গোঁয়ারের হাতে রাজার প্রহরী মার খেয়েছে এ কথা সে মরে গেলেও স্বীকার করবে। তার স্ত্রী শুনলে যে ঘরে ঢুকতে দেবে না।

রত্নেশ্বর। ঠাকুর, অনেক দূর থেকে এসেছি।

দেবদত্ত। এখনো অনেক দূরেই আছ। রাজার দর্শন কি সহজে মেলে। যোজন গণনা করেই কি দূরত্ব।

রত্নেশ্বর। গ্রামের মানুষ, রাজদর্শনের রীতিনীতি বুঝি নে, সেই জেনেই মহারাজ দয়া করবেন।

দেবদত্ত। নিজের বুদ্ধি থেকে বাহুবলে রাজদর্শনের যে রীতি তুমি উদ্ভাবন করেছ সেটা রাজধানীতে বা রাজসভায় প্রচলিত নেই। পারিষদবর্গের জন্যে দর্শনী কিছু এনেছ কি।

রত্নেশ্বর। আর কিছুই আনি নি আমার অভিযোগ ছাড়া, কিছু নেইও।

দেবদত্ত। গ্রামের মানুষ তা বুঝতে পারছি।

রত্নেশ্বর। কিসে বুঝলে, ঠাকুর।

দেবদত্ত। এখনো এ শিক্ষা হয় নি যে, রাজা তোমাদের মুখ থেকে শুনতে চান রাজ্যে সমস্তই ভালো চলছে, সত্যযুগ, রামরাজত্ব।

রত্নেশ্বর। সমস্তই যদি ভালো না চলে ?

দেবদত্ত। তা হলে সেটা গোপন না করলে আরো মন্দ চলবে। রাজাকে অপ্রিয় কথা শোনানো রাজদ্রোহিতা।

রত্নেশ্বর। আমাদের প্রতি যদি উৎপাত হয় ?

দেবদত্ত। হয় যদি তো সে তোমাদের প্রতিই হল। রাজাকে জানাতে গেলে উৎপাত হবে রাজার প্রতি।

রত্নেশ্বর। ঠাকুর, সন্দেহ হচ্ছে পরিহাস করছ।

দেবদত্ত। পরিহাস করেন ভাগ্য। বর্তমান অবস্থাটা বুঝিয়ে বলি। আজ ফাল্গুনের শুক্লাচতুর্দশী। এখানে চন্দ্রোদয়ের মুহূর্তে কেশরকুঞ্জে ভগবান মকরকেতনের পূজা, রাজার আদেশ। নাচগান বাজনা অনেক হবে, তার সঙ্গে তোমার কণ্ঠস্বর একটুও মিলবে না।

রত্নেশ্বর। না মিলুক, কিন্তু রাজার চরণ মিলবে।

দেবদত্ত। রাজাকে রাজসভায় পাওয়াই হচ্ছে পাওয়া, অস্থানে তাঁর অরাজকত্ব। অপেক্ষা করো, কাল নিজে তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

রত্নেশ্বর। ঠাকুর, তোমাদের সবুর সয়। আমার যে সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে, প্রত্যেক মুহূর্ত অসহ্য। আমাদের সব চেয়ে দুর্ভাগ্য এই যে, যমযন্ত্রণাও যখন পাই, অপমানের শূলের উপর যখন চড়ে থাকি তখনো অপেক্ষা করে থাকতে হয় রাজশাসনের জন্যে, নিজের হাত পঙ্গু। ধিক্ বিধাতাকে।

দেবদত্ত। এখন একটু থামো, ঐ মহারানী আসছেন। ওঁর কাছে আর্তনাদ করে ধৃষ্টতা কোরো না।

রত্নেশ্বর। আমার সৌভাগ্য, আপনি এসেছেন মহারানী, সমস্ত রাস্তা ওঁরই তো দর্শন কামনা করে এসেছি।

দেবদত্ত। যিনি দুঃখ পান তাঁকেই দুঃখ দিতে চাও তোমরা ? জান না, বিচারের ভার ওঁর 'পরে নেই, রাজ্যশাসন করেন রাজা।

রত্নেশ্বর। মহারানী মা !

সুমিত্রার প্রবেশ

সুমিত্রা। কী বৎস, তুমি কে।

দেবদত্ত। ও কেউ না, নাম রত্নেশ্বর, এসেছে বুধকোট থেকে ; এর বেশি ওর পরিচয় নেই। পায়ের ধুলো নিয়েই চলে যাবে। হল তো দর্শন— চল্ এখন ঘরে, আমার ব্রাহ্মণীর প্রসাদ পাবি।

সুমিত্রা। বুধকোট, সে তো শিলাদিত্যের শাসনে। বলো দেখি তার ব্যবহার কী রকম।

দেবদত্ত। মহারানী, এ সব প্রশ্ন এখানকার কোকিলের ডাকের মধ্যে ভালো শোনাচ্ছে না। আমি ওকে কালই নিজে রাজসভায় নিয়ে যাব।

রত্নেশ্বর। রাজসভা! মহারানী, সেখানে কোনো আশা নেই বলেই এই উৎসবের প্রাঙ্গণে অভিযোগ এনেছি।

সুমিত্রা। কেন আশা নেই।

রত্নেশ্বর। শিলাদিত্য স্বয়ং রাজধানীতে উপস্থিত, আমাদের কান্না চাপা দেবার জন্যে। তিনি বসেন রাজার কানের কাছে, আমরা থাকি দূরে।

সুমিত্রা। কোনো ভয় নেই তোমার, কী বলতে চাও আমার কাছে বলো।

রত্নেশ্বর। সতীতীর্থ ভৃগুকূট পাহাড়ের তলে। আমাদেরই রাজকুলের মহিষী মহেশ্বরী সেখানে স্বামীর অনুমৃতা হয়েছিলেন, সে আজ পাঁচশো বছরের কথা।

সুমিত্রা। সেই সতীকাহিনী তো ভাটের মুখে শুনেছি আমার বিবাহদিনে।

রত্নেশ্বর। তাঁরই সিঁদুরের কৌটো সেখানে সমাধিমন্দিরে।

সুমিত্রা। সেই কৌটোর সিঁদুর বিবাহকালে আমিও পরেছি।

রত্নেশ্বর। আমাদের মেয়েরা তীর্থে যায়, সেই কৌটোর সিঁদুর মাথায় পরে পুণ্য কামনায়। এতকাল কোনো বাধা হয় নি।

সুমিত্রা। এখন কি বাধা ঘটেছে।

রত্নেশ্বর। হাঁ, মহারানী।

সুমিত্রা। কিসে বাধা।

রত্নেশ্বর। শিলাদিত্য তীর্থদ্বারে কর বসিয়েছে। দরিদ্র মেয়েদের পক্ষে দুঃসাধ্য হল। হাত থেকে তাদের কঙ্কণ কেড়ে নিয়ে কর আদায় হচ্ছে।

সুমিত্রা। কী বললে! মহারাজের সম্মতি আছে এতে ?

রত্নেশ্বর। রাজকার্যের রহস্য জানি নে, মা, কথা কইতে সাহস হয় না।

সুমিত্রা। ঠাকুর, বলো, এতে মহারাজের সম্মতি আছে ?

দেবদত্ত। সম্মতির প্রয়োজন হয় না, এতে আত্মবুদ্ধি আছে।

সুমিত্রা। সত্য করে বলো, এই অর্থ রাজকোষ গ্রহণ করে?

দেবদত্ত। সেদিন সভাপণ্ডিত ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন অগ্নি যা গ্রহণ করেন তাতে মলিনতা থাকে না, রাজার কর সেই অগ্নি।

সুমিত্রা। আমি পণ্ডিতের ব্যাখ্যা শুনতে চাই নে— বলো, এই অর্থ রাজকোষে আসে?

দেবদত্ত। নিয়মরক্ষার জন্যে কিছু আসে বৈকি, কিন্তু অনিয়মের কবলটা তার চেয়ে অনেক বড়ো, বেশির ভাগ তলিয়ে যায় সেই গহ্বরে। মহারানী, অনেক পাপীর উচ্ছিষ্ট রাজকোষে জমা হয়।

রত্নেশ্বর। মা, এটুকু কথা নিয়ে দুঃখ কোরো না— আমাদের অন্নসম্বল অল্প, তার কান্না কেঁদে কেঁদে আমাদের স্বর ক্লান্ত। সেই সম্বলকে যখন কেউ স্বল্পতর করে তখন তা নিয়ে অভিযোগ করা আমরা ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু আমাদেরও মর্মস্থান আছে, সেখানে রাজায় প্রজায় ভেদ নেই; সেখানে যদি রাজা হাত দেন সে আমাদের সইবে না।

সুমিত্রা। বলো সব কথা। ভয় কোরো না।

রত্নেশ্বর। আমরা অত্যন্ত ভীরু, মহারানী, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখে আমাদেরও ভয় ভেঙে যায়। সেইজন্যেই এমন করে চলে আসতে পেরেছি। জানি বিপদ সাংঘাতিক, কিন্তু বিপদের চেয়ে যেখানে গ্লানি দুঃসহ সেখানে আমাদের মতো দুর্বলও বিপদকে গ্রাহ্য করে না। না খেয়ে মরার দুঃখ কম নয় কিন্তু এমন অবস্থা আছে যখন বেঁচে থাকার মতো দুঃখ আর নেই।

সুমিত্রা। সে কথা আমিও বুঝি। যা তোমার বলবার আছে সব তুমি আমার কাছে বলো।

রত্নেশ্বর। তীর্থদ্বারে কর সংগ্রহের জন্যে রাজার অনুচর নিযুক্ত, সুন্দরী মেয়েদের বিপদ ঘটছে প্রতিদিন।

সুমিত্রা। সর্বনাশ! সত্য বলছ?

রত্নেশ্বর। যে কথা নিয়ে মানুষ মরতে প্রস্তুত হয়, আমি সেই কথা শুধু মুখে বলতে এসেছি মহারানী, এই আমার লজ্জা। আমার ছোটোবোন গিয়েছিল তীর্থে, হতভাগিনী আজও ফেরে নি।

সুমিত্রা। এও তুমি সহ্য করেছ?

রত্নেশ্বর। সহ্য করব না, সেই পণ করেই বেরিয়েছি। নিজের হাতেই দণ্ড

তুলতে হবে, কিন্তু তার আগে রাজদণ্ডের শেষ দোহাই পেড়ে যাব। তার পরে ধর্মই জানেন, আর আমিই জানি।

সুমিত্রা। এই সমস্ত কি শিলাদিত্যের জ্ঞাতসারে?

রত্নেশ্বর। তাঁরই ইচ্ছাক্রমে।

সুমিত্রা। ঠাকুর, সত্য করে বলো, রাজার কানে এ কথা কি আজও ওঠে নি।

দেবদত্ত। তোমার কাছে কোনোদিন মিথ্যা বলি নি, আজও বলব না। রত্নেশ্বর, তোমার আবেদন হল, এখন যাও ওই আমার কুটির দেখা যাচ্ছে। [রত্নেশ্বরের প্রস্থান

সুমিত্রা। ঠাকুর, রাজার কাছে এই অভিযোগ আসে নি?

দেবদত্ত। হাঁ এসেছে। মন্ত্রী দ্বিধা করেছিলেন, আমি স্বয়ং জানিয়েছি।

সুমিত্রা। ফল কী হল।

দেবদত্ত। শুনে লাভ নেই। রাজারা যখন অন্যায় করেন তখন তার সমর্থনের জন্যে অতি ভীষণ হয়ে ওঠেন।

সুমিত্রা। ঠাকুর, ভীষণতা অন্যায়ের ছদ্মবেশ; ভয় ক'রে তাকে যেন সম্মান না করি। অন্যায়কারীকে ক্ষুদ্র বলেই জানতে হবে, অতি ক্ষুদ্র, তার হাতে যত বড়ো একটা দণ্ড থাক্। তাকে যদি ভয় করি তবে তার চেয়েও ক্ষুদ্র হতে হবে। শিলাদিত্য উৎসবের নিমন্ত্রণে রাজধানীতে এসেছে?

দেবদত্ত। হাঁ, এসেছে।

সুমিত্রা। মন্ত্রীকে আদেশ করো তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।

দেবদত্ত। মহারানী!

সুমিত্রা। তুমি যা বলবে আমি তা সব জানি, সমস্ত জেনেই বলছি আজ তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হওয়া চাই।

দেবদত্ত। আগে উৎসব সমাধা হোক।

সুমিত্রা। এ পাপের বিচার না হলে আজ উৎসব হতেই পারবে না।

দেবদত্ত। মহারানী, সাবধান হবার অত্যন্ত প্রয়োজন আছে।

সুমিত্রা। আমাকে নিবৃত্ত কোরো না। একদিন আগুনে ঝাঁপ দিতে গিয়েছিলুম, সুবিজ্ঞের পরামর্শে নিবৃত্ত হয়েছি। তখনই সংকল্প রক্ষা করলে এত অমঙ্গল ঘটত না এ জগতে। শিলাদিত্যের বিচার যদি না হয় তা হলে এ রাজত্বে রানী হবার লজ্জা আমি সইব না। ওই-যে গর্জন শুনতে পাচ্ছি দ্বারের বাইরে।

দেবদত্ত। দয়াময়ী, কতটুকুই বা শুনলে। সবটা কানে উঠলে কান বধির হয়ে যেত। যে নিঃসহায়দের সামনে সকল দ্বার রুদ্ধ তাদের কণ্ঠও রুদ্ধ থাকে, তাই তো

আছি আমরা আরামে। বাধা আজ অল্প-একটু বুঝি সরেছে— তাই গুমরে-ওঠা দুঃখসমুদ্রের ধ্বনি সামান্য একটু শোনা গেল।

সুমিত্রা। ঠাকুর, বাধা আছে তো আছে— কিন্তু তার সামনে দাঁড়িয়ে আর্তনাদ করছে কেন, ভীরু সব। বিধাতা যাদের অবজ্ঞা করেন তাদের দয়া করেন না তাও কি এরা জানে না? দ্বার ভেঙে ফেলুক-না। বিচার ভয়ে ভয়ে চায় বলেই তো ওরা বিচার পায় না। রাজা যত বড়ো জোরের সঙ্গে ওদের কাছে কর দাবি করে, তত বড়ো জোরের সঙ্গেই ওদের বিচার চাবার অধিকার। ধর্মের বিধান মানুষের অনুগ্রহের দান নয়। আমাকে নিয়ে চলো ঠাকুর, ওদের মাঝখানে।

দেবদত্ত। মহারানী, তোমার নিজের জায়গায় থাকলেই ওদের বাঁচাতে পারবে; তোমার আসন যেখানে তোমার শক্তি সেখানেই।

সুমিত্রা। আমার আসন! আমার আসন আমি পাই নি। অহর্নিশি সেই শূন্যতা সইতে পারছি নে, মন কেবলই বলছে, রুদ্রভৈরবের পায়ের কাছেই আমার স্থান— দেখিয়ে দিন তিনি পথ, ভেঙে দিন তিনি বিঘ্ন, ব্যর্থতার অপমান থেকে সেবিকাকে উদ্ধার করুন। [উভয়ের প্রস্থান

নরেশ ও বিপাশার প্রবেশ

নরেশ। শোনো শোনো, বিপাশা, শুনে যাও।

বিপাশা। শোনবার যোগ্য কথা থাকলে তবেই শুনব।

নরেশ। আমি বলতে এসেছি জালন্ধর কাশ্মীর জয় করে নি।

বিপাশা। কবে তোমার ভুল ভাঙল।

নরেশ। প্রতিদিনই ভাঙছে। প্রতিদিনই প্রমাণ পাচ্ছি, কাশ্মীরই জালন্ধর জয় করেছে। হার মানলুম। এখন প্রসন্ন হও।

বিপাশা। তার সময় আসে নি।

নরেশ। কবে আসবে।

বিপাশা। যখন আর-একবার তোমার সৈন্য নিয়ে কাশ্মীরে যুদ্ধ করতে যাবে।

নরেশ। যাব যুদ্ধ করতে, চেষ্টা করে হেরেও আসব।

বিপাশা। চেষ্টা করতে হবে না, বীরপুরুষ। সেই যুদ্ধটা না দেখে আমি যেন না মরি। ছলনাকে গৌরব বলে অহংকার করছ সেইটে চূর্ণ হবে তবেই ধর্ম আছেন এ কথা মানব।

নরেশ। সত্য বলছি, সেই গৌরবটাকে ফেলে দিতে পারলে বাঁচি।

বিপাশা। কেন বলো তো।

নরেশ। কেননা, সেই গৌরবটার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যের জিনিস দেখেছি।

বিপাশা। রানী সুমিত্রাকে দেখেছ।

নরেশ। তাঁর কথা বলা বাহুল্য। আমি বলছিলুম—

বিপাশা। আর কিছু বলতে হবে না। তাঁর চেয়ে বড়ো কথা তোমাদের রাজ্যে আর নেই। তোমাদের রাজা কি তাঁর নাগাল পায়। চুপ করে রইলে যে? লজ্জা আছে দেখছি। স্বীকার করোই-না।

নরেশ। স্বীকার অনেকদিন করেছি। কুক্ষণে মহারাজ কাশ্মীর জয় করতে গিয়েছিলেন। জয় করে তাঁর নিজের রাজ্য হারিয়েছেন। কাশ্মীর থেকে পাপগ্রহকে অভ্যর্থনা করে এনেছেন রাজ্যের মধ্যে, পাপের নৈবেদ্যে তাকেই পুষ্ট করে তুলেছেন। বিপাশা, তোমার কাছে গোপন করব না— বিপদের জাল চারি দিকে ঘিরে আসছে, গ্রন্থির পর গ্রন্থি, তারই মাঝখানে নিশ্চিন্ত বসে আছেন আমাদের স্বেচ্ছান্ধ মহারাজ, প্রস্তুত হতে হবে আমাদেরই, আর সময় নেই।

বিপাশা। অতএব?

নরেশ। অতএব এই বেলা তোমার মুখে একটা গান শুনে নিতে চাই।

বিপাশা। আমার গান, বিপদের ভূমিকায়!

নরেশ। বাঁশির স্বরে সাপের জড়তা ঘোচে, তোমার গানে আমার তরবারি জেগে উঠবে।

বিপাশা। যুদ্ধের গান চাই?

নরেশ। না, সে-গান আমার অস্থিমজ্জায় আছে, আমি ক্ষত্রিয়।

বিপাশা। তবে?

নরেশ। তুমি জান কোন্ গানটা আমি ভালোবাসি।

বিপাশা। উৎসবের সময় তো গাইতেই হবে, তখন শুনো।

নরেশ। যা সকলেই পাবে তাতে আমার কেবল একটা মাত্র ভাগ। একটি সম্পূর্ণ দান আমাকে দাও, যা কেবল আমার একলারই।

বিপাশা। গান

মন যে বলে, চিনি চিনি
যে-গন্ধ বয় এই সমীরে।
কে ওরে কয় বিদেশিনী
চৈত্ররাতের চামেলিরে?

রক্তে রেখে গেছে ভাষা
স্বপ্নে ছিল যাওয়া-আসা
কোন্ যুগে কোন্ হাওয়ার পথে
কোন্ বনে কোন্ সিন্ধুতীরে।
এই সুদূরে পরবাসে
ওর বাঁশি আজ প্রাণে আসে।
মোর পুরাতন দিনের পাখি
ডাক শুনে তার উঠল ডাকি,
চিত্ততলে জাগিয়ে তোলে
অশ্রুজলের ভৈরবীরে॥

নরেশ। বিপাশা, একটা কথা শুনতে চাই।

বিপাশা। ওই তো তোমার লুব্ধ স্বভাব। বললে, একটি গান শুনতে চাই, যেমনি গান শেষ হল রব উঠেছে একটি কথা শুনতে চাই। একটি কথা থেকে দুটি কথা হবে, তার পর আমার কাজের বেলা যাবে চলে। আমি যাই।

নরেশ। শোনো, শোনো, একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাও। ওই-যে গাইলে ওটা কি সত্য। প্রবাসে বাঁশি কি বেজেছে।

বিপাশা। অরসিক, কথা দিয়ে যার কাছে গান ব্যাখ্যা করতে হয় তাকে গান না শোনানোই ভালো। তুমি-যে অলংকার-শাস্ত্রের ছাত্রদেরও ছাড়িয়ে উঠলে।

নরেশ। তবে থাক ব্যাখ্যা, গানই আমার যথেষ্ট। [উভয়ের প্রস্থান

রাজপুরাঙ্গনা কালিন্দীর প্রবেশ। কালিন্দীর আপনমনে কাব্য আবৃত্তি

মঞ্জরী, গৌরীর প্রবেশ

গৌরী। একা-একা কার সঙ্গে আলাপ চলছে? বনদেবতার সঙ্গে?

কালিন্দী। না গো, মনোদেবতার সঙ্গে। মন্মথর স্তব কণ্ঠস্থ করছি। রাজার আদেশ।

গৌরী। ওটা হৃদয়স্থ থাকলেই হয়, কণ্ঠে আনবার দরকার কী।

কালিন্দী। হৃদয়ের পদচারণার পথ কণ্ঠে।

গৌরী। ওগো অলঙ্করিণী, এতদিন আছি, তোমাদের ধরনধারন আজও বুঝতে পারলুম না।

কালিন্দী। আশ্চর্য নেই গো কাশ্মিরিনী, বুঝতে বুদ্ধির দরকার করে। কোন্‌খানটা দুর্বোধ ঠেকছে, শুনি-না।

গৌরী। বেদে অগ্নি সূর্য ইন্দ্র বরুণ অনেক দেবতারই স্তব আছে, কিন্তু তোমাদের এই দেবতাটির তো নামও শোনা যায় না।

কালিন্দী। সত্যযুগের ঋষিমুনিরা এঁকে যত সাবধানে এড়িয়ে চলতেন ততই অসাবধানে পড়তেন বিপদে। মুখে তাঁর নাম করতেন না তাই মার খেয়ে মরতেন অন্তরে। পুরাণগুলো পড় নি বুঝি?

গৌরী। মূর্খ আছি সেই ভালো, বিদুষী। সত্যযুগের কলঙ্ককাহিনী কলিযুগে টেনে আনবার মতো এত বিদ্যের দরকার কী ভাই। কলিযুগের পাপের ভরা যথেষ্ট ভারী আছে।

কালিন্দী। বড়ো লজ্জা দিলে— মূর্খ ব'লে অহংকার করতে পারলুম না— ওখানে কাশ্মীরেরই জিত রইল।

মঞ্জরী। ভাই, তোর কালিন্দীকলকল্লোল একটুখানি থামা। ত্রিবেদীঠাকুর বলেন, কালিন্দীর রসনা তার প্রতিবেশী দশনপংক্তির কাছ থেকে দংশন করবার বিদ্যেটা শিখে নিয়েছে। কেবল সেই বিদ্যেটা ফলাবার জন্যেই যে-দেবতাকে মানিস নে তাকে নিয়ে তর্ক তুলেছিস। নতুন দেবতাকে ভক্তি করবার আগে তোর ইষ্টদেবতার সাধনা সারা হোক।

কালিন্দী। তার পরে আছেন অনিষ্টদেবতাটি। একটু চুপ কর্, ভাই, স্তবটা আর-একবার আউড়ে নিই। দেবতা ত্রুটি মার্জনা করেন, কিন্তু আমাদের সভাকবি তাঁর রচনার আবৃত্তিতে একটু ভুল পেলে কাঁদিয়ে ছাড়েন।

মঞ্জরী। ওই আসছেন ত্রিবেদীঠাকুর, ওঁর কাছে আজ সন্দেহ মিটিয়ে নিই।

আবৃত্তি করতে করতে ত্রিবেদীর প্রবেশ

ত্রিবেদী। কর্পূর ইব দগ্ধোঽপি শক্তিমান্ যো জনে জনে—
নমোঽস্ত্ববার্যবীর্যায় তস্মৈ মকরকেতবে।

মঞ্জরী। আপন মনে কী বকছ, ঠাকুর।

ত্রিবেদী। গোলমাল কোরো না, মুখস্থ করছি।

মঞ্জরী। কী মুখস্থ করছ।

ত্রিবেদী। মকরকেতুর স্তব। রাজার আদেশ।

কালিন্দী। তোমারও এই দশা!

ত্রিবেদী। দেখছ না, মধুকরের গুঞ্জন আর শোনা যাচ্ছে না। সংস্কৃত শৌরসেনী মাগধী অর্ধমাগধী মহারাষ্ট্রী পারসিক যাবনিক নানা ভাষায় আজ অভ্যাস চলছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে মকরকেতুর সকল দেশের সকল ভাষাতেই পাণ্ডিত্য।

কালিন্দী। কিন্তু অনুচ্চারিত ভাষাই তিনি সব চেয়ে ভালো বোঝেন। দাদা-ঠাকুর, একটা কথার উত্তর দাও। মকরকেতুর পূজার বিধান পেয়েছ কোন্‌ বেদে।

ত্রিবেদী। চুপ চুপ। কি কণ্ঠস্বরই পেয়েছ তোমরা পুরাঙ্গনারা।

কালিন্দী। অরসিক, বয়স হয়েছে বলে কি কণ্ঠস্বরের বিচারবুদ্ধিটাও খোয়াতে হবে। তোমাদের কবি যে কোকিলের সঙ্গে এই কণ্ঠের তুলনা করেন।

ত্রিবেদী। অন্যায় করেন না। কোনো কথা গোপনে বলবার অভ্যাস ওই পাখিটার নেই।

কালিন্দী। দাদাঠাকুর, তোমার সঙ্গে গোপন কথা বলবার মতো মনের ভাব আমার নয়। শাস্ত্রের বিচার চাই। এরা বলছিল, পুরাণে অতনুর নেই তনু, আবার বেদে নেই তার নামগন্ধ— বাকি রইল কী। তা হলে পূজাটা হবে কাকে নিয়ে।

ত্রিবেদী। আরে চুপ চুপ— স্বরটাকে আর-এক সপ্তক নামিয়ে আনো।

মঞ্জরী। কেন, ঠাকুর, ভয় কাকে ?

ত্রিবেদী। যারা নতুন দেবতার পূজা চালাতে চায় তারা ভক্তির জোরের চেয়ে গায়ের জোরটা বেশি ব্যবহার করে। আমি ভালোমানুষ, দেবতার চেয়ে এই দেবতাভক্তদের ভয় করি অনেক বেশি।

গৌরী। ঠাকুর, আমি বলছিলুম এই-সব হঠাৎ-দেবতার আবার পূজা কিসের।

ত্রিবেদী। মূঢ়ে, যারা বনেদি দেবতা তাদের এত উগ্রতা নেই। সংসারে হঠাৎ-দেবতারাই সাংঘাতিক। তাদের পূজা করায় ব্যর্থতা, না-পূজা করায় সর্বনাশ। অতএব ছাড়ো তর্ক, পরো মঞ্জীর, আনো বীণা, গাঁথো মালা— পঞ্চশরের শরগুলোকে শান দেও গে।

কালিন্দী। কিন্তু তোমার মন্ত্রটি পেলে কোথা থেকে ঠাকুর।

ত্রিবেদী। যিনি পূজা প্রচার করছেন পূজার মন্ত্ররচনা তাঁরই। আমি সেটাকে শ্রুতির দ্বারা গ্রহণ ক'রে স্মৃতির দ্বারা ব্যক্ত করব। দেখে নিয়ো, রাজসভায় শ্রুতিভূষণ বলবেন, সাধু, স্মৃতিরত্নাকর বলবেন, অহো কিমাশ্চর্যম্‌ !

মঞ্জরী। ও কী ও, ভাই, বাইরে যে অস্ত্রের ঝঞ্ঝনি শোনা গেল।

কালিন্দী। হয়তো ওটা সত্যকার নয়। হয়তো উৎসবের একটা কোনো পালার অভ্যাস চলছে।

গৌরী। ত্রিবেদীঠাকুর, এও বুঝি তোমাদের জালন্ধরের সৃষ্টিছাড়া কীর্তি? মীনকেতুর উৎসবে রক্তপাতের পালা?

ত্রিবেদী। সুন্দরী, জগতে এ পালা বার বার অভিনয় হয়ে গেছে। ত্রেতাযুগে এই পালায় একবার রাক্ষসে বানরে মিলে অগ্নিকাণ্ড করেছিল। কলিযুগে তাদের বংশ বেড়েছে বৈ কমে নি। যাই হোক শব্দটা ভালো লাগছে না— যাও তোমরা মন্দিরে আশ্রয় লও গে। [সকলের প্রস্থান

২

সুমিত্রা ও প্রতিহারীর প্রবেশ

সুমিত্রা। সেই প্রজাকে চাই, রত্নেশ্বর তার নাম।

প্রতিহারী। তাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, মহারানী।

সুমিত্রা। এই কিছুক্ষণ আগেই ছিল।

প্রতিহারী। কিন্তু কারো কাছে তার সন্ধান পাচ্ছি নে।

সুমিত্রা। দেবদত্ত ঠাকুরের ঘরে কি নেই।

প্রতিহারী। ঠাকরুন বললেন সেখানে কেউ আসে নি। ঐ যে ঠাকুর স্বয়ং আসছেন। [প্রস্থান

দেবদত্তের প্রবেশ

সুমিত্রা। রত্নেশ্বর কোথায়।

দেবদত্ত। তাকেই খুঁজতে এসেছি।

সুমিত্রা। তাকে যে নিতান্তই পাওয়া চাই।

দেবদত্ত। সেই কারণেই তাকে পাওয়া নিতান্তই কঠিন হবে। হতভাগ্যকে বলেছিলুম আমার ঘরে আশ্রয় নিতে।

সুমিত্রা। তুমি কি তবে সন্দেহ করছ—

দেবদত্ত। সন্দেহ করছি কিন্তু নাম করছি নে।

সুমিত্রা। এও কি সহ্য করতে হবে।

দেবদত্ত। হবে বৈকি। প্রমাণ নেই যে।

সুমিত্রা। তাই বলে পাপিষ্ঠকে নিষ্কৃতি দেবে?

দেবদত্ত। নিষ্কৃতির সদুপায় পাপিষ্ঠ নিজেই জানে, আমাদের কিছুই করতে হবে না।

সুমিত্রা। ঠাকুর, তবে কিছুই করবে না?

দেবদত্ত। যদি সম্ভব হত নিজের অস্থি দিয়ে বজ্র তৈরি করে ওর মাথায় ভেঙে পড়তুম।

সুমিত্রা। তুমি বলতে চাও কিছুই করবার নেই? চুপ করে রইলে কেন ঠাকুর, লজ্জায়? পাছে কিছু করতে হয় সেই ভয়ে? আমি তো ধৈর্য রাখতে পারছি নে। বিপাশা, কী করছিস এখানে।

বিপাশার প্রবেশ

বিপাশা। অনঙ্গদেবের পূজায় মহারানীর জন্যে অর্ঘ্য সাজিয়ে এনেছি।

সুমিত্রা। ফেলে দে, ফেলে দে, দূর করে ফেলে দে সব। আমি যাব রুদ্রভৈরবের মন্দিরে, ঠাকুর, পূজা প্রস্তুত করো।

দেবদত্ত। পুরোহিত ত্রিবেদীকে মহারাজ তাঁর কাজে আজ নিযুক্ত করেছেন।

সুমিত্রা। তুমি হবে আমার পুরোহিত।

দেবদত্ত। আমি পুরোহিত?

সুমিত্রা। হাঁ তুমি। নীরব যে, মনে কি ভয় আছে।

দেবদত্ত। ভয় দেবতাকে। মুখে মন্ত্র পড়তে পারি, কিন্তু অন্তরের কথা যে অন্তর্যামী জানেন। কিন্তু মহারানী, ভৈরবের পূজায় তোমার কিসের প্রয়োজন।

সুমিত্রা। দুর্বল মন, শক্তি চাই।

বিপাশা। শক্তির দরকার যার সে তোমার নয়, সে মহারাজের। যে অসামান্য রূপ নিয়ে এসেছ সংসারে তার কাছে রাজলক্ষ্মী হার মেনেছেন— সে জন্যে দোষ দেব কাকে। যদি ক্ষমা কর তো বলি, দোষ তোমারই।

সুমিত্রা। বুঝিয়ে বলো।

বিপাশা। ওই যে কাশ্মীরের নরাধমদের রাজ্যের হৃৎপিণ্ডের উপর বসিয়েছেন রাজা, তার কারণ শুনবে? রাগ করবে না?

সুমিত্রা। কারণ শুনতেই চাই আমি।

বিপাশা। প্রেমের গৌরব খুব প্রকাণ্ড করে জানাতে চেয়েছিলেন রাজা, খুব দুর্মূল্য দান দুঃসাহসের সঙ্গে দিতে পারলে তিনি বাঁচতেন। এই সামান্য কথাটা তুমি বুঝতে পার নি?

সুমিত্রা। আমি তো কোনো বাধা দিই নি।

বিপাশা। দাও নি বাধা? ওই ভুবনমোহন রূপ নিয়ে কোথায় সুদূরে দাঁড়িয়ে রইলে তুমি। কিছু চাইলে না, কিছু নিলে না, এ কী নিষ্ঠুর নিরাসক্তি। তুমি রাজহংসীর মতো, রাজার তরঙ্গিত কামনাসাগরের জলে তোমার পাখা সিক্ত হতে চায় না, রাজবৈভবের জালে পারলে না তোমাকে একটুও বাঁধতে, তুমি যত রইলে মুক্ত, রাজা ততই হলেন বন্দী। শেষে একদিন আপন রাজ্যটাকে খণ্ড খণ্ড করে ছড়িয়ে ফেলে দিলেন ওই কাশ্মীরী কুটুম্বদের হাতে— মনে করলেন তোমাকেই দেওয়া হল।

সুমিত্রা। আমি তার কিছুই জানতেম না।

বিপাশা। তা জানি, রাজা ভেবেছিলেন নিজের দাক্ষিণ্যের উন্মত্ততায় তোমাকে বিস্মিত করে দেবেন। তখনো তোমাকে চেনেন নি। কিন্তু কতবড়ো দুর্ভাগা— রাজসিংহাসনের উপরে বসে ছটফট করে মরছে; দিতে চায় দিতে পারে না, নিতে চায় নেবার যোগ্যতা নেই। ব্যর্থ নির্বুদ্ধিতার ধিক্কারে আজ সকলেরই উপর রেগে রেগে উঠছেন। তার মধ্যে তুমিও আছ।

সুমিত্রা। ঠাকুর, আজ পর্যন্ত ভালো করে বুঝতে পারি নি আমার অপরাধটা কোথায়।

দেবদত্ত। মহারানী, কলিকে কখন কোথায় নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলি সব সময়ে ভেবে পাই নে।

বিপাশা। ঠাকুর, ভেবে পেয়েছ তুমি, বলতে চাও না। কিন্তু আমি বলব। আমি ভয় করি নে কাউকে। মহারানীর সঙ্গে মহারাজের সম্বন্ধ অন্যায় দিয়ে আরম্ভ হয়েছে সেই পাপের ছিদ্র দিয়েই কলির প্রবেশ।

সুমিত্রা। বিপাশা, চুপ কর্‌ তুই।

বিপাশা। কেন চুপ করব। কাশ্মীর জয় করে এরা তোমাকে অধিকার করেছে এই মিথ্যে কথাটাই বলে বেড়াতে হবে? আশ্চর্য হয়ে যাই তোমার ধৈর্য দেখে, মহারানী। পাপকে জয় করেছ পুণ্য দিয়ে। কিন্তু সেই পুণ্যের দান কি মহারাজ গ্রহণ করতে পারলেন।

সুমিত্রা। চুপ কর্‌, চুপ কর্‌, বিপাশা।

বিপাশা। চুপ করিয়ো না। যে কথা অন্তরের মধ্যে জান সে কথা বাইরে থেকেও শোনা ভালো। ওই রাজা আসছেন। আমি যাই। থাকতে পারব না, শেষে কী বলতে কী বলে ফেলব। [প্রস্থান

বিক্রমের প্রবেশ

বিক্রম। মহারানী, দেবদত্তকে নিয়ে কী গূঢ় পরামর্শ চলছে।

সুমিত্রা। আজ ভৈরবমন্দিরে পূজা করব, ওঁকে পুরোহিত করেছি।

বিক্রম। আজ ভৈরবের পূজা? এ কি হতে পারে।

সুমিত্রা। পাপের মূর্তি দেখে ভয় পেয়েছি, যিনি সকল ভয়ের ভয় তাঁর স্মরণ নেব।

বিক্রম। পাপের মূর্তি কী দেখলে।

সুমিত্রা। সতীতীর্থে সতীধর্মের অবমাননা, অথচ এ রাজ্যে তার কোনো প্রতিকার নেই, এ সংবাদ শুনে উৎসব করতে আমি সাহস করি নি।

বিক্রম। এ সংবাদ কে দিলে। দেবদত্ত?

সুমিত্রা। যারা অত্যাচারে মর্মান্তিক পীড়িত তাদেরই একজন।

বিক্রম। মহারানী, অন্তঃপুরে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী বিচারশালা স্থাপন করেছ? আমার অধিকার হরণ করতে চাও?

সুমিত্রা। মহারাজ, ধর্ম সাক্ষী করে আমি কি তোমার সহধর্মিণী হই নি। রাজ্যের পাপ যে মুহূর্তে তোমাকে স্পর্শ করে সেই মুহূর্তেই কি আমাকেও স্পর্শ করে না।

বিক্রম। দেবদত্ত, অভিযোগ কে এনেছে। কার নামে অভিযোগ।

দেবদত্ত। বুধকোট থেকে প্রজা এসেছে, নাম রত্নেশ্বর, শিলাদিত্যের নামে অভিযোগ।

বিক্রম। আমাকে লঙ্ঘন করে রানীর কাছে কেন এই অভিযোগ।

দেবদত্ত। প্রশ্ন যখন করলে তখন সত্য কথা বলব, তোমার কাছে পূর্বেই অভিযোগ হয়েছে।

বিক্রম। আমি কি কান দিই নি।

দেবদত্ত। কান দিয়েছিলে, বলেছিলে বিশ্বাস কর না।

বিক্রম। সেই তো বিচার। অমাত্যের নামে মিথ্যা অপবাদ দিলে তারও বিচার রাজাকে করতে হবে না? জান শিলাদিত্যের 'পরে যে-ভার আছে সে অতি কঠিন। প্রত্যন্তদেশের সীমা রক্ষা করতে হয় তাকেই।

দেবদত্ত। রাজার প্রতিনিধিরূপে ধর্মরক্ষা করাও তারই কাজ।

বিক্রম। কে বললে সে তা করে নি।

দেবদত্ত। তোমার নিজের অন্তরই বলছে, তাই আমার 'পরে এত রাগ করছ।

অভিযোগকারীকে আমিই তোমার কাছে নিয়ে গেছি। মন্ত্রী সাহস করে নি। সেদিন দেখি নি কি বিচারকালে ক্ষণে ক্ষণে তোমার ভ্রূকুটি। দণ্ড তোমার কতবার উদ্যত হয়েও দুর্বল দ্বিধায় নিরস্ত হয়েছে সে কথা স্বীকার করবে না ?

বিক্রম। সাবধান! আমি দুর্বল! কিসের ভয়ে দুর্বল!

দেবদত্ত। শিলাদিত্যকে যে-শক্তি নিজে দিয়েছ আজ তার প্রতিরোধ করা তোমার নিজের পক্ষেও দুঃসাধ্য— এই কারণেই দ্বিধা। তুমি ওদের ভয় করতে আরম্ভ করেছ— আমাদের ভয় সেইখানেই।

বিক্রম। অসহ্য তোমার স্পর্ধা! অনুতাপের দিন তোমার আসন্ন।

সুমিত্রা। আর্যপুত্র, আমাদের দণ্ড দেওয়া সহজ কথা— সেজন্যে রাজশক্তির প্রয়োজন হবে না। কিন্তু শিলাদিত্যের বিচার আজই করা চাই।

বিক্রম। অভিযোগ যার সে কই ?

সুমিত্রা। সে আমি।

বিক্রম। তুমি ?

সুমিত্রা। যে হতভাগা এসেছিল তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

বিক্রম। নিজের মিথ্যার ভয়ে সে পালিয়েছে।

সুমিত্রা। মহারাজ, তুমি নিশ্চয় জান কে তাকে হরণ করেছে।

বিক্রম। মহারানী, অন্ধ দয়া আর অস্পষ্ট অনুমানের দ্বারা বিচার হয় না।

রত্নেশ্বরকে নিয়ে নরেশের প্রবেশ

নরেশ। শিলাদিত্যের লোক একে বলপূর্বক ধরে নিয়ে যাচ্ছিল রাজদ্বারের সম্মুখ দিয়ে। আমার নিষেধ শুনলে না। তলোয়ার খুলতে হল রাজা আছেন এই কথা এদের স্মরণ করিয়ে দিতে।

বিক্রম। কেন ওকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল।

নরেশ। বললে শিলাদিত্যের আদেশ। সে আদেশের উপরে তোমার আদেশ কী, সেইটে শোনবার জন্যে অপেক্ষা করছি।

রত্নেশ্বর। মহারানী, আমার রক্ষা নেই সে আমি জানি, কিন্তু বিচার চাই— সে বিচার আজই যেন হয়, তোমার সামনেই যেন হয়, দোহাই তোমার।

সুমিত্রা। মূঢ়, ওই যে মহারাজ আছেন, ওঁকে জানাও তোমার অভিযোগ।

রত্নেশ্বর। মহারাজ, মর্মঘাতী দুঃখ আমাদের— সে দুঃখ বাধা মানবে না, বিলম্ব সইবে না, মৃত্যুযন্ত্রণার চেয়ে সে প্রবল।

বিক্রম। চুপ কর্‌! দেবদত্ত, কে এদের এমন করে প্রশ্রয় দিচ্ছে। এরা বলপূর্বক আমার কাছ থেকে বিচার কেড়ে নিতে চায়? দ্বারী কোথায়।

দ্বারীর প্রবেশ

দ্বারী। কী মহারাজ।

বিক্রম। একে প্রহরীশালায় নিয়ে রাখো। কাল বিচার হবে।

দ্বারী। যে আদেশ।

রত্নেশ্বর। মহারানী, আমার আজকের দিন গেল, কালকের দিনকে বিশ্বাস নেই। বাঁচি আর মরি আমার যা-হয় হোক, কিন্তু প্রজার অভিযোগ তোমার পায়ে রেখে গেলুম, তোমাকে সে তুলে নিতে হবে। আমি বিদায় নিলুম।

সুমিত্রা। মনে রইল রত্নেশ্বর। [দ্বারী ও রত্নেশ্বরের প্রস্থান

নরেশ। মহারাজ, মন্ত্রী আমাকে দিয়ে কিছু সংবাদ পাঠিয়েছেন— আশু মন্ত্রণার আবশ্যক।

বিক্রম। তোমরা একটার পর আর-একটা উৎপাত নিজে সাজিয়ে আনছ।

নরেশ। উৎপাত সৃষ্টি করতে পারি এত শক্তি আমাদের আছে?

বিক্রম। সৃষ্টি করবার দরকার নেই। সত্যযুগেও রাজ্যে উৎপাতের অভাব ছিল না। কিন্তু উৎপাত ছড়িয়ে থাকে দেশে ও কালে। তোমরা তাদের আজই একদিনের মধ্যে পুঞ্জিত করে সাজিয়েছ। যে-সমস্ত প্রমাণ তোমাদের মিত্রদের বেলায় থাকে বিক্ষিপ্ত, তোমাদের শত্রুদের বেলা আজ তোমরা সেইগুলোকে সংহত করে কালো করে আমার সামনে ধরতে চাও— আজ উৎসবদিনের আলোর উপরে এই কালীমূর্তিকে দাঁড় করিয়ে কেবল এই কথাটা বলতে চাও, যে, তোমাদেরই জিত হল। তোমাদের এই সাজিয়ে-তোলা বিভীষিকার কাছে আমি হার মানব না এ কথা নিশ্চয় জেনো। উৎপাতের সংবাদ আছে, থাক্‌-না, নিশ্চয়ই সে আগামী কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে।

নরেশ। অপেক্ষা করতে নিশ্চয় পারে, মহারাজ, কিন্তু আজ যা সংবাদ আছে কাল তা সংকট হয়ে দাঁড়ায়। তবে যাই, মন্ত্রীকে জানাই গে।

বিক্রম। ওরা আমার প্রিয়পাত্র, ওদের প্রতি আমার পক্ষপাত, ওদের বিচার আমি করতে পারি নে, ওদের শাস্তি দিতে আমি অক্ষম— তোমাদের এসব কথা মিথ্যা, মিথ্যা। দণ্ডের যারা যোগ্য তাদের যখন দণ্ড দেব তখন ভয়ে স্তব্ধ হয়ে যাবে। ক্ষীণ দুর্বল তোমরাই, কর্তব্যের তোমরা কী জান! ক্ষমায় দয়ায় অশ্রুজলে তোমাদের

কর্তব্যবুদ্ধি পঙ্কিল— তোমরা বিচার করবার স্পর্ধা কর! সময় আসবে, বিচার করব, কিন্তু তোমাদের ওই কান্না শুনে নয়। মহারানী, তুমি কোথায় চলেছ। যেয়ো না, থামো।

সুমিত্রা। এমন আদেশ কোরো না। চলো রাজকুমার, ওই লতাবিতানে, মন্ত্রী কী সংবাদ পাঠিয়েছেন শুনতে চাই।

বিক্রম। মহারানী, তোমার এই প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা আমার কর্তব্যকে আরো অসাধ্য করে তুলছে। শুনে যাও— আমি আদেশ করছি। ফিরে এসো।

সুমিত্রা। কী, বলো।

বিক্রম। তুমি আমাকে চিনতে পারলে না— তোমার হৃদয় নেই, নারী! শংকরের তাণ্ডবকে উপেক্ষা করতে পারি কি। সে তো অপ্সরার নৃত্য নয়। আমার প্রেম, এ প্রকাণ্ড, এ প্রচণ্ড, এতে আছে আমার শৌর্য— আমার রাজপ্রতাপের চেয়ে এ ছোটো নয়। তুমি যদি এর মহিমাকে স্বীকার করতে পারতে তা হলে সব সহজ হত। ধর্মশাস্ত্র পড়েছ তুমি, ধর্মভীরু— কর্মদাসের কাঁধের উপর কর্তব্যের বোঝা চাপানোকেই মহৎ ব'লে গণ্য করা তোমার গুরুর শিক্ষা। ভুলে যাও, তোমার ওই কানে মন্ত্রগুলো। যে আদিশক্তির বন্যার উপরে ফেনিয়ে চলেছে সৃষ্টির বুদ্‌বুদ, সেই শক্তির বিপুল তরঙ্গ আমার প্রেমে— তাকে দেখো, তাকে প্রণাম করো, ওর কাছে তোমার কর্ম অকর্ম দ্বিধাদ্বন্দ্ব সমস্ত ভাসিয়ে দাও, একেই বলে মুক্তি, একেই বলে প্রলয়, এতেই আনে জীবনে যুগান্তর।

সুমিত্রা। সাহস নেই মহারাজ, সাহস নেই! তোমার প্রেম তোমার প্রেমের পাত্রকে অনেক দূরে ছাড়িয়ে গেছে— আমি তার কাছে অত্যন্ত ছোটো। তোমার চিত্তসমুদ্রে যে তুফান উঠেছে তাতে পাড়ি দেবার মতো আমার এ তরী নয়— উন্মত্ত হয়ে যদি ভাসিয়ে দিই তবে মুহূর্তে এ যাবে তলিয়ে। আমার স্থিতি তোমার প্রজাদের কল্যাণলক্ষ্মীর দ্বারে— সেখানকার ধূলির 'পরেও যদি আসন দিতে, আমার লজ্জা দূর হত। তোমার নিজের তরঙ্গগর্জনে তোমার কর্ণ বধির, কেমন করে জানবে কী নিদারুণ দুঃখ তোমার চার দিকে। কত মর্মভেদী কান্নার প্রতিধ্বনি দিনরাত্রি আমার চিত্তকুহরে ক্ষুব্ধ হয়ে বেড়াচ্ছে তোমাকে তা বোঝাবার আশা ছেড়ে দিয়েছি। যখন চার দিকেই সবাই বঞ্চিত তখন আমাকে তুমি যত বড়ো সম্পদই দাও, তাতে আমার রুচি হয় না। চলো রাজকুমার, মন্ত্রী কী আবেদন করছেন আমাকে বলবে চলো।

বিক্রম। শোনো নরেশ, কী সংবাদ এনেছ বলো আমাকে।

নরেশ। মহারাজ যুধাজিৎকে পদত্যাগের আদেশ করেছিলেন, সে তো একেবারেই শোনে নি। এদের পরস্পরের মধ্যে একটা যোগ হয়েছে বলে বোধ হচ্ছে।

বিক্রম। কিসে বোধ হল।

নরেশ। শিলাদিত্যকে যে মুহূর্তে মহারানী আহ্বান করে পাঠালেন তার পরমুহূর্তেই সে রাজধানী থেকে চলে গেল। মহারানীর আদেশ গ্রাহ্যই করলে না।

বিক্রম। আবার সংকট বাধিয়েছ? রাজকার্যে কেন হাত দিতে গেলে, মহারানী।

সুমিত্রা। রাজকার্য নয়, আত্মীয়ের কর্তব্য। জালন্ধরের কিছুতে আমার অধিকার না যদি থাকে কাশ্মীরের দায়িত্ব আছে আমার।

বিক্রম। সম্মানী লোকের অভিমানে আঘাত করে অসম্মান যদি ফিরে পেয়ে থাক কাকে দোষ দেবে।

সুমিত্রা। আত্মীয় যদি আত্মীয়ের অমর্যাদা করে থাকে তা নিয়ে আমার অভিযোগ নেই। তবে যে অপরাধ রাজার বিরুদ্ধে, তোমার প্রজার হয়ে তারই বিচার আমি চাই।

বিক্রম। বিচার যদি চাও তবে প্রথমে যুদ্ধ করতে হবে।

সুমিত্রা। হাঁ, যুদ্ধই করতে হবে।

বিক্রম। যুদ্ধ! সে তো নারীর মুখের কথা নয়।

সুমিত্রা। নারীর বাহুর সাহায্য যদি চাও তো প্রস্তুত আছি।

বিক্রম। দেখো প্রিয়ে, জয়ের অভিপ্রায়েই যুদ্ধ, আস্ফালনের জন্যে নয়। এতে সময় এবং সুযোগের অপেক্ষা আছে।

সুমিত্রা। রাজকুমার নরেশ, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, দুর্বৃত্তদের হাত থেকে প্রজাদের বাঁচাবার কোনো পথই নেই?

বিক্রম। মহারানী, মনে রেখো দয়ার অবিচারেও অন্যায় আছে। প্রজাদের 'পরে অত্যাচার হচ্ছে এও যেমন অশক্তি, অন্যায়কারীদের শাসন আমার পক্ষে অসাধ্য এও তেমনি অশ্রদ্ধেয়। এসব কথা তোমার সঙ্গেও নয় এবং আজও নয়। দেবদত্ত, পৌরোহিত্য তুমি রাজার কাছ থেকে পাও নি— ত্রিবেদী পুরোহিত। আজ তার অবকাশ নেই, পূজা কাল হবে। রাজার কার্যে বা পূজার কার্যে যদি অনধিকার হস্তক্ষেপ কর তবে তোমার 'পরে রাজার হস্তক্ষেপ প্রীতিকর হবে না। মহারানী, উৎসবের বেশ তুমি এখনো পর নি। যাও, রাজার আদেশ, এখনই বেশ পরিবর্তন করো গে। এ তো রাজরানীর বেশ—

সুমিত্রা। তাই করব মহারাজ, তাই করব, বেশ পরিবর্তন করব। ধিক এই রাজ্য! ধিক আমি এ রাজ্যের রানী! [দেবদত্ত ও বিক্রম ছাড়া আর সকলের প্রস্থান

দেবদত্ত। মহারাজ, আমিও যাচ্ছি। কিন্তু একটা অপ্রিয় কথা বলে যাব। নির্বিচারে যেদিন ওই কাশ্মীরীদের হাতে ক্ষমতা দিলে সেদিন রাজ্যে বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল। কত লোকের প্রাণদণ্ড হল, কত লোকের নির্বাসন। কত অভিজাত বংশের সম্মানী লোক অন্য রাজ্যে আশ্রয় নিলে। এত বাধা পেয়েছিলে বলেই, আত্মাভিমানের তাড়নায় তোমার নির্বন্ধ এমন দুর্ধর্ষ হয়েছিল।

বিক্রম। দেবদত্ত, এই ইতিবৃত্ত আবৃত্তি করবার কী প্রয়োজন হয়েছে।

দেবদত্ত। মহারাজ, আমার আর কিছু সাধ্য নেই, আমি কেবল পারি বিপদ সামনে রেখে অপ্রিয় কথা তোমাকে শোনাতে। একদিন কেবলমাত্র অস্ত্রের যুক্তিতে প্রমাণ করতে চেয়েছিলে যে, এ রাজ্যে সকলেই ভুল করছে কেবল তুমি ছাড়া। বহু কণ্ঠ ছেদন করে রাজ্যের কণ্ঠরোধ করেছিলে। এতবড়ো প্রকাণ্ড অহংকারের প্রমাদ সংশোধন পরিশেষে তোমার পক্ষে দুঃসাধ্য হবে এ আমি জানি। সুতরাং স্বয়ং বিধাতাকে নিতে হল সেই ভার।

বিক্রম। এ কথার সহজ অর্থ, তোমরা বিদ্রোহ করবে?

দেবদত্ত। তুমি জান সে আমার অসাধ্য— দেবতা হয়েছেন বিদ্রোহী, রাজ্যে দুর্যোগ এল, কঠিন দুঃখে এর অবসান।

বিক্রম। দেবতার নাম নিচ্ছ আমাকে ভয় দেখাতে?

দেবদত্ত। মহারাজ, তোমাকে ভয় দেখানো কি একটা খেলা। তোমার ভয় আমাদের পক্ষে সব চেয়ে ভয়ংকর। তোলো তোমার দণ্ড, প্রথম আঘাত পড়ুক আমাদের 'পরে যারা তোমার একান্ত আপনার। তোমার অন্যায়কে যারা নিজের লজ্জা করে নিয়েছে, তোমার ক্রোধকে দুঃখরূপে নিক তারা মাথায় করে। দাও দণ্ড আমাকে।

বিক্রম। যদি নাই দিই?

দেবদত্ত। অগ্রসর হয়ে নেব। আজ আমাদের জন্যে আরাম নেই, সম্মান নেই। যাও মহারাজ, তুমি উৎসব করো। আমাকে রুদ্রভৈরবের পূজা করতেই হবে। মন্দিরে প্রবেশ করতে নাই দিলে— তাঁর পূজার আহ্বান আজ শুনতে পাচ্ছি সর্বত্র এই রাজ্যের বাতাসে।

বিক্রম। স্পষ্ট কথার ছলে আমাকে অপমান করতে চাও, আমার কথাও একদিন অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠবে— বিলম্ব নেই। [উভয়ের প্রস্থান

বিপাশার প্রবেশ

বিপাশা। শোনো শোনো, রাজকুমার শোনো।

নরেশের প্রবেশ

নরেশ। কী বলো।

বিপাশা। এই মালা তোমার, বীরের কণ্ঠের যোগ্য।

নরেশ। পরিচয় পেয়েছ?

বিপাশা। পেয়েছি।

নরেশ। এত সহজে?

বিপাশা। আমি অনাগতকে দেখতে পাচ্ছি।

নরেশ। কী দেখতে পেলে।

বিপাশা। জালন্ধরের রানীর সম্মান তুমি উদ্ধার করবে। চুপ করে রইলে কেন কুমার।

নরেশ। কথা বলবার সময় এখনো আসে নি।

বিপাশা। আমি বলি কথা বলবার সময় এখন চলে গেছে।

গান

আলোক-চোরা লুকিয়ে এল ওই,
তিমিরজয়ী বীর, তোরা আজ কই।
এই কুয়াশা-জয়ের দীক্ষা
কাহার কাছে লই।
মলিন হল শুভ্র বরন,
অরুণ সোনা করল হরণ,
লজ্জা পেয়ে নীরব হল
উষা জ্যোতির্ময়ী।
সুপ্তিসাগর-তীর বেয়ে সে
এসেছে মুখ ঢেকে,
অঙ্গে কালি মেখে।
রবির রশ্মি, কই গো তোরা,
কোথায় আঁধার-ছেদন ছোরা,
উদয়শৈলশৃঙ্গ হতে
বল্ মাভৈঃ মাভৈঃ॥

নরেশ। এ গান কোথায় পেলে বিপাশা?

বিপাশা। কাশ্মীরে মার্তণ্ডদেবের মন্দিরে আমরা এ গান গাই হেমন্তে গিরিশিখিরে যখন আলোকরাজ্যে অরাজকতা আসে।

নরেশ। এ গান আমাকে শোনালে যে?

বিপাশা। এখানকার ক্লিষ্ট আকাশে তুমিই আলোকের দূত। যাক মীনকেতুর বেদি ভেঙে, সেখানে তোমার আসন ধরবে না, রুদ্রভৈরবের নির্মাল্য আনব তোমার জন্যে। এখানে তিনি ভৈরব কাশ্মীরে তিনিই মার্তণ্ড, সেই দেবতাকে প্রসন্ন করো বীর। আজ সকালে আর্তত্রাণের জন্যে যে কৃপাণ খুলেছিলে একবার দাও আমার হাতে। (তলোয়ার কপালে ঠেকিয়ে) রুদ্রের তৃতীয় চক্ষুতে তুমিই অগ্নি, প্রভাতমার্তণ্ডের দীপ্ত দৃষ্টিতে তুমিই রৌদ্রচ্ছটা, বীরের হাতে তুমি কৃপাণ, তোমাকে নমস্কার।

জাগো হে রুদ্র জাগো।
সুপ্তিজড়িত তিমিরজাল
সহে না সহে না গো।
এসো নিরুদ্ধ দ্বারে
বিমুক্ত করো তারে,
তনুমনপ্রাণ ধনজনমান
হে মহাভিক্ষু, মাগো॥

রাজকুমার, ওই দেখো!

নরেশ। সেই আমার পদ্মের কুঁড়ি! এখনো রেখেছ?

বিপাশা। এ আজ কথা কয়েছে— কাশ্মীরের হৃদয় জেগেছে এর মধ্যে।

নরেশ। ওই আসছেন মন্ত্রীর সঙ্গে রাজা। আমাকে হয়তো প্রয়োজন আছে— তুমি মন্দির-প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করো।

[বিপাশার প্রস্থান

বিক্রম ও মন্ত্রীর প্রবেশ

বিক্রম। প্রজারা বিদ্রোহী? কোথায়।

মন্ত্রী। বুধকোটে সিংহগড়ে।

বিক্রম। ক্ষমার কথা বোলো না। অক্ষমের স্পর্ধা সব চেয়ে ক্ষমার অযোগ্য।

নরেশ। বস্তুত ওদের বিদ্রোহ বিদেশী সামন্তদের বিরুদ্ধে।

বিক্রম। তারা কি আমার প্রতিনিধি নয়।

নরেশ। তখন নয় যখন তারা নিজের স্বার্থ দেখে, প্রজার নয়, রাজার নয়। আমাকে আদেশ করো আমি প্রজাদের শান্ত করে আসি।

বিক্রম। তুমি! আমার শাসন আলগা করেছ তোমরাই। প্রজাদের প্রশ্রয়ে মহারানীর সঙ্গে যোগ দিয়েছ তুমিই, বিদেশীর প্রতি ঈর্ষা তোমার মতো এমন স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে কেউ সাহস করে নি। প্রতিহারী, মহারানী কোথায়। আমার আহ্বান এখনই তাঁকে জানাও গে। তিনি শুনুন তাঁর দয়াদৃপ্ত প্রজারা আজ বিদ্রোহ করেছে— ভীরুরা বিদ্রোহ করতে সাহস করেছে তাঁর ভরসায়। কিন্তু তিনি ওদের বাঁচাতে পারবেন? বিচার সর্বাগ্রে তাঁকেই গ্রহণ করতে হবে। এখনই, এখানেই। মন্ত্রী, তোমরা অপবাদ দিয়ে এসেছ আমার চিত্ত দুর্বল, রানীর প্রতি অন্ধ আমার প্রেম। আজ দেখাব তোমরা ভুল করেছ। তোমাদের মহারানীরও বিচার হবে। নির্বাসন দিতে পারি নে ভাবছ? আমাদের বংশ রামচন্দ্রের, সূর্যবংশ।

মন্ত্রী। মহারাজ।

বিক্রম। কী, বলো। স্তব্ধ হয়ে রইলে কেন?

মন্ত্রী। সামন্তরাজদের সৈন্যদল নিকটবর্তী। শিলাদিত্য তাদের সেনাপতি।

বিক্রম। সিংহাসনের প্রতি লক্ষ?

মন্ত্রী। হাঁ মহারাজ।

বিক্রম। প্রতিরোধের কী ব্যবস্থা করেছ।

মন্ত্রী। সৈন্য প্রস্তুত নেই, তাদের সকলকে বিশ্বাস করাও কঠিন।

নরেশ। আমাকে ভার দিন মহারাজ। দ্বিধা করবার সময় নেই। আমি সৈন্য প্রস্তুত করি গে।

বিক্রম। প্রতিহারী, মহারানী কোথায়।

প্রতিহারী। তিনি অন্তঃপুরে নেই।

বিক্রম। কোথায় তিনি। ভৈরবমন্দিরে?

প্রতিহারী। সেখানে দর্শন পাই নি।

বিক্রম। কোথায় তবে।

প্রতিহারী। দ্বারপাল বলে, ঘোড়ায় চড়ে তিনি উত্তরের পথে চলে গেছেন।

বিক্রম। অর্থ কী। রাজকুমার, তুমি নিশ্চয় জান কোথায় গেছেন তিনি।

নরেশ। কিছুই জানি নে মহারাজ।

বিক্রম। চলে গেছেন? বিদ্রোহী প্রজাদের উত্তেজিত করতে? ফিরিয়ে নিয়ে এসো, ধরে নিয়ে এসো, বেঁধে নিয়ে এসো শৃঙ্খল দিয়ে— স্বৈরিনী!

নরেশ। এমন কথা মুখে আনবেন না। আমরা সইতে পারব না।

বিক্রম। মূঢ় আমি! ধিক আমাকে! অন্ধ, দেখতেই পাই নি, সিংহাসনের আড়ালে বসে কাশ্মীরের কন্যা চক্রান্ত করছিলেন। স্ত্রীলোককে বিশ্বাস নেই, বিশ্বাস নেই। অন্তঃপুরে ওকে কে রাখবে! কারাগার চাই!

নরেশ। এমন পাপ চিন্তা করবেন না, মহারাজ!

বিক্রম। তোমরা সবাই আছ এর মধ্যে। তুমিও আছ, নিশ্চয় আছ। চলে গেছেন! আগে তোমাদের দণ্ড দিয়ে তবে আমার অন্য কাজ। দেবদত্ত কোথায়। কোথায় সেই বিশ্বাসঘাতক।

মন্ত্রী। বৃথা চঞ্চল হবেন না, মহারাজ। মহারানী মনকে শান্ত করতে গেছেন, নিশ্চয় আপনিই ফিরে আসবেন। অধীর হয়ে তাঁকে অপমান করলে চিরদিনের মতো তাঁকে আমরা হারাব।

বিক্রম। ফিরে আসবেন সে কি আমি জানি নে? আমাকে কেবল স্পর্ধা দেখিয়ে গেলেন। মনে করেছেন তাঁকে কাকুতি মিনতি করে ফেরাব। ভুল মনে করেছেন। আমাকে এমনি কাপুরুষ বলেই জানেন বটে! আমার পরিচয় পান নি। নিষ্ঠুর হবার প্রচণ্ড শক্তি আমার আছে। আমাকে ভয় করতে হবে— এইবার তা বুঝবেন।

দূতের প্রবেশ

দূত। উত্তরপথ থেকে মহারানীর এই পত্র।

বিক্রম। (পত্র পড়তে পড়তে) রাজকুমার নরেশ, সুমিত্রা এসব কী লিখেছেন। এর কী মানে।—"বিবাহের পূর্বে একদিন রুদ্রভৈরবকে আত্মনিবেদন করতে গিয়েছিলেম। তাঁরই বলি ফিরিয়ে নিয়ে এসে দিলেম তোমাকে, তোমার রাজ্যকে। ব্যর্থ হল, তুমিও পেলে না, তোমার রাজ্যও পেতে বাধা পেল।"

নরেশ। মহারাজ, তুমি তো জান, মহারানী আগুনে ঝাঁপ দিতে গিয়েছিলেন, পুরবাসীরা ফিরিয়ে এনে তোমার হাতে দিলেন।

বিক্রম। সেই আগুন যে সঙ্গে আনলেন, দগ্ধ করলেন আমাকে। এই লও নরেশ, পড়ো, আমার চোখে অক্ষরগুলি নৃত্য করছে, আমি পড়তে পারছি নে!

নরেশ। মহারানী লিখছেন, "আমি যাঁর কাছে নিবেদিত তাঁকে তাঁর অর্ঘ্য ফিরিয়ে দিতে চললেম। কাশ্মীরে ধ্রুবতীর্থে মার্তণ্ডদেব আমাকে গ্রহণ করবেন। রূপ দিয়ে তোমাকে তৃপ্ত করতে পারি নি, শুভকামনা দিয়ে তোমার রাজ্যের অকল্যাণ দূর করতে পারলুম না। যদি আমার তপস্যা সার্থক হয়, যদি দেবতাকে প্রসন্ন করি

তবে দূর হতে তোমাদের মঙ্গল করতে পারব। আমাকে কামনা কোরো না, এই তোমার কাছে আমার শেষ নিবেদন। আমাকে ত্যাগ করো, তোমাদের শান্তি হোক।"

বিক্রম। দেন নি, তিনি কিছুই দেন নি, সমস্ত ফাঁকি! নারী যে সুধা এনেছে আমার দীনতম প্রজারও ঘরে, আমি রাজ্যেশ্বর তার কণাও পাই নি— আমার দিন রাত্রি তৃষ্ণায় শুকিয়ে গেছে, সুধাসমুদ্রের তীরে বসে। নরেশ, আজ আমাকে কী করতে হবে বলো, আমি মন স্থির করতে পারছি নে।

নরেশ। মহারাজ, আমার কথা শোনো, তাঁকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা কোরো না।

বিক্রম। কী বললে! করব না চেষ্টা! বিশ্বের সামনে আমার পৌরুষ ধিক্‌কৃত হবে! আনো আগে তাঁকে ফিরিয়ে, তার পর সর্বসমক্ষে তাঁকে ত্যাগ করব। রাষ্ট্র-পালকে বলো তাঁকে আসুক বন্দী করে।

নরেশ। হবে না মহারাজ, সে হবে না, আমার প্রাণ থাকতে সে হতে দেব না।

বিক্রম। বিদ্রোহ?

নরেশ। হাঁ বিদ্রোহ! তুমি আত্মবিস্মৃত, তোমার অনুমোদন করে তোমার অবমাননা করতে পারব না। তোমার রাজ্যসীমা অতিক্রম করতে এখনো তাঁর তিন-চার দিন লাগবে। আমি নিজে যাব তাঁকে ফিরিয়ে আনতে।

বিক্রম। যাও, তবে এখনই যাও, শীঘ্র যাও। [নরেশের প্রস্থান

মন্ত্রী, তুমি ভাবছ, তাঁকে ক্ষমা করে ফিরিয়ে আনছি। একেবারেই নয়। রাজ-বিদ্রোহিণী তিনি, আমি নিজেই দিতেম তাঁকে নির্বাসন। আমার দণ্ড এড়িয়ে তিনি পালাচ্ছেন, এই আমার ক্ষোভ।

মন্ত্রী। মহারাজ, তাঁকে দণ্ড দেবার কথা বলে আমাদের সকলকে দুঃখ দিচ্ছেন। তিনি কাছে আসলেই দেখতে পাবেন তাঁকে দণ্ড দেবার সাধ্য আপনার নেই।

বিক্রম। তা হতে পারে, আমি মুগ্ধ। এ মোহপাশ যাক, যাক ছিন্ন হয়ে, আমি আনব না তাঁকে আমার কাছে। প্রতিহারী, রাজকুমার নরেশকে শীঘ্র ফিরিয়ে আনো। যেতে দাও, যেতে দাও, কাশ্মীরের কন্যাকে কাশ্মীরে ফিরে যেতে দাও।

মন্ত্রী। দাসের অনুনয় শুনুন মহারাজ। রাজকুমার নরেশ তাঁকে ফিরিয়ে আনুন, তার পরে আজকের দিনের এই ক্ষতবেদনা ভুলতে দেরি হবে না।

বিক্রম। মিনতি করে ফিরিয়ে আনা নয়, নয়, কিছুতেই নয়। একদিন যুদ্ধ করে তাঁকে জালন্ধরে এনেছি, পুনর্বার যুদ্ধ করেই তাঁকে জালন্ধরে ফিরিয়ে আনব।

মন্ত্রী। যুদ্ধ করে?

বিক্রম। হাঁ, যুদ্ধ করেই। কাশ্মীরের অভিমানে কাশ্মীরে চলেছেন— জালন্ধরের অপমান ঘোষণা করবেন! পদানত ধূলিশায়ী কাশ্মীরের চোখের উপর দিয়ে নিয়ে আসব তাঁকে বন্দিনী করে, যেমন করে দাসীকে নিয়ে আসে। এই কাশ্মীরের স্পর্ধা মনের মধ্যে গোপনে পোষণ করে এতদিন আমাকে উপেক্ষা করেছেন। এবার তলোয়ার দিয়ে তার মূল উৎপাটিত করে তবে আমি শান্তি পাব। মন্ত্রী, বৃথা তর্কের চেষ্টা কোরো না— এই মুহূর্তে সৈন্য প্রস্তুত করতে বলো গে।

মন্ত্রী। মহারাজ, ইতিমধ্যে তবে কি বিনা বাধায় বিদ্রোহী সামন্তরাজদের দেবে রাজ্য অধিকার করতে।

বিক্রম। না।

মন্ত্রী। তা হলে আপাতত এদের সঙ্গে যুদ্ধ সেরে তবে অন্য কথা।

বিক্রম। যুদ্ধ নয়।

মন্ত্রী। তবে?

বিক্রম। সন্ধি।

মন্ত্রী। মহারাজ কী বললেন, সন্ধি?

বিক্রম। হাঁ, সন্ধি করব। ওরাই হবে কাশ্মীর-অভিযানে আমার সঙ্গী।

মন্ত্রী। সন্ধি করবে! মহারাজ, ক্ষোভের মুখেই এমন কথা বলছ।

বিক্রম। তোমার মন্ত্রণা দেবার সময় চলে গেছে। এখন বিনা বিচারে আমার আদেশ পালন করো।

মন্ত্রী। তবু বলতে হবে। যা সংকল্প করেছ তাতে রাজ্যের সমস্ত প্রজা উন্মত্ত হয়ে উঠবে।

বিক্রম। উন্মত্ততা গোপন থাকলে স্থায়ী হয়ে থাকে— উন্মত্ততা প্রকাশ হলে তাকে দমন করা সহজ। সেজন্যে আমার কোনো চিন্তা নেই। দূতকে ডেকে পাঠাও। [উভয়ের প্রস্থান

কন্দর্পের পুষ্পমূর্তি ও পূজোপকরণ নিয়ে বিপাশা ও তরুণীগণের প্রবেশ

বিপাশা। গান

বকুলগন্ধে বন্যা এল দখিন হাওয়ার স্রোতে।

পুষ্পধনু, ভাসাও তরী নন্দনতীর হতে।

মহারাজা বলেছিলেন এইখান থেকে যাত্রারম্ভ হবে। মাধবীবিতানে তিনি আমাদের সঙ্গে যাবেন। কই, তাঁকে তো দেখছি নে।

প্রথমা। আমাদের গান শুনতে পেলেই দেখা দেবেন।

গান। অনুবৃত্তি

পলাশকলি দিকে দিকে
তোমার আখর দিল লিখে,
চঞ্চলতা জাগিয়ে দিল অরণ্যে পর্বতে।

দ্বিতীয়া। কিন্তু মহারাজ তো এলেন না— গোধূলিলগ্ন বয়ে যাচ্ছে। ওই তো দিগন্তে চাঁদের রেখা দেখা দিল।

বিপাশা। লগ্ন এলেই কী আর গেলেই কী, আমাদের তাতে কী আসে যায়। গান থামাস নে। মহারাজ বলেছেন উৎসবকে জাগিয়ে রাখতে, একটুও যেন ম্রিয়মাণ না হয়।

গান। অনুবৃত্তি

আকাশপারে পেতে আছে একলা আসনখানি,—
নিত্যকালের সেই বিরহীর জাগল আশার বাণী।
পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে
নবীন প্রাণের পত্র আসে,
পলাশ-জবায় কনকচাঁপায় অশোকে অশথে।

বিক্রমের প্রবেশ

বিপাশা। মহারাজ, সময় হয়েছে।

বিক্রম। হাঁ সময় হয়েছে— এবার ফেলে দাও এসব, দ'লে ফেলে দাও ধুলোয়।

প্রথমা। মহারাজ কী করলেন, এ-যে দেবতার মূর্তি।

বিক্রম। এমন অক্ষম, এমন ব্যর্থ, এমন মিথ্যা, ওকে বল দেবতা! বিড়ম্বনা! এই আমি ওকে পায়ের তলায় দলছি। দ্বারী।

দ্বারী। কী মহারাজ।

বিক্রম। নিবিয়ে দিতে বলে দাও এইসব আলোর মালা। দ্বারের কাছে বাজিয়ে দাও রণভেরী। [রাজা ও তরুণীগণের প্রস্থান

নরেশের প্রবেশ

নরেশ। বিপাশা, শুনে যাও।

বিপাশা। কী, বলো।

নরেশ। চলে গেলেন।

বিপাশা। কে চলে গেলেন।

নরেশ। আমাদের মহারানী।

বিপাশা। কোথায় চলে গেলেন।

নরেশ। জান না তুমি?

বিপাশা। না।

নরেশ। তিনি গেছেন একলা ঘোড়ায় চড়ে কাশ্মীরের পথে।

বিপাশা। বলো বলো, সব কথাটা বলো।

নরেশ। পত্র পাঠিয়েছেন তিনি আর ফিরবেন না। ধ্রুবতীর্থে মার্তণ্ডমন্দিরে আশ্রয় নেবেন।

বিপাশা। আহা, কী আনন্দ। মুক্তি এতদিন পরে!

নরেশ। বিপাশা, তাঁকে তো বাঁধতে কেউ পারে নি।

বিপাশা। শিকল পরাতে পারে নি, খাঁচায় রেখেছিল। পাখা বাঁধিয়ে দিয়েছিল সোনা দিয়ে। ধরতে গিয়ে তাঁকে হারাল। এই হারানোর কী অপূর্ব মহিমা। সূর্যাস্তরশ্মির পশ্চিমযাত্রা। কিন্তু এই অন্ধরা কি এর পুণ্যরূপের ছটা দেখতে পেলে।

নরেশ। আমরা যাব তাঁকে ফেরাতে। এতক্ষণে তিনি গেছেন নন্দীগড়ের মাঠের কাছে।

বিপাশা। যেয়ো না যেয়ো না, তিনি তোমাদের নন; তাঁকে পাও নি, পাবেও না। আজ ভাঙা-উৎসবের ভিতর দিয়ে তিনি ছাড়া পেলেন পাষাণের বুকফাটা নির্ঝরের মতো।

গান

প্রলয়-নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে
হে নটরাজ, জটার বাঁধন পড়ল খুলে।
জাহ্নবী তাই মুক্তধারায়
উন্মাদিনী দিশা হারায়,
সংগীতে তার তরঙ্গদল উঠল দুলে।
রবির আলো সাড়া দিল আকাশপারে।
শুনিয়ে দিল অভয়বাণী ঘরছাড়ারে।
আপন স্রোতে আপনি মাতে,
সাথি হল আপন সাথে,
সবহারা সে সব পেল তার কূলে কূলে॥

এই গান আমরা পাহাড়ে গাই বসন্তে যখন বরফ গলতে থাকে, ঝরনাগুলো বেরিয়ে পড়ে পথে-পথে। এই তো তার সময়— ফাল্গুনের স্পর্শ লেগেছে পাহাড়ের শিখরে শিখরে, হিমালয়ের মৌন গেছে ভেঙে।

নরেশ। খুব খুশি হয়েছ, বিপাশা?

বিপাশা। খুব খুশি আমি।

নরেশ। কোনো দুঃখই বাজছে না তোমার মনে?

বিপাশা। এমন সুখ কোথায় পাব, কুমার, যাতে কোনো দুঃখ নেই।

নরেশ। বন্ধন তো কাটল, এখন তুমি কী করবে।

বিপাশা। যাঁর সঙ্গে ঘরে ছিলাম তাঁর সঙ্গেই পথে বেরব।

নরেশ। তোমাকেও আর ফেরাতে পারব না?

বিপাশা। কী হবে ফিরিয়ে বন্ধু। হয়তো বাঁধতে গিয়ে ভুল করবে।

নরেশ। আচ্ছা যাও তুমি। আমার মন বলছে, মিলব একদিন। এখানে আমারও স্থান নেই।

বিপাশা। কেন নেই, কুমার।

নরেশ। মহারাজ স্থির করেছেন, কাশ্মীরে যুদ্ধযাত্রা করবেন— যুদ্ধে জয় করেই মহারানীকে ফিরিয়ে আনবেন।

বিপাশা। সেও ভালো। এমনি রাগ করেও যদি রাজার পৌরুষ জাগে তো সেও ভালো।

নরেশ। ভুল করছ বিপাশা। এ পৌরুষ নয়, এ অসংযম— ক্ষত্রিয়তেজ একে বলে না। যে উন্মত্ততায় এতদিন আপনাকে বিস্মৃত হতে লজ্জা পান নি এও সেই উন্মাদনারই রূপান্তর। কোনো আকারে মোহমাদকতা চাই, নিজেকে ভুলতেই হবে এই তাঁর প্রকৃতি। মীনকেতুরই কেতনে রক্তের রঙ মাখাতে চলেছেন— কল্যাণ নেই। আমাকেও যেতে হল কাশ্মীরে।

বিপাশা। লড়াই করতে?

নরেশ। মহারানীকে এই কথা জানাতে যে, যারা কাশ্মীরে যুদ্ধ করতে এসেছে তারা জালন্ধরের আবর্জনা, তাদের পাপে আমাদের সকলকে যেন তিনি অপরাধী না করেন।

বিপাশা। যাবে তুমি? সত্যি যাবে?

নরেশ। হাঁ, সত্যি যাব।

বিপাশা। তবে আমিও তোমার পথের পথিক।

নরেশ। তা হলে এ পথের অবসান যেন কখনো না হয়।

বিপাশা। তুমি আর ফিরবে না?

নরেশ। ফেরবার দ্বার বন্ধ। রাজা আমাকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছেন। অন্ধ সংশয়ের হাতে যেখানে রাজদণ্ড, রাজার বন্ধুদের স্থান সেখান হতে বহুদূরে।

[উভয়ের প্রস্থান

৩

কাশ্মীর

১। সর্বনাশ! বল কী!

২। চলো, আর দেরি নয়।

১। ঠিক জান তো?

২। তরাইয়ে গিয়েছিলুম ভালুকের চামড়া বেচতে— স্বচক্ষে দেখে এলুম জালন্ধরের সৈন্য। আর দেখলুম ধনদত্তকে, চন্দ্রসেনের দূত। দুই পক্ষে বোঝাপড়া চলছে।

১। ওদের পথ আগলানো হবে না?

২। কে আগলাবে। খুড়োমহারাজ নিজের পথ খোলসা করছেন। এবার আমরা প্রজারা মিলে যেদিন যুবরাজকে রাজা করতে দাঁড়িয়েছি, এমনি অদৃষ্ট, ঠিক সেইদিনেই এসে পড়ল বিদেশী দস্যু। খুড়োরাজা এবার কাশ্মীরের রাজছত্রের উপর জালন্ধরের ছত্র চড়িয়ে সিংহাসনে নিজের অধিকার পাকা করে নিতে চেষ্টা করছেন।

১। কিন্তু দেখো বলভদ্র, এ সংবাদ এখন প্রচার করে অভিষেক ভেঙে দিয়ো না। এখানকার অনুষ্ঠান চলতে থাক্‌, আজকের মধ্যেই সমাধা হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে আমরা যা করতে পারি করি গে। রণজিৎকে পাঠাও পত্তনে। আর জটিয়াতে খবর দাও কাঠুরিয়াপাড়ায়— আমি চললেম রঙ্গীপুরে। ঘোড়া যার যতগুলো পাওয়া যায় ধরে আনা চাই। পাঁচমুড়ির মহাজনদের গমের গোলা আটক করতে হবে— অন্তত দু মাসের যুদ্ধের খোরাক দরকার।

২। এবার আমরা মরি আর বাঁচি ওই পিশাচের অভিপ্রায় কিছুতেই সিদ্ধ হতে দেব না। কুমারের অভিষেক আজ সম্পন্ন হওয়াই চাই। তার পর থেকেই

চন্দ্রসেনকে রাজবিদ্রোহী বলে গণ্য করব। ওরে, তোরা তোরণে দেবদারুশাখার মালাগুলো শীঘ্র খাটিয়ে দে। ভেরীওয়ালাকে বল্‌-না বাজিয়ে দিতে ভেরী।

১। সবাই এসে জড়ো হোক। এই-যে মহীপাল— তোমাকে অত্যন্ত দরকার।

মহীপাল। কেন, কী হয়েছে।

২। সে কথা এখানে বলা চলবে না। চলো ওই দিকে। দেরি কোরো না।

১। এইমাত্র একটা খবর পেয়েছি, চন্দ্রসেন এই দিকে আসছেন। বোধ করি অভিষেক ভেঙে দিতে।

২। না, আমার বিশ্বাস, কৌশলে যুবরাজকে সতর্ক করে দিতে। চন্দ্রসেন আর সব করতে পারে কিন্তু কুমারকে ওরা বন্দী করে নিয়ে যাবে এ তিনি কখনোই সইবেন না। কিন্তু চল্‌, আর দেরি না। [সকলের প্রস্থান

আর-এক দল

১। ব্যাপারখানা কী ভাই।

২। আকাশ থেকে পড়লে নাকি।

১। সেইরকমই তো বটে। দুঃখের কথাটা বলি। জান তো পেটের দায়ে একদিন ঢুকেছিলুম খুড়োরাজার প্রহরীর দলে। খুব মোটা মাইনে নইলে ওঁর কাজে লোক আসতে চায় না। স্ত্রীর গায়ে গহনা চড়ল— কিন্তু লজ্জায় সে ইঁদারায় জল আনতে যাওয়া বন্ধ করলে। আমাদের পাড়ায় থাকে কুন্দন; সকলের নামে সে ছড়া কাটে। সে আমার নাম দিলে খুড়ো-গণেশের খুড়তুতো ইঁদুর। শুনে দেশসুদ্ধ লোক খুব হাসলে, আমি ছাড়া।

৩। বাহবা, ঠিক নামটা বের করেছে তোদের কুন্দন। দেশে খুড়তুতো ইঁদুরের বাড়াবাড়ি হতে চলল। ঘরের ভিত পর্যন্ত ফুটো করে দিলে রে, দাঁত বসাচ্ছে সব-তাতেই, এইবার ওদের গর্তে লাগাব আগুন। তার পরে বুদ্ধু, পিঠে গণেশঠাকুরের শুঁড়-বুলোনি সইল না বুঝি।

১। অনেকদিন অনেক সহ্য করলুম। শেষকালে যেদিন খুড়োরাজা খুশি হয়ে আমাকে প্রহরীশালার সর্দার করে দিলে— সেইদিন পথের মধ্যে দেখা আমার ছোটোশালীর সঙ্গে। জান তাকে—

২। জানি বৈকি। ওই তোদের রূপমতী, খাসা মেয়ে রে! তোদের ছড়া-কাটিয়ে তাকেই তো বলে মৃত্যুশেল।

১। সে আমাকে দেখে বাঁ পা দিয়ে মাটিতে এক লাথি মারলে, ধুলো উড়িয়ে দিলে, পায়ের মল ঝম ঝম করে উঠল— মুখ বাঁকিয়ে চলে গেল। আর সইল না।

৩। হা হা হা হা! রাজা পায়ের এক ঘায়ে খুড়তুতো ইঁদুরের লেজ গেল কাটা!

১। দিলেম ফেলে আমার পাগড়ি প্রহরীশালার দ্বারে, চলে গেলেম উত্তরে মালখণ্ডে। গ্রীষ্মভোর ছাগল চরাই, শীতকালে রাজধানীতে নিয়ে আসি; কম্বল বিক্রি করি। পণ করেছি যখন হাতে কিছু টাকা হবে, পাগড়িতে লাগাব সোনার পাড়— যাব আমার শ্যালীর বাড়িতে, সেই বাঁ পায়ের লাথিটা সে ফিরিয়ে নেবে, তবে অন্য কথা। এই কথাই ভাবতে ভাবতে আসছিলেম ছাগলের পাল নিয়ে, যাচ্ছিলেম রাজধানীর দিকে। পথের মধ্যে একদল লোক ছাগলসুদ্ধ আমাকে হৈঃ হৈঃ শব্দে খেদিয়ে নিয়ে এল এইখানে, বললে এই আমাদের রাজধানী এইখানে—এই উদয়পুরে।

২। মূর্খ, মনে রাখিস, আজ থেকে এর নাম উদয়পুর নয়, কুমারপুর।

১। মনে রাখা শক্ত হবে ভাই, এখানে আমার দাদাশ্বশুরের বাড়ি, চিরদিন জানি—

৩। ভাবনা কী, নতুন রাজত্বে তোর দাদাশ্বশুরের নাম নতুন করে দেব।

১। তা যেন দিলে, কিন্তু আমার ছাগলের মহাজন থাকে সেইখানটাতে যাকে রাজধানী বলে জানতুম। সে লোকটার কাছে দেনাও আছে পাওনাও আছে। নইলে তারও নাম বদল করে দিলে খুশি হতুম।

২। আচ্ছা বেশ, খুড়োরাজের রাজত্বকালের দেনাটা কুমাররাজের রাজত্বকালে মাপ করে দেওয়া গেল।

১। আর পাওনাটা?

২। সেটা পরে দেখা যাবে— সময়মতো।

১। পেটের তাগিদ সময় মানবে না, দাদা। তা যাই হোক, তোদের মুখের কথায় রাজধানী তৈরি হয় না তো ভাই, সেরকম চেহারা দেখছি নে।

৩। সবই কি চোখে দেখতে হয়। মনে-মনে দেখ্।

১। কিন্তু ছাগলের দামটা মনে-মনে পেলে আমার চলবে না। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলো, দাদা।

৩। তবে শোন্, কুমার এলেন তীর্থ থেকে, তবু খুড়োমহারাজ সিংহাসন আঁকড়েই রইলেন। দেখলুম, টানাটানি করতে গেলে রক্তারক্তি হবে। ঠিক করেছি এখানেই যুবরাজের রাজধানী বসিয়ে তাঁকে রাজা করব। আজই অভিষেক।

১। এই আখরোটের বনে?

২। কোথাকার গোঁয়ার এটা ? রাজা যেখানেই বসবেন সিংহাসন সেইখানেই। আর তোকে যদি ইন্দ্রের আসনেও বসাই তার তলা থেকে ছাগল ডাকতে থাকবে রে।

১। না ডাকলেও সুখ হবে না ভাই, মন কেমন করবে। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি নে। ছিলেন এক রাজা, হলেন দুই রাজা, ভার সইবে ? এক ঘোড়ার দুই সওয়ার, লেজের দিকে লাগাম টানবে একজন, মুখের দিকে আর-একজন, জন্তুটা চলবে কোন্‌ রাস্তায়।

২। ওরে, জন্তুটার চেয়ে মুশকিল হবে সওয়ারের— যিনি থাকবেন লেজের দিকে তাঁকে আপনিই খসে পড়তে হবে। বুঝতে পেরেছিস ?

১। অনেকখানি বোঝা বাকি আছে। লেজের মানুষটা খসে পড়বার আগে খাজনা দেব কাকে।

৩। খাজনা দিতে হবে মহারাজ কুমারসেনকে।

১। তার পরে ?

৩। তার পরে আর কিছুই নেই।

১। খুড়োমহারাজ তো সিংহাসনে বসে উপোস করবার ব্রত নেন নি। যখন খিদে চড়ে যাবে তখন ?

২। সে কথা খুড়োমহারাজ চিন্তা করবেন। আমরা সবাই পণ করেছি খাজনা দেব মহারাজ কুমারসেনকে, আর কাউকে নয়।

১। ঠিক বলছ দাদা, সবাই পণ করেছ ?

২। হাঁ, সবাই।

১। বরাবর দেখে আসছি তোমরা মোড়লরা পিছন থেকে চেঁচিয়ে বল, বাহবা, আর সামনে থেকে মাথায় বাড়ি পড়ে আমাদেরই। ঠিক বলছ, সবাই খাজনা দেবে কুমার-মহারাজকে, কেউ পিছবে না ?

৩। কেউ না, কেউ না। আজ মহারাজের পা ছুঁয়ে শপথ গ্রহণ করব।

১। এ কথা ভালো। মার তো কপালে লেখাই আছে। একলা খাই সেইটেই দুঃখ। দেশ জুড়ে মারের ভোজ বসে যায় যদি, পাত পাড়তে ভয় করি নে।

২। এই রইল কথা ?

১। হাঁ, রইল।

৩। পিছোবি নে ?

১। পিছোবার রাস্তাটা তোমরাই খোলসা রাখ, সে রাস্তা আমরা খুঁজেই পাই নে।

৩। ওরে বোকা, মরতে পারি নে, তা নয়, কিন্তু আমরা মলে তোদের দশা কী হবে।

১। আমাদের অন্ত্যেষ্টিসংকারটা বন্ধ থাকবে।

একদল স্ত্রীলোকের প্রবেশ

প্রথমা। রাজার অভিষেকের সময় হল?

২। না, এখনো দেরি আছে। তোমরা প্রস্তুত আছ তো?

প্রথমা। আমাদের জন্যে ভেবো না গো, ভেবো না। তোমাদের পুরুষের মধ্যেই দেখি কেউ বা এগোন কেউ বা পিছোন। কেউ বলছেন সময় বুঝে কাজ, কেউ বলছেন কাজ বুঝে সময়। মাঝের থেকে সময় যাচ্ছে চলে।

দ্বিতীয়া। দেখে এলেম তোমাদের ন্যায়বাগীশ এখনো বসে তর্ক করছেন, যিনি রাজা তিনি সিংহাসনে বসেন, না, যিনি সিংহাসনে বসেন তিনিই রাজা। এই নিয়ে দুই পক্ষে মাথা-ভাঙাভাঙি চলছে আমাদের পাড়ায়। মেয়েরা কাল সমস্ত রাত ধরে সাজিয়েছে মাঙ্গল্যের ডালা।

তৃতীয়া। ভোর থেকে যে-যার গ্রাম থেকে সব বেরিয়ে পড়ল।

১। আর লজ্জা দিয়ো না আমাদের। এ কথা মেনে নিচ্ছি মেয়েদের মতো পুরুষ মেলে না। তোমাদের গানের দল আছে তো?

দ্বিতীয়া। হাঁ, তারা এল বলে।

২। তোমাদের উমিচাঁদের মেয়ে?

তৃতীয়া। সেই তো সব দল ডেকে আনছে।

২। নন্দপল্লীর উপযুক্ত মেয়ে বটে। সেদিন বিতস্তার ঘাটে আমাদের করমচাঁদ গিয়েছিলেন তাকে গোটা দুয়েক মিঠে কথা বলতে। কঙ্কণের এক ঘা খেয়েই মুখ বন্ধ।

প্রথমা। জান না বুঝি, সে বলেছে বেত্রবতী নাম নেবে— কুমার মহারাজের সিংহাসনের পশ্চাতে থাকবে তার পরিচারিকা হয়ে।

১। দাদা, তা হলে আমি ছাগল-চরানোর ব্যাবসা ছেড়ে দিয়ে রাজার ছত্রধর হব।

২। ওরে বুদ্ধু, এই খানেক আগেই তোকে দোমনা দেখেছি, একমুহূর্তে রাজভক্তি ভরপুর হয়ে উঠল কিসে।

১। এক আগুন থেকে আর-এক আগুন জ্বলে।

৩। তুই তো ছাগল চরাতে গিয়েছিলি, উত্তরখণ্ডের খবর কিছু এনেছিস ?

১। কাউকে যদি না বলো তো বলি।

৩। ভয় কিসের। বলে ফেল্ না।

১। বললে না প্রত্যয় যাবে স্বয়ং রানী সুমিত্রাকে দেখেছি ভৈরবীবেশে চলেছেন ধ্রুবতীর্থে।

২। পাগল রে !

প্রথমা। না গো, উনি মিথ্যা বলছেন না। আমিও শুনেছি বটে। কাউকে বলতে সাহস করি নি।

৩। কার কাছে শুনলে।

প্রথমা। ওই যে আমার ভাসুরঝি মন্দাকিনী। তীর্থ করে ফিরে আসছিল। পথে দেখা। রাজকুমারী চলেছেন মার্তণ্ডদেবের উপাসিকার দীক্ষা নিতে।

২। বিশ্বাস করি কী করে। বুদ্ধু, তোর সঙ্গে কথা হল কিছু ?

১। প্রণাম করে বললুম, তুমি আমাদের রাজকুমারী সুমিত্রা। তিনি বললেন, আমার নাম তপতী। জানিস তো সেই অপরূপ রূপ। সেই লাবণ্য যেন আগুনের স্নান করে এল। বললেম, দেবী, চরণের সেবক হয়ে যাই সঙ্গে। তিনি নীরবে তর্জনী তুলে ফিরে যেতে ইঙ্গিত করলেন।

৩। দুর্গম তীর্থে রাজকুমারী একলা চলেছেন, তুই এখানে এসে রাজবাড়িতে জানালি নে ?

১। দুই-একজনকে জানাতে গিয়েছিলেম— আমাকে মারে আর কি। বলে, আমি নেশা করেছি !

আর-একজনের প্রবেশ

৪। কিছুতে রাজি হল না।

২। কার কথা বলছ।

৪। আমাদের সভাকবি দর্দুর। খুড়োমহারাজের আশ্রয় ছাড়তে সাহস করল না। আজ অভিষেকে কোনোরকমের একটা সভাকবি চাই তো।

৩। চাই বৈকি। আজকের মতো রীতরক্ষা করে তার পরে সংক্ষেপে বিদায় করলেই হবে।

৪। জোগাড় করেছি একটি। মনু তাকে নিয়ে আসছে। বিদেশী, যাচ্ছে ধ্রুবতীর্থে, সঙ্গে নারী আছে।

৩। এর থেকেই ঠাওরালে সে কবি ?

৪। দেখলেম, গাছতলায় বসে মেয়েটি গান গাচ্ছে আর সে বাজাচ্ছে একতারা। মুখ দেখেই সন্দেহ হল লোকটা আর কিছুই না পারুক, গান বানাতে পারে। সিধে গিয়ে বললুম, তুমি কবি, চলো রাজার অভিষেকে। প্রথমটা কিছুতেই মানতে রাজি নয়। ভাবলে তাকে পাগল বললুম, না বোকা বললুম। সঙ্গের মেয়েটি বলল, হাঁ, ইনি কবি বৈকি, নিশ্চয় কবি, অভিষেকে যেতে হবেই তো। অমনি মানুষটা জল হয়ে গেল— আর 'না' বলবার জো রইল না।

৩। 'না' বলবার মতো মেয়েটি নয় বোধ করি।

৪। একেবারেই না। দেখলেম দিব্যি বশ মেনেছে। মেয়েটি যদি বলত, চলো, লড়াই করবে, তবে তখনই ছুটত লড়াই করতে, কবিতা লেখা তো সামান্য কথা।

২। শুনে বুঝছি, লোকটি কবি। মনে তো আছে, আমাদের ধরণীদাস। গৌরীতরাইয়ের নথনি বুনত শাল, ধরণী আস্তে আস্তে এসে দাঁড়াত তার আঙিনার কোণে। আর সে দিত তার কুণ্ডল ঝুলিয়ে ঝংকার, তারই চোটে ধরণী সাত খাতা জুড়ে ছড়া লিখছে। খেতুলাল, তুই ধরেছিস ঠিক, লোকটা কবি।

৪। হোক, বা না হোক, চেহারায় মানাবে। ওই-যে আসছে।

মন্নুর সঙ্গে নরেশ ও বিপাশার প্রবেশ

বিপাশা। (নরেশের প্রতি) কবি নরোত্তম, এঁদের বঞ্চিত কোরো না। তোমাকে গান গাইতে বলতে সাহস পাই নে। কিন্তু আমি তো তোমারই শিষ্যা, যথাসময়ে আমাকে অনুমতি কোরো, আমি গাইব।

নরেশ। তোমার ভক্তিতে আমি প্রীত। ভালো, অনুমতি করছি, গাও তুমি।

বিপাশা। সে কি প্রভু, এখনই? এখনো তো সময় হয় নি।

নরেশ। এতদিনেও আমার কাছে এ শিক্ষা হল না যে, গানের অসময় নেই?

১। কবি অন্যায় বলেন নি। ওই দেখো-না, লোক জড়ো হয়েছে। সময় হল।

বিপাশা। গান

দিনের পরে দিন-যে গেল আঁধার ঘরে,
তোমার আসনখানি দেখে মন-যে কেমন করে।
ওগো বঁধু, ফুলের সাজি
মঞ্জরীতে ভরল আজি,
ব্যথার হারে গাঁথব তারে রাখব চরণ 'পরে।

পায়ের ধ্বনি গনি গনি রাতের তারা জাগে।
উত্তরীয়ের হাওয়া এসে ফুলের বনে লাগে।
ফাগুনবেলার বুকের মাঝে
পথ-চাওয়া সুর কেঁদে বাজে,
প্রাণের কথা ভাষা হারায় চোখের জলে ঝরে॥

১। হায় হায়, খাঁটি কবি বটে রে। ছেড়ে দেওয়া হবে না। দাদাশ্বশুরের আটচালায় এক কোণে জায়গা করে দেব।

২। কবি, রচনা তোমারই বটে তো? ভণিতা নেই কেন। আমাদের বংশীলাল খুব লম্বা করেই ভণিতা লাগায়।

নরেশ। ভণিতার সম্পর্ক রাখি নে। আমি জানি গান যে গায় গান তারই। গানটা আমার কি তোমার, এই অত্যন্ত বাজে প্রশ্ন যদি না ভুলিয়ে দিলে তা হলে সে গান গানই নয়।

৩। কিন্তু দেখো কবি, আমার কেমন মনে হচ্ছে এ গান আমি পূর্বে শুনেছি এই কাশ্মীরেই।

নরেশ। বড়ো খুশি হলুম এ কথা শুনে। তুমি রসিক লোক। ভালো গান শুনলেই মনে হয় এ গান আগেই শুনেছি।

৩। মনে হচ্ছে আমাদের কবি শশাঙ্ক যেন ওইরকমের একটা—

নরেশ। কিছুই অসম্ভব নয়, কোনো কোনো কবি থাকেন যাঁর রচনা ঠিক অন্য লোকের রচনার মতোই হয়।

৩। কবি, ইচ্ছে করছে তোমাকে একটা মালা দিই।

নরেশ। মালা আমি নিই নে। আমার গান যাঁর কণ্ঠে, আমার মালাও তাঁরই কণ্ঠে পড়ে।

৪। সে তো ভালো কথা। উনি মালা পরার যোগ্য বটেন। হাঁ গা, তোমাদের ডালিতে তো মালা অনেক আছে, একখানা দাও-না ওঁকে পরিয়ে দিই।

প্রথমা। হাঁ, দিলাম বলে!

৪। ভালোমানুষের ঝি, দিলে দোষ কী।

দ্বিতীয়া। তোমরা দোষ দেখতে পাবে কেন। পথে ঘাটে মালা পরিয়ে বেড়ানো তোমাদের স্বভাব যে।

৩। মাসি, রাগ কর কেন?

দ্বিতীয়া। আর 'মাসি' 'মাসি' করতে হবে না।

৩। আচ্ছা, ছাড়লেম মাসি বলা, যা বললে খুশি হও তাই বলব। আপাতত একখানা মালা দাও-না, ওঁকে পরিয়ে দিই।

তৃতীয়া। তোমরা কি লজ্জার মাথা খেয়ে বসেছ! কোথাকার কে তার ঠিক নেই, রাজার অভিষেকের মালা দিতে হবে! এত সস্তা নয় গো।

১। ও-কথা বোলো না দিদিশাশুড়ি, রাজা থাকলে স্বয়ং ওকে মালা দিতেন।

দ্বিতীয়া। ভরতভলির লোক, তোমাদের ব্যাভারটা কী রকম গো। ওকে দিদিশাশুড়ি বল কোন্ সম্পর্কে। ও আমার বোনঝি।

১। মাসি বলতে সাহস হল না। ভাবলুম দাদাশ্বশুরের গ্রামে থাকে, ওই সম্পর্কের নামটা বেমানান হবে না।

প্রথমা। ওই-যে রাজা আসছেন শিবির থেকে। এখনো তো সময় হয় নি। এরা সব গান গেয়ে উৎপাত করে ওঁকে বের করে আনলে।

সকলে। জয়, মহারাজ কুমারসেনের জয়!

কুমারসেনের প্রবেশ

কুমার। শীঘ্র আমার অশ্ব প্রস্তুত করো।

৩। কবি, ধরো ধরো, একটা গান ধরো শিগগির।

বিপাশা। গান

তোমার আসন শূন্য আজি, হে বীর পূর্ণ করো,
ওই যে দেখি বসুন্ধরা কাঁপল থরোথরো।
বাজল তূর্য আকাশপথে,
সূর্য আসেন অগ্নিরথে,
এই প্রভাতে দখিন হাতে বিজয়খড়্গ ধরো।
ধর্ম তোমার সহায়, তোমার সহায় বিশ্ববাণী।
অমর বীর্য সহায় তোমার, সহায় বজ্রপাণি।
দুর্গম পথ সগৌরবে
তোমার চরণচিহ্ন লবে,
চিত্তে অভয়বর্ম তোমার বক্ষে তাহাই পরো॥

কুমারসেন। (বিপাশাকে ইঙ্গিতে কাছে ডেকে) হঠাৎ এখানে এলে যে।

বিপাশা। ছুটি পেয়েছি যুবরাজ।

কুমারসেন। সুমিত্রা?

বিপাশা। সে বন্দিনীও ছুটি পেয়েছে।

কুমারসেন। মৃত্যু?

বিপাশা। না, নূতন প্রাণ।

কুমারসেন। অর্থ কী, বুঝিয়ে দাও।

বিপাশা। জালন্ধর ছেড়েছেন তিনি। গেছেন ধ্রুবতীর্থে, উপাসিকার দীক্ষা নেবেন।

কুমারসেন। তোমার কথাটাকে এখনো মনের মধ্যে ঠিক নিতে পারছি নে।

বিপাশা। যুবরাজ, সুমিত্রাকে তো চেনো। সূর্যের তপস্যা সেই জ্যোতির্ময়ী ছাড়া কে গ্রহণ করতে পারে আজকের দিনে। আলোকের দূতী যারা, ভোগের ভাণ্ডারে তাদের বন্ধন রুদ্রদেব সহ্য করতে পারেন না।

কুমারসেন। আর জালন্ধররাজ বুঝি শৃঙ্খল হাতে নিয়ে ছুটেছেন।

বিপাশা। মাটির বাঁধ দিয়ে নদীকে বেঁধে তার স্রোতকে রাজভাণ্ডারে জমা করবার জন্যে; তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করো আমার ওই পথের সঙ্গীকে।

কুমারসেন। তোমার পথের সঙ্গী?

বিপাশা। হাঁ যুবরাজ, আমার পথের সঙ্গী। চুপ করে রইলে! এর থেকে বুঝছি তুমি বুঝেছ। এর উপরে কথা চলে না।

কুমারসেন। এতদিনে বন্ধন গ্রহণ করলে, বিপাশা?

বিপাশা। বিপাশা সিন্ধুনদীতে মিলেছে, সে মুক্তধারার মিলন।

কুমারসেন। ওঁর নামটি বলো।

বিপাশা। ওঁর নাম নরেশ। রাজা বিক্রমের বৈমাত্র ভাই। ডেকে আনছি।

কুমারসেন। নমস্কার, রাজকুমার।

নরেশ। নমস্কার।

কুমারসেন। তোমার মতো অতিথিকে পেয়ে আমার আজকের দিন সার্থক।

নরেশ। আমি আমার মহারানীর অনুবর্তী— তীর্থযাত্রী আমি, পথের অতিথি। তোমার দ্বারে আজ যে-অতিথি অনাহূত এসেছেন, তাঁর সংবাদ পেয়েছ? প্রস্তুত হয়েছ তো?

কুমারসেন। এই মাত্র সংবাদ পেয়েছি। আয়োজন নেই, কিন্তু আহ্বান করতে হবে। বিশেষ করে আমারই সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের কারণ কী ঘটেছে তা এখনো পর্যন্ত বুঝতেই পারি নি।

নরেশ। কারণের প্রয়োজন হয় না। অন্ধ বিদ্বেষ অন্ধ ঈর্ষা বাইরে থেকে পথ

খোঁজে না, স্বভাবের ভিতরেই তার আশ্রয়। তোমার মর্যাদা উনি সহ্য করতে পারেন না, তার অহৈতুক উত্তেজনা ওঁর দীনতার মধ্যে। এ যে বিধাতার অভিশাপ। তার উপরে উনি মনে-মনে সন্দেহ করেন মহারানী সুমিত্রা তোমার প্রশ্রয় পেয়েছেন বা তোমার প্রশ্রয় প্রার্থনা করতে এসেছেন।

কুমারসেন। এতদিনেও কি জানেন না সুমিত্রার পক্ষে তা অসম্ভব।

নরেশ। জানবার শক্তি যদি থাকত তা হলে হারাবার দুর্ভাগ্য তাঁর ঘটত না।

ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ

পুরোহিত। মহারাজ, অভিষেকের কাজ এখনই আরম্ভ করা কর্তব্য। মনে হচ্ছে বিলম্বে বিঘ্ন হতে পারে। নানাপ্রকার জনশ্রুতি শোনা যাচ্ছে।

কুমারসেন। অভিষেকের কাজ সংক্ষিপ্ত করো। বিলম্ব সইবে না।

পুরোহিত। চলো তবে মহারাজ, ওই অশ্বত্থবেদিকায়। সকলে জয়ধ্বনি করো।

তুরী ভেরী শঙ্খধ্বনি

সকলে। জয় মহারাজাধিরাজ কাশ্মীরাধিপতির জয়!

কুমারসেন। বাহিরে ওই কিসের কোলাহল।

অনুচরদের প্রবেশ

অনুচর। খুড়োমহারাজ হঠাৎ উপস্থিত। প্রহরীরা বলছে প্রাণ থাকতে তাঁকে এখানে প্রবেশ করতে দেবে না। তারা লড়াই করে মরতে প্রস্তুত। আদেশ করো মহারাজ।

কুমারসেন। শান্ত করো প্রহরীদের। খুড়োমহারাজকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এসো।

[অনুচরদের প্রস্থান

বিপাশা। আমরা তবে প্রচ্ছন্ন হই। [নরেশ ও বিপাশার প্রস্থান

চন্দ্রসেনের প্রবেশ

একদল। কোথায় চলেছ চন্দ্রসেন। পাষণ্ড, কপট। কোথায় যাও বিশ্বাস-ঘাতক। ওকে বন্দী করো।

কুমারসেন। থামো তোমরা। এ কেমন বুদ্ধি তোমাদের। উনি এসেছেন বিশ্বাস করে আমার কাছে।

চন্দ্রসেন। কিছু ভয় নেই, বৎস, শুধু বিশ্বাসের উপর ভর করে আসি নি। ওদের যদি অপঘাতমৃত্যুর ইচ্ছা থাকে নিরাশ করব না।

কুমারসেন। প্রণাম পিতৃব্যদেব। আমার অভিষেকমুহূর্ত তোমার সমাগমে সার্থক হল। আমাকে আশীর্বাদ করো।

চন্দ্রসেন। সে পরে হবে। সময় একটুও নেই। কেন এসেছি শোনো। সহসা জালন্ধররাজ সসৈন্যে কাশ্মীরে উপস্থিত।

কুমারসেন। শুনেছি সে সংবাদ। অভিষেকের কাজ সত্বর সমাধা করব।

চন্দ্রসেন। থাক্ এখন অভিষেক। অবিলম্বে চলো তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করবে।

কুমারসেন। আত্মসমর্পণ! যুদ্ধ নয়?

চন্দ্রসেন। সৈন্য কোথায় তোমার।

কুমারসেন। কেন। রাজধানীতে সৈন্যের অভাব নেই।

চন্দ্রসেন। সে তো এখনো তোমার নয়।

কুমারসেন। কিন্তু কাশ্মীরের তো বটে!

চন্দ্রসেন। বিক্রম তো কাশ্মীর চান না, তোমাকেই চান।

কুমারসেন। আমার মান-অপমান কী কাশ্মীরের নয়।

চন্দ্রসেন। কী বল তুমি! এ তো সামান্য আত্মীয়কলহ। দাও তাঁর কাছে ধরা, চাও তাঁর স্নেহ ও ক্ষমা, হাসিমুখে সমস্ত নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।

কুমারসেন। খুড়োমহারাজ, তর্ক করবার সময় নেই, শেষবার জিজ্ঞাসা করি— রাজধানী থেকে সৈন্য পাব না?

চন্দ্রসেন। রাজধানী! বিদ্রূপ করছ? শুনেছি ওই আখরোটবনেই কাশ্মীরের রাজধানী। তোমার আদেশ এইখান থেকেই ঘোষণা কোরো। আমাকে তো কোনো প্রয়োজন নেই। আমি বিদায় হই। [প্রস্থান

সকলে। ধিক্ ধিক্। নিপাত যাও। কোটি জন্ম তোমার নরকবাস হোক। সিংহাসনের কীট, সিংহাসনকে জীর্ণ করে তার ধূলির মধ্যে তোমার বিলুপ্তি ঘটুক।

কুমারসেন। স্তব্ধ হও। শোনো। জালন্ধর কাশ্মীর আক্রমণে এসেছেন, আমাকে একলা লড়তে হবে।

সকলে। মহারাজ, ন্যায় তোমার পক্ষে, ধর্ম তোমার পক্ষে, সমস্ত কাশ্মীরের হৃদয় তোমার পক্ষে। জয় মহারাজা কুমারসেনের জয়! ধিক্ ধিক্ চন্দ্রসেনকে শত শত শত ধিক্।

কুমারসেন। চুপ করো, বৃথা উত্তেজনায় বলক্ষয় কোরো না। এখনই যাও সৈন্য সংগ্রহ করো গে।

সকলে। আর অভিষেক?

কুমারসেন। নাইবা হল অভিষেক।

সকলে। সে হবে না, মহারাজ, সে হবে না। চন্দ্রসেনের চক্রান্ত শেষে সফল হবে! এ কিছুতেই পারব না সইতে। আমরা আছি, সৈন্যসংগ্রহের আয়োজনে এখনই চললুম। কিন্তু উৎসব চলুক, অনুষ্ঠান শেষ হোক।

কুমারসেন। ভয় নেই, মন্দিরে দেবসাক্ষী করে তীর্থোদকে একমুহূর্তে আমার অভিষেক হয়ে যাবে। যদি ফিরে আসি উৎসব সম্পূর্ণ করব। কিন্তু তোমরা যাও। আর বিলম্ব নয়।

সকলে। জয় মহারাজ কুমারসেনের। ধিক্ চন্দ্রসেন। ধিক্ ধিক্ ধিক্।

[সকলের প্রস্থান

আর-এক দলের প্রবেশ

১। মহারাজ, আর সময় নেই। পালাতে হবে।

কুমারসেন। কেন।

১। জালন্ধরের সৈন্য অন্ধমুনির মাঠ পর্যন্ত এসেছে, পালানো ছাড়া এখন আর উপায় নেই। চলো, শম্ভুপ্রস্থের বনে আমি পথ জানি। [উভয়ের প্রস্থান

২। এইমাত্র-যে খুড়োমহারাজ এসেছিলেন।

১। চাতুরী, চাতুরী। শত্রুপক্ষকে তিনি নিজে সন্ধান বাতলিয়েছেন।

২। গ্রামে গ্রামে লোক গেছে সৈন্য জোগাড় করতে, কিন্তু সময় তো পাওয়া গেল না। এরা যুদ্ধ করতেও দিলে না রে।

৩। এ-যে বেড়া আগুন, কিছুই করতে পারব না, মরব শুধু। অসহ্য!

১। জালন্ধরের পাপিষ্ঠরা একেই বলে যুদ্ধ করা। এ তো মানুষ খুন করা!

আর-এক দল

১। নাগপত্তন জ্বালিয়ে দিয়েছে রে, জ্বালিয়ে দিয়েছে।

২। বলিস কী।

৩। হাঁ, সেখানকার মানুষগুলো শেষ পর্যন্ত চেঁচিয়ে গলা ভেঙেছে— জয় মহারাজ কুমারসেনের জয়।

২। এর পিছনে আছে খুড়োরাজা। নাগপত্তন ওকে কিছুতেই মানে নি কিনা, এবার তারই শোধ নিলে বিদেশীকে দিয়ে।

৩। তা হলে অনেক পত্তনেরই লীলা সাঙ্গ হবে।

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত। শোনো শোনো, তোমাদের মধ্যে কুন্তীপুরের মানুষ কেউ আছ?

১। কেন বলো তো।

দেবদত্ত। চন্দ্রসেনের সঙ্গে বিক্রম মহারাজের পরামর্শ হয়েছে, সেখানে সৈন্য পাঠাবেন উৎপাত করবার জন্যে।

২। আপনি কে হন মহাশয়। বিদেশী বলে বোধ হচ্ছে।

দেবদত্ত। হাঁ বিদেশী।

৩। জালন্ধরের মানুষ?

দেবদত্ত। ঠিক ঠাউরেছ।

১। তোমার এতটা ধর্মবুদ্ধি হল কেমন করে।

দেবদত্ত। বিধাতার আশ্চর্য মহিমায় কদাচিৎ এমনতরো ঘটে। তোমাদের কাশ্মীরে চন্দ্রসেন যে বংশে জন্মেছেন সে বংশেও ভদ্রমানুষ জন্মায় দেখেছি।

২। বেশ বলেছেন, ঠাকুর, বেশ বলেছেন। ব্রাহ্মণ তো?

দেবদত্ত। হাঁ, ব্রাহ্মণ।

সকলে। প্রণাম হই।

২। নিজের রাজার বিরুদ্ধে আপনি—

দেবদত্ত। রাজার বিরুদ্ধে বল একে কোন্‌ বুদ্ধিতে। আমার রাজার পাপ যতটা নিবারণ করব আমার রাজভক্তি ততটাই সার্থক হবে।

৩। কিন্তু বিপদ আছে তো ঠাকুর, রাজা যদি—

দেবদত্ত। রাজার হয়ে আজ যারা অন্যায় করছে, বিপদের আশঙ্কা আমার চেয়ে তাদের তো কম নয়। অধর্ম যদি সাহস দিতে পারে, ধর্ম কি ভীরু হবে।

২। খুব বড়ো কথা বললে ঠাকুর। দাও, আর-একবার পায়ের ধুলো দাও।

দেবদত্ত। যুবরাজ কুমারসেন এখান থেকে পালাতে পেরেছেন?

১। ঠাকুর, মাপ করো, ওইটে পারব না, যুবরাজের কথা তোমার সঙ্গেও চলবে না।

দেবদত্ত। কিছু বলতে হবে না, আমি জানতে চাই, তিনি নিরাপদ তো?

১। আপদ-বিপদের কথা কে বলতে পারে। তবে কিনা আমাদের চেষ্টার ক্রটি হবে না।

৩। দেখো দেখো, ওই পশ্চিম পাহাড়ে। বোধ হচ্ছে অচলেশ্বরের কাছে ওরা আগুন লাগিয়েছে। বনটা সুদ্ধ জ্বলে উঠেছে। অকারণ সর্বনাশ করতে এল কেন এরা! খিদে পেলে বাঘে খায়, ভয় পেলে সাপে তাড়া করে আসে, এদের এ যে নিষ্কাম পাপ, অহৈতুকী হিংসা। এরা কোন্ জাতের মানুষ, ঠাকুর।

দেবদত্ত। দৈত্য, দৈত্য। দেবতার 'পরে এদের বিশুদ্ধ বিদ্বেষ। ওরে উন্মত্ত দুর্বৃত্ত অন্ধ, তোমার মহাপাতক তোমাকে মহাপতনে নিয়ে চলল, আজ কে তোমাকে বাঁচাতে পারে। ধিক্ তোমার বন্ধুদের। [প্রস্থান

বিক্রম ও চরের প্রবেশ

বিক্রম। কী বললে। সন্ধান পাওয়া গেল না?

চর। না মহারাজ।

বিক্রম। তবে যে চন্দ্রসেন বললেন, এইখানেই তাঁর অভিষেক হচ্ছিল। সে তো বেশিক্ষণের কথা নয়।

চর। এইমাত্র দেখলুম তাঁর ঘোড়া ফিরিয়ে আনছে। তিনি প্রবেশ করেছেন শম্ভুপ্রস্থের বনে। সেখানে গুহার পথে অদৃশ্য হতে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হয় না।

বিক্রম। যারা পথ জানে তাদের ধরে আনো।

চর। মহারাজ, মরে গেলেও তারা বলবে না। ওখানে সন্ধান করতে যাবে এমন সাহসও কারো নেই। ও যে ভূতে পাওয়া অরণ্য।

বিক্রম। ডেকে আনো চন্দ্রসেনকে।

চন্দ্রসেনের প্রবেশ

কোথায় কুমারসেন?

চন্দ্রসেন। প্রজারা মিলে কোথায় তাঁকে গোপন করেছে, খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

বিক্রম। আগুন লাগাও চারি দিকে, আপনি বেরিয়ে আসবেন।

চন্দ্রসেন। কোথায় আছেন না জেনে আগুন লাগানো হিংসার ছেলেমানুষি।

বিক্রম। সন্ধান তুমি জান, গোপন করছ।

চন্দ্রসেন। পাপে তো প্রবৃত্ত হয়েছি, তার উপরে মূঢ়তা যোগ করব, এতবড়ো অর্বাচীন আমি নই। গোপন করে তোমার কাছে নিজের বিপদ কেন ঘটাব।

বিক্রম। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি নে।

চন্দ্রসেন। সমস্ত কাশ্মীরের লোক আমাকে অভিসম্পাত করছে, অবশেষে তোমারও মুখে এমন কথা শুনব এ আমি আশা করি নি।

বিক্রম। তুমি অল্প আগেই এখানে কুমারের কাছে এসেছিলে এ কথা সত্য কি না।

চন্দ্রসেন। তাঁকে তোমার কাছে আত্মসমর্পণের পরামর্শ দিতে এসেছিলুম।

বিক্রম। সেই ছলেই তাকে জানিয়েছ আমি এসেছি। আমার পক্ষ অবলম্বনের ভান করে তাকে সতর্ক করে দিয়েছ।

চন্দ্রসেন। ভুল করে আমাকে অবিশ্বাস কোরো না, মহারাজ।

বিক্রম। সেও ভালো, কিন্তু বিশ্বাস করে ভুল করবার সময় নেই। সেনাপতিকে আদেশ করে দিচ্ছি, তুমি দৃষ্টিবন্দী হয়ে থাকবে, শেষ পর্যন্ত কুমারকে সুমিত্রাকে যদি না পাই তবে পশুর মতো পিঞ্জরে পুরে তোমাকে জালন্ধরে নিয়ে যাব, প্রাণদণ্ড দেওয়াও তোমার পক্ষে সম্মান।

দ্বিতীয় চরের প্রবেশ

চর। মহিষীর সংবাদ পাওয়া গেছে।

বিক্রম। বলো বলো, কোথায় তিনি।

চর। তিনি গেছেন মার্তণ্ডদেবের মন্দিরে, ধ্রুবতীর্থে।

বিক্রম। চলো, এখনই চলো সেখানে। এই মুহূর্তে।

চন্দ্রসেন। মহারাজ, কাশ্মীরের দেবতার বিরুদ্ধে স্পর্ধা প্রকাশ কোরো না। দেবালয়ে গিয়ে মার্তণ্ডদেবের উপাসিকাকে হরণ করা সইবে না।

বিক্রম। তোমাদের মার্তণ্ডদেবই তো আমার মহিষীকে হরণ করেছেন। দেবতার চৌর্য আমি স্বীকার করব না।

চন্দ্রসেন। এ কী বলছ। ভয় নেই তোমার?

বিক্রম। না, ভয় নেই।

চন্দ্রসেন। তা হলে আমার প্রাণদণ্ড করো। এ পাপের দায়িত্ব আমি বহন করতে পারব না।

বিক্রম। প্রাণদণ্ড সব শেষে। যতক্ষণ তোমার কাছ থেকে কাজ উদ্ধারের আশা আছে, ততক্ষণ নয়। সেনাপতি—

সেনাপতির প্রবেশ

সেনাপতি। কী মহারাজ।

বিক্রম। চলো মার্তণ্ডদেবের মন্দিরের পথে।

সেনাপতি। ওই মন্দিরের দুর্গম পথে সৈন্য নিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

বিক্রম। অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে। মন্দিরের দুর্গমতা লৌকিক হোক অলৌকিক হোক, ভৌতিক হোক দৈবিক হোক, কিছুতে মানব না। সুমিত্রার পক্ষে কাশ্মীরের আশ্রয় চূর্ণ চূর্ণ করব এই শপথ আমি নিয়েছি।

চন্দ্রসেন। দেবমন্দির ইহলোকের সীমায় নয় মহারাজ, সে তো পার্থিব কাশ্মীরের বাহিরে।

বিক্রম। সে কথা দেবতা সম্বন্ধে খাটে, কিন্তু সুমিত্রা সম্বন্ধে নয়; তিনি ইহলোকের সীমায় যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ তিনি আমার, ততক্ষণ তিনি দেবতার নন। ততক্ষণ আমার কাছে তাঁর নিষ্কৃতি নেই, তাঁর কাছে আমারও নেই নিষ্কৃতি।

চন্দ্রসেন। মহারাজ, আমি তোমার বয়োজ্যেষ্ঠ, আমি তোমার পায়ের কাছে মাথা রাখছি, দণ্ড আমার মুণ্ডচ্ছেদন করে, কাশ্মীরের দেবতার অপমান কোরো না।

বিক্রম। তোমার মুণ্ডের কী মূল্য আছে যে, তার পরিবর্তে আমার অপমান লাঘব হবে। আমাকে ছলনা করে তুমি পরিত্রাণ পাবে না। সেনাপতি, উদয়পুর অবরোধ করো। এইখানেই কুমার নিশ্চয় লুকিয়ে আছেন চন্দ্রসেন সে কথা গোপন করছেন। তার পরে চলব তীর্থের পথে। কন্দর্পদেবের পরিচয় পূর্বেই পেয়েছি, এবার নেব মার্তণ্ডদেবের পরিচয়। যে উৎসব জালন্ধরের দেবমন্দিরে আরম্ভ করেছিলুম, কাশ্মীরের দেবমন্দিরে সেই উৎসবের সমাপ্তি হবে।

৪

ধ্রুবতীর্থ। মার্তণ্ডমন্দির

বিপাশা, পুরোহিত, মন্দিরের সেবকগণ

সূর্যোদয়কালে বেদমন্ত্রে স্তব

উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ
দৃশে বিশ্বায় সূর্যম্‌॥
অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্ত্যক্তুভিঃ
সূরায় বিশ্বচক্ষসে॥

পদ্মের অর্ঘ্য হাতে সুমিত্রার প্রবেশ

বিপাশা। গান

জাগো জাগো
আলসশয়নবিলগ্ন।
জাগো জাগো
তামসগহননিমগ্ন।
ধৌত করুক করুণারুণ বৃষ্টি
সুপ্তিজড়িত যত আবিল দৃষ্টি;
জাগো জাগো
দুঃখভারনত উদ্যমভগ্ন।
জ্যোতিঃসম্পদ ভরি দিক চিত্ত
ধনপ্রলোভননাশন বিত্ত,
জাগো জাগো
পুণ্যবসন পরো লজ্জিত নগ্ন॥

পুরোহিত ভার্গবের প্রবেশ

ভার্গব। মা।

সুমিত্রা। কী বৎস ভার্গব।

ভার্গব। কিছুদিন থেকে এই দুর্গম তীর্থের পথে নানাবিধ লোকের যাতায়াত লক্ষ্য করছি। তারা পুণ্যকামী নয়।

সুমিত্রা। তাতে দোষ নেই, ভয়ও নেই।

ভার্গব। বোধ হয় যেন তারা বিদেশী।

সুমিত্রা। ভগবান সূর্যের উদয়দিগন্ত দেশে দেশে। তাঁর দেশে বিদেশী কে আছে।

ভার্গব। অপরাধ নিয়ো না দেবি, আমরা কিন্তু কিছুদিন থেকে এখানে বিদেশীদের পথরোধ করেছি।

সুমিত্রা। তা হলে আমারও এখানে পথ রুদ্ধ হল।

ভার্গব। ক্ষমা করো, দেবি। তোমাকে বিপদ হতে রক্ষা করব আমরা, এমন চিন্তা করা আমাদের স্পর্ধা, এ আমাদের মোহ। দুর্বল বুদ্ধির অপরাধ নিয়ো না, যাত্রীদের কোনো বাধা ঘটবে না।

শিখরিণীর প্রবেশ

শিখরিণী। মা তপতী।

সুমিত্রা। কী শিখরিণী, তুমি যে এখানে ?

শিখরিণী। আমার স্বামীকে ওরা মেরে ফেলেছে।

সুমিত্রা। সে কী কথা। তিনি যে সাধুপুরুষ ছিলেন, তাঁকে মারলে কেন।

শিখরিণী। যুবরাজ কোথায়, সেই সংবাদ তাঁর কাছ থেকে ওরা বের করতে চেষ্টা করেছিল। দেশে সবাই তাঁকে সত্যবাদী বলে জানত বলেই তাঁর এই বিপদ ঘটল। দেবি, আমি কিছুতেই সান্ত্বনা পাচ্ছি নে, আমাকে বুঝিয়ে বলো, সংসারে যাঁরা ধর্মকে প্রাণপণে মানেন, ধর্ম কেন তাঁদেরই এত দুঃখ দিয়ে মারেন।

সুমিত্রা। যাঁরা মরতে পেরেছেন তাঁরাই এ কথার তত্ত্ব জানেন। মৃত্যু দিয়ে যাঁরা সত্যকে পান তাঁদের জন্য শোক কোরো না।

শিখরিণী। শোক করব না মা, তিনি আমার মৃত্যুর ভয় ঘুচিয়ে দিয়ে গেছেন, আমাকে এই তাঁর শেষ দান। গ্রামের লোকেরা আমাকে বলেছে অভাগিনী ; কী বুঝবে তারা ! তিনি আমার স্বামী ছিলেন এই আমার পরম সৌভাগ্য।

সুমিত্রা। যারা তাঁকে মেরেছে, মৃত্যুর দ্বারা তাদের তিনি জয় করেছেন, সে কথা তারা কোনোদিন বুঝবে না এইটেই সকলের চেয়ে শোকের কথা। কিন্তু বৎসে, তুমি এখানে এসেছ কেন।

শিখরিণী। এখানে তোমার চরণতলে যদি আশ্রয় নিতে পারতুম তা হলে বেঁচে যেতুম। কিন্তু মা, সংসারের আলো নিবলে তবুও সংসার থাকে। আমার মেয়েটি আছে— অমন পিতার কোল হারিয়েছে, তার কল্যাণের জন্যেই সেই অন্ধকারায় আমাকে থাকতে হবে। তারই জন্যে তোমার কাছে এসেছি।

সুমিত্রা। বলো, আমাকে কী করতে হবে।

শিখরিণী। এই অলংকারগুলি এনেছি দেবমন্দিরে রক্ষা করবার জন্যে। আমার মায়ের কাছ থেকে আমি পেয়েছি, আমার কন্যার জন্যে রাখব। যে পরিবারের 'পরে চন্দ্রসেনের বিদ্বেষ, জালন্ধরের সৈন্য দিয়ে তাদের সর্বস্ব লুঠ করাচ্ছেন। এই লও মা, তোমার স্পর্শ লাভ করুক— আমার মেয়ের দেহ পবিত্র হবে।

কুঞ্জলালের প্রবেশ

কুঞ্জলাল। আজ বাহিরের কোথাও আমাদের দুঃখের পরিত্রাণ নেই দেবি, কিন্তু মনে হয় যেন অন্তরে অন্তরে তুমি সেই দুঃখকে নাশ করতে পার, তাই এসেছি।

সুমিত্রা। বলো বৎস, তোমার কী বলবার আছে।

কুঞ্জলাল। যে নগরীতে তোমার মাতামহীর জন্মভূমি সেই উদয়পুর এতদিন চন্দ্রসেনকে অস্বীকার করে স্বতন্ত্র ছিল। তিনি যখনই সৈন্য নিয়ে উৎপাত করতে এসেছেন প্রজারা সমস্ত পুরী উজাড় করে চলে গেছে। এবার সেইখানেই যুবরাজের রাজধানী স্থাপন করে তাঁর অভিষেকের আয়োজন হয়েছিল, বাধা পড়ল। রাজা বিক্রমের সৈন্য উদয়পুর বেষ্টন করেছে। প্রজাদের বেরিয়ে যাবার পথ রুদ্ধ।

ভার্গব। কুঞ্জলাল, এ কী বুদ্ধি তোর। কত বড়ো দুঃখ ওঁকে দিলি দেখ্‌ তো। কেন এ-সব সংবাদ এই শান্তিতীর্থে।

কুঞ্জলাল। মা, কেন এমন স্তব্ধ হয়ে আকাশে তাকিয়ে রইলে। চিন্তার কথা কিছুই নেই, মৃত্যুর পথ খোলা আছে, কোনো অপমান সেখানে পৌঁছয় না। দাও স্বহস্তে আজকে পূজার নির্মাল্য, নিয়ে যাই তাদের কাছে, আর দাও তোমার হাতের লিখন একখানি, একটি আশীর্বাদ— তাদের সব দুঃখ শুভ্র হয়ে যাবে।

[সকলের প্রস্থান

নরেশের প্রবেশ

নরেশ। বিপাশা, আমার কী মনে হচ্ছে বলব?

বিপাশা। বলো তো।

নরেশ। এইখানে এসে আমাদের প্রেম পরিপূর্ণ হয়েছে। আশ্চর্যের কথা শুনবে?

বিপাশা। কী, বলো।

নরেশ। আজ মন তোমার গান শোনবারও অপেক্ষা করে না— সকল ধ্বনি এখানে আলোক হয়ে উঠেছে, প্রত্যক্ষ আমার অন্তরে প্রবেশ করে। তুমি কি তাই অনুভব কর না।

বিপাশা। প্রিয়তম, তোমার আনন্দে আজ আমি আনন্দিত, তার চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারি নে।

নরেশ। আজ আলোকের মধ্যে তোমাকে দেখলুম আলোকরূপে, আর সেই সঙ্গে আমাকেও। আর কোনো ক্ষোভ নেই আমার।

সুমিত্রার প্রবেশ

সুমিত্রা। কুমার এসেছেন, শীঘ্র তাঁকে ডেকে আনো, বিপাশা।

[নরেশ ও বিপাশার প্রস্থান

কুমারসেনের প্রবেশ

কুমারসেন। রাজত্বের পথ অতিক্রম করে এই তীর্থেই শেষে আসতে হল, বোন।

সুমিত্রা। অন্যত্র তোমাকে অনেক প্রয়োজন আছে। শেষ যদি না হয়ে থাকে, এখানে এলে কেন।

কুমারসেন। তোমাকে রক্ষা করবার জন্যে।

সুমিত্রা। কার হাত থেকে।

কুমারসেন। বিক্রম মহারাজ জ্বালামুখী দেবীর শপথ নিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে করে হোক এখান থেকে তোমাকে সরাবেন। তীর্থের পথে সৈন্যবাহিনী আসা অসম্ভব তাই একে একে ক্রমে ক্রমে তাঁর লোক নিয়ে চারি দিক পূর্ণ করে তুলছেন।

সুমিত্রা। আমাকে তিনি চান ?

. কুমারসেন। হাঁ।

সুমিত্রা। আর কী চান।

কুমারসেন। আর তিনি চান আমাকে।

সুমিত্রা। কেন, তোমার সঙ্গে তাঁর কিসের বিরোধ।

কুমারসেন। আমার সঙ্গে বিরোধের স্পষ্ট কারণ যদি থাকত তা হলে সে কারণ দূর করলেই বিপদ কাটত। কারণ তাঁর অন্ধপ্রকৃতির মধ্যে, সেইজন্যে এত দুর্নিবার, এত ভয়ংকর।

সুমিত্রা। আমি যদি যাই তিনি কি তোমাকে মুক্তি দেবেন।

কুমারসেন। কিন্তু তুমি কী করে যাবে তাঁর কাছে ? তুমি যে দেবতার। রাজ্যের কথা আর আমি ভাবি নে কিন্তু কাশ্মীরের দেবতার অপমান ঘটতে দিতে পারব না।

সুমিত্রা। কী করবে তুমি।

কুমারসেন। কিছু না পারি তো মরব। পাপকে ঠেকাবার জন্যে কিছু না করাই তো পাপ।

নেপথ্যে। মহারানী !

সুমিত্রা। একী, এ যে দেবদত্ত ঠাকুর !

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত। কয়েকদিন থেকে দর্শনের চেষ্টা করেছিলুম, আমার চেহারা দেখে তোমার অনুচরদের মনে সংশয় ঘোচে না। অশোকবনে হনুমানকে দেখে রাক্ষসরা যে-রকম সন্দিগ্ধ হয়েছিল এদের সেই দশা। আজ এইমাত্র হঠাৎ কেন এরা প্রসন্ন হল

জানি নে। ছাড়া পেয়েই দেখা করতে এসেছি। একটা নিবেদন আছে— শুনতেই হবে আমার কথা।

সুমিত্রা। বলো।

দেবদত্ত। আর সহ্য হয় না মহারানী। গ্রাম থেকে গ্রামে, নগর থেকে নগরে অগ্নিকাণ্ড দুর্ভিক্ষ রক্তপাত নারীনির্যাতন। পাপের নেশা জালন্ধরের সমস্ত সৈন্যকেই পেয়েছে— থামতে পারছে না, মাত্রা কেবলই বেড়ে চলেছে। আমি মহারাজকে গিয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেম, বলেছিলেম, অহরহ যমরাজের কাছে প্রার্থনা করছি তিনি তোমাকে সরিয়ে নিয়ে যান। রাজা আমাকে কারারুদ্ধ করেছিলেন, প্রহরী দয়া করে ছেড়ে দিলে। আজ মহারাজকে কেউ নিষেধ করতে পারবে না একমাত্র তুমি ছাড়া।

কুমারসেন। ঠাকুর, এমন কথা কী করে বলছ, সুমিত্রা যাবেন তাঁর কাছে? এ মন্দির থেকে ওঁর তো ফেরবার পথ নেই। এতে স্বর্গে মর্ত্যে ধিক্‌কার উঠবে যে।

দেবদত্ত। আমি জানি বড়োই কঠিন ব্যাপার, এও জানি রাজা এখন প্রকৃতিস্থ নন। তবু বলছি দেবী সুমিত্রা, আজ তুমি সকল মান-অপমান সুখ-দুঃখের অতীত— তুমি পবিত্র, পাপ তোমার কাছে কুণ্ঠিত হবে, তুমি এই বীভৎসের মধ্যে নির্বিকার চিত্তে নামতে পার।

কুমারসেন। সুমিত্রার কী ঘটতে পারে না-পারে সে কথা ভাববার সময় আজ নেই— কিন্তু সুমিত্রা কাশ্মীরের দেবতাকে অপমান করে এখান থেকে চলে যাবে সে আমি ঘটতে দেব না। দেবতার ধন হরণ করে তাকে মানুষের ভোগের ভাণ্ডারে নিয়ে যাবে আমাদের বংশের কন্যা!

সুমিত্রা। ভাই কুমার, তাঁকে এইখানে আহ্বান করে আনব।

কুমারসেন। এইখানে? এই দেবালয়ে?

সুমিত্রা। আসুন এখানেই, নইলে তাঁর মুক্তি কিছুতেই হবে না। আমার এই শেষ কাজ, তাঁকে বাঁচাতে হবে— তাঁর মোহগ্রন্থি ছিন্ন করে দিয়ে চলে যাব।

দেবদত্ত। এ কিন্তু বড়ো সংকটের কথা, মহারানী। অনেক পাপ সে করেছে, অবশেষে দুর্বৃত্ত যদি দেবালয়ে এসে দেবতার অসম্মান করে, পুণ্যতীর্থে যদি কলুষ আনে?

সুমিত্রা। ভয় নেই, ঠাকুর, কোনো ভয় নেই। আমার প্রভু, আমার হিরণ্যদ্যুতি সকল পাপ দগ্ধ করবেন, নিঃশেষে ভস্ম করবেন। সেই রুদ্র আমাকে গ্রহণ করেছেন, তাঁর কাছ থেকে আমাকে ছিন্ন করে নিতে পারে এমন শক্তি কারো নেই। কুমার, তোমার সঙ্গে শংকর আছে?

কুমারসেন। ওই যে সে প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে।

সুমিত্রা। শংকর!

শংকর। কী দিদি। কী দেবি। এই যে আমি এসেছি। যেদিন ওরা তোমাকে কেড়ে নিয়ে গেল সেদিন মরার বেশি দুঃখ পেয়েছি; শেষকালে কাশ্মীরের কন্যাকে কাশ্মীরের দেবতা স্বয়ং উদ্ধার করে আনলেন এই দেখে আমার জন্ম সার্থক হল।

সুমিত্রা। তুমি আমার দূত হয়ে যাও মহারাজ বিক্রমের কাছে।

শংকর। এখনই যাব। বলো কী জানাতে হবে।

নরেশ। দেবী, শংকরকে নয়, আমাকে পাঠিয়ে দাও, রাজা যদি অপমান করে বৃদ্ধ সইতে পারবে না।

সুমিত্রা। না রাজকুমার, এই আমার শেষ আমন্ত্রণ— আমার চিরবন্ধু ছাড়া কার হাত দিয়ে পাঠাব। শংকর, শিশুকালে তোমার কোলে একদিন আমাকে গ্রহণ করেছ। মৃত্যুর সময় পিতা তাঁর শেষ অভিবাদন দিয়েছিলেন তোমাকেই। আজ সেই তোমার সুমিত্রার বাণী নিয়ে তোমাকেই যেতে হবে, হয়তো অপমানের মুখে। শান্ত হয়ে সহিষ্ণু হয়ে বোলো মহারাজকে, তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধের চরম পরিণামের জন্যে মন্দিরে দেবতার চরণপ্রান্তে সুমিত্রা অপেক্ষা করবে। আর তোমার পরম স্নেহের ধন কুমার, ওই কুমারের জন্য ভেবো না; তিনি মৃত্যুকে ভয় করেন না। সেই বন্ধু, সেই বিশ্ববিচারক ধর্মরাজ রইলেন তাঁর সহায়।

শংকর। দিদি, বৃদ্ধের একটি কথা শোনো, জানি কুমারের সৈন্যসামন্ত নেই, জানি চন্দ্রসেন ওঁর বিরুদ্ধে, তবু যে-কয়জন আমরা আছি ওঁর সহচর, তাদের নিয়ে ওঁকে যুদ্ধক্ষেত্রেই যেতে হবে। সেখানে তাঁর জন্মভূমি তাঁকে পুণ্যক্রোড়ে গ্রহণ করবেন।

দেবদত্ত। দেশের দুঃখ তাতে আরো আলোড়িত হয়ে উঠবে, শংকর। উন্মত্তের মত্ততাগ্নিতে আর ইন্ধন দিয়ো না।

কুমারসেন। শংকর, যাও তুমি, মহারাজকে ডেকে নিয়ে এসোগে। অতিথি তিনি, অতিথির মতো তাঁকে সংকৃত করব।

শংকর। হে রুদ্র, হে হিরণ্যপাণি, আজ তোমার জ্যোতিতে আবরণ কেন। তোমার সেবকদের লজ্জা নিবারণ করো। দীপ্যমান তেজে এসো বাহির হয়ে— তোমার অগ্নিকেতু উদ্‌ঘাটিত করে দাও। নমস্কার তোমাকে, নমস্কার তোমাকে, বারবার তোমাকে নমস্কার।

ভার্গবের প্রবেশ

ভার্গব। মহারাজ বিক্রম অনতিদূরে, এই শুনি জনশ্রুতি। আদেশ করো, সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করে দিই।

সুমিত্রা। খুলে দাও, খুলে দাও, সমস্ত দ্বার খুলে দাও, আসবার দ্বার এবং যাবার দ্বার। যাও যাও ভার্গব, তাঁকে আমন্ত্রণ করে আনো।

ভার্গব। তাঁর প্রতিজ্ঞা, দেবতার কাছ থেকে তিনি তোমাকে কেড়ে নিয়ে যাবেন। আমি এ মন্দিরের পুরোহিত, আমার কর্তব্য করতে হবে তো।

সুমিত্রা। তোমার কর্তব্যই করো। দেবতার পথ রোধ কোরো না— যে পথ দিয়ে রাজার সৈন্য আসবে সেই পথ দিয়েই আমার দেবতা আমাকে উদ্ধার করতে আসবেন। যাও তুমি এখনই, মন্দিরের সিংহদ্বার খুলে দাও। [ভার্গবের প্রস্থান

দেবদত্ত। তা হলে শংকর তুমি থাকো, মহারানীর দূত হয়ে আমিই তাঁকে আহ্বান করে আনি। [প্রস্থান

শংকর। দিদি, রাজগৃহ থেকে সেবার তোমাকে ওরা কেড়ে নিয়ে গেল, এবার কি দেবালয় থেকে তোমাকে কেড়ে নিতে দেবে। এও কি আমরা চুপ করে সহ্য করব।

সুমিত্রা। ভয় নেই শংকর। আজ আমাকে নেবার সাধ্য কার আছে।

শংকর। তবে বলো, তোমার কী সংকল্প।

সুমিত্রা। রুদ্রের কাছে বহুদিন পূর্বে আত্মনিবেদন করেছিলুম। ব্যাঘাত ঘটেছিল, সংসার আমাকে অশুচি করেছে। তপস্যা করেছি, আমার দেহমন শুদ্ধ হয়েছে। আজ আমার সেই অনেকদিনের সংকল্প সম্পূর্ণ হবে। তাঁর পরমতেজে আমার তেজ মিলিয়ে দেব।

শংকর। আমার মোহ দূর হোক সুমিত্রা, মোহ দূর হোক। তোমাকে যেন নিবৃত্ত না করি। [শংকরের প্রস্থান

সুমিত্রা। বিপাশা!

বিপাশার প্রবেশ

বিপাশা। বলো দেবি।

সুমিত্রা। আমার অগ্নিশয্যা অনেকদিন থেকেই প্রস্তুত হচ্ছে, তুমি দেখেছ বহু-দুঃখের সেই আয়োজন। আজ সময় হয়েছে, আনন্দ করো, জ্বলুক শিখা, বিলম্ব কোরো না।

বিপাশা। যে আদেশ দেবি। [পায়ের কাছে মাথা রেখে পড়ে রইল

সুমিত্রা। ওঠ্‌ বিপাশা, এবার আমার শেষ পূজা করি। অর্ঘ্য প্রস্তুত আছে?

বিপাশা। আছে, দেবী।

পদ্মের অর্ঘ্য হাতে সুমিত্রা

বিপাশা। গান

শুভ্র নবশঙ্খ তব গগন ভরি বাজে,
ধ্বনিল শুভ জাগরণ-গীত।
অরুণরুচি আসনে চরণ তব রাজে,
মম হৃদয়কমল বিকশিত।
গ্রহণ করো তারে
তিমির পরপারে,
বিমলতর পুণ্যকরপরশ-হরষিত॥

সুমিত্রা। অগ্না দেবা উদিতা সূর্যস্ত
নিরংহসঃ পিপৃতা নিরবদ্যাৎ।
পৃথিবী শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তির্দ্যৌঃ শান্তিঃ।
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

শেষ দৃশ্য

নেপথ্য থেকে চিতাগ্নির আভাস আসছে
সকলের বেদমন্ত্রসহ বেদী প্রদক্ষিণ

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্॥
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।
ক্রতো স্মর কৃতং স্মর॥
অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম॥

নেপথ্যে বাদ্যোদ্যম। বিক্রম, দেবদত্ত, শংকরের প্রবেশ

পরিশিষ্ট

মন্ত্রের অনুবাদ

১। কর্পূর ইব দগ্ধোঽপি শক্তিমান্ যো জনে জনে।
নমোঽস্ত্ববার্যবীর্যায় তস্মৈ মকরকেতবে॥

—সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার

কর্পূরের মতো, দগ্ধ হইলেও যাহার শক্তি প্রত্যেক ব্যক্তিতে অনুভূত, যাহার প্রভাবকে কেহ নিবারণ করিতে পারে না, সেই মকরকেতুকে নমস্কার॥

২। উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ
দৃশে বিশ্বায় সূর্যম্॥

—ঋগ্‌বেদ ১. ৫০. ১

অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্ত্যক্তুভিঃ
সূরায় বিশ্বচক্ষসে॥

—ঋগ্‌বেদ ১. ৫০. ২

বিশ্ব দেখিতে পাইবে এই উদ্দেশ্যে রশ্মিসমূহ সমস্ত ভূতের জ্ঞাতা উজ্জ্বল সূর্যকে ঊর্ধ্বে বহন করিতেছে॥

বিশ্বদ্রষ্টা সূর্যকে আসিতে দেখিয়া সেই নক্ষত্রগুলি রাত্রির সহিত চোরের মতো পলায়ন করিতেছে॥

৩। বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্॥
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।
ক্রতো স্মর কৃতং স্মর॥
অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম॥

—ঈশোপনিষৎ ১৮

মহাবায়ুতে আমার প্রাণবায়ু এবং এই শরীর ভস্মে মিলিত হোক ॥

ওঁ, আপন কর্তব্য স্মরণ করো, আপন কৃতকার্য স্মরণ করো ॥

হে অগ্নি, আমাদিগকে সুপথে লইয়া যাও। হে দেব, তুমি আমাদের সকল কার্য জান, তুমি আমাদের সমস্ত কুটিল পাপকে বিনাশ করো। তোমাকে আমরা বারংবার নমস্কার করি ॥

৪। অদ্যা দেবা উদিতা সূর্যস্য
নিরংহসঃ পিপৃতা নিরবদ্যাৎ ॥

—ঋগ্‌বেদ ১. ১১৫. ৬

অদ্য সূর্যের উদিত উজ্জ্বল কিরণসমূহ পাপ হইতে, নিন্দনীয় কর্ম হইতে, আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া পালন করুন ॥

৫। পৃথিবী শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তির্দ্যৌঃ শান্তিঃ।
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

—অথর্ববেদ ১৯. ৯. ১৪

পৃথিবীলোক শান্তি আনয়ন করুক। অন্তরীক্ষলোক শান্তি আনয়ন করুক। দ্যুলোক শান্তি আনয়ন করুক ॥

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ

২১॥১৪

গল্পগুচ্ছ

দুরাশা

দার্জিলিঙে গিয়া দেখিলাম, মেঘে বৃষ্টিতে দশ দিক আচ্ছন্ন। ঘরের বাহির হইতে ইচ্ছা হয় না, ঘরের মধ্যে থাকিতে আরো অনিচ্ছা জন্মে।

হোটেলে প্রাতঃকালের আহার সমাধা করিয়া পায়ে মোটা বুট এবং আপাদমস্তক ম্যাকিণ্টশ পরিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। ক্ষণে ক্ষণে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে এবং সর্বত্র ঘন মেঘের কুজ্ঝটিকায় মনে হইতেছে, যেন বিধাতা হিমালয়-পর্বতসুদ্ধ সমস্ত বিশ্বচিত্র রবার দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া মুছিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছেন।

জনশূন্য ক্যাল্‌কাটা রোডে একাকী পদচারণ করিতে করিতে ভাবিতেছিলাম— অবলম্বনহীন মেঘরাজ্যে আর তো ভালো লাগে না, শব্দস্পর্শরূপময়ী বিচিত্রা ধরণী-মাতাকে পুনরায় পাঁচ ইন্দ্রিয় দ্বারা পাঁচ রকমে আঁকড়িয়া ধরিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

এমন সময়ে অনতিদূরে রমণীকণ্ঠের সকরুণ রোদনগুঞ্জনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। রোগশোকসংকুল সংসারে রোদনধ্বনিটা কিছুই বিচিত্র নহে, অন্যত্র অন্যসময় হইলে ফিরিয়া চাহিতাম কি না সন্দেহ, কিন্তু এই অসীম মেঘরাজ্যের মধ্যে সে-রোদন সমস্ত লুপ্ত জগতের একমাত্র রোদনের মতো আমার কানে আসিয়া প্রবেশ করিল, তাহাকে তুচ্ছ বলিয়া মনে হইল না।

শব্দ লক্ষ্য করিয়া নিকটে গিয়া দেখিলাম, গৈরিকবসনাবৃতা নারী, তাহার মস্তকে স্বর্ণকপিশ জটাভার চূড়া-আকারে আবদ্ধ, পথপ্রান্তে শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া মৃদুস্বরে ক্রন্দন করিতেছে। তাহা সদ্যশোকের বিলাপ নহে, বহুদিনসঞ্চিত নিঃশব্দ শ্রান্তি ও অবসাদ আজ মেঘান্ধকার নির্জনতার ভারে ভাঙিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে।

মনে মনে ভাবিলাম, এ বেশ হইল, ঠিক যেন ঘর-গড়া গল্পের মতো আরম্ভ হইল; পর্বতশৃঙ্গে সন্ন্যাসিনী বসিয়া কাঁদিতেছে ইহা যে কখনো চর্মচক্ষে দেখিব এমন আশা কস্মিনকালে ছিল না।

মেয়েটি কোন্ জাত ঠাহর হইল না। সদয় হিন্দি ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে তুমি, তোমার কী হইয়াছে।"

প্রথমে উত্তর দিল না, মেঘের মধ্য হইতে সজলদীপ্তনেত্রে আমাকে একবার দেখিয়া লইল।

আমি আবার কহিলাম, "আমাকে ভয় করিয়ো না। আমি ভদ্রলোক।"

শুনিয়া সে হাসিয়া খাস হিন্দুস্থানিতে বলিয়া উঠিল, "বহুদিন হইতে ভয়ডরের মাথা খাইয়া বসিয়া আছি, লজ্জাশরমও নাই। বাবুজি, একসময় আমি যে-জেনানায় ছিলাম সেখানে আমার সহোদর ভাইকে প্রবেশ করিতে হইলেও অনুমতি লইতে হইত, আজ বিশ্বসংসারে আমার পর্দা নাই।"

প্রথমটা একটু রাগ হইল ; আমার চালচলন সমস্তই সাহেবী, কিন্তু এই হত-ভাগিনী বিনা দ্বিধায় আমাকে বাবুজি সম্বোধন করে কেন। ভাবিলাম, এইখানেই আমার উপন্যাস শেষ করিয়া সিগারেটের ধোঁয়া উড়াইয়া উদ্যতনাসা সাহেবিয়ানার রেলগাড়ির মতো সশব্দে সবেগে সদর্পে প্রস্থান করি। অবশেষে কৌতূহল জয়লাভ করিল। আমি কিছু উচ্চভাব ধারণ করিয়া বক্রগ্রীবায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাকে কিছু সাহায্য করিতে পারি? তোমার কোনো প্রার্থনা আছে?"

সে স্থিরভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল এবং ক্ষণকাল পরে সংক্ষেপে উত্তর করিল, "আমি বদ্রাওনের নবাব গোলামকাদের খাঁর পুত্রী।"

বদ্রাওন কোন্ মুল্লুকে এবং নবাব গোলামকাদের খাঁ কোন্ নবাব এবং তাঁহার কন্যা যে কী দুঃখে সন্ন্যাসিনীবেশে দার্জিলিঙে ক্যালকাটা রোডের ধারে বসিয়া কাঁদিতে পারে আমি তাহার বিন্দুবিসর্গ জানি না এবং বিশ্বাসও করি না, কিন্তু ভাবিলাম, রসভঙ্গ করিব না, গল্পটি দিব্য জমিয়া আসিতেছে।

তৎক্ষণাৎ সুগম্ভীর মুখে সুদীর্ঘ সেলাম করিয়া কহিলাম, "বিবিসাহেব, মাপ করো, তোমাকে চিনিতে পারি নাই।"

চিনিতে না পারিবার অনেকগুলি যুক্তিসংগত কারণ ছিল, তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান কারণ, তাঁহাকে পূর্বে কস্মিনকালে দেখি নাই, তাহার উপর এমনি কুয়াশা যে নিজের হাত পা কয়খানিই চিনিয়া লওয়া দুঃসাধ্য।

বিবিসাহেবও আমার অপরাধ লইলেন না এবং সন্তুষ্টকণ্ঠে দক্ষিণহস্তের ইঙ্গিতে স্বতন্ত্র শিলাখণ্ড নির্দেশ করিয়া আমাকে অনুমতি করিলেন, "বৈঠিয়ে।"

দেখিলাম, রমণীটির আদেশ করিবার ক্ষমতা আছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে সেই সিক্ত শৈবালাচ্ছন্ন কঠিনবন্ধুর শিলাখণ্ডতলে আসনগ্রহণের সম্মতি প্রাপ্ত হইয়া

এক অভাবনীয় সম্মান লাভ করিলাম। বদ্রাওনের গোলামকাদের খাঁর পুত্রী হুরউন্নীসা বা মেহেরউন্নীসা বা হুর-উল্‌মুল্‌ক্‌ আমাকে দার্জিলিঙে ক্যালকাটা রোডের ধারে তাঁহার অনতিদূরবর্তী অনতি-উচ্চ পঙ্কিল আসনে বসিবার অধিকার দিয়াছেন। হোটেল হইতে ম্যাকিণ্টশ পরিয়া বাহির হইবার সময় এমন সুমহৎ সম্ভাবনা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

হিমালয়বক্ষে শিলাতলে একান্তে দুইটি পান্থ নরনারীর রহস্যালাপকাহিনী সহসা সদ্যসম্পূর্ণ কবোষ্ণ কাব্যকথার মতো শুনিতে হয়, পাঠকের হৃদয়ের মধ্যে দূরাগত নির্জন গিরিকন্দরের নির্ঝরপ্রপাতধ্বনি এবং কালিদাসরচিত মেঘদূত-কুমারসম্ভবের বিচিত্র সংগীতমর্মর জাগ্রত হইয়া উঠিতে থাকে, তথাপি এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, বুট এবং ম্যাকিণ্টশ পরিয়া ক্যালকাটা রোডের ধারে কর্দমাসনে এক দীনবেশিনী হিন্দুস্থানী রমণীর সহিত একত্র উপবেশনপূর্বক সম্পূর্ণ আত্মগৌরব অক্ষুণ্ণভাবে অনুভব করিতে পারে, এমন নব্যবঙ্গ অতি অল্পই আছে। কিন্তু সেদিন ঘনঘোর বাষ্পে দশ দিক আবৃত ছিল, সংসারের নিকট চক্ষুলজ্জা রাখিবার কোনো বিষয় কোথাও ছিল না, কেবল অনন্ত মেঘরাজ্যের মধ্যে বদ্রাওনের নবাব গোলামকাদের খাঁর পুত্রী এবং আমি, এক নববিকশিত বাঙালী সাহেব— দুইজনে দুইখানি প্রস্তরের উপর বিশ্বজগতের দুইখণ্ড প্রলয়াবশেষের ন্যায় অবশিষ্ট ছিলাম, এই বিসদৃশ সম্মিলনের পরম পরিহাস কেবল আমাদের অদৃষ্টের গোচর ছিল, কাহারো দৃষ্টিগোচর ছিল না।

আমি কহিলাম, "বিবিসাহেব, তোমার এ হাল কে করিল।"

বদ্রাওনকুমারী কপালে করাঘাত করিলেন। কহিলেন, "কে সমস্ত করায় তা আমি কি জানি! এতবড়ো প্রস্তরময় কঠিন হিমালয়কে কে সামান্য বাষ্পের মেঘে অন্তরাল করিয়াছে।"

আমি কোনোরূপ দার্শনিক তর্ক না তুলিয়া সমস্ত স্বীকার করিয়া লইলাম; কহিলাম, "তা বটে, অদৃষ্টের রহস্য কে জানে! আমরা তো কীটমাত্র।"

তর্ক তুলিতাম, বিবিসাহেবকে আমি এত সহজে নিষ্কৃতি দিতাম না কিন্তু আমার ভাষায় কুলাইত না। দরোয়ান এবং বেহারাদের সংসর্গে যেটুকু হিন্দি অভ্যস্ত হইয়াছে তাহাতে ক্যালকাটা রোডের ধারে বসিয়া বদ্রাওনের অথবা অন্য কোনো স্থানের কোনো নবাবপুত্রীর সহিত অদৃষ্টবাদ ও স্বাধীন ইচ্ছাবাদ সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইত।

বিবিসাহেব কহিলেন, "আমার জীবনের আশ্চর্য কাহিনী অদ্যই পরিসমাপ্ত হইয়াছে, যদি ফরমায়েশ করেন তো বলি।"

আমি শশব্যস্ত হইয়া কহিলাম, "বিলক্ষণ! ফরমায়েশ কিসের। যদি অনুগ্রহ করেন তো শুনিয়া শ্রবণ সার্থক হইবে।"

কেহ না মনে করেন, আমি ঠিক এই কথাগুলি এমনিভাবে হিন্দুস্থানি ভাষায় বলিয়াছিলাম, বলিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সামর্থ্য ছিল না। বিবিসাহেব যখন কথা কহিতেছিলেন আমার মনে হইতেছিল, যেন শিশিরস্নাত স্বর্ণশীর্ষ স্নিগ্ধশ্যামল শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়া প্রভাতের মন্দমধুর বায়ু হিল্লোলিত হইয়া যাইতেছে, তাহার পদে পদে এমন সহজ নম্রতা, এমন সৌন্দর্য, এমন বাক্যের অবারিত প্রবাহ। আর আমি অতি সংক্ষেপে খণ্ড খণ্ড ভাবে বর্বরের মতো সোজা সোজা উত্তর দিতেছিলাম। ভাষায় সেরূপ সুসম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন সহজ শিষ্টতা আমার কোনোকালে জানা ছিল না; বিবিসাহেবের সহিত কথা কহিবার সময় এই প্রথম নিজের আচরণের দীনতা পদে পদে অনুভব করিতে লাগিলাম।

তিনি কহিলেন, "আমার পিতৃকুলে দিল্লির সম্রাটবংশের রক্ত প্রবাহিত ছিল, সেই কুলগর্ব রক্ষা করিতে গিয়া আমার উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পাওয়া দুঃসাধ্য হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌয়ের নবাবের সহিত আমার সম্বন্ধের প্রস্তাব আসিয়াছিল, পিতা ইতস্তত করিতেছিলেন, এমন সময় দাঁতে টোটা কাটা লইয়া সিপাহিলোকের সহিত সরকার-বাহাদুরের লড়াই বাধিল, কামানের ধোঁয়ায় হিন্দুস্থান অন্ধকার হইয়া গেল।"

স্ত্রীকণ্ঠে, বিশেষত সম্ভ্রান্ত মহিলার মুখে হিন্দুস্থানি কখনো শুনি নাই, শুনিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, এ ভাষা আমিরের ভাষা— এ যে-দিনের ভাষা সে-দিন আর নাই, আজ রেলোয়ে টেলিগ্রাফে, কাজের ভিড়ে, আভিজাত্যের বিলোপে সমস্তই যেন হ্রস্ব খর্ব নিরলংকার হইয়া গেছে। নবাবজাদীর ভাষামাত্র শুনিয়া সেই ইংরাজরচিত আধুনিক শৈলনগরী দার্জিলিঙের ঘনকুজ্ঝটিকাজালের মধ্যে আমার মনশ্চক্ষের সম্মুখে মোঘলসম্রাটের মানসপুরী মায়াবলে জাগিয়া উঠিতে লাগিল— শ্বেতপ্রস্তররচিত বড়ো বড়ো অভ্রভেদী সৌধশ্রেণী, পথে লম্বপুচ্ছ অশ্বপৃষ্ঠে মছলন্দের সাজ, হস্তীপৃষ্ঠে স্বর্ণঝালরখচিত হাওদা, পুরবাসিগণের মস্তকে বিচিত্রবর্ণের উষ্ণীষ, শালের রেশমের মস্‌লিনের প্রচুরপ্রসর জামা পায়জামা, কোমরবন্ধে বক্র তরবারি, জরির জুতার অগ্রভাগে বক্র শীর্ষ— সুদীর্ঘ অবসর, সুলম্ব পরিচ্ছদ, সুপ্রচুর শিষ্টাচার।

নবাবপুত্রী কহিলেন, "আমাদের কেল্লা যমুনার তীরে। আমাদের ফৌজের অধিনায়ক ছিল একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ। তাহার নাম ছিল কেশরলাল।"

রমণী এই কেশরলাল শব্দটির উপর তাহার নারীকণ্ঠের সমস্ত সংগীত যেন একেবারে এক মুহূর্তে উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিল। আমি ছড়িটা ভূমিতে রাখিয়া নড়িয়া-চড়িয়া খাড়া হইয়া বসিলাম।

"কেশরলাল পরম হিন্দু ছিল। আমি প্রত্যহ প্রত্যূষে উঠিয়া অন্তঃপুরের গবাক্ষ হইতে দেখিতাম, কেশরলাল আবক্ষ যমুনার জলে নিমগ্ন হইয়া প্রদক্ষিণ করিতে করিতে জোড়করে ঊর্ধ্বমুখে নবোদিতসূর্যের উদ্দেশে অঞ্জলি প্রদান করিত। পরে সিক্তবস্ত্রে ঘাটে বসিয়া একাগ্রমনে জপ সমাপন করিয়া পরিষ্কার সুকণ্ঠে ভৈরোঁরাগে ভজনগান করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া আসিত।

আমি মুসলমানবালিকা ছিলাম কিন্তু কখনো স্বধর্মের কথা শুনি নাই এবং স্বধর্মসংগত উপাসনাবিধিও জানিতাম না; তখনকার দিনে বিলাসে মদ্যপানে স্বেচ্ছাচারে আমাদের পুরুষের মধ্যে ধর্মবন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছিল এবং অন্তঃপুরের প্রমোদ-ভবনেও ধর্ম সজীব ছিল না।

বিধাতা আমার মনে বোধ করি স্বাভাবিক ধর্মপিপাসা দিয়াছিলেন, অথবা আর-কোনো নিগূঢ় কারণ ছিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু প্রত্যহ প্রশান্ত প্রভাতে নবোন্মেষিত অরুণালোকে নিস্তরঙ্গ নীল যমুনার নির্জন শ্বেত সোপানতটে কেশরলালের পূজার্চনাদৃশ্যে আমার সদ্যসুপ্তোত্থিত অন্তঃকরণ একটি অব্যক্ত ভক্তিমাধুর্যে পরিপ্লুত হইয়া যাইত।

নিয়ত সংযত শুদ্ধাচারে ব্রাহ্মণ কেশরলালের গৌরবর্ণ প্রাণসার সুন্দর তনু দেহখানি ধূমলেশহীন জ্যোতিঃশিখার মতো বোধ হইত; ব্রাহ্মণের পুণ্যমাহাত্ম্য অপূর্ব শ্রদ্ধাভরে এই মুসলমানদুহিতার মূঢ় হৃদয়কে বিনম্র করিয়া দিত।

আমার একটি হিন্দু বাঁদি ছিল, সে প্রতিদিন নত হইয়া প্রণাম করিয়া কেশরলালের পদধূলি লইয়া আসিত, দেখিয়া আমার আনন্দও হইত ঈর্ষাও জন্মিত। ক্রিয়াকর্ম-পার্বণ উপলক্ষে এই বন্দিনী মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া দক্ষিণা দিত। আমি নিজে হইতে তাহাকে অর্থসাহায্য করিয়া বলিতাম, 'তুই কেশরলালকে নিমন্ত্রণ করিবি না?' সে জিভ কাটিয়া বলিত, 'কেশরলালঠাকুর কাহারো অন্নগ্রহণ বা দানপ্রতিগ্রহ করেন না।'

এইরূপে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কেশরলালকে কোনোরূপ ভক্তিচিহ্ন দেখাইতে না পারিয়া আমার চিত্ত যেন ক্ষুব্ধ ক্ষুধাতুর হইয়া থাকিত।

আমাদের পূর্বপুরুষের কেহ-একজন একটি ব্রাহ্মণকন্যাকে বলপূর্বক বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন, আমি অন্তঃপুরের প্রান্তে বসিয়া তাঁহারই পুণ্যরক্তপ্রবাহ আপন শিরার মধ্যে অনুভব করিতাম, এবং সেই রক্তসূত্রে কেশরলালের সহিত একটি ঐক্যসম্বন্ধ কল্পনা করিয়া কিয়ৎপরিমাণে তৃপ্তি বোধ হইত।

আমার হিন্দু দাসীর নিকট হিন্দুধর্মের সমস্ত আচার ব্যবহার, দেবদেবীর সমস্ত

আশ্চর্য কাহিনী, রামায়ণ-মহাভারতের সমস্ত অপূর্ব ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া শুনিতাম, শুনিয়া সেই অবরুদ্ধ অন্তঃপুরের প্রান্তে বসিয়া হিন্দুজগতের এক অপরূপ দৃশ্য আমার মনের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইত। মূর্তিপ্রতিমূর্তি, শঙ্খঘণ্টাধ্বনি, স্বর্ণচূড়াখচিত দেবালয়, ধূপধুনার ধূম, অগুরুচন্দনমিশ্রিত পুষ্পরাশির সুগন্ধ, যোগীসন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতা, ব্রাহ্মণের অমানুষিক মাহাত্ম্য, মানুষ-ছদ্মবেশধারী দেবতাদের বিচিত্র লীলা, সমস্ত জড়িত হইয়া আমার নিকটে এক অতিপুরাতন অতিবিস্তীর্ণ অতিসুন্দর অপ্রাকৃত মায়ালোক সৃজন করিত; আমার চিত্ত যেন নীড়হারা ক্ষুদ্র পক্ষীর ন্যায় প্রদোষকালের একটি প্রকাণ্ড প্রাচীন প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইত। হিন্দুসংসার আমার বালিকাহৃদয়ের নিকট একটি পরমরমণীয় রূপকথার রাজ্য ছিল।

এমন সময় কোম্পানি বাহাদুরের সহিত সিপাহিলোকের লড়াই বাধিল। আমাদের বদ্রাওনের ক্ষুদ্র কেল্লাটির মধ্যেও বিপ্লবের তরঙ্গ জাগিয়া উঠিল।

কেশরলাল বলিল, 'এইবার গো-খাদক গোরালোককে আর্যাবর্ত হইতে দূর করিয়া দিয়া আর-একবার হিন্দুস্থানে হিন্দুমুসলমানে রাজপদ লইয়া দ্যূতক্রীড়া বসাইতে হইবে।'

আমার পিতা গোলামকাদের খাঁ সাবধানী লোক ছিলেন; তিনি ইংরাজ জাতিকে কোনো একটি বিশেষ কুটুম্বসম্ভাষণে অভিহিত করিয়া বলিলেন, 'উহারা অসাধ্য সাধন করিতে পারে, হিন্দুস্থানের লোক উহাদের সহিত পারিয়া উঠিবে না। আমি অনিশ্চিত প্রত্যাশে আমার এই ক্ষুদ্র কেল্লাটুকু খোয়াইতে পারিব না, আমি কোম্পানিবাহাদুরের সহিত লড়িব না।'

যখন হিন্দুস্থানের সমস্ত হিন্দুমুসলমানের রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, তখন আমার পিতার এই বণিকের মতো সাবধানতায় আমাদের সকলের মনেই ধিক্কার উপস্থিত হইল। আমার বেগম মাতৃগণ পর্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

এমন সময় ফৌজ লইয়া সশস্ত্র কেশরলাল আসিয়া আমার পিতাকে বলিলেন, 'নবাবসাহেব, আপনি যদি আমাদের পক্ষে যোগ না দেন তবে যতদিন লড়াই চলে আপনাকে বন্দী রাখিয়া আপনার কেল্লার আধিপত্যভার আমি গ্রহণ করিব।'

পিতা বলিলেন, 'সে-সমস্ত হাঙ্গামা কিছুই করিতে হইবে না, তোমাদের পক্ষে আমি রহিব।'

কেশরলাল কহিলেন, 'ধনকোষ হইতে কিছু অর্থ বাহির করিতে হইবে।'

পিতা বিশেষ কিছু দিলেন না, কহিলেন, 'যখন যেমন আবশ্যক হইবে আমি দিব।'

আমার সীমন্ত হইতে পদাঙ্গুলি পর্যন্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যতকিছু ভূষণ ছিল সমস্ত কাপড়ে বাঁধিয়া আমার হিন্দু দাসী দিয়া গোপনে কেশরলালের নিকট পাঠাইয়া দিলাম। তিনি গ্রহণ করিলেন। আনন্দে আমার ভূষণবিহীন প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

কেশরলাল মরিচাপড়া বন্দুকের চোঙ এবং পুরাতন তলোয়ারগুলি মাজিয়া ঘষিয়া সাফ করিতে প্রস্তুত হইলেন, এমন সময় হঠাৎ একদিন অপরাহ্ণে জিলার কমিশনার সাহেব লালকুর্তি গোরা লইয়া আকাশে ধুলা উড়াইয়া আমাদের কেল্লার মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

আমার পিতা গোলামকাদের খাঁ গোপনে তাঁহাকে বিদ্রোহসংবাদ দিয়াছিলেন।

বদ্রাওনের ফৌজের উপর কেশরলালের এমন একটি অলৌকিক আধিপত্য ছিল যে, তাঁর কথায় তাহারা ভাঙা বন্দুক ও ভোঁতা তরবারি হস্তে লড়াই করিয়া মরিতে প্রস্তুত হইল।

বিশ্বাসঘাতক পিতার গৃহ আমার নিকট নরকের মতো বোধ হইল। ক্ষোভে দুঃখে লজ্জায় ঘৃণায় বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, তবু চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল বাহির হইল না। আমার ভীরু ভ্রাতার পরিচ্ছদ পরিয়া ছদ্মবেশে অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া গেলাম, কাহারো দেখিবার অবকাশ ছিল না।

তখন ধুলা এবং বারুদের ধোঁয়া, সৈনিকের চিৎকার এবং বন্দুকের শব্দ থামিয়া গিয়া মৃত্যুর ভীষণ শান্তি জলস্থল-আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছে। যমুনার জল রক্তরাগে রঞ্জিত করিয়া সূর্য অস্ত গিয়াছে, সন্ধ্যাকাশে শুক্লপক্ষের পরিপূর্ণপ্রায় চন্দ্রমা।

রণক্ষেত্র মৃত্যুর বিকট দৃশ্যে আকীর্ণ। অন্য সময় হইলে করুণায় আমার বক্ষ ব্যথিত হইয়া উঠিত, কিন্তু সেদিন স্বপ্নাবিষ্টের মতো আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, খুঁজিতেছিলাম কোথায় আছে কেশরলাল, সেই একমাত্র লক্ষ্য ছাড়া আর সমস্ত আমার নিকট অলীক বোধ হইতেছিল।

খুঁজিতে খুঁজিতে রাত্রি দ্বিপ্রহরে উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইলাম, রণক্ষেত্রের অদূরে যমুনাতীরের আম্রকাননচ্ছায়ায় কেশরলাল এবং তাঁহার ভক্তভৃত্য দেওকিনন্দনের মৃতদেহ পড়িয়া আছে। বুঝিতে পারিলাম, সাংঘাতিক আহত অবস্থায়, হয় প্রভু ভৃত্যকে অথবা ভৃত্য প্রভুকে রণক্ষেত্র হইতে এই নিরাপদ স্থানে বহন করিয়া আনিয়া শান্তিতে মৃত্যুহস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

প্রথমেই আমি আমার বহুদিনের বুভুক্ষিত ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিলাম। কেশরলালের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া আমার আজানুলম্বিত কেশজাল উন্মুক্ত

করিয়া দিয়া বারম্বার তাঁহার পদধূলি মুছিয়া লইলাম, আমার উত্তপ্ত ললাটে তাঁহার হিমশীতল পাদপদ্ম তুলিয়া লইলাম, তাঁহার চরণ চুম্বন করিবামাত্র বহুদিবসের নিরুদ্ধ অশ্রুরাশি উচ্ছ্বসিত উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে কেশরলালের দেহ বিচলিত হইল, এবং সহসা তাঁহার মুখ হইতে বেদনার অস্ফুট আর্তস্বর শুনিয়া আমি তাঁহার চরণতল ছাড়িয়া চমকিয়া উঠিলাম; শুনিলাম নিমীলিত নেত্রে শুষ্ক কণ্ঠে একবার বলিলেন 'জল'।

আমি তৎক্ষণাৎ আমার গাত্রবস্ত্র যমুনার জলে ভিজাইয়া ছুটিয়া চলিয়া আসিলাম। বসন নিংড়াইয়া কেশরলালের আমীলিত ওষ্ঠাধরের মধ্যে জল দিতে লাগিলাম, এবং বামচক্ষু নষ্ট করিয়া তাঁহার কপালে যে নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছিল সেই আহত স্থানে আমার সিক্ত বসনপ্রান্ত ছিঁড়িয়া বাঁধিয়া দিলাম।

এমনি বারকতক যমুনা হইতে জল আনিয়া তাঁহার মুখে চক্ষে সিঞ্চন করার পর অল্পে অল্পে চেতনার সঞ্চার হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আর জল দিব?' কেশরলাল কহিলেন, 'কে তুমি।' আমি আর থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম, 'অধীনা আপনার ভক্ত সেবিকা। আমি নবাব গোলামকাদের খাঁর কন্যা।' মনে করিয়াছিলাম, কেশরলাল আসন্ন মৃত্যুকালে তাঁহার ভক্তের শেষ পরিচয় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন, এ সুখ হইতে আমাকে কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবে না।

আমার পরিচয় পাইবামাত্র কেশরলাল সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'বেইমানের কন্যা, বিধর্মী! মৃত্যুকালে যবনের জল দিয়া তুই আমার ধর্ম নষ্ট করিলি!' এই বলিয়া প্রবল বলে আমার কপোলদেশে দক্ষিণ করতলের আঘাত করিলেন, আমি মূর্ছিতপ্রায় হইয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম।

তখন আমি ষোড়শী, প্রথম দিন অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়াছি, তখনো বহিরাকাশের লুব্ধ তপ্ত সূর্যকর আমার সুকুমার কপোলের রক্তিম লাবণ্যবিভা অপহরণ করিয়া লয় নাই, সেই বহিঃসংসারে পদক্ষেপ করিবামাত্র সংসারের নিকট হইতে, আমার সংসারের দেবতার নিকট হইতে এই প্রথম সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইলাম।"

আমি নির্বাপিত-সিগারেটে এতক্ষণ মোহমুগ্ধ চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া ছিলাম। গল্প শুনিতেছিলাম, কি ভাষা শুনিতেছিলাম, কি সংগীত শুনিতেছিলাম জানি না, আমার মুখে একটি কথা ছিল না। এতক্ষণ পরে আমি আর থাকিতে পারিলাম না, হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম, "জানোয়ার।"

নবাবজাদী কহিলেন, "কে জানোয়ার! জানোয়ার কি মৃত্যুযন্ত্রণার সময় মুখের নিকট সমাহৃত জলবিন্দু পরিত্যাগ করে।"

আমি অপ্রতিভ হইয়া কহিলাম, "তা বটে। সে দেবতা।"

নবাবজাদী কহিলেন, "কিসের দেবতা! দেবতা কি ভক্তের একাগ্রচিত্তের সেবা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে!"

আমি বলিলাম, "তাও ঘটে।" বলিয়া চুপ করিয়া গেলাম।

নবাবপুত্রী কহিতে লাগিলেন, "প্রথমটা আমার বড়ো বিষম বাজিল। মনে হইল, সমস্ত বিশ্বজগৎ হঠাৎ আমার মাথার উপর চুরমার হইয়া ভাঙিয়া পড়িয়া গেল। মুহূর্তের মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া সেই কঠোর কঠিন নিষ্ঠুর নির্বিকার পবিত্র বীর ব্রাহ্মণের পদতলে দূর হইতে প্রণাম করিলাম— মনে মনে কহিলাম, হে ব্রাহ্মণ, তুমি হীনের সেবা, পরের অন্ন, ধনীর দান, যুবতীর যৌবন, রমণীর প্রেম কিছুই গ্রহণ কর না; তুমি স্বতন্ত্র, তুমি একাকী, তুমি নির্লিপ্ত, তুমি সুদূর, তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করিবার অধিকারও আমার নাই!

নবাবদুহিতাকে ভূলুণ্ঠিতমস্তকে প্রণাম করিতে দেখিয়া কেশরলাল কী মনে করিল বলিতে পারি না, কিন্তু তাহার মুখে বিস্ময় অথবা কোনো ভাবান্তর প্রকাশ পাইল না। শান্তভাবে একবার আমার মুখের দিকে চাহিল; তাহার পরে ধীরে ধীরে উঠিল। আমি সচকিত হইয়া আশ্রয় দিবার জন্য আমার হস্ত প্রসারণ করিলাম, সে তাহা নীরবে প্রত্যাখ্যান করিল, এবং বহু কষ্টে যমুনার ঘাটে গিয়া অবতীর্ণ হইল। সেখানে একটি খেয়ানৌকা বাঁধা ছিল। পার হইবার লোকও ছিল না, পার করিবার লোকও ছিল না। সেই নৌকার উপর উঠিয়া কেশরলাল বাঁধন খুলিয়া দিল, নৌকা দেখিতে দেখিতে মধ্যস্রোতে গিয়া ক্রমশ অদৃশ্য হইয়া গেল— আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল, সমস্ত হৃদয়ভার, সমস্ত যৌবনভার, সমস্ত অনাদৃত ভক্তিভার লইয়া সেই অদৃশ্য নৌকার অভিমুখে জোড়কর করিয়া সেই নিস্তব্ধ নিশীথে সেই চন্দ্রালোকপুলকিত নিস্তরঙ্গ যমুনার মধ্যে অকাল-বৃন্তচ্যুত পুষ্পমঞ্জরীর ন্যায় এই ব্যর্থ জীবন বিসর্জন করি।

কিন্তু পারিলাম না। আকাশের চন্দ্র, যমুনাপারের ঘনকৃষ্ণ বনরেখা, কালিন্দীর নিবিড় নীল নিষ্কম্প জলরাশি, দূরে আম্রবনের ঊর্ধ্বে আমাদের জ্যোৎস্নাচিক্কণ কেল্লার চূড়াগ্রভাগ, সকলেই নিঃশব্দগম্ভীর ঐকতানে মৃত্যুর গান গাহিল; সেই নিশীথে গ্রহচন্দ্রতারাখচিত নিস্তব্ধ তিন ভুবন আমাকে একবাক্যে মরিতে কহিল। কেবল

বীচিভঙ্গবিহীন প্রশান্ত যমুনাবক্ষোবাহিত একখানি অদৃশ্য জীর্ণ নৌকা সেই জ্যোৎস্না রজনীর সৌম্যসুন্দর শান্তশীতল অনন্ত ভুবনমোহন মৃত্যুর প্রসারিত আলিঙ্গনপাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আমাকে জীবনের পথে টানিয়া লইয়া চলিল। আমি মোহ-স্বপ্নাভিহতার ন্যায় যমুনার তীরে তীরে কোথাও-বা কাশবন, কোথাও-বা মরুবালুকা কোথাও-বা বন্ধুর বিদীর্ণ তট, কোথাও-বা ঘনগুল্মদুর্গম বনখণ্ডের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলাম।"

এইখানে বক্তা চুপ করিল। আমিও কোনো কথা কহিলাম না।

অনেকক্ষণ পরে নবাবদুহিতা কহিল, "ইহার পরে ঘটনাবলী বড়ো জটিল। সে কেমন করিয়া বিশ্লেষ করিয়া পরিষ্কার করিয়া বলিব জানি না। একটা গহন অরণ্যের মাঝখান দিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম, ঠিক কোন্ পথ দিয়া কখন চলিয়াছিলাম সে কি আর খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি। কোথায় আরম্ভ করিব, কোথায় শেষ করিব, কোন্‌টা ত্যাগ করিব, কোন্‌টা রাখিব, সমস্ত কাহিনীকে কী উপায়ে এমন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিব যাহাতে কিছুই অসাধ্য অসম্ভব অপ্রকৃত বোধ না হয়।

কিন্তু জীবনের এই কয়টা দিনে ইহা বুঝিয়াছি যে, অসাধ্য অসম্ভব কিছুই নাই। নবাব-অন্তঃপুরের বালিকার পক্ষে বাহিরের সংসার একান্ত দুর্গম বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহা কাল্পনিক; একবার বাহির হইয়া পড়িলে একটা চলিবার পথ থাকেই। সে-পথ নবাবি পথ নহে, কিন্তু পথ; সে-পথে মানুষ চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে— তাহা বন্ধুর বিচিত্র সীমাহীন, তাহা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত, তাহা সুখেদুঃখে বাধাবিঘ্নে জটিল, কিন্তু তাহা পথ।

এই সাধারণ মানবের পথে একাকিনী নবাবদুহিতার সুদীর্ঘ ভ্রমণবৃত্তান্ত সুখশ্রাব্য হইবে না, হইলেও সে-সব কথা বলিবার উৎসাহ আমার নাই। এক কথায়, দুঃখকষ্ট বিপদ অবমাননা অনেক ভোগ করিতে হইয়াছে, তবু জীবন অসহ্য হয় নাই। আতশবাজির মতো যত দাহন ততই উদ্দাম গতি লাভ করিয়াছি। যতক্ষণ বেগে চলিয়াছিলাম ততক্ষণ পুড়িতেছি বলিয়া বোধ ছিল না, আজ হঠাৎ সেই পরম দুঃখের সেই চরম সুখের আলোকশিখাটি নিবিয়া গিয়া এই পথপ্রান্তের ধূলির উপর জড়-পদার্থের ন্যায় পড়িয়া গিয়াছি— আজ আমার যাত্রা শেষ হইয়া গেছে, এইখানেই আমার কাহিনী সমাপ্ত।"

এই বলিয়া নবাবপুত্রী থামিল। আমি মনে মনে ঘাড় নাড়িলাম; এখানে তো

কোনোমতেই শেষ হয় না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভাঙা হিন্দিতে বলিলাম, "বেয়াদপি মাপ করিবেন, শেষদিককার কথাটা আর অল্প একটু খোলসা করিয়া বলিলে অধীনের মনের ব্যাকুলতা অনেকটা হ্রাস হয়।"

নবাবপুত্রী হাসিলেন। বুঝিলাম, আমার ভাঙা হিন্দিতে ফল হইয়াছে। যদি আমি খাস হিন্দিতে বাৎ চালাইতে পারিতাম তাহা হইলে আমার কাছে তাঁহার লজ্জা ভাঙিত না, কিন্তু আমি যে তাঁহার মাতৃভাষা অতি অল্পই জানি সেইটেই আমাদের উভয়ের মধ্যে বৃহৎ ব্যবধান, সেইটেই একটা আব্রু।

তিনি পুনরায় আরম্ভ করিলেন, "কেশরলালের সংবাদ আমি প্রায়ই পাইতাম কিন্তু কোনোমতেই তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারি নাই। তিনি তাঁতিয়াটোপির দলে মিশিয়া সেই বিপ্লবাচ্ছন্ন আকাশতলে অকস্মাৎ কখনো পূর্বে, কখনো পশ্চিমে, কখনো ঈশানে, কখনো নৈর্ঋতে, বজ্রপাতের মতো মুহূর্তের মধ্যে ভাঙিয়া পড়িয়া, মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হইতেছিলেন।

আমি তখন যোগিনী সাজিয়া কাশীর শিবানন্দস্বামীকে পিতৃসম্বোধন করিয়া তাঁহার নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলাম। ভারতবর্ষের সমস্ত সংবাদ তাঁহার পদতলে আসিয়া সমাগত হইত, আমি ভক্তিভরে শাস্ত্র শিক্ষা করিতাম এবং মর্মান্তিক উদ্‌বেগের সহিত যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহ করিতাম।

ক্রমে ব্রিটিশরাজ হিন্দুস্থানের বিদ্রোহবহ্নি পদতলে দলন করিয়া নিবাইয়া দিল। তখন সহসা কেশরলালের সংবাদ আর পাওয়া গেল না। ভীষণ প্রলয়ালোকের রক্ত-রশ্মিতে ভারতবর্ষের দূরদুরান্তর হইতে যে-সকল বীর-মূর্তি ক্ষণে ক্ষণে দেখা যাইতেছিল, হঠাৎ তাহারা অন্ধকারে পড়িয়া গেল।

তখন আমি আর থাকিতে পারিলাম না। গুরুর আশ্রয় ছাড়িয়া ভৈরবীবেশে আবার বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে পথে, তীর্থে তীর্থে, মঠে মন্দিরে ভ্রমণ করিয়াছি, কোথাও কেশরলালের কোনো সন্ধান পাই নাই। দুই-একজন যাহারা তাহার নাম জানিত, কহিল, 'সে হয় যুদ্ধে নয় রাজদণ্ডে মৃত্যু লাভ করিয়াছে।' আমার অন্তরাত্মা কহিল, 'কখনো নহে, কেশরলালের মৃত্যু নাই।—সেই ব্রাহ্মণ সেই দুঃসহ জলদগ্নি কখনো নির্বাণ পায় নাই, আমার আত্মাহুতি গ্রহণ করিবার জন্য সে এখনো কোন্ দুর্গম নির্জন যজ্ঞবেদীতে ঊর্ধ্বশিখা হইয়া জ্বলিতেছে।'

হিন্দুশাস্ত্রে আছে জ্ঞানের দ্বারা তপস্যার দ্বারা শূদ্র ব্রাহ্মণ হইয়াছে, মুসলমান

ব্রাহ্মণ হইতে পারে কি না সে কথার কোনো উল্লেখ নাই ; তাহার একমাত্র কারণ তখন মুসলমান ছিল না। আমি জানিতাম কেশরলালের সহিত আমার মিলনের বহু বিলম্ব আছে, কারণ তৎপূর্বে আমাকে ব্রাহ্মণ হইতে হইবে। একে একে ত্রিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইল। আমি অন্তরে বাহিরে আচারে ব্যবহারে কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মণ হইলাম, আমার সেই ব্রাহ্মণ পিতামহীর রক্ত নিষ্কলুষতেজে আমার সর্বাঙ্গে প্রবাহিত হইল, আমি মনে মনে আমার সেই যৌবনারম্ভের প্রথম ব্রাহ্মণ, আমার যৌবনশেষের শেষ ব্রাহ্মণ, আমার ত্রিভুবনের এক ব্রাহ্মণের পদতলে সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া একটি অপরূপ দীপ্তিলাভ করিলাম।

যুদ্ধবিপ্লবের মধ্যে কেশরলালের বীরত্বের কথা আমি অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু সে কথা আমার হৃদয়ে মুদ্রিত হয় নাই। আমি সেই যে দেখিয়াছিলাম, নিঃশব্দে জ্যোৎস্নানিশীথে নিস্তব্ধ যমুনার মধ্যস্রোতে একখানি ক্ষুদ্র নৌকার মধ্যে একাকী কেশরলাল ভাসিয়া চলিয়াছে, সেই চিত্রই আমার মনে অঙ্কিত হইয়া আছে। আমি কেবল অহরহ দেখিতেছিলাম, ব্রাহ্মণ নির্জন স্রোত বাহিয়া নিশিদিন কোন্ অনির্দেশ মহারহস্যাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, তাহার কোনো সঙ্গী নাই, সেবক নাই, কাহাকেও তাহার কোনো আবশ্যক নাই, সেই নির্মল আত্মনিমগ্ন পুরুষ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ; আকাশের গ্রহচন্দ্রতারা তাহাকে নিঃশব্দে নিরীক্ষণ করিতেছে।

এমন সময় সংবাদ পাইলাম, কেশরলাল রাজদণ্ড হইতে পলায়ন করিয়া নেপালে আশ্রয় লইয়াছে। আমি নেপালে গেলাম। সেখানে দীর্ঘকাল বাস করিয়া সংবাদ পাইলাম, কেশরলাল বহুকাল হইল নেপাল ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে কেহ জানে না।

তাহার পর হইতে পাহাড়ে পাহাড়ে ভ্রমণ করিতেছি। এ হিন্দুর দেশ নহে— ভুটিয়া লেপচাগণ ম্লেচ্ছ, ইহাদের আহারব্যবহারে আচারবিচার নাই, ইহাদের দেবতা ইহাদের পূজার্চনাবিধি সকলই স্বতন্ত্র। বহুদিনের সাধনায় আমি যে বিশুদ্ধ শুচিতা লাভ করিয়াছি, ভয় হইতে লাগিল, পাছে তাহাতে রেখামাত্র চিহ্ন পড়ে। আমি বহু চেষ্টায় আপনাকে সর্বপ্রকার মলিন সংস্পর্শ হইতে রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলাম। আমি জানিতাম, আমার তরী তীরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, আমার জীবনের চরমতীর্থ অনতিদূরে।

তাহার পরে আর কী বলিব। শেষ কথা অতি স্বল্প। প্রদীপ যখন নেবে

তখন একটি ফুৎকারেই নিবিয়া যায়, সে কথা আর সুদীর্ঘ করিয়া কী ব্যাখ্যা করিব।

আটত্রিশ বৎসর পরে এই দার্জিলিঙে আসিয়া আজ প্রাতঃকালে কেশরলালের দেখা পাইয়াছি।"

বক্তাকে এইখানে ক্ষান্ত হইতে দেখিয়া আমি ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, "কী দেখিলেন।"

নবাবপুত্রী কহিলেন, "দেখিলাম, বৃদ্ধ কেশরলাল ভুটিয়াপল্লীতে ভুটিয়া স্ত্রী এবং তাহার গর্ভজাত পৌত্রপৌত্রী লইয়া ম্লানবস্ত্রে মলিন অঙ্গনে ভুট্টা হইতে শস্য সংগ্রহ করিতেছে।"

গল্প শেষ হইল। আমি ভাবিলাম, একটা সান্ত্বনার কথা বলা আবশ্যক। কহিলাম, "আটত্রিশ বৎসর একাদিক্রমে যাহাকে প্রাণভয়ে বিজাতীয়ের সংস্রবে অহরহ থাকিতে হইয়াছে সে কেমন করিয়া আপন আচার রক্ষা করিবে।"

নবাবকন্যা কহিলেন, "আমি কি তাহা বুঝি না। কিন্তু এতদিন আমি কী মোহ লইয়া ফিরিতেছিলাম! যে ব্রহ্মণ্য আমার কিশোর হৃদয় হরণ করিয়া লইয়াছিল আমি কি জানিতাম, তাহা অভ্যাস তাহা সংস্কার মাত্র। আমি জানিতাম, তাহা ধর্ম, তাহা অনাদি অনন্ত। তাহাই যদি না হইবে তবে ষোলোবৎসর বয়সে প্রথম পিতৃগৃহ হইতে বাহির হইয়া সেই জ্যোৎস্নানিশীথে আমার বিকশিত পুষ্পিত ভক্তিবেগ-কম্পিত দেহমনপ্রাণের প্রতিদানে ব্রাহ্মণের দক্ষিণ হস্ত হইতে যে দুঃসহ অপমান প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কেন তাহা গুরুহস্তের দীক্ষার ন্যায় নিঃশব্দে অবনত মস্তকে দ্বিগুণিত ভক্তিভরে শিরোধার্য করিয়া লইয়াছিলাম। হায় ব্রাহ্মণ, তুমি তো তোমার এক অভ্যাসের পরিবর্তে আর এক অভ্যাস লাভ করিয়াছ, আমি আমার এক যৌবন এক জীবনের পরিবর্তে আর-এক জীবন যৌবন কোথায় ফিরিয়া পাইব।"

এই বলিয়া রমণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "নমস্কার বাবুজি!"

মুহূর্তপরেই যেন সংশোধন করিয়া কহিল, "সেলাম বাবুসাহেব!" এই মুসলমান-অভিবাদনের দ্বারা সে যেন জীর্ণভিত্তি ধূলিশায়ী ভগ্ন ব্রহ্মণ্যের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিল। আমি কোনো কথা না বলিতেই সে সেই হিমাদ্রিশিখরের ধূসর কুজ্ঝটিকারাশির মধ্যে মেঘের মতো মিলাইয়া গেল।

আমি ক্ষণকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সমস্ত ঘটনাবলী মানসপটে চিত্রিত দেখিতে

লাগিলাম। মছলন্দের আসনে যমুনাতীরের গবাক্ষে সুখাসীনা ষোড়শী নবাব-বালিকাকে দেখিলাম, তীর্থমন্দিরে সন্ধ্যারতিকালে তপস্বিনীর ভক্তিগদ্গদ একাগ্র মূর্তি দেখিলাম, তাহার পরে এই দার্জিলিঙে ক্যালকাটা রোডের প্রান্তে প্রবীণার কুহেলিকাচ্ছন্ন ভগ্নহৃদয়ভারকাতর নৈরাশ্যমূর্তিও দেখিলাম, একটি সুকুমার রমণীদেহে ব্রাহ্মণমুসলমানের রক্ততরঙ্গের বিপরীত সংঘর্ষজনিত বিচিত্র ব্যাকুল সংগীতধ্বনি সুন্দর সুসম্পূর্ণ উর্দু ভাষায় বিগলিত হইয়া আমার মস্তিষ্কের মধ্যে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

চক্ষু খুলিয়া দেখিলাম, হঠাৎ মেঘ কাটিয়া গিয়া স্নিগ্ধ রৌদ্রে নির্মল আকাশ ঝলমল করিতেছে, ঠেলাগাড়িতে ইংরাজ রমণী ও অশ্বপৃষ্ঠে ইংরাজ পুরুষগণ বায়ুসেবনে বাহির হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে দুই-একটি বাঙালির গলাবন্ধবিজড়িত মুখমণ্ডল হইতে আমার প্রতি সকৌতুক কটাক্ষ বর্ষিত হইতেছে।

দ্রুত উঠিয়া পড়িলাম, এই সূর্যালোকিত অনাবৃত জগৎদৃশ্যের মধ্যে সেই মেঘাচ্ছন্ন কাহিনীকে আর সত্য বলিয়া মনে হইল না। আমার বিশ্বাস, আমি পর্বতের কুয়াশার সহিত আমার সিগারেটের ধূম ভূরিপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া একটি কল্পনাখণ্ড রচনা করিয়াছিলাম— সেই মুসলমানব্রাহ্মণী, সেই বিপ্রবীর, সেই যমুনা-তীরের কেল্লা, কিছুই হয়তো সত্য নহে।

বৈশাখ ১৩০৫

পুত্রযজ্ঞ

বৈদ্যনাথ গ্রামের মধ্যে বিজ্ঞ ছিলেন সেইজন্য তিনি ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বর্তমানের সমস্ত কাজ করিতেন। যখন বিবাহ করিলেন তখন তিনি বর্তমান নববধূর অপেক্ষা ভাবী নবকুমারের মুখ স্পষ্টতররূপে দেখিতে পাইয়াছিলেন। শুভদৃষ্টির সময় এতটা দূরদৃষ্টি প্রায় দেখা যায় না। তিনি পাকা লোক ছিলেন সেইজন্য প্রেমের চেয়ে পিণ্ডটাকেই অধিক বুঝিতেন এবং পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা এই মর্মেই তিনি বিনোদিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

কিন্তু এ সংসারে বিজ্ঞ লোকও ঠকে। যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াও যখন বিনোদিনী তাহার সর্বপ্রধান কর্তব্যটি পালন করিল না তখন পুন্নাম নরকের দ্বার খোলা দেখিয়া বৈদ্যনাথ বড়ো চিন্তিত হইলেন। মৃত্যুর পরে তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্যই বা কে ভোগ

করিবে এই ভাবনায় মৃত্যুর পূর্বে তিনি সেই ঐশ্বর্য ভোগ করিতে একপ্রকার বিমুখ হইলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, বর্তমানের অপেক্ষা ভবিষ্যৎটাকেই তিনি সত্য বলিয়া জানিতেন।

কিন্তু যুবতী বিনোদিনীর নিকট হঠাৎ এতটা প্রাজ্ঞতা প্রত্যাশা করা যায় না। সে বেচারার দুর্মূল্য বর্তমান তাহার নববিকশিত যৌবন বিনা প্রেমে বিফলে অতিবাহিত হইয়া যায়, এইটেই তাহার পক্ষে সবচেয়ে শোচনীয় ছিল। পারলৌকিক পিণ্ডের ক্ষুধাটা সে ইহলৌকিক চিত্তক্ষুধাদাহে একেবারেই ভুলিয়া বসিয়াছিল, মনুর পবিত্র বিধান এবং বৈদ্যনাথের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় তাহার বুভুক্ষিত হৃদয়ে তিলমাত্র তৃপ্তি হইল না।

যে যাহাই বলুক, এই বয়সটাতে ভালোবাসা দেওয়া এবং ভালোবাসা পাওয়াই রমণীর সকল সুখ এবং সকল কর্তব্যের চেয়ে স্বভাবতই বেশি মনে হয়।

কিন্তু বিনোদার ভাগ্যে নবপ্রেমের বর্ষাবারিসিঞ্চনের বদলে স্বামীর, পিস্‌শাশুড়ির এবং অন্যান্য গুরু ও গুরুতর লোকের সমুচ্চ আকাশ হইতে তর্জন-গর্জনের শিলাবৃষ্টি ব্যবস্থা হইল। সকলেই তাহাকে বন্ধ্যা বলিয়া অপরাধী করিত। একটা ফুলের চারাকে আলোক এবং বাতাস হইতে রুদ্ধঘরে রাখিলে তাহার যেরূপ অবস্থা হয়, বিনোদার বঞ্চিত যৌবনেরও সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল।

সদাসর্বদা এইসকল চাপাচুপি ও বকাবকির মধ্যে থাকিতে না পারিয়া যখন সে কুসুমের বাড়ি তাস খেলিতে যাইত সেই সময়টা তাহার বড়ো ভালো লাগিত। সেখানে পুংনরকের ভীষণ ছায়া সর্বদা বর্তমান না থাকাতে হাসি-ঠাট্টা-গল্পের কোনো বাধা ছিল না।

কুসুম যেদিন তাস খেলিবার কাত না পাইত সেদিন তাহার তরুণ দেবর নগেন্দ্রকে ধরিয়া আনিত। নগেন্দ্র ও বিনোদার আপত্তি হাসিয়া উড়াইয়া দিত। এ সংসারে এক হইতে আর হয় এবং খেলা ক্রমে সংকটে পরিণত হইতে পারে, এ-সব গুরুতর কথা অল্পবয়সে হঠাৎ বিশ্বাস হয় না।

এ সম্বন্ধে নগেন্দ্রেরও আপত্তির দৃঢ়তা কিছুমাত্র দেখা গেল না, এখন আর সে তাস খেলিবার জন্য অধিক পীড়াপীড়ির অপেক্ষা করিতে পারে না।

এইরূপে বিনোদার সহিত নগেন্দ্রের প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ হইতে লাগিল।

নগেন্দ্র যখন তাস খেলিতে বসিত তখন তাসের অপেক্ষা সজীবতর পদার্থের প্রতি তাহার নয়নমন পড়িয়া থাকাতে খেলায় প্রায়ই হারিতে লাগিল। পরাজয়ের প্রকৃত কারণ বুঝিতে কুসুম এবং বিনোদার কাহারো বাকি রহিল না। পূর্বেই বলিয়াছি,

কর্মফলের গুরুত্ব বোঝা অল্প বয়সের কর্ম নহে। কুসুম মনে করিত, এ একটা বেশ মজা হইতেছে, এবং মজাটা ক্রমে ষোলো-আনায় সম্পূর্ণ হইয়া উঠে ইহাতে তাহার একটা আগ্রহ ছিল। ভালোবাসার নবাঙ্কুরে গোপনে জলসিঞ্চন তরুণীদের পক্ষে বড়ো কৌতুকের।

বিনোদারও মন্দ লাগিল না। হৃদয়জয়ের সুতীক্ষ্ণ ক্ষমতাটা একজন পুরুষ মানুষের উপর শাণিত করিবার ইচ্ছা অন্যায় হইতে পারে, কিন্তু নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে।

এইরূপে তাসের হারজিৎ ও ছক্কাপাঞ্জার পুনঃপুন আবর্তনের মধ্যে কোন্‌-এক সময়ে দুইটি খেলোয়াড়ের মনে মনে মিল হইয়া গেল, অন্তর্যামী ব্যতীত আর-একজন খেলোয়াড় তাহা দেখিল এবং আমোদ বোধ করিল।

একদিন দুপুরবেলায় বিনোদা কুসুম ও নগেন্দ্র তাস খেলিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে কুসুম তাহার রুগ্‌ণ শিশুর কান্না শুনিয়া উঠিয়া গেল। নগেন্দ্র বিনোদার সহিত গল্প করিতে লাগিল। কিন্তু কী গল্প করিতেছিল তাহা নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল না; রক্তস্রোত তাহার হৃৎপিণ্ড উদ্‌বেলিত করিয়া তাহার সর্বশরীরের শিরায় মধ্যে তরঙ্গিত হইতেছিল।

হঠাৎ একসময় তাহার উদ্দাম যৌবন বিনয়ের সমস্ত বাঁধ ভাঙিয়া ফেলিল, হঠাৎ বিনোদার হাত দুটি চাপিয়া ধরিয়া সবলে তাহাকে টানিয়া লইয়া চুম্বন করিল। বিনোদা নগেন্দ্র-কর্তৃক এই অবমাননায় ক্রোধে ক্ষোভে লজ্জায় অধীর হইয়া নিজের হাত ছাড়াইবার জন্য টানাটানি করিতেছে এমন সময় তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল, ঘরে তৃতীয় ব্যক্তির আগমন হইয়াছে। নগেন্দ্র নতমুখে ঘর হইতে বাহির হইবার পথ অন্বেষণ করিতে লাগিল।

পরিচারিকা গম্ভীরস্বরে কহিল, "বউঠাকরুন, তোমাকে পিসিমা ডাকছেন।" বিনোদা ছলছল চক্ষে নগেন্দ্রের প্রতি বিদ্যুৎকটাক্ষ বর্ষণ করিয়া দাসীর সঙ্গে চলিয়া গেল।

পরিচারিকা যেটুকু দেখিয়াছিল তাহাকে হ্রস্ব এবং যাহা না দেখিয়াছিল তাহাকেই সুদীর্ঘতর করিয়া বৈদ্যনাথের অন্তঃপুরে একটা ঝড় তুলিয়া দিল। বিনোদার কী দশা হইল সে কথা বর্ণনার অপেক্ষা কল্পনা সহজ। সে যে কতদূর নিরপরাধ কাহাকেও বুঝাইতে চেষ্টা করিল না, নতমুখে সমস্ত সহিয়া গেল।

বৈদ্যনাথ আপন ভাবী পিণ্ডদাতার আবির্ভাবসম্ভাবনা অত্যন্ত সংশয়াচ্ছন্ন জ্ঞান করিয়া বিনোদাকে কহিল, "কলঙ্কিনী, তুই আমার ঘর হইতে দূর হইয়া যা।"

বিনোদা শয়নকক্ষের দ্বার রোধ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল, তাহার অশ্রুহীন

চক্ষু মধ্যাহ্নের মরুভূমির মতো জ্বলিতেছিল। যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া বাহিরের বাগানে কাকের ডাক থামিয়া গেল, তখন নক্ষত্রখচিত শান্ত আকাশের দিকে চাহিয়া তাহার বাপমায়ের কথা মনে পড়িল এবং তখন দুই গণ্ড দিয়া অশ্রু বিগলিত হইয়া পড়িতে লাগিল।

সেই রাত্রে বিনোদা স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া গেল। কেহ তাহার খোঁজও করিল না।

তখন বিনোদা জানিত না যে, 'প্রজনার্থং মহাভাগা' স্ত্রী-জন্মের মহাভাগ্য সে লাভ করিয়াছে, তাহার স্বামীর পারলৌকিক সদ্‌গতি তাহার গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

এই ঘটনার পর দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে বৈদ্যনাথের বৈষয়িক অবস্থার প্রচুর উন্নতি হইয়াছে। এখন তিনি পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় বৃহৎ বাড়ি কিনিয়া বাস করিতেছেন।

কিন্তু তাঁহার বিষয় যতই বৃদ্ধি হইল বিষয়ের উত্তরাধিকারীর জন্য প্রাণ ততই ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

পরে পরে দুইবার বিবাহ করিলেন তাহাতে পুত্র না জন্মিয়া কেবলই কলহ জন্মিতে লাগিল। দৈবজ্ঞপণ্ডিতে সন্ন্যাসী-অবধূতে ঘর ভরিয়া গেল; শিকড় মাদুলি জলপড়া এবং পেটেন্ট ঔষধের বর্ষণ হইতে লাগিল। কালীঘাটে যত ছাগশিশু মরিল তাহার অস্থিস্তূপে তৈমুরলঙের কঙ্কালজয়স্তম্ভ ধিক্কৃত হইতে পারিত; কিন্তু তবু, কেবল গুটিকতক অস্থি ও অতি স্বল্প মাংসের একটি ক্ষুদ্রতম শিশুও বৈদ্যনাথের বিশাল প্রাসাদের প্রান্তস্থান অধিকার করিয়া দেখা দিল না। তাঁহার অবর্তমানে পরের ছেলে কে তাঁহার অন্ন খাইবে ইহাই ভাবিয়া অন্নে তাঁহার অরুচি জন্মিল।

বৈদ্যনাথ আরো একটি স্ত্রী বিবাহ করিলেন; কারণ সংসারে আশারও অন্ত নাই, কন্যাদায়গ্রস্তের কন্যারও শেষ নাই।

দৈবজ্ঞেরা কোষ্ঠী দেখিয়া বলিল, ওই কন্যার পুত্রস্থানে যেরূপ শুভযোগ দেখা যাইতেছে তাহাতে বৈদ্যনাথের ঘরে প্রজাবৃদ্ধির আর বিলম্ব নাই; তাহার পরে ছয় বৎসর অতীত হইয়া গেল তথাপি পুত্রস্থানের শুভযোগ আলস্য পরিত্যাগ করিলেন না।

বৈদ্যনাথ নৈরাশ্যে অবনত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের পরামর্শে একটা প্রচুর ব্যয়সাধ্য যজ্ঞের আয়োজন করিলেন, তাহাতে বহুকাল ধরিয়া বহু ব্রাহ্মণের সেবা চলিতে লাগিল।

এ দিকে তখন দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা অস্থিচর্মসার হইয়া উঠিয়াছিল। বৈদ্যনাথ যখন অন্নের মধ্যে বসিয়া ভাবিতেছিলেন 'আমার অন্ন কে খাইবে', তখন সমস্ত উপবাসী দেশ আপন রিক্তস্থালীর দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল 'কী খাইব'।

ঠিক সেই সময়ে চারিমাস কাল ধরিয়া বৈদ্যনাথের চতুর্থ সহধর্মিণী একশত ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করিতেছিল এবং একশত ব্রাহ্মণ প্রাতে প্রচুর অন্ন এবং সায়াহ্নে অপর্যাপ্ত পরিমাণে জলপান খাইয়া খুরি সরা ভাঁড় এবং দধিঘৃতলিপ্ত কলার পাতে ম্যুনিসিপালিটির আবর্জনাশকট পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছিল। অন্নের গন্ধে দুর্ভিক্ষকাতর বুভুক্ষুগণ দলে দলে দ্বারে সমাগত হইতে লাগিল, তাহাদিগকে সর্বদা খেদাইয়া রাখিবার জন্য অতিরিক্ত দ্বারী নিযুক্ত হইল।

একদিন প্রাতে বৈদ্যনাথের মার্বলমণ্ডিত দালানে একটি স্থূলোদর সন্ন্যাসী দুইসের মোহনভোগ এবং দেড়সের দুগ্ধ- সেবায় নিযুক্ত আছে, বৈদ্যনাথ গায়ে একখানি চাদর দিয়া জোড়করে একান্ত বিনীতভাবে ভূতলে বসিয়া ভক্তিভরে পবিত্র ভোজনব্যাপার নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময় কোনোমতে দ্বারীদের দৃষ্টি এড়াইয়া জীর্ণদেহ বালক-সহিত একটি অতি শীর্ণকায়া রমণী গৃহে প্রবেশ করিয়া ক্ষীণ স্বরে কহিল, "বাবু, দুটি খেতে দাও।"

বৈদ্যনাথ শশব্যস্ত হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "গুরুদয়াল! গুরুদয়াল!" গতিক মন্দ বুঝিয়া স্ত্রীলোকটি অতি করুণ স্বরে কহিল, "ওগো, এই ছেলেটিকে দুটি খেতে দাও। আমি কিছু চাই নে।"

গুরুদয়াল আসিয়া বালক ও তাহার মাতাকে তাড়াইয়া দিল। সেই ক্ষুধাতুর নিরন্ন বালকটি বৈদ্যনাথের একমাত্র পুত্র। একশত পরিপুষ্ট ব্রাহ্মণ এবং তিনজন বলিষ্ঠ সন্ন্যাসী বৈদ্যনাথকে পুত্রপ্রাপ্তির দুরাশায় প্রলুব্ধ করিয়া তাহার অন্ন খাইতে লাগিল।

জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫

ডিটেকটিভ

আমি পুলিসের ডিটেকটিভ কর্মচারী। আমার জীবনে দুটিমাত্র লক্ষ্য ছিল— আমার স্ত্রী এবং আমার ব্যবসায়। পূর্বে একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে ছিলাম, সেখানে আমার স্ত্রীর প্রতি সমাদরের অভাব হওয়াতেই আমি দাদার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বাহির হইয়া আসি। দাদাই উপার্জন করিয়া আমাকে পালন করিতেছিলেন, অতএব সহসা সস্ত্রীক তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আসা আমার পক্ষে দুঃসাহসের কাজ হইয়াছিল।

কিন্তু কখনো নিজের উপরে আমার বিশ্বাসের ত্রুটি ছিল না। আমি নিশ্চয় জানিতাম, সুন্দরী স্ত্রীকে যেমন বশ করিয়াছি বিমুখ অদৃষ্টলক্ষ্মীকেও তেমনি বশ করিতে পারিব। মহিমচন্দ্র এ সংসারে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে না।

পুলিসবিভাগে সামান্যভাবে প্রবেশ করিলাম, অবশেষে ডিটেকটিভ-পদে উত্তীর্ণ হইতে অধিক বিলম্ব হইল না।

উজ্জ্বল শিখা হইতেও যেমন কজ্জলপাত হয় তেমনি আমার স্ত্রীর প্রেম হইতেও ঈর্ষা এবং সন্দেহের কালিমা বাহির হইত। সেটাতে আমার কিছু কাজের ব্যাঘাত করিত; কারণ পুলিসের কর্মে স্থানাস্থান কালাকাল বিচার করিলে চলে না, বরঞ্চ স্থানের অপেক্ষা অস্থান এবং কালের অপেক্ষা অকালটারই চর্চা অধিক করিয়া করিতে হয়— তাহাতে করিয়া আমার স্ত্রীর স্বভাবসিদ্ধ সন্দেহ আরো যেন দুর্নিবার হইয়া উঠিত। সে আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিত, "তুমি এমন যখন-তখন যেখানে-সেখানে যাপন কর, কালেভদ্রে আমার সঙ্গে দেখা হয়, আমার জন্য তোমার আশঙ্কা হয় না?" আমি তাহাকে বলিতাম, "সন্দেহ করা আমাদের ব্যবসায়, সেই কারণে ঘরের মধ্যে সেটাকে আর আনি না।"

স্ত্রী বলিত, "সন্দেহ করা আমার ব্যবসায় নহে, উহা আমার স্বভাব, আমাকে তুমি লেশমাত্র সন্দেহের কারণ দিলে আমি সব করিতে পারি।"

ডিটেকটিভ লাইনে আমি সকলের সেরা হইব, একটা নাম রাখিব, এ প্রতিজ্ঞা আমার দৃঢ় ছিল। এ সম্বন্ধে যতকিছু বিবরণ এবং গল্প আছে তাহার কোনোটাই পড়িতে বাকি রাখি নাই। কিন্তু পড়িয়া কেবল মনের অসন্তোষ এবং অধীরতা বাড়িতে লাগিল।

কারণ, আমাদের দেশের অপরাধীগুলা ভীরু নির্বোধ, অপরাধগুলা নির্জীব এবং

সরল, তাহার মধ্যে দুরূহতা দুর্গমতা কিছুই নাই। আমাদের দেশের খুনী নররক্তপাতের উৎকট উত্তেজনা কোনোমতেই নিজের মধ্যে সংবরণ করিতে পারে না। জালিয়াত যে-জাল বিস্তার করে তাহাতে অনতিবিলম্বে নিজেই আপাদমস্তক জড়াইয়া পড়ে, অপরাধব্যূহ হইতে নির্গমনের কূটকৌশল সে কিছুই জানে না। এমন নির্জীব দেশে ডিটেকটিভের কাজে সুখও নাই, গৌরবও নাই।

বড়োবাজারের মাড়োয়ারি জুয়াচোরকে অনায়াসে গ্রেপ্তার করিয়া কতবার মনে মনে বলিয়াছি, 'ওরে অপরাধীকুলকলঙ্ক, পরের সর্বনাশ করা গুণী ওস্তাদলোকের কর্ম; তোর মতো আনাড়ি নির্বোধের সাধুতপস্বী হওয়া উচিত ছিল।' খুনীকে ধরিয়া তাহার প্রতি স্বগত উক্তি করিয়াছি, 'গবর্মেণ্টের সমুন্নত ফাঁসিকাষ্ঠ কি তোদের মতো গৌরববিহীন প্রাণীদের জন্য হইয়াছিল— তোদের না আছে উদার কল্পনাশক্তি, না আছে কঠোর আত্মসংযম, তোরা বেটারা খুনী হইবার স্পর্ধা করিস!'

আমি কল্পনাচক্ষে যখন লণ্ডন এবং প্যারিসের জনাকীর্ণ পথের দুই পার্শ্বে শীত-বাষ্পাকুল অভ্রভেদী হর্ম্যশ্রেণী দেখিতে পাইতাম তখন আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত। মনে মনে ভাবিতাম, 'এই হর্ম্যরাজি এবং পথ-উপপথের মধ্য দিয়া যেমন জনস্রোত কর্মস্রোত উৎসবস্রোত সৌন্দর্যস্রোত অহরহ বহিয়া যাইতেছে, তেমনি সর্বত্রই একটা হিংস্রকুটিল কৃষ্ণকুঞ্চিত ভয়ংকর অপরাধপ্রবাহ তলে তলে আপনার পথ করিয়া চলিয়াছে; তাহারই সামীপ্যে য়ুরোপীয় সামাজিকতার হাস্যকৌতুক শিষ্টাচার এমন বিরাটভীষণ রমণীয়তা লাভ করিয়াছে। আর, আমাদের কলিকাতার পথপার্শ্বের মুক্তবাতায়ন গৃহশ্রেণীর মধ্যে রান্নাবাটনা, গৃহকার্য, পরীক্ষার পাঠ, তাসদাবার বৈঠক, দাম্পত্য কলহ, বড়োজোর ভ্রাতৃবিচ্ছেদ এবং মকদ্দমার পরামর্শ ছাড়া বিশেষ কিছু নাই— কোনো-একটা বাড়ির দিকে চাহিয়া কখনো এ কথা মনে হয় না যে, হয়তো এই মুহূর্তেই এই গৃহের কোনো-একটা কোণে শয়তান মুখ গুঁজিয়া বসিয়া আপনার কালো কালো ডিমগুলিতে তা দিতেছে।

আমি অনেক সময়ই রাস্তায় বাহির হইয়া পথিকদের মুখ এবং চলনের ভাব পর্যবেক্ষণ করিতাম; ভাবে ভঙ্গিতে যাহাদিগকে কিছুমাত্র সন্দেহজনক বোধ হইয়াছে আমি অনেক সময়ই গোপনে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছি, তাহাদের নামধাম ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়াছি, অবশেষে পরম নৈরাশ্যের সহিত আবিষ্কার করিয়াছি— তাহারা নিষ্কলঙ্ক ভালোমানুষ, এমন-কি তাহাদের আত্মীয়-বান্ধবেরাও তাদের সম্বন্ধে আড়ালে কোনোপ্রকার গুরুতর মিথ্যা অপবাদও প্রচার করে না। পথিকদের মধ্যে সবচেয়ে যাহাকে পাষণ্ড বলিয়া মনে হইয়াছে, এমন-কি যাহাকে দেখিয়া নিশ্চয় মনে করিয়াছি

যে, এইমাত্র সে কোনো একটা উৎকট দুষ্কার্য সাধন করিয়া আসিয়াছে, সন্ধান করিয়া জানিয়াছি— সে একটি ছাত্রবৃত্তি স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত, তখনই অধ্যাপনকার্য সমাধা করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিতেছে। এইসকল লোকেরাই অন্য-কোনো দেশে জন্মগ্রহণ করিলে বিখ্যাত চোরডাকাত হইয়া উঠিতে পারিত, কেবলমাত্র যথোচিত জীবনীশক্তি এবং যথেষ্ট পরিমাণ পৌরুষের অভাবেই আমাদের দেশে ইহারা কেবল পণ্ডিতি করিয়া বৃদ্ধবয়সে পেন্সন লইয়া মরে ; বহু চেষ্টা ও সন্ধানের পর এই দ্বিতীয় পণ্ডিতটার নিরীহতার প্রতি আমার যেরূপ সুগভীর অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল কোনো অতিক্ষুদ্র ঘটিবাটি-চোরের প্রতি তেমন হয় নাই।

অবশেষে একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদেরই বাসার অনতিদূরে একটি গ্যাসপোস্টের নীচে একটা মানুষ দেখিলাম, বিনা আবশ্যকে সে উৎসুকভাবে একই স্থানে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে। তাহাকে দেখিয়া আমার সন্দেহমাত্র রহিল না যে, সে একটি-কোনো গোপন দুরভিসন্ধির পশ্চাতে নিযুক্ত রহিয়াছে। নিজে অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহার চেহারাখানা বেশ ভালো করিয়া দেখিয়া লইলাম— তরুণ বয়স, দেখিতে সুশ্রী ; আমি মনে মনে কহিলাম, দুষ্কর্ম করিবার এই তো ঠিক উপযুক্ত চেহারা ; নিজের মুখশ্রীই যাহাদের সর্বপ্রধান বিরুদ্ধ সাক্ষী তাহারা যেন সর্বপ্রকার অপরাধের কাজ সর্বপ্রযত্নে পরিহার করে, সৎকার্য করিয়া তাহারা নিষ্ফল হইতে পারে, কিন্তু দুষ্কর্ম দ্বারা সফলতালাভও তাহাদের পক্ষে দুরাশা। দেখিলাম, এই ছোকরাটির চেহারাটাই ইহার সর্বপ্রধান বাহাদুরি ; সে জন্য আমি মনে মনে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার তারিফ করিলাম ; বলিলাম, 'ভগবান তোমাকে যে দুর্লভ সুবিধাটি দিয়াছেন সেটাকে রীতিমত কাজে খাটাইতে পার, তবে তো বলি সাবাস্।'

আমি অন্ধকার হইতে তাহার সম্মুখে আসিয়াই পৃষ্ঠে চপেটাঘাতপূর্বক বলিলাম, "এই যে, ভালো আছেন তো ?" সে তৎক্ষণাৎ প্রবলমাত্রায় চমকিয়া উঠিয়া একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া উঠিল। আমি কহিলাম, মাপ করিবেন, ভুল হইয়াছে, হঠাৎ আপনাকে অন্য লোক ঠাওরাইয়াছিলাম।" মনে মনে কহিলাম 'কিছুমাত্র ভুল করি নাই, যাহা ঠাওরাইয়াছিলাম তাই বটে।' কিন্তু এতটা অধিক চমকিয়া ওঠা তাহার পক্ষে অনুপযুক্ত হইয়াছিল, ইহাতে আমি কিছু ক্ষুণ্ণ হইলাম। নিজের শরীরের প্রতি তাহার আরো অধিক দখল থাকা উচিত ছিল ; কিন্তু শ্রেষ্ঠতার সম্পূর্ণ আদর্শ অপরাধী শ্রেণীর মধ্যেও বিরল। চোরকেও সেরা চোর করিয়া তুলিতে প্রকৃতি কৃপণতা করিয়া থাকে।

অন্তরালে আসিয়া দেখিলাম, সে ত্রস্তভাবে গ্যাসপোস্ট ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

পিছনে পিছনে গেলাম; দেখিলাম, ছোকরাটি গোলদিঘির মধ্যে প্রবেশ করিয়া পুষ্করিণীতীরে তৃণশয্যার উপর চিত হইয়া শুইয়া পড়িল; আমি ভাবিলাম, উপায়চিন্তার এ একটা স্থান বটে, গ্যাসপোস্টের তলদেশ অপেক্ষা অনেকাংশে ভালো— লোকে যদি কিছু সন্দেহ করে তো বড়োজোর এই ভাবিতে পারে যে, ছোকরাটি অন্ধকার আকাশে প্রেয়সীর মুখচন্দ্র অঙ্কিত করিয়া কৃষ্ণপক্ষ রাত্রির অভাব পূরণ করিতেছে। ছেলেটির প্রতি উত্তরোত্তর আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

অনুসন্ধান করিয়া তাহার বাসা জানিলাম। মন্মথ তাহার নাম, সে কলেজের ছাত্র, পরীক্ষা ফেল্‌ করিয়া গ্রীষ্মাবকাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার বাসার সহবাসী ছাত্রগণ সকলেই আপন আপন বাড়ি চলিয়া গেছে। দীর্ঘ অবকাশকালে সকল ছাত্রই বাসা ছাড়িয়া পালায়, এই লোকটিকে কোন্‌ দুষ্টগ্রহ ছুটি দিতেছে না সেটা বাহির করিতে কৃতসংকল্প হইলাম।

আমিও ছাত্র সাজিয়া তাহার বাসার এক অংশ গ্রহণ করিলাম। প্রথম দিন যখন সে আমাকে দেখিল কেমন একরকম করিয়া সে আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার ভাবটা ভালো বুঝিলাম না। যেন সে বিস্মিত, যেন সে আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছে, এমনি একটা ভাব। বুঝিলাম, শিকারীর উপযুক্ত শিকার বটে, ইহাকে সোজাভাবে ফস্‌ করিয়া কায়দা করা যাইবে না।

অথচ যখন তাহার সহিত প্রণয়বন্ধনের চেষ্টা করিলাম তখন সে ধরা দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিল না। কিন্তু মনে হইল, সেও আমাকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে, সেও আমাকে চিনিতে চায়। মনুষ্যচরিত্রের প্রতি এইরূপ সদাসতর্ক সজাগ কৌতূহল, ইহা ওস্তাদের লক্ষণ। এত অল্প বয়সে এতটা চাতুরী দেখিয়া বড়ো খুশি হইলাম।

মনে ভাবিলাম, মাঝখানে একজন রমণী না আনিলে এই অসাধারণ অকালধূর্ত ছেলেটির হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটন করা সহজ হইবে না।

একদিন গদ্‌গদকণ্ঠে মন্মথকে বলিলাম, "ভাই, একটি স্ত্রীলোককে আমি ভালোবাসি, কিন্তু সে আমাকে ভালোবাসে না।"

প্রথমটা সে যেন কিছু চকিতভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "এরূপ দুর্যোগ বিরল নহে। এইপ্রকার মজা করিবার জন্যই কৌতুকপর বিধাতা নরনারীর প্রভেদ করিয়াছেন।"

আমি কহিলাম, "তোমার পরামর্শ ও সাহায্য চাহি।" সে সম্মত হইল।

আমি বানাইয়া বানাইয়া অনেক ইতিহাস কহিলাম; সে সাগ্রহে কৌতূহলে সমস্ত কথা শুনিল, কিন্তু অধিক কথা কহিল না। আমার ধারণা ছিল, ভালোবাসার,

বিশেষত গর্হিত ভালোবাসার ব্যাপার প্রকাশ করিয়া বলিলে মানুষের মধ্যে অন্তরঙ্গতা দ্রুত বাড়িয়া উঠে; কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে তাহার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, ছোকরাটি পূর্বাপেক্ষা যেন চুপ মারিয়া গেল, অথচ সকল কথা মনে গাঁথিয়া লইল। ছেলেটির প্রতি আমার ভক্তির সীমা রহিল না।

এ দিকে মন্মথ প্রত্যহ গোপনে দ্বার রোধ করিয়া কী করে, এবং তার গোপন অভিসন্ধি কিরূপে কতদূর অগ্রসর হইতেছে আমি তাহার ঠিকানা করিতে পারিলাম না, অথচ অগ্রসর হইতেছিল তাহার সন্দেহ নাই। কী একটা নিগূঢ় ব্যাপারে সে ব্যাপৃত আছে এবং সম্প্রতি সেটা অত্যন্ত পরিপক্ক হইয়াছে, তাহা এই নবযুবকটির মুখ দেখিবামাত্র বুঝা যাইত। আমি গোপন চাবিতে তাহার ডেস্ক খুলিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে একটা অত্যন্ত দুর্বোধ কবিতার খাতা, কলেজের বক্তৃতার নোট এবং বাড়ির লোকের গোটাকতক অকিঞ্চিৎকর চিঠি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। কেবল বাড়ির চিঠি হইতে এই প্রমাণ হইয়াছে যে, বাড়ি ফিরিবার জন্য আত্মীয়স্বজন বারম্বার প্রবল অনুরোধ করিয়াছে; তথাপি, তৎসত্ত্বেও বাড়ি না যাইবার একটা সংগত কারণ অবশ্য আছে; সেটা যদি ন্যায়সঙ্গত হইত তবে নিশ্চয় কথায় কথায় এতদিনে ফাঁস হইত, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইবার সম্ভাবনা থাকাতেই এই ছোকরাটির গতিবিধি এবং ইতিহাস আমার কাছে এমন নিরতিশয় ঔৎসুক্যজনক হইয়াছে— যে অসামাজিক মনুষ্যসম্প্রদায় পাতালতলে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিয়া এই বৃহৎ মনুষ্য-সমাজকে সর্বদাই নীচের দিক হইতে দোলায়মান করিয়া রাখিয়াছে, এই বালকটি সেই বিশ্বব্যাপী বহুপুরাতন বৃহৎজাতির একটি অঙ্গ, এ সামান্য একজন স্কুলের ছাত্র নহে; এ জগৎবক্ষবিহারিণী সর্বনাশিনীর একটি প্রলয়সহচর; আধুনিককালের চশমাপরা নিরীহ বাঙালী ছাত্রের বেশে কলেজের পাঠ অধ্যয়ন করিতেছে, নৃমুণ্ডধারী কাপালিক বেশে ইহার ভৈরবতা আমার নিকট আরো ভৈরবতর হইত না; আমি ইহাকে ভক্তি করি।

অবশেষে সশরীরে রমণীর অবতারণা করিতে হইল। পুলিসের বেতনভোগী হরিমতি আমার সহায় হইল। মন্মথকে জানাইলাম, আমি এই হরিমতির হতভাগ্য প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই আমি কিছুদিন গোলদিঘির ধারে মন্মথের পার্শ্বচর হইয়া 'আবার গগনে কেন সুধাংশু-উদয় রে' কবিতাটি বারম্বার আবৃত্তি করিলাম; এবং হরিমতিও কতকটা অন্তরের সহিত, কতকটা লীলাসহকারে জানাইল যে, তাহার চিত্ত সে মন্মথকে সমর্পণ করিয়াছে। কিন্তু আশানুরূপ ফল হইল না, মন্মথ সুদূর নির্লিপ্ত অবিচলিত কৌতূহলের সহিত সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

এমন সময় একদিন মধ্যাহ্নে তাহার ঘরের মেজেতে একখানি চিঠির গুটিকতক ছিন্নাংশ কুড়াইয়া পাইলাম। জোড়া দিয়া দিয়া এই অসম্পূর্ণ বাক্যটুকু আদায় করিলাম, "আজ সন্ধ্যা সাতটার সময় গোপনে তোমার বাসায়"— অনেক খুঁজিয়া আর কিছু বাহির করিতে পারিলাম না।

আমার অন্তঃকরণ পুলকিত হইয়া উঠিল; মাটির মধ্য হইতে কোনো বিলুপ্তবংশ প্রাচীন প্রাণীর একখণ্ড হাড় পাইলে প্রত্নজীবতত্ত্ববিদের কল্পনা যেমন মহানন্দে সজাগ হইয়া উঠে আমারও সেই অবস্থা হইল।

আমি জানিতাম, আজ রাত্রি দশটার সময় আমাদের বাসায় হরিমতির আবির্ভাব হইবার কথা আছে, ইতিমধ্যে সন্ধ্যা সাতটার সময় ব্যাপারখানা কী। ছেলেটির যেমন সাহস তেমনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। যদি কোনো গোপন অপরাধের কাজ করিতে হয় তবে ঘরে যেদিন কোনো একটা বিশেষ হাঙ্গামা সেই দিন অবকাশ বুঝিয়া করা ভালো। প্রথমত প্রধান ব্যাপারের দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট থাকে, দ্বিতীয়ত যেদিন যেখানে কোনো বিশেষ সমাগম আছে সেদিন সেখানে কেহ ইচ্ছাপূর্বক কোনো গোপন ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিবে ইহা কেহ সম্ভব মনে করে না।

হঠাৎ আমার সন্দেহ হইল যে, আমার সহিত এই নূতন বন্ধুত্ব এবং হরিমতির সহিত এই প্রেমাভিনয়, ইহাকেও মন্মথ আপন কার্যসিদ্ধির উপায় করিয়া লইয়াছে; এইজন্যই সে আপনাকে ধরাও দেয় না, আপনাকে ছাড়াইয়াও লয় না। আমরা তাহাকে তাহার গোপন কার্য হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছি; সকলেই মনে করিতেছে যে, সে আমাদিগকে লইয়াই ব্যাপৃত রহিয়াছে— সেও সে ভ্রম দূর করিতে চায় না।

তর্কগুলা একবার ভাবিয়া দেখো। যে বিদেশী ছাত্র ছুটির সময় আত্মীয়স্বজনের অনুনয়বিনয় উপেক্ষা করিয়া শূন্য বাসায় একলা পড়িয়া থাকে, নির্জন স্থানে তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে এ-বিষয়ে কাহারো সংশয় থাকিতে পারে না, অথচ আমি তাহার বাসায় আসিয়া তাহার নির্জনতা ভঙ্গ করিয়াছি; এবং একটা রমণীর অবতারণা করিয়া নূতন উপদ্রব সৃজন করিয়াছি; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সে বিরক্ত হয় না, বাসা ছাড়ে না, আমাদের সঙ্গ হইতে দূরে থাকে না— অথচ হরিমতি অথবা আমার প্রতি তাহার তিলমাত্র আসক্তি জন্মে নাই ইহা নিশ্চয় সত্য, এমন-কি তাহার অসতর্ক অবস্থায় বারম্বার লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, আমাদের উভয়ের প্রতি তাহার একটা আন্তরিক ঘৃণা ক্রমেই যেন প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

ইহার একমাত্র তাৎপর্য এই যে, সজনতার সাফাইটুকু রক্ষা করিয়া নির্জনতার

সুবিধাটুকু ভোগ করিতে হইলে আমার মতো নবপরিচিত লোককে নিকটে রাখা সর্বাপেক্ষা সদুপায়; এবং কোনো বিষয়ে একান্তমনে লিপ্ত হওয়ার পক্ষে রমণীর মতো এমন সহজ ছুতা আর কিছু নাই। ইতিপূর্বে মন্মথর আচরণ যেরূপ নিরর্থক এবং সন্দেহজনক ছিল, আমাদের আগমনের পর তাহা সম্পূর্ণ লোপ হইল। কিন্তু এতটা দূরের কথা মুহূর্তের মধ্যে বিচার করিয়া দেখিতে পারে, এতবড়ো মতলবী লোক যে আমাদের বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করিতে পারে ইহা চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠিল— মন্মথ কিছু যদি মনে না করিত, তবে আমি বোধ হয় তাহাকে দুই হাতে বক্ষে চাপিয়া ধরিতে পারিতাম।

সেদিন মন্মথের সঙ্গে দেখা হইবামাত্র তাহাকে বলিলাম, "আজ তোমাকে সন্ধ্যা সাতটার সময় হোটেলে খাওয়াইব সংকল্প করিয়াছি।" শুনিয়া সে একটু চমকিয়া উঠিল, পরে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল, "ভাই, মাপ করো, আমার পাকযন্ত্রের অবস্থা আজ বড়ো শোচনীয়।" হোটেলের খানায় মন্মথর কখনো কোনো কারণে অনভিরুচি দেখি নাই, আজ তাহার অন্তরিন্দ্রিয় নিশ্চয়ই নিতান্তই দুরূহ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

সেদিন সন্ধ্যার পূর্বভাগে আমার বাসায় থাকিবার কথা ছিল না। কিন্তু আমি সেদিন গায়ে পড়িয়া নানা কথা পাড়িয়া বৈকালের দিকে কিছুতেই আর উঠিবার গা করিলাম না। মন্মথ মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল, আমার সকল মতের সঙ্গেই সে সম্পূর্ণ সম্মতি প্রকাশ করিল, কোনো তর্কের কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিল না। অবশেষে ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যাকুলচিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "হরিমতিকে আজ আনিতে যাইবে না?" আমি সচকিত ভাবে কহিলাম, "হাঁ হাঁ, সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তুমি, ভাই, আহারাদি প্রস্তুত করিয়া রাখো, আমি ঠিক সাড়ে দশটা রাত্রে তাহাকে এখানে আনিয়া উপস্থিত করিব।" এই বলিয়া চলিয়া গেলাম।

আনন্দের নেশা আমার সর্বশরীরের রক্তের মধ্যে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। সন্ধ্যা সাত ঘটিকার প্রতি মন্মথের যেপ্রকার ঔৎসুক্য দেখিলাম আমার ঔৎসুক্য তদপেক্ষা অল্প ছিল না; আমি আমাদের বাসার অনতিদূরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া প্রেয়সীসমাগমোৎকণ্ঠিত প্রণয়ীর ন্যায় মুহুর্মুহু ঘড়ি দেখিতে লাগিলাম। গোধূলির অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া যখন রাজপথে গ্যাস জ্বালিবার সময় হইল এমন সময় একটি রুদ্ধদ্বার পাল্‌কি আমাদের বাসার মধ্যে প্রবেশ করিল। ওই আচ্ছন্ন পাল্‌কিটির মধ্যে একটি অশ্রুসিক্ত অবগুণ্ঠিত পাপ, একটি মূর্তিমতী ট্র্যাজেডি কলেজের ছাত্রনিবাসের মধ্যে গুটিকতক

উড়ে বেহারার স্কন্ধে চাপিয়া সমুচ্চ হাঁই-হাঁই শব্দে অত্যন্ত অনায়াসে সহজভাবে প্রবেশ করিতেছে কল্পনা করিয়া আমার সর্বশরীরে অপূর্ব পুলকসঞ্চার হইল।

আমি আর অধিক বিলম্ব করিতে পারিলাম না। অনতিকাল পরে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বাহিয়া দোতলায় উঠিলাম। ইচ্ছা ছিল গোপনে লুকাইয়া দেখিয়া শুনিয়া লইব, কিন্তু তাহা ঘটিল না; কারণ, সিঁড়ির সম্মুখবর্তী ঘরেই সিঁড়ির দিকে মুখ করিয়া মন্মথ বসিয়াছিল, এবং গৃহের অপর প্রান্তে বিপরীতমুখে একটি অবগুণ্ঠিতা নারী বসিয়া মৃদুস্বরে কথা কহিতেছিল। যখন দেখিলাম মন্মথ আমাকে দেখিতে পাইয়াছে, তখন দ্রুত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিলাম, "ভাই, আমার ঘড়িটা ঘরে ফেলিয়া আসিয়াছি, তাই লইতে আসিলাম।" মন্মথ এমনি অভিভূত হইয়া পড়িল যে, বোধ হইল যেন তখনই সে মাটিতে পড়িয়া যাইবে। আমি কৌতুক এবং আনন্দে নিরতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিলাম; বলিলাম, "ভাই, তোমার অসুখ করিয়াছে না কি।" সে কোনো উত্তর দিতে পারিল না। তখন সেই কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ আড়ষ্ট অবগুণ্ঠিত নারীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি মন্মথর কে হন।" কোনো উত্তর পাইলাম না, কিন্তু দেখিলাম তিনি মন্মথর কেহই হন না, আমারই স্ত্রী হন! তাহার পর কী হইল সকলে জানেন।

এই আমার ডিটেকটিভ-পদের প্রথম চোর ধরা।

আমি কিয়ৎক্ষণ পরে ডিটেকটিভ মহিমচন্দ্রকে কহিলাম, "মন্মথর সহিত তোমার স্ত্রীর সম্বন্ধ সমাজবিরুদ্ধ না হইতেও পারে।"

মহিম কহিল, "না হইবারই সম্ভব। আমার স্ত্রীর বাক্স হইতে মন্মথর এই চিঠিখানি পাওয়া গেছে।" বলিয়া একখানি চিঠি আমার হাতে দিল; সেখানি নিম্নে প্রকাশিত হইল—

সুচরিতাসু,

হতভাগ্য মন্মথের কথা তুমি বোধ করি এতদিনে ভুলিয়া গিয়াছ। বাল্যকালে যখন কাজিবাড়ির মাতুলালয়ে যাইতাম, তখন সর্বদাই সেখান হইতে তোমাদের বাড়ি গিয়া তোমার সহিত অনেক খেলা করিয়াছি। আমাদের সে খেলাঘর এবং সে খেলার সম্পর্ক ভাঙিয়া গেছে। তুমি জান কি না বলিতে পারি না, একসময় ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া এবং লজ্জার মাথা খাইয়া তোমার সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ-চেষ্টাও করিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের বয়স প্রায় এক বলিয়া উভয় পক্ষেরই কর্তারা কোনোক্রমে রাজি হইলেন না।

তাহার পর তোমার বিবাহ হইয়া গেলে চার-পাঁচ বৎসর তোমার আর কোনো

সন্ধান পাই নাই। আজ পাঁচ মাস হইল তোমার স্বামী কলিকাতার পুলিসের কর্ম লইয়া শহরে বদলি হইয়াছেন, খবর পাইয়া আমি তোমাদের বাসা সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছি।

তোমার সহিত সাক্ষাতের দুরাশা আমার নাই এবং অন্তর্যামী জানেন, তোমার গার্হস্থ্যসুখের মধ্যে উপদ্রবের মতো প্রবেশলাভ করিবার দুরভিসন্ধিও আমি রাখি না। সন্ধ্যার সময় তোমাদের বাসার সম্মুখবর্তী একটি গ্যাসপোস্টের তলে আমি সূর্যোপাসকের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকি, তুমি ঠিক সাড়ে-সাতটার সময় একটি প্রজ্জলিত কেরোসিন ল্যাম্প লইয়া প্রত্যহ নিয়মিত তোমাদের দোতলার দক্ষিণ দিকের ঘরের কাঁচের জানলাটির সম্মুখে স্থাপন কর; সেইসময় মুহূর্তকালের জন্য তোমার দীপালোকিত প্রতিমাখানি আমার দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তোমার সম্বন্ধে আমার এই একটিমাত্র অপরাধ।

ইতিমধ্যে ঘটনাক্রমে তোমার স্বামীর সহিত আমার আলাপ এবং ক্রমে ঘনিষ্ঠতাও হইয়াছে। তাঁহার চরিত্র যেরূপ দেখিলাম তাহাতে বুঝিতে বাকি নাই যে, তোমার জীবন সুখের নহে। তোমার প্রতি আমার কোনোপ্রকার সামাজিক অধিকার নাই, কিন্তু যে বিধাতা তোমার দুঃখকে আমার দুঃখে পরিণত করিয়াছেন তিনিই সে দুঃখ-মোচনের চেষ্টাভার আমার উপরেই স্থাপন করিয়াছেন।

অতএব আমার স্পর্ধা মাপ করিয়া শুক্রবার সন্ধ্যাবেলায় ঠিক সাতটার সময় গোপনে পালকি করিয়া একবার বিশ মিনিটের জন্য আমার বাসায় আসিলে আমি তোমাকে তোমার স্বামী সম্বন্ধে কতকগুলি গোপন কথা বলিতে চাহি, যদি বিশ্বাস না কর এবং যদি সহ্য করিতে পার তবে তৎসম্বন্ধে প্রমাণও দেখাইতে পারি, এবং সেই সঙ্গে কতকগুলি পরামর্শ দিতেও ইচ্ছা করি; আমি ভগবানকে অন্তরে রাখিয়া আশা করিতেছি, সেই পরামর্শমতে চলিলে তুমি একদিন সুখী হইতে পারিবে।

আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ নহে। ক্ষণকালের জন্য তোমাকে সম্মুখে দেখিব, তোমার কথা শুনিব এবং তোমার চরণতলস্পর্শে আমার গৃহখানিকে চিরকালের জন্য সুখস্বপ্নমণ্ডিত করিয়া তুলিব, এ আকাঙ্ক্ষাও আমার অন্তরে আছে। যদি আমাকে বিশ্বাস না কর এবং যদি এ সুখ হইতেও আমাকে বঞ্চিত করিতে চাও, তবে সে কথা আমাকে লিখিয়ো, আমি তদুত্তরে পত্রযোগেই সকল কথা জানাইব। যদি চিঠি লিখিবার বিশ্বাসও না থাকে তবে আমার এই পত্রখানি তোমার স্বামীকে দেখাইয়ো, তাহার পরে আমার যাহা বক্তব্য তাহা তাঁহাকেই বলিব।

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার

আষাঢ় ১৩০৫

অধ্যাপক

প্রথম পরিচ্ছেদ

কলেজে আমার সহপাঠীসম্প্রদায়ের মধ্যে আমার একটু বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। সকলেই আমাকে সকল বিষয়েই সমজদার বলিয়া মনে করিত।

ইহার প্রধান কারণ, ভুল হউক আর ঠিক হউক, সকল বিষয়েই আমার একটা মতামত ছিল। অধিকাংশ লোকেই হাঁ এবং না জোর করিয়া বলিতে পারে না, আমি সেটা খুব বলিতাম।

কেবল যে আমি মতামত লইয়া ছিলাম তাহা নহে, নিজেও রচনা করিতাম; বক্তৃতা দিতাম, কবিতা লিখিতাম, সমালোচনা করিতাম, এবং সর্বপ্রকারেই আমার সহপাঠীদের ঈর্ষা ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলাম।

কালেজে এইরূপে শেষপর্যন্ত আপন মহিমা মহীয়ান রাখিয়া বাহির হইয়া আসিতে পারিতাম। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার খ্যাতিস্থানের শনি এক নূতন অধ্যাপকের মূর্তি ধারণ করিয়া কালেজে উদিত হইল।

আমাদের তখনকার সেই নবীন অধ্যাপকটি আজকালকার একজন সুবিখ্যাত লোক, অতএব আমার এই জীবনবৃত্তান্তে তাঁহার নাম গোপন করিলেও তাঁহার উজ্জ্বল নামের বিশেষ ক্ষতি হইবে না। আমার প্রতি তাঁহার আচরণ লক্ষ করিয়া বর্তমান ইতিহাসে তাঁহাকে বামাচরণবাবু বলিয়া ডাকা যাইবে।

ইঁহার বয়স যে আমাদের অপেক্ষা অধিক ছিল তাহা নহে; অল্পদিন হইল এম. এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়া টনি সাহেবের বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু লোকটি ব্রাহ্ম বলিয়া কেমন তাঁহাকে অত্যন্ত সুদূর এবং স্বতন্ত্র মনে হইত, আমাদের সমকালীন সমবয়স্ক বলিয়া বোধ হইত না। আমরা নব্যহিন্দুর দল পরস্পরের মধ্যে তাঁহাকে ব্রহ্মদৈত্য বলিয়া ডাকিতাম।

আমাদের একটি তর্কসভা ছিল। আমি সে সভার বিক্রমাদিত্য এবং আমিই সে-সভার নবরত্ন ছিলাম। আমরা ছত্রিশজন সভ্য ছিলাম, তন্মধ্যে পঁয়ত্রিশ জনকে গণনা হইতে বাদ দিলে কোনো ক্ষতি হইত না এবং অবশিষ্ট একজনের যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার যেরূপ ধারণা উক্ত পঁয়ত্রিশ জনেরও সেইরূপ ধারণা ছিল।

এই সভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে আমি কার্লাইলের সমালোচনা করিয়া এক ওজস্বী প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলাম। মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাহার অসাধারণত্বে

শ্রোতামাত্রেই চমৎকৃত হইবে— চমৎকৃত হইবার কথা ছিল, কারণ, আমার প্রবন্ধে কার্লাইলকে আদ্যোপান্ত নিন্দা করিয়াছিলাম।

সে অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন বামাচরণবাবু। প্রবন্ধপাঠ শেষ হইলে আমার সহাধ্যায়ী ভক্তগণ আমার মতের অসমসাহসিকতা ও ইংরাজিভাষায় বিশুদ্ধ তেজস্বিতায় বিমুগ্ধ ও নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিল। কাহারো কিছু বক্তব্য নাই শুনিয়া বামাচরণ-বাবু উঠিয়া শান্তগম্ভীর স্বরে সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিলেন যে, আমেরিকার সুলেখক সুবিখ্যাত লাউয়েল সাহেবের প্রবন্ধ হইতে আমার প্রবন্ধটির যে-অংশ চুরি সে-অংশ অতি চমৎকার, এবং যে-অংশ আমার সম্পূর্ণ নিজের সেটুকু পরিত্যাগ করিলেই ভালো হইত।

যদি তিনি বলিতেন, লাউয়েলের সহিত নবীন প্রবন্ধলেখকের মতের এমন-কি ভাষারও আশ্চর্য অবিকল ঐক্য দেখা যাইতেছে, তাহা হইলে তাঁহার কথাটা সত্যও হইত অথচ অপ্রিয়ও হইত না।

এই ঘটনার পর, সহপাঠীমহলে আমার প্রতি যে অখণ্ড বিশ্বাস ছিল তাহাতে একটি বিদারণরেখা পড়িল। কেবল আমার চিরানুরক্ত ভক্তাগ্রগণ্য অমূল্যচরণের হৃদয়ের লেশমাত্র বিকার জন্মিল না। সে আমাকে বারম্বার বলিতে লাগিল, "তোমার বিদ্যাপতি নাটকখানা ব্রহ্মদৈত্যকে শুনাইয়া দাও, দেখি সে সম্বন্ধে নিন্দুক কী বলিতে পারে।"

রাজা শিবসিংহের মহিষী লছিমাদেবীকে কবি বিদ্যাপতি ভালোবাসিতেন এবং তাঁহাকে না দেখিলে তিনি কবিতা রচনা করিতে পারিতেন না। এই মর্ম অবলম্বন করিয়া আমি একখানি পরম শোকাবহ উচ্চশ্রেণীর পদ্যনাটক রচনা করিয়াছিলাম; আমার শ্রোতৃবর্গের মধ্যে যাঁহারা পুরাতত্ত্বের মর্যাদা লঙ্ঘন করিতে চাহেন না তাঁহারা বলিতেন, ইতিহাসে এরূপ ঘটনা ঘটে নাই। আমি বলিতাম, সে ইতিহাসের দুর্ভাগ্য! ঘটিলে ইতিহাস ঢের বেশি সরস ও সত্য হইত।

নাটকখানি যে উচ্চশ্রেণীর সে কথা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। অমূল্য বলিত সর্বোচ্চ-শ্রেণীর। আমি আপনাকে যতটা মনে করিতাম, সে আবার আমাকে তাহারও চেয়ে বেশি মনে করিত। অতএব, আমার যে কী-এক বিরাট রূপ তাহার চিত্তে প্রতিফলিত ছিল, আমিও তাহার ইয়ত্তা করিতে পারিতাম না।

নাটকখানি বামাচরণবাবুকে শুনাইয়া দিবার পরামর্শ আমার কাছে মন্দ লাগিল না; কারণ, সে নাটকে নিন্দাযোগ্য ছিদ্র লেশমাত্র ছিল না এইরূপ আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস। অতএব, আর-একদিন তর্কসভার বিশেষ অধিবেশন আহূত হইল, ছাত্রবৃন্দের

সমক্ষে আমি আমার নাটকখানি পাঠ করিলাম এবং বামাচরণবাবু তাহার সমালোচনা করিলেন।

সে সমালোচনাটি বিস্তারিত আকারে লিপিবদ্ধ করিবার প্রবৃত্তি আমার নাই। সংক্ষেপত, সমালোচনাটি আমার অনুকূল হয় নাই; বামাচরণবাবুর মতে নাটকগত পাত্রগণের চরিত্র ও মনোভাব-সকল নির্দিষ্ট বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। বড়ো বড়ো সাধারণ ভাবের কথা আছে, কিন্তু তাহা বাষ্পবৎ অনিশ্চিত, লেখকের অন্তরের মধ্যে আকার ও জীবন প্রাপ্ত হইয়া তাহা সৃজিত হইয়া উঠে নাই।

বৃশ্চিকের পুচ্ছদেশেই হুল থাকে, বামাচরণবাবুর সমালোচনার উপসংহারেই তীব্রতম বিষ সঞ্চিত ছিল। আসন গ্রহণ করিবার পূর্বে তিনি বলিলেন, আমার এই নাটকের অনেকগুলি দৃশ্য এবং মূলভাবটি গেটে-রচিত টাসো নাটকের অনুকরণ, এমন কি অনেকস্থলে অনুবাদ।

এ কথার সদুত্তর ছিল। আমি বলিতে পারিতাম, হউক অনুকরণ, কিন্তু সেটা নিন্দার বিষয় নহে! সাহিত্যরাজ্যে চুরিবিদ্যা বড়ো বিদ্যা, এমন-কি, ধরা পড়িলেও। সাহিত্যের বড়ো বড়ো মহাজনগণ এই কাজ করিয়া আসিয়াছেন, এমন-কি, সেক্স-পিয়রও বাদ যান না। সাহিত্যে যাহার অরিজিন্যালিটি অত্যন্ত অধিক সেই চুরি করিতে সাহস করে, কারণ, সে পরের জিনিসকে সম্পূর্ণ আপনার করিতে পারে।

ভালো ভালো এইরূপ আরো অনেক কথা ছিল, কিন্তু সেদিন বলা হয় নাই। বিনয় তাহার কারণ নহে। আসল কথা, সেদিন একটি কথাও মনে পড়ে নাই। প্রায় পাঁচ-সাতদিন পরে একে একে উত্তরগুলি দৈবাগত ব্রহ্মাস্ত্রের ন্যায় আমার মনে উদয় হইতে লাগিল; কিন্তু শত্রুপক্ষ সম্মুখে উপস্থিত না থাকাতে সে অস্ত্রগুলি আমাকেই বিঁধিয়া মারিল। ভাবিতাম, এ কথাগুলো অন্তত আমার ক্লাসের ছাত্রদিগকে শুনাইয়া দিব। কিন্তু উত্তরগুলি আমার সহাধ্যায়ী গর্দভদিগের বুদ্ধির পক্ষে কিছু অতিমাত্র সূক্ষ্ম ছিল! তাহারা জানিত, চুরিমাত্রেই চুরি; আমার চুরি এবং অন্যের চুরিতে যে কতটা প্রভেদ আছে তাহা বুঝিবার সামর্থ্য যদি তাহাদের থাকিত তবে আমার সহিতও তাহাদের বিশেষ প্রভেদ থাকিত না।

বি. এ পরীক্ষা দিলাম, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিব তাহাতেও আমার সন্দেহ ছিল না; কিন্তু মনে আনন্দ রহিল না। বামাচরণের সেই গুটিকতক কথার আঘাতে আমার সমস্ত খ্যাতি ও আশার অভ্রভেদী মন্দির ভগ্নস্তূপ হইয়া পড়িল। কেবল আমার প্রতি অবোধ অমূল্যের শ্রদ্ধা কিছুতেই হ্রাস হইল না; প্রভাতে যখন যশঃসূর্য আমার সম্মুখে উদিত ছিল তখনো সেই শ্রদ্ধা অতি দীর্ঘ ছায়ার ন্যায় আমার পদতললগ্ন হইয়া

ছিল, আবার সায়াহ্নে যখন আমার যশঃসূর্য পশ্চাতে অস্তোন্মুখ হইল তখনো সেই শ্রদ্ধা দীর্ঘায়তন বিস্তার করিয়া আমার পদপ্রান্ত পরিত্যাগ করিল না। কিন্তু এ শ্রদ্ধায় কোনো পরিতৃপ্তি নাই, ইহা শূন্য ছায়ামাত্র, ইহা মূঢ় ভক্তহৃদয়ের মোহান্ধকার, ইহা বুদ্ধির উজ্জ্বল রশ্মিপাত নহে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাবা বিবাহ দিবার জন্য আমাকে দেশ হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি কিছুদিন সময় লইলাম।

বামাচরণবাবুর সমালোচনায় আমার নিজের মধ্যে একটা আত্মবিরোধ, নিজের প্রতি নিজের একটা বিদ্রোহভাব জন্মিয়াছিল। আমার সমালোচক অংশ আমার লেখক অংশকে গোপনে আঘাত দিতেছিল। আমার লেখক অংশ বলিতেছিল, আমি ইহার প্রতিশোধ লইব; আবার একবার লিখিব এবং তখন দেখিব, আমি বড়ো না আমার সমালোচক বড়ো।

মনে মনে স্থির করিলাম, বিশ্বপ্রেম, পরের জন্য আত্মবিসর্জন এবং শত্রুকে মার্জনা —এই ভাবটি অবলম্বন করিয়া গদ্যে হউক পদ্যে হউক, খুব 'সাব্লাইম'-গোছের একটা-কিছু লিখিব; বাঙালী সমালোচকদিগকে সুবৃহৎ সমালোচনার খোরাক জোগাইব।

স্থির করিলাম, একটি সুন্দর নির্জন স্থানে বসিয়া আমার জীবনের এই সর্বপ্রধান কীর্তিটির সৃষ্টিকার্য সমাধা করিব। প্রতিজ্ঞা করিলাম, অন্তত একমাসকাল বন্ধুবান্ধব পরিচিত অপরিচিত কাহারো সহিত সাক্ষাৎ করিব না।

অমূল্যকে ডাকিয়া আমার প্ল্যান বলিলাম। সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল, সে যেন তখনই আমার ললাটে স্বদেশের অনতিদূরবর্তী ভাবী মহিমার প্রথম অরুণ-জ্যোতি দেখিতে পাইল। গম্ভীর মুখে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বিস্ফারিত নেত্র আমার মুখের প্রতি স্থাপন করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "যাও, ভাই, অমর কীর্তি অক্ষয় গৌরব অর্জন করিয়া আইস।"

আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল; মনে হইল, যেন আসন্নগৌরবগর্বিত ভক্তিবিহ্বল বঙ্গদেশের প্রতিনিধি হইয়া অমূল্য এই কথাগুলি আমাকে বলিল।

অমূল্যও বড়ো কম ত্যাগস্বীকার করিল না; সে স্বদেশের হিতের জন্য সুদীর্ঘ একমাসকাল আমার সঙ্গপ্রত্যাশা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন করিল। সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস

ফেলিয়া আমার বন্ধু ট্রামে চড়িয়া তাহার কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের বাসায় চলিয়া গেল, আমি গঙ্গার ধারে ফরাসডাঙার বাগানে অমর কীর্তি অক্ষয় গৌরব উপার্জন করিতে গেলাম।

গঙ্গার ধারে নির্জন ঘরে চিত হইয়া শুইয়া বিশ্বজনীন প্রেমের কথা ভাবিতে ভাবিতে মধ্যাহ্নে প্রগাঢ় নিদ্রাবেশ হইত, একেবারে অপরাহ্নে পাঁচটার সময় জাগিয়া উঠিতাম। তাহার পর শরীর-মনটা কিছু অবসাদগ্রস্ত হইয়া থাকিত; কোনোমতে চিত্তবিনোদন ও সময়যাপনের জন্য বাগানের পশ্চাদ্দিকে রাজপথের ধারে একটা ছোটো কাষ্ঠাসনে বসিয়া চুপচাপ করিয়া গোরুর গাড়ি ও লোক-চলাচল দেখিতাম। নিতান্ত অসহ্য হইলে স্টেশনে গিয়া বসিতাম, টেলিগ্রাফের কাঁটা কট্‌কট্‌ শব্দ করিত, টিকিটের ঘণ্টা বাজিত, লোকসমাগম হইত, রক্তচক্ষু সহস্রপদ লৌহসরীসৃপ ফুঁষিতে ফুঁষিতে আসিত, উৎকট চীৎকার করিয়া চলিয়া যাইত, লোকজনের হুড়ামুড়ি পড়িত, কিয়ৎক্ষণের জন্য কৌতুকবোধ করিতাম। বাড়ি ফিরিয়া, আহার করিয়া, সঙ্গী অভাবে সকাল-সকাল শুইয়া পড়িতাম, এবং প্রাতঃকালে সকাল-সকাল উঠিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন না থাকাতে বেলা আট-নয়টা পর্যন্ত বিছানায় যাপন করিতাম।

শরীর মাটি হইল, বিশ্বপ্রেমেরও কোনো অস্থিসন্ধি খুঁজিয়া পাইলাম না। কোনোকালে একা থাকা অভ্যাস না থাকাতে সঙ্গীহীন গঙ্গাতীর শূন্য শ্মশানের মতো বোধ হইতে লাগিল; অমূল্যটাও এমনি গর্দভ যে, একদিনের জন্যও সে আপন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিল না।

ইতিপূর্বে কলিকাতায় বসিয়া ভাবিতাম, বিপুলচ্ছায়া বটবৃক্ষের তলে পা ছড়াইয়া বসিব, পদপ্রান্তে কলনাদিনী স্রোতস্বিনী আপন-মনে বহিয়া চলিবে— মাঝখানে স্বপ্নাবিষ্ট কবি, এবং চারি দিকে তাহার ভাবরাজ্য ও বহিঃপ্রকৃতি— কাননে পুষ্প, শাখায় বিহঙ্গ, আকাশে তারা, মনের মধ্যে বিশ্বজনীন প্রেম এবং লেখনীমুখে অশ্রান্ত অজস্র ভাবস্রোত বিচিত্র ছন্দে প্রবাহিত। কিন্তু কোথায় প্রকৃতি এবং কোথায় প্রকৃতির কবি, কোথায় বিশ্ব আর কোথায় বিশ্বপ্রেমিক! একদিনের জন্যও বাগানে বাহির হই নাই। কাননের ফুল কাননে ফুটিত, আকাশের তারা আকাশে উঠিত, বটবৃক্ষের ছায়া বটবৃক্ষের তলে পড়িত, আমিও ঘরের ছেলে ঘরেই পড়িয়া থাকিতাম।

আত্মমাহাত্ম্য কিছুতেই প্রমাণ করিতে না পারিয়া বামাচরণের প্রতি আক্রোশ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

সে সময়টাতে বাল্যবিবাহ লইয়া বাঙলার শিক্ষিতসমাজে একটা বাগ্‌যুদ্ধ

বাধিয়াছিল। বামাচরণ বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধ পক্ষে ছিলেন এবং পরম্পর শোনা গিয়াছিল যে তিনি একটি যুবতী কুমারীর প্রণয়পাশে আবদ্ধ এবং অচিরে পরিণয়-পাশে বদ্ধ হইবার প্রত্যাশায় আছেন।

বিষয়টা আমার কাছে অত্যন্ত কৌতুকাবহ ঠেকিয়াছিল, এবং বিশ্বপ্রেমের মহাকাব্যও ধরা দিল না, তাই বসিয়া বসিয়া বামাচরণকে নায়কের আদর্শ করিয়া কদম্বকলি মজুমদার নামক একটি কাল্পনিক যুবতীকে নায়িকা খাড়া করিয়া সুতীব্র এক প্রহসন লিখিলাম। লেখনী এই অমর কীর্তিটি প্রসব করিবার পর আমি কলিকাতা যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। এমন সময় যাত্রায় ব্যাঘাত পড়িল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন অপরাহ্ণে স্টেশনে না গিয়া অলসভাবে বাগানবাড়ির ঘরগুলি পরিদর্শন করিতেছিলাম। আবশ্যক না হওয়াতে ইতিপূর্বে অধিকাংশ ঘরে পদার্পণ করি নাই, বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে আমার কৌতূহল বা অভিনিবেশ লেশমাত্র ছিল না। সেদিন নিতান্তই সময়যাপনের উদ্দেশে বায়ুভরে উড্ডীন চ্যুতপত্রের মতো ইতস্তত ফিরিতেছিলাম।

উত্তর দিকের ঘরের দরজা খুলিবামাত্র একটি ক্ষুদ্র বারান্দায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। বারান্দার সম্মুখেই বাগানের উত্তরসীমার প্রাচীরের গাত্রসংলগ্ন দুইটি বৃহৎ জামের গাছ মুখামুখী করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সেই দুইটি গাছের মধ্যবর্তী অবকাশ দিয়া আর-একটি বাগানের সুদীর্ঘ বকুলবীথির কিয়দংশ দেখা যায়।

কিন্তু সে-সমস্তই আমি পরে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, তখন আমার আর-কিছুই দেখিবার অবসর হয় নাই, কেবল দেখিয়াছিলাম, একটি ষোড়শী যুবতী হাতে একখানি বই লইয়া মস্তক আনমিত করিয়া পদচারণা করিতে করিতে অধ্যয়ন করিতেছে।

ঠিক সে-সময়ে কোনোরূপ তত্ত্বালোচনা করিবার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু কিছুদিন পরে ভাবিয়াছিলাম যে, দুষ্মন্ত বড়ো বড়ো বাণ শরাসন বাগাইয়া রথে চড়িয়া বনে মৃগয়া করিতে আসিয়াছিলেন, মৃগ তো মরিল না, মাঝে হইতে দৈবাৎ দশমিনিট কাল গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া যাহা দেখিলেন, যাহা শুনিলেন, তাহাই তাঁহার জীবনের সকল দেখাশুনার সেরা হইয়া দাঁড়াইল। আমিও পেন্সিল কলম এবং খাতাপত্র উদ্যত করিয়া কাব্যমৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলাম, বিশ্বপ্রেম বেচারা তো পলাইয়া রক্ষা পাইল, আর আমি দুইটি জামগাছের আড়াল হইতে যাহা দেখিবার তাহা দেখিয়া লইলাম ; মানুষের একটা জীবনে এমন দুইবার দেখা যায় না।

পৃথিবীতে অনেক জিনিসই দেখি নাই। জাহাজে উঠি নাই, বেলুনে চড়ি নাই, কয়লার খনির মধ্যে নামি নাই— কিন্তু আমার নিজের মানসী আদর্শের সম্বন্ধে আমি যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং অজ্ঞ ছিলাম তাহা এই উত্তর দিকের বারান্দায় আসিবার পূর্বে সন্দেহমাত্র করি নাই। বয়স একুশ প্রায় উত্তীর্ণ হয়, ইতিমধ্যে আমার অন্তঃকরণ কল্পনাযোগবলে নারীসৌন্দর্যের একটা ধ্যানমূর্তি যে সৃজন করিয়া লয় নাই, এ কথা বলিতে পারি না। সেই মূর্তিকে নানা বেশভূষায় সজ্জিত এবং নানা অবস্থার মধ্যে স্থাপন করিয়াছি, কিন্তু কখনো সুদূর স্বপ্নেও তাহার পায়ে জুতা, গায়ে জামা, হাতে বই দেখিব এমন আশাও করি নাই, ইচ্ছাও করি নাই। কিন্তু আমার লক্ষ্মী ফাল্গুন-শেষের অপরাহ্ণে প্রবীণ তরুশ্রেণীর আকম্পিত ঘনপল্লববিতানে দীর্ঘনিপতিত ছায়া- এবং আলোক-রেখাঙ্কিত পুষ্পবনপথে, জুতা পায়ে দিয়া, জামা গায়ে দিয়া, বই হাতে করিয়া, দুইটি জামগাছের আড়ালে অকস্মাৎ দেখা দিলেন— আমিও কোনো কথাটি কহিলাম না।

দুই মিনিটের বেশি আর দেখা গেল না। নানা ছিদ্র দিয়া দেখিবার নানা চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু কোনো ফল পাই নাই। সেইদিন প্রথম সন্ধ্যার প্রাক্কালে বটবৃক্ষতলে প্রসারিত চরণে বসিলাম— আমার চোখের সম্মুখে পরপারের ঘনীভূত তরুশ্রেণীর উপর সন্ধ্যাতারা প্রশান্ত স্মিতহাস্যে উদিত হইল, এবং দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাশ্রী আপন নাথহীন বিপুল নির্জন বাসরগৃহের দ্বার খুলিয়া দিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

যে বইখানি তাহার হাতে দেখিয়াছিলাম সেটা আমার পক্ষে একটা নূতন রহস্য-নিকেতন হইয়া দাঁড়াইল। ভাবিতে লাগিলাম, সেটা কী বই। উপন্যাস অথবা কাব্য? তাহার মধ্যে কী ভাবের কথা আছে। যে পাতাটি খোলা ছিল এবং যাহার উপরে সেই অপরাহ্ণবেলার ছায়া ও রবিরশ্মি, সেই বকুলবনের পল্লবমর্মর এবং সেই যুগলচক্ষুর ঔৎসুক্যপূর্ণ স্থিরদৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল, ঠিক সেই পাতাটিতে গল্পের কোন্ অংশ, কাব্যের কোন্ রসটুকু প্রকাশ পাইতেছিল। সেইসঙ্গে ভাবিতে লাগিলাম, ঘনমুক্ত কেশজালের অন্ধকারচ্ছায়াতলে সুকুমার ললাটমণ্ডপটির অভ্যন্তরে বিচিত্র ভাবের আবেশ কেমন করিয়া লীলায়িত হইয়া উঠিতেছিল, কুমারীহৃদয়ের নিভৃত নির্জনতার উপরে নব নব কাব্যমায়া কী অপূর্ব সৌন্দর্যলোক সৃজন করিতেছিল —অর্ধেক রাত্রি ধরিয়া এমন কত কী ভাবিয়াছিলাম তাহা পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত করা অসম্ভব।

কিন্তু, সে যে কুমারী এ কথা আমাকে কে বলিল। আমার বহুপূর্ববর্তী প্রেমিক

দুষ্মন্তকে পরিচয়লাভের পূর্বেই যিনি শকুন্তলা সম্বন্ধে আশ্বাস দিয়াছিলেন, তিনিই। তিনি মনের বাসনা; তিনি মানুষকে সত্য মিথ্যা ঢের কথা অজস্র বলিয়া থাকেন; কোনোটা খাটে, কোনোটা খাটে না, দুষ্মন্তের এবং আমারটা খাটিয়া গিয়াছিল।

আমার এই অপরিচিতা প্রতিবেশিনী বিবাহিতা কি কুমারী কি ব্রাহ্মণ কি শূদ্র, সে সংবাদ লওয়া আমার পক্ষে কঠিন ছিল না, কিন্তু তাহা করিলাম না, কেবল নীরব চকোরের মতো বহুসহস্র যোজন দূর হইতে আমার চন্দ্রমণ্ডলটিকে বেষ্টন করিয়া করিয়া ঊর্ধ্বকণ্ঠে নিরীক্ষণ করিবার চেষ্টা করিলাম।

পরদিন মধ্যাহ্নে একখানি ছোটো নৌকা ভাড়া করিয়া তীরের দিকে চাহিয়া জোয়ার বাহিয়া চলিলাম, মাল্লাদিগকে দাঁড় টানিতে নিষেধ করিয়া দিলাম।

আমার শকুন্তলার তপোবনকুটিরটি গঙ্গার ধারেই ছিল। কুটিরটি ঠিক কণ্বের কুটিরের মতো ছিল না; গঙ্গা হইতে ঘাটের সিঁড়ি বৃহৎ বাড়ির বারান্দার উপর উঠিয়াছে, বারান্দাটি ঢালু কাঠের ছাদ দিয়া ছায়াময়।

আমার নৌকাটি যখন নিঃশব্দে ঘাটের সম্মুখে ভাসিয়া আসিল, দেখিলাম আমার নবযুগের শকুন্তলা বারান্দার ভূমিতলে বসিয়া আছেন; পিঠের দিকে একটা চৌকি, চৌকির উপরে গোটাকতক বই রহিয়াছে, সেই বইগুলির উপরে তাঁহার খোলা চুল স্তূপাকারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তিনি সেই চৌকিতে ঠেস্ দিয়া ঊর্ধ্বমুখ করিয়া উত্তোলিত বাম বাহুর উপর মাথা রাখিয়াছেন, নৌকা হইতে তাঁহার মুখ অদৃশ্য, কেবল সুকোমল কণ্ঠের একটি সুকুমার বক্ররেখা দেখা যাইতেছে, খোলা দুইখানি পদপল্লবের একটি ঘাটের উপরের সিঁড়িতে এবং একটি তাহার নীচের সিঁড়িতে প্রসারিত, শাড়ির কালো পাড়টি বাঁকা হইয়া পড়িয়া সেই দুটি পা বেষ্টন করিয়া আছে। একখানা বই মনোযোগহীন শিথিল দক্ষিণ হস্ত হইতে স্রস্ত হইয়া ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে। মনে হইল, যেন মূর্তিমতী মধ্যাহ্নলক্ষ্মী! সহসা দিবসের কর্মের মাঝখানে একটি নিস্পন্দসুন্দরী অবসরপ্রতিমা। পদতলে গঙ্গা, সম্মুখে সুদূর পরপার এবং ঊর্ধ্বে তীব্রতাপিত নীলাম্বর তাহাদের সেই অন্তরাত্মারূপিণীর দিকে, সেই দুটি খোলা পা, সেই অলসবিন্যস্ত বাম বাহু, সেই উৎক্ষিপ্ত বঙ্কিম কণ্ঠরেখার দিকে নিরতিশয় নিস্তব্ধ একাগ্রতার সহিত নীরবে চাহিয়া আছে।

যতক্ষণ দেখা যায় দেখিলাম, দুই সজলপল্লব নেত্রপাতের দ্বারা দুইখানি চরণপদ্ম বারম্বার নিছিয়া মুছিয়া লইলাম।

অবশেষে নৌকা যখন দূরে গেল, মাঝখানে একটা তীরতরুর আড়াল আসিয়া পড়িল, তখন হঠাৎ যেন কী একটা ত্রুটি স্মরণ হইল, চমকিয়া মাঝিকে কহিলাম,

"মাঝি, আজ আর আমার হুগলি যাওয়া হইল না, এইখান হইতেই বাড়ি ফেরো।" কিন্তু ফিরিবার সময় উজানে দাঁড় টানিতে হইল, সেই শব্দে আমি সংকুচিত হইয়া উঠিলাম। সেই দাঁড়ের শব্দে যেন এমন কাহাকে আঘাত করিতে লাগিল যাহা সচেতন সুন্দর সুকুমার, যাহা অনন্ত-আকাশ-ব্যাপী অথচ একটি হরিণশাবকের মতো ভীরু। নৌকা যখন ঘাটের নিকটবর্তী হইল তখন দাঁড়ের শব্দে আমার প্রতিবেশিনী প্রথমে ধীরে মুখ তুলিয়া মৃদু কৌতূহলের সহিত আমার নৌকার দিকে চাহিল, মুহূর্ত পরেই আমার ব্যগ্রব্যাকুল দৃষ্টি দেখিয়া সে চকিত হইয়া গৃহমধ্যে চলিয়া গেল; আমার মনে হইল, আমি যেন তাহাকে আঘাত করিলাম, যেন কোথায় তাহার বাজিল!

তাড়াতাড়ি উঠিবার সময় তাহার ক্রোড় হইতে একটি অর্ধদষ্ট স্বল্পপক্ক পেয়ারা গড়াইতে গড়াইতে নিম্ন সোপানে আসিয়া পড়িল, সেই দশনচিহ্নিত অধরচুম্বিত ফলটির জন্য আমার সমস্ত অন্তঃকরণ উৎসুক হইয়া উঠিল, কিন্তু মাঝিমাল্লাদের লজ্জায় তাহা দূর হইতে নিরীক্ষণ করিতে করিতে চলিয়া গেলাম। দেখিলাম, উত্তরোত্তর লোলুপায়মান জোয়ারের জল ছলছল লুব্ধ শব্দে তাহার লোল রসনার দ্বারা সেই ফলটিকে আয়ত্ত করিবার জন্য বারম্বার উন্মুখ হইয়া উঠিতেছে, আধ ঘণ্টার মধ্যে তাহার নির্লজ্জ অধ্যবসায় চরিতার্থ হইবে ইহাই কল্পনা করিয়া ক্লিষ্টচিত্তে আমি আমার বাড়ির ঘাটে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম।

বটবৃক্ষচ্ছায়ায় পা ছড়াইয়া দিয়া সমস্ত দিন স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম, দুইখানি সুকোমল পদপল্লবের তলে বিশ্বপ্রকৃতি মাথা নত করিয়া পড়িয়া আছে— আকাশ আলোকিত, ধরণী পুলকিত, বাতাস উতলা, তাহারই মধ্যে দুইখানি অনাবৃত চরণ স্থির নিস্পন্দ সুন্দর; তাহারা জানেও না যে, তাহাদেরই রেণুকণার মাদকতায় তপ্তযৌবন নববসন্ত দিগ্‌বিদিকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে।

ইতিপূর্বে প্রকৃতি আমার কাছে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ছিল, নদী বন আকাশ সমস্তই স্বতন্ত্র ছিল। আজ সেই বিশাল বিপুল বিকীর্ণতার মাঝখানে একটি সুন্দরী প্রতিমূর্তি দেখা দিবামাত্র তাহা অবয়ব ধারণ করিয়া এক হইয়া উঠিয়াছে। আজ প্রকৃতি আমার কাছে এক ও সুন্দর, সে আমাকে অহরহ মূকভাবে অনুনয় করিতেছে, "আমি মৌন, তুমি আমাকে ভাষা দেও, আমার অন্তঃকরণে যে-একটি অব্যক্ত স্তব উত্থিত হইতেছে তুমি তাহাকে ছন্দে লয়ে তানে তোমার সুন্দর মানবভাষায় ধ্বনিত করিয়া তোলো!"

প্রকৃতির সেই নীরব অনুনয়ে আমার হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্রী বাজিতে থাকে। বারম্বার কেবল এই গান শুনি, "হে সুন্দরী, হে মনোহারিণী, হে বিশ্বজয়িনী, হে মনপ্রাণপতঙ্গের

একটিমাত্র দীপশিখা, হে অপরিসীম জীবন, হে অনন্তমধুর মৃত্যু!" এ গান শেষ করিতে পারি না, সংলগ্ন করিতে পারি না; ইহাকে আকারে পরিস্ফুট করিতে পারি না, ইহাকে ছন্দে গাঁথিয়া ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারি না; মনে হয়, আমার অন্তরের মধ্যে জোয়ারের জলের মতো একটা অনির্বচনীয় অপরিমেয় শক্তির সঞ্চার হইতেছে, এখনো তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারিতেছি না, যখন পারিব তখন আমার কণ্ঠ অকস্মাৎ দিব্য সংগীতে ধ্বনিত, আমার ললাট অলৌকিক আভায় আলোকিত হইয়া উঠিবে।

এমন সময় একটি নৌকা পরপারের নৈহাটি স্টেশন হইতে পার হইয়া আমার বাগানের ঘাটে আসিয়া লাগিল। দুই স্কন্ধের উপর কোঁচানো চাদর ঝুলাইয়া ছাতাটি কক্ষে লইয়া হাস্যমুখে অমূল্য নামিয়া পড়িল। অকস্মাৎ বন্ধুকে দেখিয়া আমার মনে যেরূপ ভাবোদয় হইল, আশা করি, শত্রুর প্রতিও কাহারো যেন সেইরূপ না ঘটে। বেলা প্রায় দুইটার সময় আমাকে সেই বটের ছায়ায় নিতান্ত ক্ষিপ্তের মতো বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অমূল্যর মনে ভারি একটা আশার সঞ্চার হইল। পাছে বঙ্গদেশের ভবিষ্যৎ সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যের কোনো-একটা অংশ তাহার পদশব্দে সচকিত হইয়া বন্য রাজহংসের মতো একেবারে জলের মধ্যে গিয়া পড়ে সেই ভয়ে সে সসংকোচে মৃদুমন্দগমনে আসিতে লাগিল; দেখিয়া আমার আরো রাগ হইল, কিঞ্চিৎ অধীর হইয়া কহিলাম, "কী হে অমূল্য, ব্যাপারখানা কী! তোমার পায়ে কাঁটা ফুটিল নাকি।" অমূল্য ভাবিল, আমি খুব একটা মজার কথা বলিলাম; হাসিতে হাসিতে কাছে আসিয়া তরুতল কোঁচা দিয়া বিশেষরূপে ঝাড়িয়া লইল, পকেট হইতে একটি রুমাল লইয়া ভাঁজ খুলিয়া বিছাইয়া তাহার উপরে সাবধানে বসিল, কহিল, "যে প্রহসনটা লিখিয়া পাঠাইয়াছ সেটা পড়িয়া হাসিয়া বাঁচি না।" বলিয়া তাহার স্থানে স্থানে আবৃত্তি করিতে করিতে হাস্যোচ্ছ্বাসে তাহার নিশ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। আমার এমনি মনে হইল যে, যে কলমে সেই প্রহসনটা লিখিয়াছিলাম, সেটা যে গাছের কাষ্ঠদণ্ডে নির্মিত সেটাকে শিকড়সুদ্ধ উৎপাটন করিয়া মস্ত একটা আগুন করিয়া প্রহসনটাকে ছাই করিয়া ফেলিলেও আমার খেদ মিটিবে না।

অমূল্য সসংকোচে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার সে কাব্যের কতদূর।" শুনিয়া আরো আমার গা জ্বলিতে লাগিল, মনে মনে কহিলাম, 'যেমন আমার কাব্য তেমনি তোমার বুদ্ধি!' মুখে কহিলাম, "সে-সব পরে হইবে ভাই, আমাকে অনর্থক ব্যস্ত করিয়া তুলিয়ো না।"

অমূল্য লোকটা কৌতূহলী, চারি দিক পর্যবেক্ষণ না করিয়া সে থাকিতে পারে না,

তাহার ভয়ে আমি উত্তরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিলাম। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ও দিকে কী আছে হে।" আমি বলিলাম, "কিছু না!" এতবড়ো মিথ্যা কথাটা আমার জীবনে আর কখনো বলি নাই।

দুটা দিন আমাকে নানা প্রকারে বিদ্ধ করিয়া, দগ্ধ করিয়া, তৃতীয় দিনের সন্ধ্যার ট্রেনে অমূল্য চলিয়া গেল। এই দুটা দিন আমি বাগানের উত্তরের দিকে যাই নাই, সে দিকে নেত্রপাতমাত্র করি নাই, কৃপণ যেমন তাহার রত্নভাণ্ডারটি লুকাইয়া বেড়ায় আমি তেমনি করিয়া আমার উত্তরের সীমানার বাগানটি সামলাইয়া বেড়াইতেছিলাম। অমূল্য চলিয়া যাইবামাত্র একেবারে ছুটিয়া দ্বার খুলিয়া দোতলার ঘরের উত্তরের বারান্দায় বাহির হইয়া পড়িলাম। উপরে উন্মুক্ত আকাশে প্রথম কৃষ্ণপক্ষের অপর্যাপ্ত জ্যোৎস্না; নিম্নে শাখাজালনিবদ্ধ তরুশ্রেণীতলে খণ্ডকিরণখচিত একটি গভীর নিভৃত প্রদোষান্ধকার; মর্মরিত ঘনপল্লবের দীর্ঘনিশ্বাসে, তরুতলবিচ্যুত বকুলফুলের নিবিড় সৌরভে এবং সন্ধ্যারণ্যের স্তম্ভিত সংযত নিঃশব্দতায় তাহা রোমে রোমে পরিপূর্ণ হইয়া ছিল। তাহারই মাঝখানটিতে আমার কুমারী প্রতিবেশিনী তাহার শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ পিতার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে করিতে কী কথা কহিতেছিল— বৃদ্ধ সস্নেহে অথচ শ্রদ্ধাভরে ঈষৎ অবনমিত হইয়া নীরবে মনোযোগসহকারে শুনিতে-ছিলেন। এই পবিত্র স্নিগ্ধ বিশ্রম্ভালাপে ব্যাঘাত করিবার কিছুই ছিল না, সন্ধ্যাকালের শান্ত নদীতে কচিৎ দাঁড়ের শব্দ সুদূরে বিলীন হইতেছিল এবং অবিরল তরুশাখার অসংখ্য নীড়ে দুটি-একটি পাখি দৈবাৎ ক্ষণিক মৃদুকাকলিতে জাগিয়া উঠিতেছিল। আমার অন্তঃকরণ আনন্দে অথবা বেদনায় যেন বিদীর্ণ হইবে মনে হইল। আমার অস্তিত্ব যেন প্রসারিত হইয়া সে ছায়ালোকবিচিত্র ধরণীতলের সহিত এক হইয়া গেল, আমি যেন আমার বক্ষঃস্থলের উপর ধীরবিক্ষিপ্ত পদচারণা অনুভব করিতে লাগিলাম, যেন তরুপল্লবের সহিত সংলগ্ন হইয়া গিয়া আমার কানের কাছে মধুর মৃদুগুঞ্জনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। এই বিশাল মূঢ় প্রকৃতির অন্তর্বেদনা যেন আমার সর্বশরীরের অস্থিগুলির মধ্যে কুহরিত হইয়া উঠিল; আমি যেন বুঝিতে পারিলাম, ধরণী পায়ের নীচে পড়িয়া থাকে, অথচ পা জড়াইয়া ধরিতে পারে না বলিয়া ভিতরে ভিতরে কেমন করিতে থাকে, নতশাখা বনস্পতিগুলি কথা শুনিতে পায় অথচ কিছুই বুঝিতে পারে না বলিয়া সমস্ত শাখায় পল্লবে মিলিয়া কেমন ঊর্ধ্বশ্বাসে উন্মাদ কলশব্দে হাহাকার করিয়া উঠিতে চাহে। আমিও আমার সর্বাঙ্গে সর্বান্তঃকরণে ওই পদবিক্ষেপ, ওই বিশ্রম্ভালাপ, অব্যবহিতভাবে অনুভব করিতে লাগিলাম কিন্তু কোনোমতেই ধরিতে পারিলাম না বলিয়া ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরিতে লাগিলাম।

পরদিনে আমি আর থাকিতে পারিলাম না। প্রাতঃকালে আমার প্রতিবেশীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। ভবনাথবাবু তখন বড়ো এক পেয়ালা চা পাশে রাখিয়া চোখে চশমা দিয়া নীলপেন্সিলে-দাগ-করা একখানা হ্যামিল্‌টনের পুরাতন পুঁথি মনোযোগ দিয়া পড়িতেছিলেন। আমি ঘরে প্রবেশ করিলে চশমার উপরিভাগ হইতে আমাকে কিয়ৎক্ষণ অন্যমনস্কভাবে দেখিলেন, বই হইতে মনটাকে এক মুহূর্তে প্রত্যাহরণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে অকস্মাৎ সচকিত হইয়া ত্রস্তভাবে আতিথ্যের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিলেন। আমি সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিলাম। তিনি এমনি শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন যে চশমার খাপ খুঁজিয়া পাইলেন না। খামকা বলিলেন, "আপনি চা খাইবেন?" আমি যদিচ চা খাই না, তথাপি বলিলাম, "আপত্তি নাই।" ভবনাথবাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া 'কিরণ' 'কিরণ' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। দ্বারের নিকট অত্যন্ত মধুর শব্দ শুনিলাম, "কী, বাবা।" ফিরিয়া দেখিলাম, তাপসকন্যদুহিতা সহসা আমাকে দেখিয়া ত্রস্ত হরিণীর মতো পলায়নোদ্যতা হইয়াছেন। ভবনাথবাবু তাঁহাকে ফিরিয়া ডাকিলেন; আমার পরিচয় দিয়া কহিলেন, "ইনি আমাদের প্রতিবেশী মহীন্দ্রকুমার বাবু।" এবং আমাকে কহিলেন, "ইনি আমার কন্যা কিরণবালা।" আমি কী করিব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না, ইতিমধ্যে কিরণ আমাকে আনম্রসুন্দর নমস্কার করিলেন। আমি তাড়াতাড়ি ত্রুটি সারিয়া লইয়া তাহা শোধ করিয়া দিলাম। ভবনাথবাবু কহিলেন, "মা, মহীন্দ্রবাবুর জন্য এক পেয়ালা চা আনিয়া দিতে হইবে।" আমি মনে মনে অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া উঠিলাম কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার পূর্বেই কিরণ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আমার মনে হইল, যেন কৈলাসে সনাতন ভোলানাথ তাঁহার কন্যা স্বয়ং লক্ষ্মীকে অতিথির জন্য এক পেয়ালা চা আনিতে বলিলেন; অতিথির পক্ষে সে নিশ্চয়ই অমিশ্র অমৃত হইবে, কিন্তু তবু, কাছাকাছি নন্দীভৃঙ্গী কোনো বেটাই কি হাজির ছিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভবনাথবাবুর বাড়ি আমি এখন নিত্য অতিথি। পূর্বে চা জিনিসটাকে অত্যন্ত ডরাইতাম, এক্ষণে সকালে বিকালে চা খাইয়া খাইয়া আমার চায়ের নেশা ধরিয়া গেল।

আমাদের বি. এ. পরীক্ষার জন্য জর্মানপণ্ডিত-বিরচিত দর্শনশাস্ত্রের নব্য-ইতিহাস আমি সদ্য পাঠ করিয়া আসিয়াছিলাম, তদুপলক্ষে ভবনাথবাবুর সহিত কেবল দর্শন-আলোচনার জন্যই আসিতাম কিছুদিন এইপ্রকার ভান করিলাম। তিনি হ্যামিলটন

প্রভৃতি কতকগুলি সেকাল-প্রচলিত ভ্রান্ত পুঁথি লইয়া এখনো নিযুক্ত রহিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাকে আমি কৃপাপাত্র মনে করিতাম, এবং আমার নূতন বিদ্যা অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত জাহির করিতে ছাড়িতাম না। ভবনাথবাবু এমনি ভালোমানুষ, এমনি সকল বিষয়ে সসংকোচ যে, আমার মতো অল্পবয়স্ক যুবকের মুখ হইতেও সকল কথা মানিয়া যাইতেন, তিলমাত্র প্রতিবাদ করিতে হইলে অস্থির হইয়া উঠিতেন, ভয় করিতেন পাছে আমি কিছুতে ক্ষুণ্ণ হই। কিরণ আমাদের এই-সকল তত্ত্বালোচনার মাঝখান হইতেই কোনো ছুতায় উঠিয়া চলিয়া যাইত। তাহাতে আমার যেমন ক্ষোভ জন্মিত তেমনি আমি গর্বও অনুভব করিতাম। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের দুরূহ পাণ্ডিত্য কিরণের পক্ষে দুঃসহ; সে যখন মনে মনে আমার বিদ্যাপর্বতের পরিমাপ করিত তখন তাহাকে কত উচ্চেই চাহিতে হইত।

কিরণকে যখন দূর হইতে দেখিতাম তখন তাহাকে শকুন্তলা দময়ন্তী প্রভৃতি বিচিত্র নামে এবং বিচিত্র ভাবে জানিতাম, এখন ঘরের মধ্যে তাহাকে 'কিরণ' বলিয়া জানিলাম, এখন আর সে জগতের বিচিত্র নায়িকার ছায়ারূপিণী নহে, এখন সে একমাত্র কিরণ। এখন সে শতশতাব্দীর কাব্যলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়া, অনন্তকালের যুবকচিত্তের স্বপ্নস্বর্গ পরিহার করিয়া, একটি নির্দিষ্ট বাঙালিঘরের মধ্যে কুমারী-কন্যারূপে বিরাজ করিতেছে। সে আমারই মাতৃভাষায় আমার সঙ্গে অত্যন্ত সাধারণ ঘরের কথা বলিয়া থাকে, সামান্য কথায় সরলভাবে হাসিয়া উঠে, সে আমাদেরই ঘরের মেয়ের মতো দুই হাতে দুটি সোনার বালা পরিয়া থাকে, গলার হারটি বেশি কিছু নয় কিন্তু বড়ো সুমিষ্ট, শাড়ির প্রান্তটি কখনো কবরীর উপরিভাগ বাঁকিয়া বেষ্টন করিয়া আসে কখনো বা পিতৃগৃহের অনভ্যাসবশত চ্যুত হইয়া পড়িয়া যায়, ইহা আমার কাছে বড়ো আনন্দের। সে যে অকাল্পনিক, সে যে সত্য, সে যে কিরণ, সে যে তাহা ব্যতীত নহে এবং তাহার অধিক নহে, এবং যদিচ সে আমার নহে তবুও সে যে আমাদের, সেজন্য আমার অন্তঃকরণ সর্বদাই তাহার প্রতি উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতারসে অভিষিক্ত হইতে থাকে।

একদিন জ্ঞানমাত্রেরই আপেক্ষিকতা লইয়া ভবনাথবাবুর নিকট অত্যন্ত উৎসাহসহকারে বাচালতা প্রকাশ করিতেছিলাম; আলোচনা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবামাত্র কিরণ উঠিয়া গেল এবং অনতিকাল পরেই সম্মুখের বারান্দায় একটা তোলা উনান এবং রাঁধিবার সরঞ্জাম আনিয়া রাখিয়া, ভবনাথবাবুকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, "বাবা, কেন তুমি মহীন্দ্রবাবুকে ঐসকল শক্ত কথা লইয়া বৃথা বকাইতেছ! আসুন মহীন্দ্রবাবু, তার চেয়ে আমার রান্নায় যোগ দিলে কাজে লাগিবে।"

ভবনাথবাবুর কোনো দোষ ছিল না, এবং কিরণ তাহা অবগত ছিল। কিন্তু ভবনাথবাবু অপরাধীর মতো অনুতপ্ত হইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তা বটে! আচ্ছা ও কথাটা আর-একদিন হইবে।" এই বলিয়া নিরুদ্‌বিগ্নচিত্তে তিনি তাঁহার নিত্য-নিয়মিত অধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন।

আবার আর-একদিন অপরাহ্নে আর-একটা গুরুতর কথা পাড়িয়া ভবনাথবাবুকে স্তম্ভিত করিয়া দিতেছি এমন সময় ঠিক মাঝখানে আসিয়া কিরণ কহিল, "মহীন্দ্রবাবু, অবলাকে সাহায্য করিতে হইবে। দেয়ালে লতা চড়াইব, নাগাল পাইতেছি না, আপনাকে এই পেরেকগুলি মারিয়া দিতে হইবে।" আমি উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া গেলাম, ভবনাথবাবুও প্রফুল্লমনে পড়িতে বসিলেন।

এমনি প্রায় যখনই ভবনাথবাবুর কাছে আমি ভারী কথা পাড়িবার উপক্রম করি, কিরণ একটা-না-একটা কাজের ছুতা ধরিয়া ভঙ্গ করিয়া দেয়। ইহাতে আমি মনে-মনে পুলকিত হইয়া উঠিতাম, আমি বুঝিতাম যে, কিরণের কাছে আমি ধরা পড়িয়াছি; সে কেমন করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে যে, ভবনাথবাবুর সহিত তত্ত্বালোচনা আমার জীবনের চরম সুখ নহে।

বাহ্যবস্তুর সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গিয়া যখন দুরূহ রহস্যরসাতলের মধ্যপথে অবতীর্ণ হইয়াছি এমন সময় কিরণ আসিয়া বলিত, "মহীন্দ্রবাবু, রান্নাঘরের পাশে আমার বেগুনের খেত আপনাকে দেখাইয়া আনিগে, চলুন।"

আকাশকে অসীম মনে করা কেবল আমাদের অনুমানমাত্র, আমাদের অভিজ্ঞতা ও কল্পনাশক্তির বাহিরে কোথাও কোনো-একরূপে তাহার সীমা থাকা কিছুই অসম্ভব নহে, ইত্যাকার মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি, এমন সময় কিরণ আসিয়া বলিত, "মহীন্দ্র-বাবু, দুটো আম পাকিয়াছে, আপনাকে ডাল নামাইয়া ধরিতে হইবে।"

কী উদ্ধার, কী মুক্তি! অকূল সমুদ্রের মাঝখান হইতে এক মুহূর্তে কী সুন্দর কূলে আসিয়া উঠিতাম। অনন্ত আকাশ ও বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে সংশয়জাল যতই দুশ্ছেদ্য জটিল হউক-না কেন, কিরণের বেগুনের খেত বা আমতলা সম্বন্ধে কোনোপ্রকার দুরূহতা ও সন্দেহের লেশমাত্র ছিল না। কাব্যে বা উপন্যাসে তাহা উল্লেখযোগ্য নহে কিন্তু জীবনে তাহা সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপের ন্যায় মনোহর। মাটিতে পা ঠেকা যে কী আরাম তাহা সে-ই জানে যে বহুক্ষণ জলের মধ্যে সাঁতার দিয়াছে। আমি এতদিন কল্পনায় যে প্রেমসমুদ্র সৃজন করিয়াছিলাম তাহা যদি সত্য হইত তবে সেখানে চিরকাল যে কী করিয়া ভাসিয়া বেড়াইতাম তাহা বলিতে পারি না। সেখানে আকাশও অসীম,

সমুদ্রও অসীম, সেখান হইতে আমাদের প্রতিদিবসের বিচিত্র জীবনযাত্রার সীমাবদ্ধ ব্যাপার একেবারে নির্বাসিত, সেখানে তুচ্ছতার লেশমাত্র নাই, সেখানে কেবল ছন্দে লয়ে সংগীতে ভাব ব্যক্ত করিতে হয়, এবং তলাইতে গেলে কোথাও তল পাওয়া যায় না। কিরণ সেখান হইতে মজ্জমান এই হতভাগ্যের কেশপাশ ধরিয়া যখন তাহার আমতলায় তাহার বেগুনের খেতে টানিয়া তুলিল তখন পায়ের তলায় মাটি পাইয়া আমি বাঁচিয়া গেলাম। আমি দেখিলাম, বারান্দায় বসিয়া খিচুড়ি রাঁধিয়া, মই চড়িয়া দেয়ালে পেরেক মারিয়া, লেবুগাছে ঘনসবুজ পত্ররাশির মধ্য হইতে সবুজ লেবুফল সন্ধান করিতে সাহায্য করিয়া অভাবনীয় আনন্দ লাভ করা যায়, অথচ সে আনন্দলাভের জন্য কিছুমাত্র প্রয়াস পাইতে হয় না— আপনি যে কথা মুখে আসে, আপনি যে হাসি উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে, আকাশ হইতে যতটুকু আলো আসে এবং গাছ হইতে যতটুকু ছায়া পড়ে তাহাই যথেষ্ট। ইহা ছাড়া আমার কাছে একটি সোনার কাঠি ছিল আমার নবযৌবন, একটি পরশপাথর ছিল আমার প্রেম, একটি অক্ষয় কল্পতরু ছিল আমার নিজের প্রতি নিজের অক্ষুণ্ণ বিশ্বাস; আমি বিজয়ী, আমি ইন্দ্র, আমার উচ্চৈঃশ্রবার পথে কোনো বাধা দেখিতে পাই নাই। কিরণ, আমার কিরণ, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। সে কথা এতক্ষণ স্পষ্ট করিয়া বলি নাই, কিন্তু হৃদয়ের এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত মুহূর্তের মধ্যে মহাসুখে বিদীর্ণ করিয়া সে কথা বিদ্যুতের মতো আমার সমস্ত অন্তঃকরণ ধাঁধিয়া ক্ষণে ক্ষণে নাচিয়া উঠিতেছিল। কিরণ, আমার কিরণ।

ইতিপূর্বে আমি কোনো অনাত্মীয়া মহিলার সংস্রবে আসি নাই, যে নব্য-রমণীগণ শিক্ষালাভ করিয়া অবরোধের বাহিরে সঞ্চরণ করেন তাঁহাদের রীতিনীতি আমি কিছুই অবগত নহি; অতএব তাঁহাদের আচরণে কোন্‌খানে শিষ্টতার সীমা, কোন্‌খানে প্রেমের অধিকার, তাহা আমি কিছুই জানি না; কিন্তু ইহাও জানি না, আমাকে কেনই বা ভালো না বাসিবে, আমি কোন্ অংশে ন্যূন।

কিরণ যখন আমার হাতে চায়ের পেয়ালাটি দিয়া যাইত তখন চায়ের সঙ্গে পাত্রভরা কিরণের ভালোবাসাও গ্রহণ করিতাম, চা-টি যখন পান করিতাম তখন মনে করিতাম, আমার গ্রহণ সার্থক হইল এবং কিরণেরও দান সার্থক হইল। কিরণ যদি সহজ সুরে বলিত 'মহীন্দ্রবাবু, কাল সকাল-সকাল আসবেন তো?' তাহার মধ্যে ছন্দে লয়ে বাজিয়া উঠিত—

কী মোহিনী জান, বন্ধু, কী মোহিনী জান!
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা-হেন!

আমি সহজ কথায় উত্তর করিতাম, 'কাল আটটার মধ্যে আসব।' তাহার মধ্যে কিরণ কি শুনিতে পাইত না—

পরানপুতলি তুমি হিয়ে-মণিহার,
সরবস ধন মোর সকল সংসার।

আমার সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত্রি অমৃতে পূর্ণ হইয়া গেল। আমার সমস্ত চিন্তা এবং কল্পনা মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন নূতন শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া লতার ন্যায় কিরণকে আমার সহিত বেষ্টন করিয়া বাঁধিতে লাগিল। যখন শুভ-অবসর আসিবে তখন কিরণকে কী পড়াইব, কী শিখাইব, কী শুনাইব, কী দেখাইব তাহারই অসংখ্য সংকল্পে আমার মন আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এমন-কি স্থির করিলাম, জর্মানপণ্ডিত-রচিত দর্শনশাস্ত্রের নব্য ইতিহাসেও যাহাতে তাহার চিত্তের ঔৎসুক্য জন্মে এমন শিক্ষা তাহাকে দিতে হইবে, নতুবা আমাকে সে সর্বতোভাবে বুঝিতে পারিবে না। ইংরাজি কাব্যসাহিত্যের সৌন্দর্যলোকে আমি তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইব। আমি মনে মনে হাসিলাম, কহিলাম, 'কিরণ, তোমার আমতলা এবং বেগুনের খেত আমার কাছে নূতন রাজ্য। আমি কস্মিনকালে স্বপ্নেও জানিতাম না যে, সেখানে বেগুন এবং ঝড়ে-পড়া কাঁচা আম ছাড়াও দুর্লভ অমৃতফল এত সহজে পাওয়া যায়। কিন্তু যখন সময় আসিবে তখন আমিও তোমাকে এমন এক রাজ্যে লইয়া যাইব যেখানে বেগুন ফলে না কিন্তু তথাপি বেগুনের অভাব মুহূর্তের জন্য অনুভব করিতে হয় না। সে জ্ঞানের রাজ্য, ভাবের স্বর্গ।"

সূর্যাস্তকালের দিগন্তবিলীন পাণ্ডুবর্ণ সন্ধ্যাতারা ঘনায়মান সায়াহ্নে ক্রমেই যেমন পরিস্ফুট দীপ্তি লাভ করে, কিরণও তেমনি কিছুদিন ধরিয়া ভিতর হইতে আনন্দে লাবণ্যে নারীত্বের পূর্ণতায় যেন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। সে যেন তাহার গৃহের, তাহার সংসারের ঠিক মধ্য-আকাশে অধিরোহণ করিয়া চারি দিকে আনন্দের মঙ্গল-জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে লাগিল; সেই জ্যোতিতে তাহার বৃদ্ধ পিতার শুভ্রকেশের উপর পবিত্রতর উজ্জ্বল আভা পড়িল, এবং সেই জ্যোতি আমার উদ্বেল হৃদয়সমুদ্রের প্রত্যেক তরঙ্গের উপর কিরণের মধুর নামের একটি করিয়া জ্যোতির্ময় স্বাক্ষর মুদ্রিত করিয়া দিল।

এ দিকে আমার ছুটি সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল, বিবাহ-উদ্দেশে বাড়ি আসিবার জন্য পিতার সস্নেহ অনুরোধ ক্রমে কঠিন আদেশে পরিণত হইবার উপক্রম হইল, এ দিকে অমূল্যকেও আর ঠেকাইয়া রাখা যায় না, সে কোন্‌দিন উন্মত্ত বন্যহস্তীর ন্যায় আমার এই পদ্মবনের মাঝখানে ফস করিয়া তাহার বিপুল চরণচতুষ্টয় নিক্ষেপ করিবে

এ উদ্‌বেগও উত্তরোত্তর প্রবল হইতে লাগিল। কেমন করিয়া অবিলম্বে অন্তরের আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করিয়া আমার প্রণয়কে পরিণয়ে বিকশিত করিয়া তুলিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

একদিন মধ্যাহ্নকালে ভবনাথবাবুর গৃহে গিয়া দেখি, তিনি গ্রীষ্মের উত্তাপে চৌকিতে ঠেসান দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন এবং সম্মুখে গঙ্গাতীরের বারান্দায় নির্জন ঘাটের সোপানে বসিয়া কিরণ কী বই পড়িতেছে। আমি নিঃশব্দপদে পশ্চাতে গিয়া দেখি, একখানি নূতন কাব্যসংগ্রহ, যে পাতাটি খোলা আছে তাহাতে শেলির একটি কবিতা উদ্‌ধৃত এবং তাহার পার্শ্বে লাল কালিতে একটি পরিষ্কার লাইন টানা। সেই কবিতাটি পাঠ করিয়া কিরণ ঈষৎ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বপ্নভারাকুল নয়নে আকাশের দূরতম প্রান্তের দিকে চাহিল; বোধ হইল, যেন সেই একটি কবিতা কিরণ আজ এক ঘণ্টা ধরিয়া দশবার করিয়া পড়িয়াছে এবং অনন্ত নীলাকাশে, আপন হৃদয়-তরণীর পালে একটিমাত্র উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস দিয়া, তাহাকে অতিদূর নক্ষত্রলোকে প্রেরণ করিয়াছে। শেলি কাহার জন্য এই কবিতাটি লিখিয়াছিল জানি না; মহীন্দ্রনাথ নামক কোনো বাঙালি যুবকের জন্য লেখে নাই তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আজ এই স্তবগানে আমি ছাড়া আর-কাহারো অধিকার নাই ইহা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। কিরণ এই কবিতাটির পাশে আপন অন্তরতম হৃদয়-পেন্সিল দিয়া একটি উজ্জ্বল রক্তচিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছে, সেই মায়াগণ্ডির মোহমন্ত্রে কবিতাটি আজ তাহারই, এবং সেই সঙ্গে আমারও। আমি পুলকোচ্ছ্বসিত চিত্তকে সম্বরণ করিয়া সহজ সুরে কহিলাম, "কী পড়িতেছেন।" পালভরা নৌকা যেন হঠাৎ চড়ায় ঠেকিয়া গেল। কিরণ চমকিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি বইখানা বন্ধ করিয়া একেবারে আঁচলের মধ্যে ঢাকিয়া ফেলিল। আমি হাসিয়া কহিলাম, "বইখানি একবার দেখিতে পারি?" কিরণকে কী যেন বাজিল, সে আগ্রহসহকারে বলিয়া উঠিল, "না না, ও বই থাক্।"

আমি কিয়দ্দূরে একটা ধাপ নীচে বসিয়া ইংরাজি কাব্যসাহিত্যের কথা উত্থাপন করিলাম, এমন করিয়া কথা তুলিলাম যাহাতে কিরণেরও সাহিত্যশিক্ষা হয় এবং আমারও মনের কথা ইংরাজ কবির জবানিতে ব্যক্ত হইয়া উঠে। খররৌদ্রতাপে সুগভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে জলের স্থলের ছোটো ছোটো কলশব্দগুলি নিদ্রাকাতর জননীর ঘুমপাড়ানি গানের মতো অতিশয় মৃদু এবং সকরুণ হইয়া আসিল।

কিরণ যেন অধীর হইয়া উঠিল; কহিল, "বাবা একা বসিয়া আছেন, অনন্ত

আকাশ সম্বন্ধে আপনাদের সে তর্কটা শেষ করিবেন না?" আমি মনে মনে ভাবিলাম, অনন্ত আকাশ তো চিরকাল থাকিবে এবং তাহার সম্বন্ধে তর্কও তো কোনোকালে শেষ হইবে না, কিন্তু জীবন স্বল্প এবং শুভ অবসর দুর্লভ ও ক্ষণস্থায়ী। কিরণের কথার উত্তর না দিয়া কহিলাম, "আমার কতকগুলি কবিতা আছে, আপনাকে শুনাইব।" কিরণ কহিল, "কাল শুনিব।" বলিয়া একেবারে উঠিয়া ঘরের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবা, মহীন্দ্রবাবু আসিয়াছেন।" ভবনাথবাবু নিদ্রাভঙ্গে বালকের ন্যায় তাঁহার সরল নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আমার বক্ষে যেন ধক্ করিয়া একটা মস্ত ঘা লাগিল। ভবনাথবাবুর ঘরে গিয়া অনন্ত আকাশ সম্বন্ধে তর্ক করিতে লাগিলাম। কিরণ বই হাতে লইয়া দোতলায় বোধ হয় তাহার নির্জন শয়নকক্ষে নির্বিঘ্নে পড়িতে গেল।

পরদিন সকালের ডাকে লালপেন্সিলের দাগ দেওয়া একখানা স্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজ পাওয়া গেল, তাহাতে বি. এ পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। প্রথমেই প্রথম-ডিবিশান-কোঠায় কিরণবালা বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়া একটা নাম চোখে পড়িল; আমার নিজের নাম প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় কোনো বিভাগেই নাই।

পরীক্ষায় অকৃতার্থ হইবার বেদনার সঙ্গে সঙ্গে বজ্রাগ্নির ন্যায় একটা সন্দেহ বাজিতে লাগিল যে, কিরণবালা বন্দ্যোপাধ্যায় হয়তো আমাদেরই কিরণবালা। সে-যে কালেজে পড়িয়াছে বা পরীক্ষা দিয়াছে, এ কথা যদিও আমাকে বলে নাই তথাপি সন্দেহ ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল। কারণ, ভাবিয়া দেখিলাম, বৃদ্ধ পিতা এবং তাঁহার কন্যাটি নিজেদের সম্বন্ধে কোনো কথাই কখনো আলাপ করেন নাই, এবং আমিও নিজের আখ্যান বলিতে এবং নিজের বিদ্যা প্রচার করিতে সর্বদাই এমন নিযুক্ত ছিলাম যে, তাঁহাদের কথা ভালো করিয়া জিজ্ঞাসাও করি নাই।

জর্মানপণ্ডিত-রচিত আমার নূতন-পড়া দর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধীয় তর্কগুলি আমার মনে পড়িতে লাগিল, এবং মনে পড়িল, আমি একদিন কিরণকে বলিয়াছিলাম, "আপনাকে যদি আমি কিছুদিন গুটিকতক বই পড়াইবার সুযোগ পাই তাহা হইলে ইংরাজি কাব্যসাহিত্য সম্বন্ধে আপনার একটা পরিষ্কার ধারণা জন্মাইতে পারি।"

কিরণবালা দর্শনশাস্ত্রে অনার লইয়াছেন এবং সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণা। যদি এই কিরণ হয়!

অবশেষে প্রবল খোঁচা দিয়া আপন ভস্মাচ্ছন্ন অহংকারকে উদ্দীপ্ত করিয়া কহিলাম,

"হয় হউক— আমার রচনাবলী আমার জয়স্তম্ভ।" বলিয়া খাতা-হাতে সবলে পা ফেলিয়া মাথা পূর্বাপেক্ষা উচ্চে তুলিয়া ভবনাথবাবুর বাগানে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

তখন তাঁহার ঘরে কেহ ছিল না। আমি একবার ভালো করিয়া বৃদ্ধের পুস্তকগুলি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, এক কোণে আমার সেই নব্যজার্মান-পণ্ডিত-রচিত দর্শনের ইতিহাসখানি অনাদরে পড়িয়া রহিয়াছে; খুলিয়া দেখিলাম, ভবনাথবাবুর স্বহস্তলিখিত নোটে তাহার মার্জিন পরিপূর্ণ। বৃদ্ধ নিজে তাঁহার কন্যাকে শিক্ষা দিয়াছেন। আমার আর সন্দেহ রহিল না।

ভবনাথবাবু অন্যদিনের অপেক্ষা প্রসন্নজ্যোতিবিচ্ছুরিত মুখে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন, যেন কোনো সুসংবাদের নির্ঝরধারায় তিনি সদ্য প্রাতঃস্নান করিয়া আসিয়াছেন। আমি অকস্মাৎ কিছু দম্ভের ভাবে রুক্ষহাস্য হাসিয়া কহিলাম, "ভবনাথবাবু, আমি পরীক্ষায় ফেল করিয়াছি।" যে-সকল বড়ো বড়ো লোক বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফেল করিয়া জীবনের পরীক্ষায় প্রথমশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়, আমি যেন আজ তাহাদেরই মধ্যে গণ্য হইলাম। পরীক্ষা বাণিজ্য ব্যবসায় চাকুরি প্রভৃতিতে কৃতকার্য হওয়া মাঝামাঝি লোকের লক্ষণ, নিম্নতম এবং উচ্চতম শ্রেণীর লোকদেরই অকৃতকার্য হইবার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। ভবনাথবাবুর মুখ সস্নেহকরুণ হইয়া আসিল, তিনি তাঁহার কন্যার পরীক্ষোত্তরণসংবাদ আমাকে আর দিতে পারিলেন না; কিন্তু আমার অসংগত উগ্র প্রফুল্লতা দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইয়া গেলেন। তাঁহার সরল বুদ্ধিতে আমার গর্বের কারণ বুঝিতে পারিলেন না।

এমন সময় আমাদের কালেজের নবীন অধ্যাপক বামাচরণবাবুর সহিত কিরণ সলজ্জ সরসোজ্জ্বল মুখে বর্ষাধৌত লতাটির মতো ছলছল্ করিতে করিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমার আর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। রাত্রে বাড়িতে আসিয়া আমার রচনাবলীর খাতাখানা পুড়াইয়া ফেলিয়া দেশে গিয়া বিবাহ করিলাম।

গঙ্গার ধারে যে বৃহৎ কাব্য লিখিবার কথা ছিল তাহা লেখা হইল না, কিন্তু জীবনের মধ্যে তাহা লাভ করিলাম।

ভাদ্র ১৩০৫

রাজটিকা

নবেন্দুশেখরের সহিত অরুণলেখার যখন বিবাহ হইল তখন হোমধূমের অন্তরাল হইতে ভগবান প্রজাপতি ঈষৎ একটু হাস্য করিলেন। হায়, প্রজাপতির পক্ষে যাহা খেলা আমাদের পক্ষে তাহা সকল সময়ে কৌতুকের নহে।

নবেন্দুশেখরের পিতা পূর্ণেন্দুশেখর ইংরাজরাজ-সরকারে বিখ্যাত। তিনি এই ভবসমুদ্রে কেবলমাত্র দ্রুতবেগে সেলাম-চালনা দ্বারা রায়বাহাদুর পদবীর উত্তুঙ্গ মরুকূলে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; আরো দুর্গমতর সম্মানপথের পাথেয় তাঁহার ছিল, কিন্তু পঞ্চান্ন বৎসর বয়ঃক্রমকালে অনতিদূরবর্তী রাজখেতাবের কুহেলিকাচ্ছন্ন গিরিচূড়ার প্রতি করুণ লোলুপ দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ করিয়া এই রাজানুগৃহীত ব্যক্তি অকস্মাৎ খেতাব-বর্জিত-লোকে গমন করিলেন এবং তাঁহার বহু-সেলাম-শিথিল গ্রীবাগ্রন্থি শ্মশানশয্যায় বিশ্রাম লাভ করিল।

কিন্তু, বিজ্ঞানে বলে, শক্তির স্থানান্তর ও রূপান্তর আছে, নাশ নাই— চঞ্চলা লক্ষ্মীর অচঞ্চলা সখী সেলামশক্তি পৈতৃক স্কন্ধ হইতে পুত্রের স্কন্ধে অবতীর্ণ হইলেন, এবং নবেন্দুর নবীন মস্তক তরঙ্গতাড়িত কুষ্মাণ্ডের মতো ইংরাজের দ্বারে দ্বারে অবিশ্রাম উঠিতে পড়িতে লাগিল।

নিঃসন্তান অবস্থায় ইঁহার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হইলে যে পরিবারে ইনি দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিলেন সেখানকার ইতিহাস ভিন্নপ্রকার।

সে পরিবারে বড়োভাই প্রমথনাথ পরিচিতবর্গের প্রীতি এবং আত্মীয়বর্গের আদরের স্থল ছিলেন। বাড়ির লোকে এবং পাড়ার পাঁচজনে তাঁহাকে সর্ববিষয়ে অনুকরণস্থল বলিয়া জানিত।

প্রমথনাথ বিদ্যায় বি. এ. এবং বুদ্ধিতে বিচক্ষণ ছিলেন, কিন্তু মোটা মাহিনা বা জোর কলমের কোনো ধার ধারিতেন না; মুরুব্বির বলও তাঁহার বিশেষ ছিল না, কারণ, ইংরাজ তাঁহাকে যে পরিমাণ দূরে রাখিত তিনিও তাহাকে সেই পরিমাণ দূরে রাখিয়া চলিতেন। অতএব, গৃহকোণে এবং পরিচিতমণ্ডলীর মধ্যেই প্রমথনাথ জাজ্বল্যমান ছিলেন, দূরস্থ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার কোনো ক্ষমতা তাঁহার ছিল না।

এই প্রমথনাথ একবার বছর তিনেকের জন্য বিলাতে ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। সেখানে ইংরাজের সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া ভারতবর্ষের অপমানদুঃখ সমস্ত ভুলিয়া ইংরাজি সাজ পরিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন।

ভাইবোনেরা প্রথমটা একটু কুণ্ঠিত হইল, অবশেষে দুইদিন পরে বলিতে লাগিল,

ইংরাজি কাপড়ে দাদাকে যেমন মানায় এমন আর-কাহাকেও না। ইংরাজি বস্ত্রের গৌরবগর্ব পরিবারের অন্তরের মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইল।

প্রমথনাথ বিলাত হইতে মনে ভাবিয়া আসিয়াছিলেন 'কী করিয়া ইংরাজের সহিত সমপর্যায় রক্ষা করিয়া চলিতে হয় আমি তাহারই অপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখাইব'— নত না হইলে ইংরাজের সহিত মিলন হয় না এ কথা যে বলে সে নিজের হীনতা প্রকাশ করে এবং ইংরাজকেও অন্যায় অপরাধী করিয়া থাকে।

প্রমথনাথ বিলাতের বড়ো বড়ো লোকের কাছ হইতে অনেক সাদরপত্র আনিয়া ভারতবর্ষীয় ইংরাজমহলে কিঞ্চিৎ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। এমন-কি মধ্যে মধ্যে সস্ত্রীক ইংরাজের চা ডিনার খেলা এবং হাস্যকৌতুকের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভাগ পাইতে লাগিলেন। সৌভাগ্যমদমত্ততায় ক্রমশই তাঁহার শিরা-উপশিরাগুলি অল্প অল্প ঝাঁঝাঁ করিতে শুরু করিল।

এমন সময়ে একটি নূতন রেলওয়ে লাইন খোলা উপলক্ষে রেলওয়ে কোম্পানির নিমন্ত্রণে ছোটোলাটের সঙ্গে দেশের অনেকগুলি রাজপ্রসাদগর্বিত সম্ভ্রান্তলোকে গাড়ি বোঝাই করিয়া নবলৌহপথে যাত্রা করিলেন। প্রথমনাথও তাহার মধ্যে ছিলেন।

ফিরিবার সময় একটা ইংরাজ দারোগা দেশীয় বড়োলোকদিগকে কোনো-এক বিশেষ গাড়ি হইতে অত্যন্ত অপমানিত করিয়া নামাইয়া দিল। ইংরাজবেশধারী প্রমথনাথও মানে মানে নামিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া দারোগা কহিল, "আপনি উঠিতেছেন কেন, আপনি বসুন-না।"

এই বিশেষ সম্মানে প্রমথনাথ প্রথমটা একটু স্ফীত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু, যখন গাড়ি ছাড়িয়া দিল, যখন তৃণহীন কর্ষণধূসর পশ্চিম প্রান্তরের প্রান্তসীমা হইতে ম্লান সূর্যাস্ত-আভা সকরুণরক্তিম লজ্জার মতো সমস্ত দেশের উপর যেন পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং যখন তিনি একাকী বসিয়া বাতায়নপথ হইতে অনিমেষনয়নে বনান্তরাল-বাসিনী কুণ্ঠিতা বঙ্গভূমির প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, তখন ধিক্কারে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল এবং দুই চক্ষু দিয়া অগ্নিজ্বালাময়ী অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল।

তাঁহার মনে একটা গল্পের উদয় হইল। একটি গর্দভ রাজপথ দিয়া দেবপ্রতিমার রথ টানিয়া চলিতেছিল, পথিকবর্গ তাহার সম্মুখে ধুলায় লুণ্ঠিত হইয়া প্রতিমাকে প্রণাম করিতেছিল এবং মূঢ় গর্দভ আপন মনে ভাবিতেছিলেন, 'সকলে আমাকেই সম্মান করিতেছে।'

প্রমথনাথ মনে মনে কহিলেন, 'গর্দভের সহিত আমার এই একটু প্রভেদ

দেখিতেছি, আমি আজ বুঝিয়াছি, সম্মান আমাকে নহে, আমার স্কন্ধের বোঝাগুলাকে।'

প্রমথনাথ বাড়ি আসিয়া বাড়ির ছেলেপুলে সকলকে ডাকিয়া একটা হোমাগ্নি জ্বালাইলেন এবং বিলাতি বেশভূষাগুলো একে একে আহুতিস্বরূপ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শিখা যতই উচ্চ হইয়া উঠিল ছেলেরা ততই উচ্ছ্বসিত আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।

তাহার পর হইতে প্রমথনাথ ইংরাজঘরের চায়ের চুমুক এবং রুটির টুকরা পরিত্যাগ করিয়া পুনশ্চ গৃহকোণদুর্গের মধ্যে দুর্গম হইয়া বসিলেন, এবং পূর্বোক্ত লাঞ্ছিত উপাধিধারীগণ পূর্ববৎ ইংরাজের দ্বারে দ্বারে উষ্ণীষ আন্দোলিত করিয়া ফিরিতে লাগিল।

দৈবদুর্যোগে দুর্ভাগ্য নবেন্দুশেখর এই পরিবারের একটি মধ্যমা ভগিনীকে বিবাহ করিয়া বসিলেন। বাড়ির মেয়েগুলি লেখাপড়াও যেমন জানে দেখিতে শুনিতেও তেমনি; নবেন্দু ভাবিলেন, 'বড়ো জিতিলাম।'

কিন্তু 'আমাকে পাইয়া তোমরাও জিতিয়াছ' এ কথা প্রমাণ করিতে কালবিলম্ব করিলেন না। কোন্ সাহেব তাঁহার বাবাকে কবে কী চিঠি লিখিয়াছিল তাহা যেন নিতান্ত ভ্রমবশত দৈবক্রমে পকেট হইতে বাহির করিয়া শ্যালীদের হস্তে চালান করিয়া দিতে লাগিলেন। শ্যালীদের সুন্দর সুকোমল বিম্বোষ্ঠের ভিতর হইতে তীক্ষ্ন প্রখর হাসি যখন টুক্‌টুকে মখমলের খাপের ভিতরকার ঝক্‌ঝকে ছোরার মতো দেখা দিতে লাগিল, তখন স্থানকালপাত্র সম্বন্ধে হতভাগ্যের চৈতন্য জন্মিল। বুঝিল, 'বড়ো ভুল করিয়াছি।'

শ্যালীবর্গের মধ্যে জ্যেষ্ঠা এবং রূপে গুণে শ্রেষ্ঠা লাবণ্যলেখা একদা শুভদিন দেখিয়া নবেন্দুর শয়নকক্ষের কুলুঙ্গির মধ্যে দুইজোড়া বিলাতি বুট সিন্দুরে মণ্ডিত করিয়া স্থাপন করিল; এবং তাহার সম্মুখে ফুলচন্দন ও দুই জ্বলন্ত বাতি রাখিয়া ধূপধুনা জ্বালাইয়া দিল। নবেন্দু ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র দুই শ্যালী তাহার দুই কান ধরিয়া কহিল, "তোমার ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করো, তাঁহার কল্যাণে তোমার পদবৃদ্ধি হউক।"

তৃতীয়া শ্যালী কিরণলেখা বহুদিন পরিশ্রম করিয়া একখানি চাদরে জোন্স স্মিথ ব্রাউন টম্‌সন প্রভৃতি একশত প্রচলিত ইংরাজি নাম লাল সুতা দিয়া সেলাই করিয়া একদিন মহাসমারোহে নবেন্দুকে নামাবলি উপহার দিল।

চতুর্থ শ্যালী শশাঙ্কলেখা যদিও বয়ঃক্রম হিসাবে গণ্যব্যক্তির মধ্যে নহে, বলিল, "ভাই, আমি একটা জপমালা তৈরি করিয়া দিব, সাহেবের নাম জপ করিবে।"

তাহার বড়ো বোনরা তাহাকে শাসন করিয়া বলিল, "যাঃ, তোর আর জ্যাঠামি করিতে হইবে না।"

নবেন্দুর মনে মনে রাগও হয়, লজ্জাও হয়, কিন্তু শ্যালীদের ছাড়িতেও পারে না; বিশেষত বড়োশ্যালীটি বড়ো সুন্দরী। তাহার মধুও যেমন কাঁটাও তেমনি; তাহার নেশা এবং তাহার জ্বালা দুটোই মনের মধ্যে একেবারে লাগিয়া থাকে! ক্ষতপক্ষ পতঙ্গ রাগিয়া ভোঁ-ভোঁ করিতে থাকে অথচ অন্ধ অবোধের মতো চারি দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে।

অবশেষে শ্যালীসংসর্গের প্রবল মোহে পড়িয়া সাহেবের সোহাগ-লালসা নবেন্দু সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে লাগিল। বড়োসাহেবকে যেদিন সেলাম নিবেদন করিতে যাইত শ্যালীদিগকে বলিত, "সুরেন্দ্রবাঁড়ুয্যের বক্তৃতা শুনিতে যাইতেছি।" দার্জিলিং হইতে প্রত্যাসন্ন মেজোসাহেবকে শেয়ালদহ স্টেশনে সম্মান জ্ঞাপন করিতে যাইবার সময় শ্যালীদিগকে বলিয়া যাইত, "মেজমামার সহিত দেখা করিতে চলিলাম।"

সাহেব এবং শ্যালী, এই দুই নৌকায় পা দিয়া হতভাগা বিষম সংকটে পড়িল। শ্যালীরা মনে মনে কহিল, 'তোমার অন্য নৌকাটাকে ফুটা না করিয়া ছাড়িব না।'

মহারানীর আগামী জন্মদিনে নবেন্দু খেতাব-স্বর্গলোকের প্রথম সোপানে রায়বাহাদুর পদবীতে পদার্পণ করিবেন এইরূপ গুজব শুনা গেল, কিন্তু সেই সম্ভাবিত সম্মানলাভের আনন্দ-উচ্ছ্বসিত সংবাদ ভীরু বেচারা শ্যালীদিগের নিকটে ব্যক্ত করিতে পারিল না; কেবল একদিন শরৎশুক্লপক্ষের সায়াহ্নে সর্বনেশে চাঁদের আলোকে পরিপূর্ণচিত্তাবেগে স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করিয়া ফেলিল। পরদিন দিবালোকে স্ত্রী পাল্কি করিয়া তাহার বড়দিদির বাড়ি গিয়া অশ্রুগদ্‌গদ কণ্ঠে আক্ষেপ করিতে লাগিল। লাবণ্য কহিল, "তা বেশ তো, রায়বাহাদুর হইয়া তোর স্বামীর তো লেজ বাহির হইবে না, তোর এত লজ্জাটা কিসের!"

অরুণলেখা বারম্বার বলিতে লাগিল, "না দিদি, আর যা-ই হই, আমি রায়বাহাদুরনী হইতে পারিব না।"

আসল কথা, অরুণের পরিচিত ভূতনাথবাবু রায়বাহাদুর ছিলেন, পদবীটার প্রতি আন্তরিক আপত্তির কারণ তাহাই।

লাবণ্য অনেক আশ্বাস দিয়া কহিল, "আচ্ছা, তোকে সেজন্য ভাবিতে হইবে না।"

বক্সারে লাবণ্যর স্বামী নীলরতন কাজ করিতেন। শরতের অবসানে নবেন্দু সেখান হইতে লাবণ্যর নিমন্ত্রণ পাইলেন। আনন্দচিত্তে অনতিবিলম্বে গাড়ি চড়িয়া যাত্রা করিলেন। রেলে চড়িবার সময় তাঁহার বামাঙ্গ কাঁপিল না, কিন্তু তাহা হইতে কেবল এই প্রমাণ হয় যে, আসন্ন বিপদের সময় বামাঙ্গ কাঁপাটা একটা অমূলক কুসংস্কারমাত্র।

লাবণ্যলেখা পশ্চিম প্রদেশের নবশীতাগমসম্ভূত স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের অরুণে পাণ্ডুরে পূর্ণপরিস্ফুট হইয়া নির্মল শরৎকালের নির্জন-নদীকূল-লালিতা অম্লানপ্রফুল্লা কাশবনশ্রীর মতো হাস্যে ও হিল্লোলে ঝলমল করিতেছিল।

নবেন্দুর মুগ্ধ দৃষ্টির উপরে যেন একটি পূর্ণপুষ্পিতা মালতীলতা নবপ্রভাতের শীতোজ্জ্বল শিশিরকণা ঝলকে ঝলকে বর্ষণ করিতে লাগিল।

মনের আনন্দে এবং পশ্চিমের হাওয়ায় নবেন্দুর অজীর্ণ রোগ দূর হইয়া গেল। স্বাস্থ্যের নেশায়, সৌন্দর্যের মোহে এবং শ্যালীহস্তের শুশ্রূষাপুলকে সে যেন মাটি ছাড়িয়া আকাশের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। তাহাদের বাগানের সম্মুখ দিয়া পরিপূর্ণ গঙ্গা যেন তাহারই মনের দুরন্ত পাগলামিকে আকার দান করিয়া বিষম গোলমাল করিতে করিতে প্রবল আবেগে নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া যাইত।

ভোরের বেলা নদীতীরে বেড়াইয়া ফিরিবার সময় শীতপ্রভাতের স্নিগ্ধরৌদ্র যেন প্রিয়মিলনের উত্তাপের মতো তাহার সমস্ত শরীরকে চরিতার্থ করিয়া দিত। তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া শ্যালীর শখের রন্ধনে জোগান দিবার ভার লইয়া নবেন্দুর অজ্ঞতা ও অনৈপুণ্য পদে পদে প্রকাশ পাইতে থাকিত। কিন্তু, অভ্যাস ও মনোযোগের দ্বারা উত্তরোত্তর তাহা সংশোধন করিয়া লইবার জন্য মূঢ় অনভিজ্ঞের কিছুমাত্র আগ্রহ দেখা গেল না; কারণ, প্রত্যহ নিজেকে অপরাধী করিয়া সে যে-সকল তাড়না ভর্ৎসনা লাভ করিত তাহাতে কিছুতেই তাহার তৃপ্তির শেষ হইত না। যথাযথ পরিমাণে মালমসলা বিভাগ, উনান হইতে হাঁড়ি তোলা-নামা, উত্তাপাধিক্যে ব্যঞ্জন পুড়িয়া না যায় তাহার যথোচিত ব্যবস্থা— ইত্যাদি বিষয়ে সে যে সদ্যোজাত শিশুর মতো অপটু অক্ষম এবং নিরুপায় ইহাই প্রত্যহ বলপূর্বক প্রমাণ করিয়া নবেন্দু শ্যালীর কৃপামিশ্রিত হাস্য এবং হাস্যমিশ্রিত লাঞ্ছনা মনের সুখে ভোগ করিত।

মধ্যাহ্নে এক দিকে ক্ষুধার তাড়না অন্য দিকে শ্যালীর পীড়াপীড়ি, নিজের আগ্রহ

এবং প্রিয়জনের ঔৎসুক্য, রন্ধনের পারিপাট্য এবং রন্ধনীর সেবামাধুর্য, উভয়ের সংযোগে ভোজন ব্যাপারের ওজন রক্ষা করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিত।

আহারের পর সামান্য তাস খেলাতেও নবেন্দু প্রতিভার পরিচয় দিতে পারিত না। চুরি করিত, হাতের কাগজ দেখিত, কাড়াকাড়ি বকাবকি বাধাইয়া দিত কিন্তু তবু জিতিতে পারিত না। না জিতিলেও জোর করিয়া তাহার হার অস্বীকার করিত এবং সেজন্য প্রত্যহ তাহার গঞ্জনার সীমা থাকিত না; তথাপিও পাষণ্ড আত্মসংশোধনচেষ্টায় সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল।

কেবল এক বিষয়ে তাহার সংশোধন সম্পূর্ণ হইয়াছিল। সাহেবের সোহাগ যে জীবনের চরম লক্ষ্য, এ কথা সে উপস্থিতমত ভুলিয়া গিয়াছিল। আত্মীয়-স্বজনের শ্রদ্ধা ও স্নেহ যে কত সুখের ও গৌরবের ইহাই সে সর্বান্তঃকরণে অনুভব করিতেছিল।

তাহা ছাড়া, সে যেন এক নূতন আবহাওয়ার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিল। লাবণ্যর স্বামী নীলরতনবাবু আদালতে বড়ো উকিল হইয়াও সাহেবসুবাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন না বলিয়া অনেক কথা উঠিত। তিনি বলিতেন, "কাজ কী, ভাই! যদি পাল্টা ভদ্রতা না করে তবে আমি যাহা দিলাম তাহা তো কোনোমতেই ফিরাইয়া পাইব না। মরুভূমির বালি ফুটফুটে সাদা বলিয়াই কি তাহাতে বীজ বুনিয়া কোনো সুখ আছে! ফসল ফিরিয়া পাইলে কালো জমিতেও বীজ বোনা যায়।"

নবেন্দুও টানে পড়িয়া দলে ভিড়িয়া গেল তাহার আর পরিণামচিন্তা রহিল না। পৈতৃক এবং স্বকীয় যত্নে পূর্বে জমি যাহা পাট করা ছিল তাহাতেই রায়বাহাদুর খেতাবের সম্ভাবনা আপনিই বাড়িতে লাগিল। ইতিমধ্যে আর নবজলসিঞ্চনের প্রয়োজন রহিল না। নবেন্দু ইংরাজের বিশেষ একটি শখের শহরে এক বহুব্যয়সাধ্য ঘোড়দৌড়স্থান নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

হেনকালে কন্‌গ্রেসের সময় নিকটবর্তী হইল। নীলরতনের নিকট চাঁদা-সংগ্রহের অনুরোধপত্র আসিল।

নবেন্দু লাবণ্যর সহিত মনের আনন্দে নিশ্চিন্তমনে তাস খেলিতেছিল। নীলরতন খাতা-হস্তে মধ্যে আসিয়া পড়িয়া কহিল, "একটা সই দিতে হইবে।"

পূর্বসংস্কারক্রমে নবেন্দুর মুখ শুকাইয়া গেল। লাবণ্য শশব্যস্ত হইয়া কহিল, "খবরদার, এমন কাজ করিয়ো না, তোমার ঘোড়দৌড়ের মাঠখানা মাটি হইয়া যাইবে।"

নবেন্দু আস্ফালন করিয়া কহিল, "সেই ভাবনায় আমার রাত্রে ঘুম হয় না!"

নীলরতন আশ্বাস দিয়া কহিল, "তোমার নাম কোনো কাগজে প্রকাশ হইবে না।"

লাবণ্য অত্যন্ত চিন্তিত বিজ্ঞভাবে কহিল, "তবু কাজ কী! কী জানি যদি কথায় কথায়—"

নবেন্দু তীব্রস্বরে কহিল, "কাগজে প্রকাশ হইলে আমার নাম ক্ষইয়া যাইবে না।"

এই বলিয়া নীলরতনের হাত হইতে খাতা টানিয়া একেবারে হাজার টাকা ফস্‌ করিয়া সই করিয়া দিল। মনের মধ্যে আশা রহিল, কাগজে সংবাদ বাহির হইবে না।

লাবণ্য মাথায় হাত দিয়া কহিল, "করিলে কী!"

নবেন্দু দর্পভরে কহিল, "কেন, অন্যায় কী করিয়াছি।"

লাবণ্য কহিল, "শেয়ালদা স্টেশনের গার্ড, হোয়াইট্‌-অ্যাবের দোকানের অ্যাসিস্টান্ট, হার্ট্‌ব্রাদারদের সহিস-সাহেব, এঁরা যদি তোমার উপর রাগ করিয়া অভিমান করিয়া বসেন, যদি তোমার পূজার নিমন্ত্রণে শ্যাম্পেন খাইতে না আসেন, যদি দেখা হইলে তোমার পিঠ না চাপড়ান!"

নবেন্দু উদ্ধতভাবে কহিল, "তাহা হইলে আমি বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিব।"

দিনকয়েক পরেই নবেন্দু প্রাতঃকালে চা খাইতে-খাইতে খবরের কাগজ পড়িতেছেন, হঠাৎ চোখে পড়িল এক X স্বাক্ষরিত পত্রপ্রেরক তাঁহাকে প্রচুর ধন্যবাদ দিয়া কন্‌গ্রেসে চাঁদার কথা প্রকাশ করিয়াছে এবং তাঁহার মতো লোককে দলে পাইয়া কন্‌গ্রেসের যে কতটা বলবৃদ্ধি হইয়াছে লোকটা তাহারও পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারে নাই।

কন্‌গ্রেসের বলবৃদ্ধি! হা স্বর্গগত তাত পূর্ণেন্দুশেখর! কন্‌গ্রেসের বলবৃদ্ধি করিবার জন্যই কি তুমি হতভাগাকে ভারতভূমিতে জন্মদান করিয়াছিলে!

কিন্তু, দুঃখের সঙ্গে সুখও আছে। নবেন্দুর মতো লোক যে যে-সে লোক নহেন, তাঁহাকে নিজ তীরে তুলিবার জন্য যে এক দিকে ভারতবর্ষীয় ইংরাজ-সম্প্রদায় অপর দিকে কন্‌গ্রেস লালায়িতভাবে ছিপ ফেলিয়া অনিমিষলোচনে বসিয়া আছে, এ কথাটা নিতান্ত ঢাকিয়া রাখিবার কথা নহে। অতএব নবেন্দু হাসিতে হাসিতে কাগজখানা লইয়া লাবণ্যকে দেখাইলেন। কে লিখিয়াছে যেন কিছুই জানে না, এমনি ভাবে লাবণ্য আকাশ হইতে পড়িয়া কহিল, "ওমা, এ যে সমস্তই ফাঁস করিয়া দিয়াছে! আহা! আহা! তোমার এমন শত্রু কে ছিল! তাহার কলমে যেন ঘুণ ধরে, তাহার কালিতে যেন বালি পড়ে, তাহার কাগজ যেন পোকায় কাটে—"

নবেন্দু হাসিয়া কহিল, "আর অভিশাপ দিয়ো না। আমি আমার শত্রুকে মার্জনা করিয়া আশীর্বাদ করিতেছি, তাহার সোনার দোয়াত-কলম হয় যেন!"

দুইদিন পরে কন্‌গ্রেসের বিপক্ষপক্ষীয় একখানা ইংরাজ-সম্পাদিত ইংরাজি কাগজ ডাকযোগে নবেন্দুর হাতে আসিয়া পৌঁছিলে পড়িয়া দেখিলেন, তাহাতে 'One who knows' স্বাক্ষরে পূর্বোক্ত সংবাদের প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে। লেখক লিখিতেছেন যে, নবেন্দুকে যাঁহারা জানেন তাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে এই দুর্নাম-রটনা কখনোই বিশ্বাস করিতে পারেন না; চিতাবাঘের পক্ষে নিজ চর্মের কৃষ্ণ অঙ্কগুলির পরিবর্তন যেমন অসম্ভব নবেন্দুর পক্ষেও কন্‌গ্রেসের দলবৃদ্ধি করা তেমনি। বাবু নবেন্দুশেখরের যথেষ্ট নিজস্ব পদার্থ আছে, তিনি কর্মশূন্য উমেদার ও মক্কেলশূন্য আইনজীবী নহেন। তিনি দুইদিন বিলাতে ঘুরিয়া, বেশভূষা-আচারব্যবহারে অদ্ভুত কপিবৃত্তি করিয়া, স্পর্ধাভরে, ইংরেজ-সমাজে প্রবেশোদ্যত হইয়া, অবশেষে ক্ষুন্নমনে হতাশভাবে ফিরিয়া আসেন নাই, অতএব কেন যে তিনি এই-সকল ইত্যাদি ইত্যাদি।

হা পরলোকগত পিতঃ পূর্ণেন্দুশেখর! ইংরাজের নিকট এত নাম এত বিশ্বাস সঞ্চয় করিয়া তবে তুমি মরিয়াছিলে!

এ চিঠিখানিও শ্যালীর নিকট পেখমের মতো বিস্তার করিয়া ধরিবার যোগ্য। ইহার মধ্যে একটা কথা আছে যে, নবেন্দু অখ্যাত অকিঞ্চন লক্ষ্মীছাড়া নহেন, তিনি সারবান পদার্থবান লোক।

লাবণ্য পুনশ্চ আকাশ হইতে পড়িয়া কহিল, "এ আবার তোমার কোন্ পরমবন্ধু লিখিল! কোন্ টিকিট কালেক্টর, কোন্ চামড়ার দালাল, কোন্ গড়ের বাদ্যের বাজনদার!"

নীলরতন কহিল, "এ চিঠির একটা প্রতিবাদ করা তো তোমার উচিত।"

নবেন্দু কিছু উঁচু চালে বলিল, "দরকার কী! যে যা বলে তাহারই কি প্রতিবাদ করিতে হইবে।"

লাবণ্য উচ্চৈঃস্বরে চারি দিকে একেবারে হাসির ফোয়ারা ছড়াইয়া দিল।

নবেন্দু অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "এত হাসি যে!"

তাহার উত্তরে লাবণ্য পুনর্বার অনিবার্য বেগে হাসিয়া পুষ্পিতযৌবনা দেহলতা লুণ্ঠিত করিতে লাগিল।

নবেন্দু নাকে মুখে চোখে এই প্রচুর পরিহাসের পিচকারি খাইয়া অত্যন্ত নাকাল হইল। একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, "তুমি মনে করিতেছ, প্রতিবাদ করিতে আমি ভয় করি!"

লাবণ্য কহিল, "তা কেন। আমি ভাবিতেছিলাম, তোমার অনেক আশাভরসার সেই ঘোড়দৌড়ের মাঠখানি বাঁচাইবার চেষ্টা এখনো ছাড় নাই— যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।"

নবেন্দু কহিল, "আমি বুঝি সেইজন্য লিখিতে চাহি না!" অত্যন্ত রাগিয়া দোয়াতকলম লইয়া বসিল। কিন্তু, লেখার মধ্যে রাগের রক্তিমা বড়ো প্রকাশ পাইল না, কাজেই লাবণ্য ও নীলরতনকে সংশোধনের ভার লইতে হইল। যেন লুচিভাজার পালা পড়িল; নবেন্দু যেটা জলে ও ঘিয়ে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা নরম নরম করিয়া এবং চাপিয়া যথাসাধ্য চেপটা করিয়া বেলিয়া দেয় তাঁহার দুই সহকারী তৎক্ষণাৎ সেটাকে ভাজিয়া কড়া ও গরম করিয়া ফুলাইয়া ফুলাইয়া তোলে। লেখা হইল যে, আত্মীয় যখন শত্রু হয় তখন বহিঃশত্রু অপেক্ষা ভয়ংকর হইয়া উঠে। পাঠান অথবা রাশিয়ান ভারত-গবর্মেন্টের তেমন শত্রু নহে যেমন শত্রু গর্বোদ্ধত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান-সম্প্রদায়। গবর্মেন্টের সহিত প্রজাসাধারণের নিরাপদ সৌহার্দ্যবন্ধনের তাহারাই দুর্ভেদ্য অন্তরায়। কন্‌গ্রেস রাজা ও প্রজার মাঝখানে স্থায়ী সদ্ভাবসাধনের যে প্রশস্ত রাজপথ খুলিয়াছে, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলো ঠিক তাহার মধ্যস্থল জুড়িয়া একেবারে কণ্টকিত হইয়া রহিয়াছে। ইত্যাদি।

নবেন্দুর ভিতরে ভিতরে ভয়-ভয় করিতে লাগিল অথচ 'লেখাটা বড়ো সরেস হইয়াছে' মনে করিয়া, রহিয়া রহিয়া একটু আনন্দও হইতে লাগিল। এমন সুন্দর রচনা তাহার সাধ্যাতীত ছিল।

ইহার পর কিছুদিন ধরিয়া নানা কাগজে বিবাদবিসম্বাদ-বাদপ্রতিবাদে নবেন্দুর চাঁদা এবং কন্‌গ্রেসে যোগ দেওয়ার কথা লইয়া দশ দিকে ঢাক বাজিতে লাগিল।

নবেন্দু এক্ষণে মরিয়া হইয়া কথায় বার্তায় শ্যালীসমাজে অত্যন্ত নির্ভীক দেশহিতৈষী হইয়া উঠিল। লাবণ্য মনে মনে হাসিয়া কহিল, 'এখনো তোমার অগ্নিপরীক্ষা বাকি আছে।'

একদিন প্রাতঃকালে নবেন্দু স্নানের পূর্বে বক্ষস্থল তৈলাক্ত করিয়া পৃষ্ঠদেশের দুর্গম অংশগুলিতে তৈলসঞ্চার করিবার কৌশল অবলম্বন করিতেছেন, এমন সময় বেহারা এক কার্ড হাতে করিয়া তাঁহাকে দিল, তাহাতে স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেটের নাম আঁকা। লাবণ্য সহাস্যকুতূহলী চক্ষে আড়াল হইতে কৌতুক দেখিতেছিল।

তৈললাঞ্ছিত কলেবরে তো ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করা যায় না— নবেন্দু ভাজিবার পূর্বে মসলা-মাখা কই-মৎস্যের মতো বৃথা ব্যতিব্যস্ত হইতে লাগিলেন। তাড়াতাড়ি চকিতের মধ্যে স্নান করিয়া কোনোমতে কাপড় পরিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে

বাহিরের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বেহারা বলিল, "সাহেব অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া চলিয়া গিয়াছেন।" এই আগাগোড়া মিথ্যাচরণ পাপের কতটা অংশ বেহারার, কতটা অংশ লাবণ্যর, তাহা নৈতিক গণিতশাস্ত্রের একটা সূক্ষ্ম সমস্যা।

টিকটিকির কাটা লেজ যেমন সম্পূর্ণ অন্ধভাবে ধড় ফড় করে, নবেন্দুর ক্ষুব্ধ হৃদয় ভিতরে ভিতরে তেমনি আছাড় খাইতে লাগিল। সমস্ত দিন খাইতে শুইতে আর সোয়াস্তি রহিল না।

লাবণ্য আভ্যন্তরিক হাস্যের সমস্ত আভাস মুখ হইতে সম্পূর্ণ দূর করিয়া দিয়া উদ্‌বিগ্নভাবে থাকিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "আজ তোমার কী হইয়াছে বলো দেখি! অসুখ করে নাই তো?"

নবেন্দু কায়ক্লেশে হাসিয়া কোনোমতে একটা দেশকালপাত্রোচিত উত্তর বাহির করিল; কহিল, "তোমার এলেকার মধ্যে আবার অসুখ কিসের। তুমি আমার ধন্বন্তরিনী।"

কিন্তু, মুহূর্তমধ্যেই হাসি মিলাইয়া গেল এবং সে ভাবিতে লাগিল, 'একে আমি কন্‌গ্রেসে চাঁদা দিলাম, কাগজে কড়া চিঠি লিখিলাম, তাহার উপরে ম্যাজিস্ট্রেট নিজে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, আমি তাঁহাকে বসাইয়া রাখিলাম, না জানি কী মনে করিতেছেন!'

'হা তাত, হা পূর্ণেন্দুশেখর! আমি যাহা নই ভাগ্যের বিপাকে গোলেমালে তাহাই প্রতিপন্ন হইলাম।'

পরদিন সাজগোজ করিয়া ঘড়ির চেন ঝুলাইয়া মস্ত একটা পাগড়ি পরিয়া নবেন্দু বাহির হইল। লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল, "যাও কোথায়।"

নবেন্দু কহিল, "একটা বিশেষ কাজ আছে—"

লাবণ্য কিছু বলিল না।

সাহেবের দরজার কাছে কার্ড বাহির করিবামাত্র আরদালি কহিল, "এখন দেখা হইবে না।"

নবেন্দু পকেট হইতে দুইটা টাকা বাহির করিল। আরদালি সংক্ষিপ্ত সেলাম করিয়া কহিল, "আমরা পাঁচজন আছি।" নবেন্দু তৎক্ষণাৎ দশ টাকার এক নোট বাহির করিয়া দিলেন।

সাহেবের নিকট তলব পড়িল। সাহেব, তখন চটিজুতা ও মর্নিংগৌন পরিয়া লেখাপড়ার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। নবেন্দু একটা সেলাম করিলেন, ম্যাজিস্ট্রেট

তাঁহাকে অঙ্গুলিসংকেতে বসিবার অনুমতি করিয়া কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়া কহিলেন, "কী বলিবার আছে, বাবু।"

নবেন্দু ঘড়ির চেন নাড়িতে নাড়িতে বিনীত কম্পিত স্বরে বলিল, "কাল আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু—"

সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একটা চোখ কাগজ হইতে তুলিয়া বলিলেন, "সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম! Babu, what nonsense are you talking!"

নবেন্দু "Beg your pardon! ভুল হইয়াছে, গোল হইয়াছে" করিতে করিতে ঘর্মাপ্লুত কলেবরে কোনোমতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। এবং সে রাত্রে বিছানায় শুইয়া কোনো দূরস্বপ্নশ্রুত মন্ত্রের ন্যায় একটা বাক্য থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার কানে আসিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল, "Babu, you are a howling idiot!"

পথে আসিতে আসিতে তাঁহার মনে ধারণা হইল যে, ম্যাজিস্ট্রেট যে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল সে কথাটা কেবল রাগ করিয়া সে অস্বীকার করিল। মনে মনে কহিলেন, 'ধরণী দ্বিধা হও!' কিন্তু ধরণী তাঁহার অনুরোধ রক্ষা না করাতে নির্বিঘ্নে বাড়ি আসিয়া পৌঁছিলেন।

লাবণ্যকে আসিয়া কহিলেন, "দেশে পাঠাইবার জন্য গোলাপজল কিনিতে গিয়াছিলাম।"

বলিতে-না-বলিতে কালেক্টরের চাপরাস-পরা জনছয়েক পেয়াদা আসিয়া উপস্থিত। সেলাম করিয়া হাস্যমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

লাবণ্য হাসিয়া কহিল, "তুমি কন্‌গ্রেসে চাঁদা দিয়াছ বলিয়া তোমাকে গ্রেফ্‌তার করিতে আসে নাই তো?"

পেয়াদারা ছয়জনে বারো পাটি দন্তাগ্রভাগ উন্মুক্ত করিয়া কহিল, "বকশিশ, বাবুসাহেব।"

নীলরতন পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া বিরক্তস্বরে কহিলেন, "কিসের বকশিশ!"

পেয়াদারা বিকশিতদন্তে কহিল, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন, তাহার বকশিশ।

লাবণ্য হাসিয়া কহিল, "ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আজকাল গোলাপজল বিক্রি ধরিয়াছেন নাকি। এমন অত্যন্ত ঠাণ্ডা ব্যবসায় তো তাঁহার পূর্বে ছিল না।"

হতভাগ্য নবেন্দু গোলাপজলের সহিত ম্যাজিস্ট্রেট-দর্শনের সামঞ্জস্য সাধন করিতে গিয়া কী যে আবোলতাবোল বলিল তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না।

নীলরতন কহিল, "বকশিশের কোনো কাজ হয় নাই। বকশিশ নাহি মিলেগা।"

নবেন্দু সংকুচিতভাবে পকেট হইতে একটা নোট বাহির করিয়া কহিল, "উহারা গরিব মানুষ, কিছু দিতে দোষ কী।"

নীলরতন নবেন্দুর হাত হইতে নোট টানিয়া লইয়া কহিল, "উহাদের অপেক্ষা গরিব মানুষ জগতে আছে, আমি তাহাদিগকে দিব।"

রুষ্ট মহেশ্বরের ভূতপ্রেতগণকেও কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা করিবার সুযোগ না পাইয়া নবেন্দু অত্যন্ত ফাঁপরে পড়িয়া গেল। পেয়াদাগণ যখন বজ্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গমনোদ্যত হইল, তখন নবেন্দু একান্ত করুণভাবে তাহাদের দিকে চাহিলেন; নীরবে নিবেদন করিলেন, "বাবাসকল, আমার কোনো দোষ নাই, তোমরা তো জান!"

কলিকাতায় কন্‌গ্রেসের অধিবেশন। তদুপলক্ষে নীলরতন সস্ত্রীক রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। নবেন্দুও তাঁহাদের সঙ্গে ফিরিল।

কলিকাতায় পদার্পণ করিবামাত্র কন্‌গ্রেসের দলবল নবেন্দুকে চতুর্দিকে ঘিরিয়া একটা প্রকাণ্ড তাণ্ডব শুরু করিয়া দিল। সম্মান সমাদর স্তুতিবাদের সীমা রহিল না। সকলেই বলিল, "আপনাদের মতো নায়কগণ দেশের কাজে যোগ না দিলে দেশের উপায় নাই।" কথাটার যাথার্থ্য নবেন্দু অস্বীকার করিতে পারিলেন না, এবং গোলেমালে হঠাৎ কখন্ দেশের একজন অধিনায়ক হইয়া উঠিলেন। কন্‌গ্রেস-সভায় যখন পদার্পণ করিলেন তখন সকলে মিলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিজাতীয় বিলাতী তারস্বরে 'হিপ্ হিপ্ হুরে' শব্দে তাহাকে উৎকট অভিবাদন করিল। আমাদের মাতৃভূমির কর্ণমূল লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল।

যথাকালে মহারানীর জন্মদিন আসিল, নবেন্দুর রায়বাহাদুর খেতাব নিকটসমাগত মরীচিকার মতো অন্তর্ধান করিল।

সেইদিন সায়াহ্নে লাবণ্যলেখা সমারোহে নবেন্দুকে নিমন্ত্রণপূর্বক তাঁহাকে নববস্ত্রে ভূষিত করিয়া স্বহস্তে তাঁহার ললাটে রক্তচন্দনের তিলক এবং প্রত্যেক শ্যালী তাঁহার কণ্ঠে একগাছি করিয়া স্বরচিত পুষ্পমালা পরাইয়া দিল। অরুণাম্বরবসনা অরুণলেখা সেদিন হাস্যে লজ্জায় এবং অলংকারে আড়াল হইতে ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল। তাহার স্বেদাঞ্চিত লজ্জাশীতল হস্তে একটা গোড়েমালা দিয়া ভগিনীরা তাহাকে টানাটানি করিল কিন্তু সে কোনোমতে বশ মানিল না এবং সেই প্রধান মাল্যখানি নবেন্দুর কণ্ঠ কামনা করিয়া জনহীন নিশীথের জন্য গোপনে অপেক্ষা করিতে লাগিল। শ্যালীরা নবেন্দুকে কহিল, "আজ আমরা তোমাকে রাজা করিয়া দিলাম! ভারতবর্ষে এমন সম্মান তুমি ছাড়া আর কাহারো সম্ভব হইবে না।"

নবেন্দু ইহাতে সম্পূর্ণ সান্ত্বনা পাইল কি না তাহা তাহার অন্তঃকরণ আর অন্তর্যামীই জানেন, কিন্তু আমাদের এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, মরিবার পূর্বে সে রায়বাহাদুর হইবেই এবং তাহার মৃত্যু উপলক্ষে Englishman ও Pioneer সমস্বরে শোক করিতে ছাড়িবে না। অতএব, ইতিমধ্যে Three Cheers for বাবু পূর্ণেন্দুশেখর! হিপ্ হিপ্ হুরে, হিপ্ হিপ হুরে, হিপ্ হিপ্ হুরে!

আশ্বিন ১৩০৫

মণিহারা

সেই জীর্ণপ্রায় বাঁধাঘাটের ধারে আমার বোট লাগানো ছিল। তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে।

বোটের ছাদের উপরে মাঝি নমাজ পড়িতেছে। পশ্চিমের জ্বলন্ত আকাশপটে তাহার নীরব উপাসনা ক্ষণে ক্ষণে ছবির মতো আঁকা পড়িতেছিল। স্থির রেখাহীন নদীর জলের উপর ভাষাতীত অসংখ্য বর্ণচ্ছটা দেখিতে দেখিতে ফিকা হইতে গাঢ় লেখায়, সোনার রঙ হইতে ইস্পাতের রঙে, এক আভা হইতে আর-এক আভায় মিলাইয়া আসিতেছিল।

জানালা-ভাঙা বারান্দা-ঝুলিয়া-পড়া জরাগ্রস্ত বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে অশ্বত্থমূল-বিদারিত ঘাটের উপর ঝিল্লিমুখর সন্ধ্যাবেলায় একলা বসিয়া আমার শুষ্ক চক্ষুর কোণ ভিজিবে-ভিজিবে করিতেছে, এমন সময়ে মাথা হইতে পা পর্যন্ত হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া শুনিলাম, "মহাশয়ের কোথা হইতে আগমন।"

দেখিলাম ভদ্রলোকটি স্বল্পাহারশীর্ণ, ভাগ্যলক্ষ্মী কর্তৃক নিতান্ত অনাদৃত। বাংলা-দেশের অধিকাংশ বিদেশী চাকুরের যেমন একরকম বহুকাল-জীর্ণসংস্কার-বিহীন চেহারা, ইহারও সেইরূপ। ধুতির উপরে একখানি মলিন তৈলাক্ত আসামী মটকার বোতাম-খোলা চাপকান; কর্মক্ষেত্র হইতে যেন অল্পক্ষণ হইল ফিরিতেছেন। এবং যে সময় কিঞ্চিৎ জলপান খাওয়া উচিত ছিল সে সময় হতভাগ্য নদীতীরে কেবল সন্ধ্যার হাওয়া খাইতে আসিয়াছেন।

আগন্তুক সোপানপার্শ্বে আসনগ্রহণ করিলেন। আমি কহিলাম, "আমি রাঁচি হইতে আসিতেছি।"

"কী করা হয়।"

"ব্যাবসা করিয়া থাকি।"

"কী ব্যাবসা।"

"হরীতকী, রেশমের গুটি এবং কাঠের ব্যাবসা।"

"কী নাম।"

ঈষৎ থামিয়া একটা নাম বলিলাম। কিন্তু সে আমার নিজের নাম নহে।

ভদ্রলোকের কৌতূহলনিবৃত্তি হইল না। পুনরায় প্রশ্ন হইল, "এখানে কী করিতে আগমন।"

আমি কহিলাম, "বায়ুপরিবর্তন।"

লোকটি কিছু আশ্চর্য হইল। কহিল, "মহাশয়, আজ প্রায় ছয়বৎসর ধরিয়া এখানকার বায়ু এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ গড়ে পনেরো গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন খাইতেছি কিন্তু কিছু তো ফল পাই নাই।"

আমি কহিলাম, "এ কথা মানিতেই হইবে, রাঁচি হইতে এখানে বায়ুর যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা যাইবে।"

তিনি কহিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, যথেষ্ট। এখানে কোথায় বাসা করিবেন।"

আমি ঘাটের উপরকার জীর্ণবাড়ি দেখাইয়া কহিলাম, "এই বাড়িতে।"

বোধ করি লোকটির মনে সন্দেহ হইল, আমি এই পোড়ো বাড়িতে কোনো গুপ্তধনের সন্ধান পাইয়াছি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর কোনো তর্ক তুলিলেন না, কেবল আজ পনেরো বৎসর পূর্বে এই অভিশাপগ্রস্ত বাড়িতে যে ঘটনাটি ঘটিয়াছিল তাহারই বিস্তারিত বর্ণনা করিলেন।

লোকটি এখানকার ইস্কুলমাস্টার। তাঁহার ক্ষুধা ও রোগ-শীর্ণ মুখে মস্ত একটা টাকের নীচে একজোড়া বড়ো বড়ো চক্ষু আপন কোটরের ভিতর হইতে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় জ্বলিতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া ইংরাজ-কবি কোল্‌রিজের সৃষ্ট প্রাচীন নাবিকের কথা আমার মনে পড়িল।

মাঝি নমাজ পড়া সমাধা করিয়া রন্ধনকার্যে মন দিয়াছে। সন্ধ্যার শেষ আভাটুকু মিলাইয়া আসিয়া ঘাটের উপরকার জনশূন্য অন্ধকার বাড়ি আপন পূর্বাবস্থার প্রকাণ্ড প্রেতমূর্তির মতো নিস্তব্ধ দাঁড়াইয়া রহিল।

ইস্কুলমাস্টার কহিলেন—

আমি এই গ্রামে আসার প্রায় দশ বৎসর পূর্বে এই বাড়িতে ফণিভূষণ সাহা বাস

করিতেন। তিনি তাঁহার অপুত্রক পিতৃব্য দুর্গামোহন সাহার বৃহৎ বিষয় এবং ব্যবসায়ের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

কিন্তু, তাঁহাকে একালে ধরিয়াছিল। তিনি লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তিনি জুতাসমেত সাহেবের আপিসে ঢুকিয়া সম্পূর্ণ খাঁটি ইংরাজি বলিতেন। তাহাতে আবার দাড়ি রাখিয়াছিলেন, সুতরাং সাহেব-সওদাগরের নিকট তাঁহার উন্নতির সম্ভাবনামাত্র ছিল না। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই নব্যবঙ্গ বলিয়া ঠাহর হইত।

আবার ঘরের মধ্যেও এক উপসর্গ জুটিয়াছিল। তাঁহার স্ত্রীটি ছিলেন সুন্দরী। একে কালেজে-পড়া তাহাতে সুন্দরী স্ত্রী, সুতরাং সেকালের চালচলন আর রহিল না। এমন-কি, ব্যামো হইলে অ্যাসিস্টাণ্ট-সার্জনকে ডাকা হইত। অশন বসন ভূষণও এই পরিমাণে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

মহাশয় নিশ্চয়ই বিবাহিত, অতএব এ কথা আপনাকে বলাই বাহুল্য যে, সাধারণত স্ত্রীজাতি কাঁচা আম, ঝাল লঙ্কা এবং কড়া স্বামীই ভালোবাসে। যে দুর্ভাগ্য পুরুষ নিজের স্ত্রীর ভালোবাসা হইতে বঞ্চিত সে-যে কুশ্রী অথবা নির্ধন তাহা নহে, সে নিতান্ত নিরীহ।

যদি জিজ্ঞাসা করেন, কেন এমন হইল, আমি এ সম্বন্ধে অনেক কথা ভাবিয়া রাখিয়াছি। যাহার যা প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতা সেটার চর্চা না করিলে সে সুখী হয় না। শিঙে শান দিবার জন্য হরিণ শক্ত গাছের গুঁড়ি খোঁজে, কলাগাছে তাহার শিং ঘষিবার সুখ হয় না। নরনারীর ভেদ হইয়া অবধি স্ত্রীলোক দুরন্ত পুরুষকে নানা কৌশলে ভুলাইয়া বশ করিবার বিদ্যা চর্চা করিয়া আসিতেছে। যে স্বামী আপনি বশ হইয়া বসিয়া থাকে তাহার স্ত্রী-বেচারা একেবারেই বেকার, সে তাহার মাতামহীদের নিকট হইতে শতলক্ষ বৎসরের শাণ-দেওয়া যে উজ্জ্বল বরুণাস্ত্র, অগ্নিবাণ ও নাগপাশবন্ধনগুলি পাইয়াছিল তাহা সমস্ত নিষ্ফল হইয়া যায়।

স্ত্রীলোক পুরুষকে ভুলাইয়া নিজের শক্তিতে ভালোবাসা আদায় করিয়া লইতে চায়, স্বামী যদি ভালোমানুষ হইয়া সে অবসরটুকু না দেয়, তবে স্বামীর অদৃষ্ট মন্দ এবং স্ত্রীরও ততোধিক।

নবসভ্যতার শিক্ষামন্ত্রে পুরুষ আপন স্বভাবসিদ্ধ বিধাতাদত্ত সুমহৎ বর্বরতা হারাইয়া আধুনিক দাম্পত্যসম্বন্ধটাকে এমন শিথিল করিয়া ফেলিয়াছে। অভাগা ফণিভূষণ আধুনিক সভ্যতার কল হইতে অত্যন্ত ভালোমানুষটি হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল—ব্যবসায়েও সে সুবিধা করিতে পারিল না, দাম্পত্যেও তাহার তেমন সুযোগ ঘটে নাই।

ফণিভূষণের স্ত্রী মণিমালিকা, বিনা চেষ্টায় আদর, বিনা অশ্রুবর্ষণে ঢাকাই শাড়ি এবং বিনা দুর্জয় মানে বাজুবন্ধ লাভ করিত। এইরূপে তাহার নারীপ্রকৃতি এবং সেই সঙ্গে তাহার ভালোবাসা নিশ্চেষ্ট হইয়া গিয়াছিল; সে কেবল গ্রহণ করিত, কিছু দিত না। তাহার নিরীহ এবং নির্বোধ স্বামীটি মনে করিত, দানই বুঝি প্রতিদান পাইবার উপায়। একেবারে উল্‌টা বুঝিয়াছিল আর কি।

ইহার ফল হইল এই যে, স্বামীকে সে আপন ঢাকাই শাড়ি এবং বাজুবন্ধ জোগাইবার যন্ত্রস্বরূপ জ্ঞান করিত; যন্ত্রটিও এমন সুচারু যে, কোনোদিন তাহার চাকায় এক ফোঁটা তেল জোগাইবারও দরকার হয় নাই।

ফণিভূষণের জন্মস্থান ফুলবেড়ে, বাণিজ্যস্থান এখানে। কর্মানুরোধে এখানেই তাহাকে অধিকাংশ সময় থাকিতে হইত। ফুলবেড়ের বাড়িতে তাহার মা ছিল না, তবু পিসি মাসি ও অন্য পাঁচজন ছিল। কিন্তু, ফণিভূষণ পিসি মাসি ও অন্য পাঁচজনের উপকারার্থেই বিশেষ করিয়া সুন্দরী স্ত্রী ঘরে আনে নাই। সুতরাং স্ত্রীকে সে পাঁচজনের কাছ থেকে আনিয়া এই কুঠিতে একলা নিজের কাছেই রাখিল। কিন্তু অন্যান্য অধিকার হইতে স্ত্রী-অধিকারের প্রভেদ এই যে, স্ত্রীকে পাঁচজনের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একলা নিজের কাছে রাখিলেই যে সব সময় বেশি করিয়া পাওয়া যায় তাহা নহে।

স্ত্রীটি বেশি কথাবার্তা কহিত না, পাড়াপ্রতিবেশিনীদের সঙ্গেও তাহার মেলামেশা বেশি ছিল না; ব্রত উপলক্ষ্য করিয়া দুটো ব্রাহ্মণকে খাওয়ানো বা বৈষ্ণবীকে দুটো পয়সা ভিক্ষা দেওয়া কখনো তাহার দ্বারা ঘটে নাই। তাহার হাতে কোনো জিনিস নষ্ট হয় নাই; কেবল স্বামীর আদরগুলা ছাড়া আর যাহা পাইয়াছে সমস্তই জমা করিয়া রাখিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সে নিজের অপরূপ যৌবনশ্রী হইতেও যেন লেশমাত্র অপব্যয় ঘটিতে দেয় নাই। লোকে বলে, তাহার চব্বিশবৎসর বয়সের সময়ও তাহাকে চোদ্দবৎসরের মতো কাঁচা দেখিতে ছিল। যাহাদের হৃৎপিণ্ড বরফের পিণ্ড, যাহাদের বুকের মধ্যে ভালোবাসার জ্বালাযন্ত্রণা স্থান পায় না, তাহারা বোধ করি সুদীর্ঘকাল তাজা থাকে, তাহারা কৃপণের মতো অন্তরে বাহিরে আপনাকে জমাইয়া রাখিতে পারে।

ঘনপল্লবিত অতিসতেজ লতার মতো বিধাতা মণিমালিকাকে নিষ্ফলা করিয়া রাখিলেন, তাহাকে সন্তান হইতে বঞ্চিত করিলেন। অর্থাৎ, তাহাকে এমন একটা কিছু দিলেন না যাহাকে সে আপন লোহার সিন্দুকের মণিমাণিক্য অপেক্ষা বেশি করিয়া বুঝিতে পারে, যাহা বসন্তপ্রভাতের নবসূর্যের মতো আপন কোমল উত্তাপে তাহার হৃদয়ের বরফপিণ্ডটা গলাইয়া সংসারের উপর একটা স্নেহনির্ঝর বহাইয়া দেয়।

কিন্তু মণিমালিকা কাজকর্মে মজবুত ছিল। কখনোই সে লোকজন বেশি রাখে নাই। যে কাজ তাহার দ্বারা সাধ্য সে কাজে কেহ বেতন লইয়া যাইবে ইহা সে সহিতে পারিত না। সে কাহারো জন্য চিন্তা করিত না, কাহাকেও ভালোবাসিত না, কেবল কাজ করিত এবং জমা করিত, এইজন্য তাহার রোগ শোক তাপ কিছুই ছিল না; অপরিমিত স্বাস্থ্য, অবিচলিত শান্তি এবং সঞ্চীয়মান সম্পদের মধ্যে সে সবলে বিরাজ করিত।

অধিকাংশ স্বামীর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট; যথেষ্ট কেন, ইহা দুর্লভ। অঙ্গের মধ্যে কটিদেশ বলিয়া একটা ব্যাপার আছে তাহা কোমরে ব্যথা না হইলে মনে পড়ে না; গৃহের আশ্রয়স্বরূপে স্ত্রী-যে একজন আছে ভালোবাসার তাড়নায় তাহা পদে পদে এবং তাহা চব্বিশঘণ্টা অনুভব করার নাম ঘরকন্নার কোমরে ব্যথা। নিরতিশয় পাতিব্রত্যটা স্ত্রীর পক্ষে গৌরবের বিষয় কিন্তু পতির পক্ষে আরামের নহে, আমার তো এইরূপ মত।

মহাশয়, স্ত্রীর ভালোবাসা ঠিক কতটা পাইলাম, ঠিক কতটুকু কম পড়িল, অতি সূক্ষ্ম নিক্তি ধরিয়া তাহা অহরহ তৌল করিতে বসা কি পুরুষমানুষের কর্ম! স্ত্রী আপনার কাজ করুক, আমি আপনার কাজ করি, ঘরের মোটা হিসাবটা তো এই। অব্যক্তের মধ্যে কতটা ব্যক্ত, ভাবের মধ্যে কতটুকু অভাব, সুস্পষ্টের মধ্যেও কী পরিমাণ ইঙ্গিত, অণুপরমাণুর মধ্যে কতটা বিপুলতা— ভালোবাসাবাসির তত সুসূক্ষ্ম বোধশক্তি বিধাতা পুরুষমানুষকে দেন নাই, দিবার প্রয়োজন হয় নাই। পুরুষ-মানুষের তিলপরিমাণ অনুরাগ-বিরাগের লক্ষণ লইয়া মেয়েরা বটে ওজন করিতে বসে। কথার মধ্য হইতে আসল ভঙ্গীটুকু এবং ভঙ্গীর মধ্য হইতে আসল কথাটুকু চিরিয়া চিরিয়া চুনিয়া চুনিয়া বাহির করিতে থাকে। কারণ, পুরুষের ভালোবাসাই তাহাদের বল, তাহাদের জীবনব্যবসায়ের মূলধন। ইহারই হাওয়ার গতিক লক্ষ্য করিয়া ঠিক সময়ে ঠিকমত পাল ঘুরাইতে পারিলে তবেই তাহাদের তরণী তরিয়া যায়। এইজন্যই বিধাতা ভালোবাসামান-যন্ত্রটি মেয়েদের হৃদয়ের মধ্যে ঝুলাইয়া দিয়াছেন, পুরুষদের দেন নাই।

কিন্তু বিধাতা যাহা দেন নাই সম্প্রতি পুরুষরা সেটি সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন। কবিরা বিধাতার উপর টেক্কা দিয়া এই দুর্লভ যন্ত্রটি, এই দিগ্‌দর্শন যন্ত্রশলাকাটি নির্বিচারে সর্বসাধারণের হস্তে দিয়াছেন। বিধাতার দোষ দিই না, তিনি মেয়ে-পুরুষকে যথেষ্ট ভিন্ন করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু সভ্যতায় সে ভেদ আর থাকে না, এখন মেয়েও পুরুষ হইতেছে, পুরুষও মেয়ে হইতেছে; সুতরাং ঘরের

মধ্য হইতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিদায় লইল। এখন শুভবিবাহের পূর্বে, পুরুষকে বিবাহ করিতেছি না মেয়েকে বিবাহ করিতেছি, তাহা কোনোমতে নিশ্চয় করিতে না পারিয়া, বরকন্যা উভয়েরই চিত্ত আশঙ্কায় দুরু দুরু করিতে থাকে।

আপনি বিরক্ত হইতেছেন! একলা পড়িয়া থাকি, স্ত্রীর নিকট হইতে নির্বাসিত; দূর হইতে সংসারের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব মনের মধ্যে উদয় হয়— এগুলো ছাত্রদের কাছে বলিবার বিষয় নয়, কথাপ্রসঙ্গে আপনাকে বলিয়া লইলাম, চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

মোটকথাটা এই যে, যদিচ রন্ধনে নুন কম হইত না এবং পানে চুন বেশি হইত না, তথাপি ফণিভূষণের হৃদয় কী-যেন-কী নামক একটা দুঃসাধ্য উৎপাত অনুভব করিত। স্ত্রীর কোনো দোষ ছিল না, কোনো ভ্রম ছিল না, তবু স্বামীর কোনো সুখ ছিল না। সে তাহার সহধর্মিণীর শূন্যগহ্বর হৃদয় লক্ষ্য করিয়া কেবলই হীরামুক্তার গহনা ঢালিত কিন্তু সেগুলা পড়িত গিয়া লোহার সিন্দুকে, হৃদয় শূন্যই থাকিত। খুড়া দুর্গামোহন ভালোবাসা এত সূক্ষ্ম করিয়া বুঝিত না, এত কাতর হইয়া চাহিত না, এত প্রচুর পরিমাণে দিত না, অথচ খুড়ির নিকট হইতে তাহা অজস্র পরিমাণে লাভ করিত। ব্যবসায়ী হইতে গেলে নব্যবাবু হইলে চলে না এবং স্বামী হইতে গেলে পুরুষ হওয়া দরকার, এ কথায় সন্দেহমাত্র করিবেন না।

ঠিক এই সময়ে শৃগালগুলা নিকটবর্তী ঝোপের মধ্য হইতে অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল। মাস্টারমহাশয়ের গল্পস্রোতে মিনিটকয়েকের জন্য বাধা পড়িল। ঠিক মনে হইল, সেই অন্ধকার সভাভূমিতে কৌতুকপ্রিয় শৃগালসম্প্রদায় ইস্কুলমাস্টারের ব্যাখ্যাত দাম্পত্যনীতি শুনিয়াই হউক বা নবসভ্যতাদুর্বল ফণিভূষণের আচরণেই হউক রহিয়া রহিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিতে লাগিল। তাহাদের ভাবোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত হইয়া জলস্থল দ্বিগুণতর নিস্তব্ধ হইলে পর, মাস্টার সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁহার বৃহৎ উজ্জ্বল চক্ষু পাকাইয়া গল্প বলিতে লাগিলেন—

ফণিভূষণের জটিল এবং বহুবিস্তৃত ব্যবসায়ে হঠাৎ একটা ফাঁড়া উপস্থিত হইল। ব্যাপারটা কী তাহা আমার মতো অব্যবসায়ীর পক্ষে বোঝা এবং বোঝানো শক্ত। মোদ্দা কথা, সহসা কী কারণে বাজারে তাহার ক্রেডিট রাখা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। যদি কেবলমাত্র পাঁচটা দিনের জন্যও সে কোথাও হইতে লাখদেড়েক টাকা বাহির করিতে পারে, বাজারে একবার বিদ্যুতের মতো এই টাকাটার চেহারা দেখাইয়া

যায়, তাহা হইলেই মুহূর্তের মধ্যে সংকট উত্তীর্ণ হইয়া তাহার ব্যাবসা পালভরে ছুটিয়া চলিতে পারে।

টাকাটার সুযোগ হইতেছিল না। স্থানীয় পরিচিত মহাজনদের নিকট হইতে ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এরূপ জনরব উঠিলে তাহার ব্যবসায়ের দ্বিগুণ অনিষ্ট হইবে, আশঙ্কায় তাহাকে অপরিচিত স্থানে ঋণের চেষ্টা দেখিতে হইতেছিল। সেখানে উপযুক্ত বন্ধক না রাখিলে চলে না।

গহনা বন্ধক রাখিলে লেখাপড়া এবং বিলম্বের কারণ থাকে না, চট্‌পট্ এবং সহজেই কাজ হইয়া যায়।

ফণিভূষণ একবার স্ত্রীর কাছে গেল। নিজের স্ত্রীর কাছে স্বামী যেমন সহজভাবে যাইতে পারে ফণিভূষণের তেমন করিয়া যাইবার ক্ষমতা ছিল না। সে দুর্ভাগ্যক্রমে নিজের স্ত্রীকে ভালোবাসিত, যেমন ভালোবাসা কাব্যের নায়ক কাব্যের নায়িকাকে বাসে ; যে ভালোবাসায় সন্তর্পণে পদক্ষেপ করিতে হয় এবং সকল কথা মুখে ফুটিয়া বাহির হইতে পারে না, যে ভালোবাসার প্রবল আকর্ষণ সূর্য এবং পৃথিবীর আকর্ষণের ন্যায় মাঝখানে একটা অতিদূর ব্যবধান রাখিয়া দেয়।

তথাপি তেমন তেমন দায়ে পড়িলে কাব্যের নায়ককেও প্রেয়সীর নিকট হুণ্ডি এবং বন্ধক এবং হ্যাণ্ড্‌নোটের প্রসঙ্গ তুলিতে হয় ; কিন্তু সুর বাধিয়া যায়, বাক্যস্খলন হয়, এমন সকল পরিষ্কার কাজের কথার মধ্যেও ভাবের জড়িমা ও বেদনার বেপথু আসিয়া উপস্থিত হয়। হতভাগ্য ফণিভূষণ স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিল না, 'ওগো, আমার দরকার হইয়াছে, তোমার গহনাগুলো দাও।'

কথাটা বলিল, অথচ অত্যন্ত দুর্বলভাবে বলিল। মণিমালিকা যখন কঠিন মুখ করিয়া হাঁ-না কিছুই উত্তর করিল না, তখন সে একটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর আঘাত পাইল কিন্তু আঘাত করিল না। কারণ, পুরুষোচিত বর্বরতা লেশমাত্র তাহার ছিল না। যেখানে জোর করিয়া কাড়িয়া লওয়া উচিত ছিল, সেখানে সে আপনার আন্তরিক ক্ষোভ পর্যন্ত চাপিয়া গেল। যেখানে ভালোবাসার একমাত্র অধিকার, সর্বনাশ হইয়া গেলেও সেখানে বলকে প্রবেশ করিতে দিবে না, এই তাহার মনের ভাব। এ সম্বন্ধে তাহাকে যদি ভর্ৎসনা করা যাইত তবে সম্ভবত সে এইরূপ সূক্ষ্ম তর্ক করিত যে, বাজারে যদি অন্যায় কারণেও আমার ক্রেডিট না থাকে তবে তাই বলিয়া বাজার লুটিয়া লইবার অধিকার আমার নাই, স্ত্রী যদি স্বেচ্ছাপূর্বক বিশ্বাস করিয়া আমাকে গহনা না দেয় তবে তাহা আমি কাড়িয়া লইতে পারি না। বাজারে যেমন ক্রেডিট ঘরে তেমনি ভালোবাসা, বাহুবল কেবলমাত্র রণক্ষেত্রে। পদে পদে

এইরূপ অত্যন্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তর্কসূত্র কাটিবার জন্যই কি বিধাতা পুরুষমানুষকে এরূপ উদার, এরূপ প্রবল, এরূপ বৃহদাকার করিয়া নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার কি বসিয়া বসিয়া অত্যন্ত সুকুমার চিত্তবৃত্তিকে নিরতিশয় তনিমার সহিত অনুভব করিবার অবকাশ আছে, না ইহা তাহাকে শোভা পায়।

যাহা হউক, আপন উন্নত হৃদয়বৃত্তির গর্বে স্ত্রীর গহনা স্পর্শ না করিয়া ফণিভূষণ অন্য উপায়ে অর্থ-সংগ্রহের জন্য কলিকাতায় চলিয়া গেল।

সংসারে সাধারণত স্ত্রীকে স্বামী যতটা চেনে স্বামীকে স্ত্রী তাহার চেয়ে অনেক বেশি চেনে; কিন্তু স্বামীর প্রকৃতি যদি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয় তবে স্ত্রীর অণুবীক্ষণে তাহার সমস্তটা ধরা পড়ে না। আমাদের ফণিভূষণকে ফণিভূষণের স্ত্রী ঠিক বুঝিত না। স্ত্রীলোকের অশিক্ষিতপটুত্ব যে-সকল বহুকালাগত প্রাচীন সংস্কারের দ্বারা গঠিত, অত্যন্ত নব্য পুরুষেরা তাহার বাহিরে গিয়া পড়ে। ইহারা এক রকমের! ইহারা মেয়েমানুষের মতোই রহস্যময় হইয়া উঠিতেছে। সাধারণ পুরুষমানুষের যে-কটা বড়ো বড়ো কোটা আছে, অর্থাৎ কেহ-বা বর্বর, কেহ-বা নির্বোধ, কেহ-বা অন্ধ, তাহার মধ্যে কোনোটাতেই ইহাদিগকে ঠিকমত স্থাপন করা যায় না।

সুতরাং মণিমালিকা পরামর্শের জন্য তাহার মন্ত্রীকে ডাকিল। গ্রামসম্পর্কে অথবা দূরসম্পর্কে মণিমালিকার এক ভাই ফণিভূষণের কুঠিতে গোমস্তার অধীনে কাজ করিত। তাহার এমন স্বভাব ছিল না যে কাজের দ্বারা উন্নতি লাভ করে, কোনো-একটা উপলক্ষ্য করিয়া আত্মীয়তার জোরে বেতন এবং বেতনেরও বেশি কিছু কিছু সংগ্রহ করিত।

মণিমালিকা তাহাকে ডাকিয়া সকল কথা বলিল; জিজ্ঞাসা করিল, 'এখন পরামর্শ কী।'

সে অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো মাথা নাড়িল; অর্থাৎ গতিক ভালো নহে। বুদ্ধিমানেরা কখনোই গতিক ভালো দেখে না। সে কহিল, 'বাবু কখনোই টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন না, শেষকালে তোমার এ গহনাতে টান পড়িবেই।'

মণিমালিকা মানুষকে যেরূপ জানিত তাহাতে বুঝিল, এইরূপ হওয়াই সম্ভব এবং ইহাই সংগত। তাহার দুশ্চিন্তা সুতীব্র হইয়া উঠিল। সংসারে তাহার সন্তান নাই; স্বামী আছে বটে কিন্তু স্বামীর অস্তিত্ব সে অন্তরের মধ্যে অনুভব করে না, অতএব যাহা তাহার একমাত্র যত্নের ধন, যাহা তাহার ছেলের মতো ক্রমে ক্রমে বৎসরে বৎসরে বাড়িয়া উঠিতেছে, যাহা রূপকমাত্র নহে, যাহা প্রকৃতই সোনা, যাহা

মানিক, যাহা বক্ষের, যাহা কণ্ঠের, যাহা মাথায়— সেই অনেকদিনের অনেক সাধের সামগ্রী এক মুহূর্তেই ব্যবসায়ের অতলস্পর্শ গহ্বরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে ইহা কল্পনা করিয়া তাহার সর্বশরীর হিম হইয়া আসিল। সে কহিল, 'কী করা যায়।'

মধুসূদন কহিল, 'গহনাগুলো লইয়া এইবেলা বাপের বাড়ি চলো।' গহনার কিছু অংশ, এমন-কি অধিকাংশই যে তাহার ভাগে আসিবে বুদ্ধিমান মধু মনে মনে তাহার উপায় ঠাহরাইল।

মণিমালিকা এ প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল।

আষাঢ়শেষের সন্ধ্যাবেলায় এই ঘাটের ধারে একখানি নৌকা আসিয়া লাগিল। ঘনমেঘাচ্ছন্ন প্রত্যূষে নিবিড় অন্ধকারে নিদ্রাহীন ভেকের কলরবের মধ্যে একখানি মোটা চাদরে পা হইতে মাথা পর্যন্ত আবৃত করিয়া মণিমালিকা নৌকায় উঠিল। মধুসূদন নৌকার মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিয়া কহিল, 'গহনার বাক্সটা আমার কাছে দাও।' মণি কহিল, 'সে পরে হইবে, এখন নৌকা খুলিয়া দাও।'

নৌকা খুলিয়া দিল, খরস্রোতে হুহু করিয়া ভাসিয়া গেল।

মণিমালিকা সমস্ত রাত ধরিয়া একটি একটি করিয়া তাহার সমস্ত গহনা সর্বাঙ্গ ভরিয়া পরিয়াছে, মাথা হইতে পা পর্যন্ত আর স্থান ছিল না। বাক্সে করিয়া গহনা লইলে সে বাক্স হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারে, এ আশঙ্কা তাহার ছিল। কিন্তু, গায়ে পরিয়া গেলে তাহাকে না বধ করিয়া সে গহনা কেহ লইতে পারিবে না।

সঙ্গে কোনোপ্রকার বাক্স না দেখিয়া মধুসূদন কিছু বুঝিতে পারিল না, মোটা চাদরের নীচে যে মণিমালিকার দেহপ্রাণের সঙ্গে সঙ্গে দেহপ্রাণের অধিক গহনাগুলি আচ্ছন্ন ছিল তাহা সে অনুমান করিতে পারে নাই! মণিমালিকা ফণিভূষণকে বুঝিত না বটে, কিন্তু মধুসূদনকে চিনিতে তাহার বাকি ছিল না।

মধুসূদন গোমস্তার কাছে একখানা চিঠি রাখিয়া গেল যে, সে কর্ত্রীকে পিত্রালয়ে পৌঁছাইয়া দিতে রওনা হইল। গোমস্তা ফণিভূষণের বাপের আমলের; সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া হ্রস্ব-ইকারকে দীর্ঘ-ঈকার এবং দন্ত্য-সকে তালব্য-শ করিয়া মনিবকে এক পত্র লিখিল, ভালো বাংলা লিখিল না কিন্তু স্ত্রীকে অযথা প্রশ্রয় দেওয়া যে পুরুষোচিত নহে এ কথাটা ঠিকমতই প্রকাশ করিল।

ফণিভূষণ মণিমালিকার মনের কথাটা ঠিক বুঝিল। তাহার মনে এই আঘাতটা প্রবল হইল যে, 'আমি গুরুতর ক্ষতিসম্ভাবনা সত্ত্বেও স্ত্রীর অলংকার পরিত্যাগ করিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তবু আমাকে সন্দেহ। আমাকে আজিও চিনিল না।'

নিজের প্রতি যে নিদারুণ অন্যায়ে ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত ছিল, ফণিভূষণ তাহাতে ক্ষুব্ধ হইল মাত্র। পুরুষমানুষ বিধাতার ন্যায়দণ্ড, তাহার মধ্যে তিনি বজ্রাগ্নি নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন, নিজের প্রতি অথবা অপরের প্রতি অন্যায়ের সংঘর্ষে সে যদি দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতে না পারে তবে ধিক্‌ তাহাকে। পুরুষমানুষ দাবাগ্নির মতো রাগিয়া উঠিবে সামান্য কারণে, আর স্ত্রীলোক শ্রাবণমেঘের মতো অশ্রুপাত করিতে থাকিবে বিনা উপলক্ষে বিধাতা এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু সে আর টেঁকে না।

ফণিভূষণ অপরাধিনী স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে কহিল, 'এই যদি তোমার বিচার হয় তবে এইরূপই হউক, আমার কর্তব্য আমি করিয়া যাইব।' আরো শতাব্দী-পাঁচছয় পরে যখন কেবল অধ্যাত্মশক্তিতে জগৎ চলিবে তখন যাহার জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল সেই ভাবী যুগের ফণিভূষণ উনবিংশ শতাব্দীতে অবতীর্ণ হইয়া সেই আদিযুগের স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়া বসিয়াছে শাস্ত্রে যাহার বুদ্ধিকে প্রলয়ংকরী বলিয়া থাকে। ফণিভূষণ স্ত্রীকে এক-অক্ষর পত্র লিখিল না এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, এ সম্বন্ধে স্ত্রীর কাছে কখনো সে কোনো কথার উল্লেখ করিবে না। কী ভীষণ দণ্ডবিধি।

দিনদশেক পরে কোনোমতে যথোপযুক্ত টাকা সংগ্রহ করিয়া বিপদুত্তীর্ণ ফণিভূষণ বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। সে জানিত, বাপের বাড়িতে গহনাপত্র রাখিয়া এতদিনে মণিমালিকা ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। সেদিনকার দীন প্রার্থীভাব ত্যাগ করিয়া কৃতকার্য কৃতীপুরুষ স্ত্রীর কাছে দেখা দিলে মণি যে কিরূপ লজ্জিত এবং অনাবশ্যক প্রয়াসের জন্য কিঞ্চিৎ অনুতপ্ত হইবে, ইহাই কল্পনা করিতে করিতে ফণিভূষণ অন্তঃপুরে শয়নাগারের দ্বারের কাছে আসিয়া উপনীত হইল।

দেখিল, দ্বার রুদ্ধ। তালা ভাঙিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, ঘর শূন্য। কোণে লোহার সিন্দুক খোলা পড়িয়া আছে, তাহাতে গহনাপত্রের চিহ্নমাত্র নাই।

স্বামীর বুকের মধ্যে ধক্‌ করিয়া একটা ঘা লাগিল। মনে হইল, সংসার উদ্দেশ্যহীন এবং ভালোবাসা ও বাণিজ্যব্যাবসা সমস্তই ব্যর্থ। আমরা এই সংসারপিঞ্জরের প্রত্যেক শলাকার উপরে প্রাণপাত করিতে বসিয়াছি, কিন্তু তাহার ভিতরে পাখি নাই, রাখিলেও সে থাকে না। তবে অহরহ হৃদয়খনির রক্তমানিক ও অশ্রুজলের মুক্তামালা দিয়া কী সাজাইতে বসিয়াছি। এই চিরজীবনের সর্বস্বজড়ানো শূন্য সংসার-খাঁচাটা ফণিভূষণ মনে মনে পদাঘাত করিয়া অতিদূরে ফেলিয়া দিল।

ফণিভূষণ স্ত্রীর সম্বন্ধে কোনোরূপ চেষ্টা করিতে চাহিল না। মনে করিল, যদি

ইচ্ছা হয় তো ফিরিয়া আসিবে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গোমস্তা আসিয়া কহিল, 'চুপ করিয়া থাকিলে কী হইবে, কর্ত্রীবধূর খবর লওয়া চাই তো।' এই বলিয়া মণিমালিকার পিত্রালয়ে লোক পাঠাইয়া দিল। সেখান হইতে খবর আসিল, মণি অথবা মধু এ পর্যন্ত সেখানে পৌঁছে নাই।

তখন চারি দিকে খোঁজ পড়িয়া গেল। নদীতীরে-তীরে প্রশ্ন করিতে করিতে লোক ছুটিল। মধুর তল্লাস করিতে পুলিসে খবর দেওয়া হইল— কোন্ নৌকা, নৌকার মাঝি কে, কোন্ পথে তাহারা কোথায় চলিয়া গেল, তাহার কোনো সন্ধান মিলিল না।

সর্বপ্রকার আশা ছাড়িয়া দিয়া একদিন ফণিভূষণ সন্ধ্যাকালে তাহার পরিত্যক্ত শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেদিন জন্মাষ্টমী, সকাল হইতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে। উৎসব উপলক্ষে গ্রামের প্রান্তরে একটা মেলা বসে, সেখানে আটচালার মধ্যে বারোয়ারির যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। মুষলধারায় বৃষ্টিপাতশব্দে যাত্রার গানের সুর মৃদুতর হইয়া কানে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। ঐ-যে বাতায়নের উপরে শিথিলকব্জা দরজাটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে ঐখানে ফণিভূষণ অন্ধকারে একলা বসিয়াছিল— বাদলার হাওয়া বৃষ্টির ছাঁট এবং যাত্রার গান ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, কোনো খেয়ালই ছিল না। ঘরের দেওয়ালে আর্ট্ স্টুডিয়ো-রচিত লক্ষ্মীসরস্বতীর একজোড়া ছবি টাঙানো; আলনার উপরে একটি গামছা ও তোয়ালে, একটি চুড়িপেড়ে ও একটি ডুরে শাড়ি সদ্যব্যবহারযোগ্যভাবে পাকানো ঝুলানো রহিয়াছে। ঘরের কোণে টিপাইয়ের উপরে পিতলের ডিবায় মণিমালিকার স্বহস্তরচিত গুটিকতক পান শুষ্ক হইয়া পড়িয়া আছে। কাচের আলমারির মধ্যে তাহার আবাল্যসঞ্চিত চীনের পুতুল, এসেন্সের শিশি, রঙিন কাচের ডিক্যাণ্টার, শৌখিন তাস, সমুদ্রের বড়ো বড়ো কড়ি, এমন-কি শূন্য সাবানের বাক্সগুলি পর্যন্ত অতি পরিপাটি করিয়া সাজানো; যে অতিক্ষুদ্র গোলকবিশিষ্ট ছোটো শখের কেরোসিন-ল্যাম্প সে নিজে প্রতিদিন প্রস্তুত করিয়া স্বহস্তে জ্বালাইয়া কুলুঙ্গিটির উপর রাখিয়া দিত তাহা যথাস্থানে নির্বাপিত এবং ম্লান হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, কেবল সেই ক্ষুদ্র ল্যাম্পটি এই শয়নকক্ষে মণিমালিকার শেষমুহূর্তের নিরুত্তর সাক্ষী; সমস্ত শূন্য করিয়া যে চলিয়া যায়, সেও এত চিহ্ন, এত ইতিহাস, সমস্ত জড়সামগ্রীর উপর আপন সজীব হৃদয়ের এত স্নেহস্বাক্ষর রাখিয়া যায়! এসো মণিমালিকা, এসো, তোমার দীপটি তুমি জ্বালাও, তোমার ঘরটি তুমি আলো করো, আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তোমার যত্নকুঞ্চিত শাড়িটি তুমি পরো, তোমার জিনিসগুলি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তোমার কাছ হইতে কেহ

কিছু প্রত্যাশা করে না, কেবল তুমি উপস্থিত হইয়া মাত্র তোমার অক্ষয় যৌবন তোমার অম্লান সৌন্দর্য লইয়া চারি দিকের এই-সকল বিপুল বিক্ষিপ্ত অনাথ জড়-সামগ্রীরাশিকে একটি প্রাণের ঐক্যে সঞ্জীবিত করিয়া রাখো ; এই-সকল মূক প্রাণহীন পদার্থের অব্যক্ত ক্রন্দন গৃহকে শ্মশান করিয়া তুলিয়াছে।

গভীর রাত্রে কখন একসময়ে বৃষ্টির ধারা এবং যাত্রার গান থামিয়া গেছে। ফণিভূষণ জানলার কাছে যেমন বসিয়া ছিল তেমনি বসিয়া আছে। বাতায়নের বাহিরে এমন একটা জগদ্‌ব্যাপী নীরন্ধ্র অন্ধকার যে তাহার মনে হইতেছিল, যেন সম্মুখে যমালয়ের একটা অভ্রভেদী সিংহদ্বার, যেন এইখানে দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া ডাকিলে চিরকালের লুপ্ত জিনিস অচিরকালের মতো একবার দেখা দিতেও পারে। এই মসীকৃষ্ণ মৃত্যুর পটে, এই অতি কঠিন নিকষ-পাষাণের উপর সেই হারানো সোনার একটি রেখা পড়িতেও পারে।

এমন সময় একটা ঠক্‌ঠক্ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গহনার ঝম্‌ঝম্ শব্দ শোনা গেল। ঠিক মনে হইল, শব্দটা নদীর ঘাটের উপর হইতে উঠিয়া আসিতেছে। তখন নদীর জল এবং রাত্রির অন্ধকার এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছিল। পুলকিত ফণিভূষণ দুই উৎসুক চক্ষু দিয়া অন্ধকার ঠেলিয়া ঠেলিয়া ফুঁড়িয়া ফুঁড়িয়া দেখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল— স্ফীত হৃদয় এবং ব্যগ্র দৃষ্টি ব্যথিত হইয়া উঠিল, কিছুই দেখা গেল না। দেখিবার চেষ্টা যতই একান্ত বাড়িয়া উঠিল অন্ধকার ততই যেন ঘনীভূত, জগৎ ততই যেন ছায়াবৎ হইয়া আসিল। প্রকৃতি নিশীথরাত্রে আপন মৃত্যুনিকেতনের গবাক্ষদ্বারে অকস্মাৎ অতিথিসমাগম দেখিয়া দ্রুত হস্তে আরো একটা বেশি করিয়া পর্দা ফেলিয়া দিল।

শব্দটা ক্রমে ঘাটের সর্বোচ্চ সোপানতল ছাড়িয়া বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাড়ির সম্মুখে আসিয়া থামিল। দেউড়ি বন্ধ করিয়া দরোয়ান যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল। তখন সেই রুদ্ধ দ্বারের উপর ঠক্‌ঠক্ ঝম্‌ঝম্ করিয়া ঘা পড়িতে লাগিল, যেন অলংকারের সঙ্গে সঙ্গে একটা শক্ত জিনিস দ্বারের উপর আসিয়া পড়িতেছে। ফণিভূষণ আর থাকিতে পারিল না। নির্বাণদীপ কক্ষগুলি পার হইয়া, অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া নামিয়া, রুদ্ধ দ্বারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বার বাহির হইতে তালাবদ্ধ ছিল। ফণিভূষণ প্রাণপণে দুই হাতে সেই দ্বার নাড়া দিতেই সেই সংঘাতে এবং তাহার শব্দে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। দেখিতে পাইল, সে নিদ্রিত অবস্থায় উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিয়াছিল। তাহার সর্বশরীর ঘর্মাক্ত, হাত পা বরফের মতো ঠাণ্ডা, এবং হৃৎপিণ্ড নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের মতো

স্ফুরিত হইতেছে। স্বপ্ন ভাঙিয়া দেখিল, বাহিরে আর-কোনো শব্দ নাই, কেবল শ্রাবণের ধারা তখনো ঝর্‌ঝর্‌ শব্দে পড়িতেছিল এবং তাহারই সহিত মিশ্রিত হইয়া শুনা যাইতেছিল, যাত্রার ছেলেরা ভোরের সুরে তান ধরিয়াছে।

যদিচ ব্যাপারটা সমস্তই স্বপ্ন কিন্তু এত অধিক নিকটবর্তী এবং সত্যবৎ যে ফণিভূষণের মনে হইল, যেন অতি অল্পের জন্যই সে তাহার অসম্ভব আকাঙ্ক্ষার আশ্চর্য সফলতা হইতে বঞ্চিত হইল। সেই জলপতনশব্দের সহিত দূরাগত ভৈরবীর তান তাহাকে বলিতে লাগিল, এই জাগরণই স্বপ্ন, এই জগৎই মিথ্যা।

তাহার পরদিনেও যাত্রা ছিল এবং দরোয়ানেরও ছুটি ছিল। ফণিভূষণ হুকুম দিল, আজ সমস্ত রাত্রি যেন দেউড়ির দরজা খোলা থাকে। দরোয়ান কহিল, মেলা উপলক্ষে নানা দেশ হইতে নানাপ্রকার লোক আসিয়াছে, দরজা খোলা রাখিতে সাহস হয় না। ফণিভূষণ সে কথা মানিল না। দরোয়ান কহিল, 'তবে আমি সমস্ত রাত্রি হাজির থাকিয়া পাহারা দিব।' ফণিভূষণ কহিল, 'সে হইবে না, তোমাকে যাত্রা শুনিতে যাইতেই হইবে।' দরোয়ান আশ্চর্য হইয়া গেল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় দীপ নিভাইয়া দিয়া ফণিভূষণ তাহার শয়নকক্ষের সেই বাতায়নে আসিয়া বসিল। আকাশে অবৃষ্টিসংরম্ভ মেঘ এবং চতুর্দিকে কোনো-একটি অনির্দিষ্ট আসন্নপ্রতীক্ষার নিস্তব্ধতা। ভেকের অশ্রান্ত কলরব এবং যাত্রার গানের চিৎকারধ্বনি সেই স্তব্ধতা ভাঙিতে পারে নাই, কেবল তাহার মধ্যে একটা অসংগত অদ্ভুতরস বিস্তার করিতেছিল।

অনেকরাত্রে একসময়ে ভেক এবং ঝিল্লি এবং যাত্রার দলের ছেলেরা চুপ করিয়া গেল এবং রাত্রের অন্ধকারের উপরে আরো একটা কিসের অন্ধকার আসিয়া পড়িল। বুঝা গেল, এইবার সময় আসিয়াছে।

পূর্বদিনের মতো নদীর ঘাটে একটা ঠক্‌ঠক্‌ এবং ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ উঠিল। কিন্তু, ফণিভূষণ সে দিকে চোখ ফিরাইল না। তাহার ভয় হইল, পাছে অধীর ইচ্ছা এবং অশান্ত চেষ্টায় তাহার সকল ইচ্ছা সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। পাছে আগ্রহের বেগ তাহার ইন্দ্রিয়শক্তিকে অভিভূত করিয়া ফেলে। সে আপনার সকল চেষ্টা নিজের মনকে দমন করিবার জন্য প্রয়োগ করিল, কাঠের মূর্তির মতো শক্ত হইয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

শিঞ্জিত শব্দ আজ ঘাট হইতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া মুক্ত দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিল। শুনা গেল, অন্দর মহলের গোলসিঁড়ি দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে শব্দ উপরে উঠিতেছে। ফণিভূষণ আপনাকে আর দমন করিতে পারে না, তাহার বক্ষ তুফানের

ডিঙির মতো আছাড় খাইতে লাগিল এবং নিশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। গোলসিঁড়ি শেষ করিয়া সেই শব্দ বারান্দা দিয়া ক্রমে ঘরের নিকটবর্তী হইতে লাগিল। অবশেষে ঠিক সেই শয়নকক্ষের দ্বারের কাছে আসিয়া খট্‌খট্‌ এবং ঝম্‌ঝম্‌ থামিয়া গেল। কেবল চৌকাঠটি পার হইলেই হয়।

ফণিভূষণ আর থাকিতে পারিল না। তাহার রুদ্ধ আবেগ এক মুহূর্তে প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; সে বিদ্যুদ্‌বেগে চৌকি হইতে উঠিয়া কাঁদিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, 'মণি!' অমনি সচকিত হইয়া জাগিয়া দেখিল, তাহারই সেই ব্যাকুল কণ্ঠের চিৎকারে ঘরের শার্সিগুলা পর্যন্ত ধ্বনিত স্পন্দিত হইতেছে। বাহিরে সেই ভেকের কলরব এবং যাত্রার ছেলেদের ক্লিষ্ট কণ্ঠের গান।

ফণিভূষণ নিজের ললাটে সবলে আঘাত করিল।

পরদিন মেলা ভাঙিয়া গেছে। দোকানি এবং যাত্রার দল চলিয়া গেল। ফণিভূষণ হুকুম দিল, সেইদিন সন্ধ্যার পর তাহার বাড়িতে সে নিজে ছাড়া আর কেহই থাকিবে না। চাকরেরা স্থির করিল, বাবু তান্ত্রিকমতে একটা কী সাধনে নিযুক্ত আছেন। ফণিভূষণ সমস্তদিন উপবাস করিয়া রহিল।

জনশূন্য বাড়িতে সন্ধ্যাবেলায় ফণিভূষণ বাতায়নতলে আসিয়া বসিল। সেদিন আকাশের স্থানে স্থানে মেঘ ছিল না, এবং ধৌত নির্মল বাতাসের মধ্য দিয়া নক্ষত্রগুলিকে অত্যুজ্জ্বল দেখাইতেছিল। কৃষ্ণপক্ষ দশমীর চাঁদ উঠিতে অনেক বিলম্ব আছে। মেলা উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়াতে পরিপূর্ণ নদীতে নৌকা মাত্রই ছিল না এবং উৎসবজাগরণক্লান্ত গ্রাম দুইরাত্রি জাগরণের পর আজ গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন।

ফণিভূষণ একখানা চৌকিতে বসিয়া চৌকির পিঠের উপর মাথা ঊর্ধ্বমুখ করিয়া তারা দেখিতেছিল; ভাবিতেছিল, একদিন যখন তাহার বয়স ছিল উনিশ, যখন কলিকাতার কালেজে পড়িত, যখন সন্ধ্যাকালে গোলদিঘির তৃণশয়নে চিত হইয়া, হাতের উপরে মাথা রাখিয়া, ঐ অনন্তকালের তারাগুলির দিকে চাহিয়া থাকিত এবং মনে পড়িত তাহার সেই নদীকূলবর্তী শ্বশুরবাড়ির একটি বিরলকক্ষে চোদ্দবৎসরের বয়ঃসন্ধিগতা মণির সেই উজ্জ্বল কাঁচা মুখখানি, তখনকার সেই বিরহ কী সুমধুর, তখনকার সেই তারাগুলির আলোকস্পন্দন হৃদয়ের যৌবনস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে কী বিচিত্র 'বসন্তরাগেণ যতিতালাভ্যাং' বাজিয়া বাজিয়া উঠিত! আজ সেই একই তারা আগুন দিয়া আকাশে মোহমুদ্গরের শ্লোক কয়টা লিখিয়া রাখিয়াছে; বলিতেছে, সংসারোহয়মতীব বিচিত্রঃ!

দেখিতে দেখিতে তারাগুলি সমস্ত লুপ্ত হইয়া গেল। আকাশ হইতে একখানা

অন্ধকার নামিয়া এবং পৃথিবী হইতে একখানা অন্ধকার উঠিয়া চোখের উপরকার এবং নীচেকার পল্লবের মতো একত্র আসিয়া মিলিত হইল। আজ ফণিভূষণের চিত্ত শান্ত ছিল। সে নিশ্চয় জানিত, আজ তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, সাধকের নিকট মৃত্যু আপন রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দিবে।

পূর্বরাত্রির মতো সেই শব্দ নদীর জলের মধ্য হইতে ঘাটের সোপানের উপর উঠিল। ফণিভূষণ দুই চক্ষু নিমীলিত করিয়া স্থির দৃঢ়চিত্তে ধ্যানাসনে বসিল। শব্দ দ্বারীশূন্য দেউড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল, শব্দ জনশূন্য অন্তঃপুরের গোলসিঁড়ির মধ্য দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিতে লাগিল, শব্দ দীর্ঘ বারান্দা পার হইল এবং শয়নকক্ষের দ্বারের কাছে আসিয়া ক্ষণকালের জন্য থামিল।

ফণিভূষণের হৃদয় ব্যাকুল এবং সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, কিন্তু আজ সে চক্ষু খুলিল না। শব্দ চৌকাঠ পার হইয়া অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আলনায় যেখানে শাড়ি কোঁচানো আছে, কুলুঙ্গিতে যেখানে কেরোসিনের দীপ দাঁড়াইয়া, টিপাইয়ের ধারে যেখানে পানের বাটায় পান শুষ্ক, এবং সেই বিচিত্রসামগ্রীপূর্ণ আলমারির কাছে প্রত্যেক জায়গায় এক-একবার করিয়া দাঁড়াইয়া অবশেষে শব্দটা ফণিভূষণের অত্যন্ত কাছে আসিয়া থামিল।

তখন ফণিভূষণ চোখ মেলিল এবং দেখিল, ঘরে নবোদিত দশমীর চন্দ্রালোক আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, এবং তাহার চৌকির ঠিক সম্মুখে একটি কঙ্কাল দাঁড়াইয়া। সেই কঙ্কালের আট আঙুলে আংটি, করতলে রতনচক্র, প্রকোষ্ঠে বালা, বাহুতে বাজুবন্ধ, গলায় কণ্ঠি, মাথায় সিঁথি, তাহার আপাদমস্তকে অস্থিতে অস্থিতে এক-একটি আভরণ সোনায় হীরায় ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। অলংকারগুলি ঢিলা, ঢল্‌ঢল্ করিতেছে, কিন্তু অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িতেছে না। সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর, তাহার অস্থিময় মুখে তাহার দুই চক্ষু ছিল সজীব ; সেই কালো তারা, সেই ঘনদীর্ঘ পক্ষ্ম, সেই সজল উজ্জ্বলতা, সেই অবিচলিত দৃঢ়শান্ত দৃষ্টি। আজ আঠারো বৎসর পূর্বে একদিন আলোকিত সভাগৃহে নহবতের সাহানা আলাপের মধ্যে ফণিভূষণ যে দুটি আয়ত-সুন্দর কালো-কালো ঢলঢল চোখ শুভদৃষ্টিতে প্রথম দেখিয়াছিল সেই দুটি চক্ষুই আজ শ্রাবণের অর্ধরাত্রে কৃষ্ণপক্ষ দশমীর চন্দ্রকিরণে দেখিল ; দেখিয়া তাহার সর্বশরীরে রক্ত হিম হইয়া আসিল। প্রাণপণে দুই চক্ষু বুজিতে চেষ্টা করিল, কিছুতেই পারিল না ; তাহার চক্ষু মৃত মানুষের চক্ষুর মতো নির্নিমেষ চাহিয়া রহিল।

তখন সেই কঙ্কাল স্তম্ভিত ফণিভূষণের মুখের দিকে তাহার দৃষ্টি স্থির রাখিয়া

দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া নীরবে অঙ্গুলিসংকেতে ডাকিল। তাহার চার আঙুলের অস্থিতে হীরার আংটি ঝক্‌মক্‌ করিয়া উঠিল।

ফণিভূষণ মূঢ়ের মতো উঠিয়া দাঁড়াইল। কঙ্কাল দ্বারের অভিমুখে চলিল; হাড়েতে হাড়েতে গহনায় গহনায় কঠিন শব্দ হইতে লাগিল। ফণিভূষণ পাশবদ্ধ পুত্তলীর মতো তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। বারান্দা পার হইল, নিবিড় অন্ধকার গোলসিঁড়ি ঘুরিয়া ঘুরিয়া খট্‌খট্‌ ঠক্‌ঠক্‌ ঝম্‌ঝম্‌ করিতে করিতে নীচে উত্তীর্ণ হইল। নীচেকার বারান্দা পার হইয়া জনশূন্য দীপহীন দেউড়িতে প্রবেশ করিল। অবশেষে দেউড়ি পার হইয়া ইঁটের-খোয়া-দেওয়া বাগানের রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। খোয়াগুলি অস্থিপাতে কড়্‌কড়্‌ করিতে লাগিল। সেখানে ক্ষীণ জ্যোৎস্না ঘন ডালপালার মধ্যে আটক খাইয়া কোথাও নিষ্কৃতির পথ পাইতেছিল না; সেই বর্ষার নিবিড়গন্ধ অন্ধকার ছায়াপথে জোনাকির ঝাঁকের মধ্য দিয়া উভয়ে নদীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঘাটের যে ধাপ বাহিয়া শব্দ উপরে উঠিয়াছিল সেই ধাপ দিয়া অলংকৃত কঙ্কাল তাহার আন্দোলনহীন ঋজুগতিতে কঠিন শব্দ করিয়া এক-পা এক-পা নামিতে লাগিল। পরিপূর্ণ বর্ষানদীর প্রবলস্রোত জলের উপর জ্যোৎস্নার একটি দীর্ঘরেখা ঝিক্‌ঝিক্‌ করিতেছে।

কঙ্কাল নদীতে নামিল, অনুবর্তী ফণিভূষণও জলে পা দিল। জলস্পর্শ করিবামাত্র ফণিভূষণের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। সম্মুখে আর তাহার পথপ্রদর্শক নাই, কেবল নদীর পরপারে গাছগুলা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া এবং তাহাদের মাথার উপরে খণ্ড চাঁদ শান্ত অবাকভাবে চাহিয়া আছে। আপাদমস্তক বারম্বার শিহরিয়া শিহরিয়া স্খলিতপদে ফণিভূষণ স্রোতের মধ্যে পড়িয়া গেল। যদিও সাঁতার জানিত কিন্তু স্নায়ু তাহার বশ মানিল না, স্বপ্নের মধ্য হইতে কেবল মুহূর্তমাত্র জাগরণের প্রান্তে আসিয়া পরক্ষণে অতলস্পর্শ সুপ্তির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেল।

গল্প শেষ করিয়া ইস্কুলমাস্টার খানিকক্ষণ থামিলেন। হঠাৎ থামিবামাত্র বোঝা গেল, তিনি ছাড়া ইতিমধ্যে জগতের আর-সকলই নীরব নিস্তব্ধ হইয়া গেছে। অনেকক্ষণ আমি একটি কথাও বলিলাম না এবং অন্ধকারে তিনি আমার মুখের ভাবও দেখিতে পাইলেন না।

আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি এ গল্প বিশ্বাস করিলেন না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি ইহা বিশ্বাস করেন।"

তিনি কহিলেন, "না। কেন করি না তাহার কয়েকটি যুক্তি দিতেছি। প্রথমত প্রকৃতিঠাকুরানী উপন্যাসলেখিকা নহেন, তাঁহার হাতে বিস্তর কাজ আছে—"

আমি কহিলাম, "দ্বিতীয়ত, আমারই নাম শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ সাহা।"

ইস্কুলমাস্টার কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া কহিলেন, "আমি তাহা হইলে ঠিকই অনুমান করিয়াছিলাম, আপনার স্ত্রীর নাম কী ছিল।"

আমি কহিলাম, "নৃত্যকালী।"

অগ্রহায়ণ ১৩০৫

দৃষ্টিদান

শুনিয়াছি, আজকাল অনেক বাঙালির মেয়েকে নিজের চেষ্টায় স্বামী সংগ্রহ করিতে হয়। আমিও তাই করিয়াছি, কিন্তু দেবতার সহায়তায়। আমি ছেলেবেলা হইতে অনেক ব্রত এবং অনেক শিবপূজা করিয়াছিলাম।

আমার আটবৎসর বয়স উত্তীর্ণ না হইতেই বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব-জন্মের পাপবশত আমি আমার এমন স্বামী পাইয়াও সম্পূর্ণ পাইলাম না। মা ত্রিনয়নী আমার দুইচক্ষু লইলেন। জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত স্বামীকে দেখিয়া লইবার সুখ দিলেন না।

বাল্যকাল হইতেই আমার অগ্নিপরীক্ষার আরম্ভ হয়। চোদ্দবৎসর পার না হইতেই আমি একটি মৃতশিশু জন্ম দিলাম; নিজেও মরিবার কাছাকাছি গিয়াছিলাম কিন্তু যাহাকে দুঃখভোগ করিতে হইবে সে মরিলে চলিবে কেন। যে দীপ জ্বলিবার জন্য হইয়াছে তাহার তেল অল্প হয় না; রাত্রিভোর জ্বলিয়া তবে তাহার নির্বাণ।

বাঁচিলাম বটে কিন্তু শরীরের দুর্বলতায়, মনের খেদে, অথবা যে কারণেই হউক, আমার চোখের পীড়া হইল।

আমার স্বামী তখন ডাক্তারি পড়িতেছিলেন। নূতন বিদ্যাশিক্ষার উৎসাহবশত চিকিৎসা করিবার সুযোগ পাইলে তিনি খুশি হইয়া উঠিতেন। তিনি নিজেই আমার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন।

দাদা সে বছর বি. এল. দিবেন বলিয়া কালেজে পড়িতেছিলেন। তিনি একদিন আসিয়া আমার স্বামীকে কহিলেন, "করিতেছ কী। কুমুর চোখ দুটো যে নষ্ট করিতে বসিয়াছ। একজন ভালো ডাক্তার দেখাও।"

আমার স্বামী কহিলেন, "ভালো ডাক্তার আসিয়া আর নূতন চিকিৎসা কী করিবে। ওষুধপত্র তো সব জানাই আছে।"

দাদা কিছু রাগিয়া কহিলেন, "তবে তো তোমার সঙ্গে তোমাদের কলেজের বড়োসাহেবের কোনো প্রভেদ নাই।"

স্বামী বলিলেন, "আইন পড়িতেছ, ডাক্তারির তুমি কী বোঝ। তুমি যখন বিবাহ করিবে তখন তোমার স্ত্রীর সম্পত্তি লইয়া যদি কখনো মকদ্দমা বাধে তুমি কি আমার পরামর্শমত চলিবে।"

আমি মনে মনে ভাবিতেছিলাম, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইলে উলুখড়েরই বিপদ সবচেয়ে বেশি। স্বামীর সঙ্গে বিবাদ বাধিল দাদার, কিন্তু দুইপক্ষ হইতে বাজিতেছে আমাকেই। আবার ভাবিলাম, দাদারা যখন আমাকে দানই করিয়াছেন তখন আমার সম্বন্ধে কর্তব্য লইয়া এ-সমস্ত ভাগাভাগি কেন। আমার সুখদুঃখ, আমার রোগ ও আরোগ্য, সে তো সমস্তই আমার স্বামীর।

সে দিন আমার এই এক সামান্য চোখের চিকিৎসা লইয়া দাদার সঙ্গে আমার স্বামীর যেন একটু মনান্তর হইয়া গেল। সহজেই আমার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল, আমার জলের ধারা আরো বাড়িয়া উঠিল; তাহার প্রকৃত কারণ আমার স্বামী কিম্বা দাদা কেহই তখন বুঝিলেন না।

আমার স্বামী কালেজে গেলে বিকালবেলায় হঠাৎ দাদা এক ডাক্তার লইয়া আসিয়া উপস্থিত। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া কহিল, সাবধানে না থাকিলে পীড়া গুরুতর হইবার সম্ভাবনা আছে। এই বলিয়া কী-সমস্ত ওষুধ লিখিয়া দিল, দাদা তখনই তাহা আনাইতে পাঠাইলেন।

ডাক্তার চলিয়া গেলে আমি দাদাকে বলিলাম, "দাদা, আপনার পায়ে পড়ি, আমার যে চিকিৎসা চলিতেছে তাহাতে কোনোরূপ ব্যাঘাত ঘটাইবেন না।"

আমি শিশুকাল হইতে দাদাকে খুব ভয় করিতাম; তাঁহাকে যে মুখ ফুটিয়া এমন করিয়া কিছু বলিতে পারিব, ইহা আমার পক্ষে এক আশ্চর্য ঘটনা। কিন্তু, আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম, আমার স্বামীকে লুকাইয়া দাদা আমার যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেছেন তাহাতে আমার অশুভ বৈ শুভ নাই।

দাদাও আমার প্রগল্‌ভতায় বোধ করি কিছু আশ্চর্য হইলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিয়া অবশেষে বলিলেন, "আচ্ছা, আমি আর ডাক্তার আনিব না, কিন্তু যে ওষুধটা আসিবে তাহা বিধিমতে সেবন করিয়া দেখিস্‌।" ওষুধ আসিলে পর আমাকে তাহা ব্যবহারের নিয়ম বুঝাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। স্বামী কলেজ হইতে আসিবার

পূর্বেই আমি সে কৌটা এবং শিশি এবং তুলি এবং বিধিবিধান সমস্তই সযত্নে আমাদের প্রাঙ্গণের পাতকুয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিলাম।

দাদার সঙ্গে কিছু আড়ি করিয়াই আমার স্বামী যেন আরো দ্বিগুণ চেষ্টায় আমার চোখের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন। এবেলা ওবেলা ওষুধ বদল হইতে লাগিল। চোখে ঠুলি পরিলাম, চশমা পরিলাম, চোখে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ওষুধ ঢালিলাম, গুঁড়া লাগাইলাম, দুর্গন্ধ মাছের তেল খাইয়া ভিতরকার পাকযন্ত্রসুদ্ধ যখন বাহির হইবার উদ্যম করিত তাহাও দমন করিয়া রহিলাম।

স্বামী জিজ্ঞাসা করিতেন, কেমন বোধ হইতেছে। আমি বলিতাম, অনেকটা ভালো। আমি মনে করিতেও চেষ্টা করিতাম যে, ভালোই হইতেছে। যখন বেশি জল পড়িতে থাকিত তখন ভাবিতাম জল কাটিয়া যাওয়াই ভালো লক্ষণ; যখন জল পড়া বন্ধ হইত তখন ভাবিতাম, এই তো আরোগ্য হইবার পথে দাঁড়াইয়াছি।

কিন্তু কিছুকাল পরে যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। চোখে ঝাপসা দেখিতে লাগিলাম এবং মাথার বেদনায় আমাকে স্থির থাকিতে দিল না। দেখিলাম, আমার স্বামীও যেন কিছু অপ্রতিভ হইয়াছেন। এতদিন পরে কী ছুতা করিয়া যে ডাক্তার ডাকিবেন, ভাবিয়া পাইতেছেন না।

আমি তাঁহাকে বলিলাম, "দাদার মন রক্ষার জন্য একবার একজন ডাক্তার ডাকিতে দোষ কী। এই লইয়া তিনি অনর্থক রাগ করিতেছেন, ইহাতে আমার মনে কষ্ট হয়। চিকিৎসা তো তুমিই করিবে, ডাক্তার একজন উপসর্গ থাকা ভালো।"

স্বামী কহিলেন, "ঠিক বলিয়াছ।" এই বলিয়া সেইদিনই এক ইংরাজ ডাক্তার লইয়া হাজির করিলেন। কী কথা হইল জানি না কিন্তু মনে হইল, যেন সাহেব আমার স্বামীকে কিছু ভর্ৎসনা করিলেন; তিনি নতশিরে নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ডাক্তার চলিয়া গেলে আমি আমার স্বামীর হাত ধরিয়া বলিলাম, "কোথা হইতে একটা গোঁয়ার গোরা-গর্দভ ধরিয়া আনিয়াছ, একজন দেশী ডাক্তার আনিলেই হইত। আমার চোখের রোগ ও কি তোমার চেয়ে ভালো বুঝিবে।"

স্বামী কিছু কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "চোখে অস্ত্র করা আবশ্যক হইয়াছে।"

আমি একটু রাগের ভান করিয়া কহিলাম, "অস্ত্র করিতে হইবে, সে তো তুমি জানিতে কিন্তু প্রথম হইতেই সে কথা আমার কাছে গোপন করিয়া গেছ। তুমি কি মনে কর, আমি ভয় করি।"

স্বামীর লজ্জা দূর হইল ; তিনি বলিলেন, "চোখে অস্ত্র করিতে হইবে শুনিলে ভয় না করে, পুরুষের মধ্যে এমন বীর কয়জন আছে।"

আমি ঠাট্টা করিয়া বলিলাম, "পুরুষের বীরত্ব কেবল স্ত্রীর কাছে।"

স্বামী তৎক্ষণাৎ ম্লান গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "সে কথা ঠিক। পুরুষের কেবল অহংকার সার।"

আমি তাঁহার গাম্ভীর্য উড়াইয়া দিয়া কহিলাম, "অহংকারেও বুঝি তোমরা মেয়েদের সঙ্গে পার ? তাহাতেও আমাদের জিত।"

ইতিমধ্যে দাদা আসিলে আমি দাদাকে বিরলে ডাকিয়া বলিলাম, "দাদা, আপনার সেই ডাক্তারের ব্যবস্থামত চলিয়া এতদিন আমার চোখ বেশ ভালোই হইতেছিল, একদিন ভ্রমক্রমে খাইবার ওষুধটা চক্ষে লেপন করিয়া তাহার পর হইতে চোখ যায়-যায় হইয়া উঠিয়াছে। আমার স্বামী বলিতেছেন, চোখে অস্ত্র করিতে হইবে।"

দাদা বলিলেন, "আমি ভাবিতেছিলাম, তোর স্বামীর চিকিৎসাই চলিতেছে, তাই আরো আমি রাগ করিয়া এতদিন আসি নাই।"

আমি বলিলাম, "না, আমি গোপনে সেই ডাক্তারের ব্যবস্থামতই চলিতে-ছিলাম, স্বামীকে জানাই নাই, পাছে তিনি রাগ করেন।"

স্ত্রীজন্ম গ্রহণ করিলে এত মিথ্যাও বলিতে হয়! দাদার মনেও কষ্ট দিতে পারি না, স্বামীর যশও ক্ষুণ্ন করা চলে না। মা হইয়া কোলের শিশুকে ভুলাইতে হয়, স্ত্রী হইয়া শিশুর বাপকে ভুলাইতে হয়— মেয়েদের এত ছলনার প্রয়োজন।

ছলনার ফল হইল এই যে, অন্ধ হইবার পূর্বে আমার দাদা এবং স্বামীর মিলন দেখিতে পাইলাম। দাদা ভাবিলেন, গোপনচিকিৎসা করিতে গিয়া এই দুর্ঘটনা ঘটিল ; স্বামী ভাবিলেন, গোড়ায় আমার দাদার পরামর্শ শুনিলেই ভালো হইত। এই ভাবিয়া দুই অনুতপ্ত হৃদয় ভিতরে ভিতরে ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া পরস্পরের অত্যন্ত নিকটবর্তী হইল। স্বামী দাদার পরামর্শ লইতে লাগিলেন, দাদাও বিনীতভাবে সকল বিষয়ে আমার স্বামীর মতের প্রতিই নির্ভর প্রকাশ করিলেন।

অবশেষে উভয়ের পরামর্শক্রমে একদিন একজন ইংরাজ ডাক্তার আসিয়া আমার বাম চোখে অস্ত্রাঘাত করিল। দুর্বল চক্ষু সে আঘাত কাটাইয়া উঠিতে পারিল না, তাহার ক্ষীণ দীপ্তিটুকু হঠাৎ নিবিয়া গেল। তাহার পরে বাকি চোখটাও দিনে দিনে অল্পে অল্পে অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল। বাল্যকালে শুভদৃষ্টির দিনে যে চন্দনচর্চিত তরুণমূর্তি আমার সম্মুখে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার উপরে চিরকালের মতো পর্দা পড়িয়া গেল।

একদিন স্বামী আমার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া কহিলেন, "তোমার কাছে আর মিথ্যা বড়াই করিব না, তোমার চোখ-দুটি আমিই নষ্ট করিয়াছি।"

দেখিলাম, তাঁহার কণ্ঠস্বরে অশ্রুজল ভরিয়া আসিয়াছে। আমি দুই হাতে তাঁহার দক্ষিণহস্ত চাপিয়া কহিলাম, "বেশ করিয়াছ, তোমার জিনিস তুমি লইয়াছ। ভাবিয়া দেখো দেখি, যদি কোনো ডাক্তারের চিকিৎসায় আমার চোখ নষ্ট হইত তাহাতে আমার কী সান্ত্বনা থাকিত। ভবিতব্যতা যখন খণ্ডে না তখন চোখ তো আমার কেহই বাঁচাইতে পারিত না, সে চোখ তোমার হাতে গিয়াছে এই আমার অন্ধতার একমাত্র সুখ। যখন পূজার ফুল কম পড়িয়াছিল তখন রামচন্দ্র তাঁহার দুই চক্ষু উৎপাটন করিয়া দেবতাকে দিতে গিয়াছিলেন। আমার দেবতাকে আমার দৃষ্টি দিলাম— আমার পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, আমার প্রভাতের আলো, আমার আকাশের নীল, আমার পৃথিবীর সবুজ সব তোমাকে দিলাম; তোমার চোখে যখন যাহা ভালো লাগিবে আমাকে মুখে বলিয়ো, সে আমি তোমার চোখের দেখার প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিব।"

আমি এত কথা বলিতে পারি নাই, মুখে এমন করিয়া বলাও যায় না; এ-সব কথা আমি অনেক দিন ধরিয়া ভাবিয়াছি। মাঝে মাঝে যখন অবসাদ আসিত, নিষ্ঠার তেজ ম্লান হইয়া পড়িত, নিজেকে বঞ্চিত দুঃখিত দুর্ভাগ্যদগ্ধ বলিয়া মনে হইত, তখন আমি নিজের মনকে দিয়া এই-সব কথা বলাইয়া লইতাম; এই শান্তি, এই ভক্তিকে অবলম্বন করিয়া নিজের দুঃখের চেয়েও নিজেকে উচ্চ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতাম। সে দিন কতকটা কথায় কতকটা নীরবে বোধ করি আমার মনের ভাবটা তাঁহাকে একরকম করিয়া বুঝাইতে পারিতেছিলাম। তিনি কহিলেন, "কুমু, মূঢ়তা করিয়া তোমার যা নষ্ট করিয়াছি সে আর ফিরাইয়া দিতে পারিব না, কিন্তু আমার যতদূর সাধ্য তোমার চোখের অভাব মোচন করিয়া তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব।"

আমি কহিলাম, "সে কোনো কাজের কথা নয়। তুমি যে তোমার ঘরকন্নাকে একটি অন্ধের হাসপাতাল করিয়া রাখিবে, সে আমি কিছুতেই দিব না। তোমাকে আর-একটি বিবাহ করিতেই হইবে।"

কিজন্য যে বিবাহ করা নিতান্ত আবশ্যক তাহা সবিস্তারে বলিবার পূর্বে আমার একটুখানি কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইল। একটু কাশিয়া, একটু সামলাইয়া লইয়া বলিতে যাইতেছি, এমন সময় আমার স্বামী উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া উঠিলেন, "আমি মূঢ়, আমি অহংকারী, কিন্তু তাই বলিয়া আমি পাষণ্ড নই। নিজের হাতে তোমাকে অন্ধ করিয়াছি, অবশেষে সেই দোষে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যদি অন্য

স্ত্রী গ্রহণ করি তবে আমাদের ইষ্টদেব গোপীনাথের শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি যেন ব্রহ্মহত্যা-পিতৃহত্যার পাতকী হই।"

এতবড়ো শপথটা করিতে দিতাম না, বাধা দিতাম, কিন্তু অশ্রু তখন বুক বাহিয়া, কণ্ঠ চাপিয়া, দুইচক্ষু ছাপিয়া, ঝরিয়া পড়িবার জো করিতেছিল; তাহাকে সম্বরণ করিয়া কথা বলিতে পারিতেছিলাম না। তিনি যাহা বলিলেন তাহা শুনিয়া বিপুল আনন্দের উদ্‌বেগে বালিশের মধ্যে মুখ চাপিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। আমি অন্ধ, তবু তিনি আমাকে ছাড়িবেন না। দুঃখীর দুঃখের মতো আমাকে হৃদয়ে করিয়া রাখিবেন। এত সৌভাগ্য আমি চাই না, কিন্তু মন তো স্বার্থপর।

অবশেষে অশ্রুর প্রথম পশলাটা সবেগে বর্ষণ হইয়া গেলে তাঁহার মুখ আমার বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলাম, "এমন ভয়ংকর শপথ কেন করিলে। আমি কি তোমাকে নিজের সুখের জন্য বিবাহ করিতে বলিয়াছিলাম। সতিনকে দিয়া আমি আমার স্বার্থ সাধন করিতাম। চোখের অভাবে তোমার যে কাজ নিজে করিতে পারিতাম না সে আমি তাহাকে দিয়া করাইতাম!"

স্বামী কহিলেন, "কাজ তো দাসীতেও করে। আমি কি কাজের সুবিধার জন্য একটা দাসী বিবাহ করিয়া আমার এই দেবীর সঙ্গে একাসনে বসাইতে পারি।" বলিয়া আমার মুখ তুলিয়া ধরিয়া আমার ললাটে একটি নির্মল চুম্বন করিলেন; সেই চুম্বনের দ্বারা আমার যেন তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত হইল, সেইক্ষণে আমার দেবীত্বে অভিষেক হইয়া গেল। আমি মনে মনে কহিলাম, সেই ভালো। যখন অন্ধ হইয়াছি তখন আমি এই বহিঃসংসারের আর গৃহিণী হইতে পারি না, এখন আমি সংসারের উপরে উঠিয়া দেবী হইয়া স্বামীর মঙ্গল করিব। আর মিথ্যা নয়, ছলনা নয়, গৃহিণী রমণীর যতকিছু ক্ষুদ্রতা এবং কপটতা আছে সমস্ত দূর করিয়া দিলাম।

সে দিন সমস্ত দিন নিজের সঙ্গে একটা বিরোধ চলিতে লাগিল। গুরুতর শপথে বাধ্য হইয়া স্বামী যে কোনোমতেই দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারিবেন না, এই আনন্দ মনের মধ্যে যেন একেবারে দংশন করিয়া রহিল; কিছুতেই তাহাকে ছাড়াইতে পারিলাম না। অদ্য আমার মধ্যে যে নূতন দেবীর আবির্ভাব হইয়াছে তিনি কহিলেন, 'হয়তো এমন দিন আসিতে পারে যখন এই শপথ-পালন অপেক্ষা বিবাহ করিলে তোমার স্বামীর মঙ্গল হইবে।' কিন্তু আমার মধ্যে যে পুরাতন নারী ছিল সে কহিল, 'তা হউক, কিন্তু তিনি যখন শপথ করিয়াছেন তখন তো আর বিবাহ করিতে পারিবেন না।' দেবী কহিলেন, 'তা হউক, কিন্তু ইহাতে তোমার খুশি হইবার কোনো কারণ নাই।' মানবী কহিল, 'সকলই বুঝি, কিন্তু যখন তিনি শপথ করিয়াছেন

তখন' ইত্যাদি। বার বার সেই এক কথা। দেবী তখন কেবল নিরুত্তরে ভ্রূকুটি করিলেন এবং একটা ভয়ংকর আশঙ্কার অন্ধকারে আমার সমস্ত অন্তঃকরণ আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

আমার অনুতপ্ত স্বামী চাকরদাসীকে নিষেধ করিয়া নিজে আমার সকল কাজ করিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। স্বামীর উপর তুচ্ছ বিষয়েও এইরূপ নিরুপায় নির্ভর প্রথমটা ভালোই লাগিত। কারণ, এমনি করিয়া সর্বদাই তাঁহাকে কাছে পাইতাম। চোখে তাঁহাকে দেখিতাম না বলিয়া তাঁহাকে সর্বদা কাছে পাইবার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। স্বামীসুখের যে অংশ আমার চোখের ভাগে পড়িয়াছিল সেইটে এখন অন্য ইন্দ্রিয়েরা বাঁটিয়া লইয়া নিজেদের ভাগ বাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল। এখন আমার স্বামী অধিকক্ষণ বাহিরের কাজে থাকিলে মনে হইত, আমি যেন শূন্যে রহিয়াছি, আমি যেন কোথাও কিছু ধরিতে পারিতেছি না, আমার যেন সব হারাইল। পূর্বে স্বামী যখন কালেজে যাইতেন তখন বিলম্ব হইলে পথের দিকের জানালা একটুখানি ফাঁক করিয়া পথ চাহিয়া থাকিতাম। যে জগতে তিনি বেড়াইতেন সে জগৎটাকে আমি চোখের দ্বারা নিজের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম। আজ আমার দৃষ্টিহীন সমস্ত শরীর তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে চেষ্টা করে। তাঁহার পৃথিবীর সহিত আমার পৃথিবীর যে প্রধান সাঁকো ছিল সেটা আজ ভাঙিয়া গেছে। এখন তাঁহার এবং আমার মাঝখানে একটা দুস্তর অন্ধতা; এখন আমাকে কেবল নিরুপায় ব্যগ্রভাবে বসিয়া থাকিতে হয়, কখন তিনি তাঁহার পার হইতে আমার পারে আপনি আসিয়া উপস্থিত হইবেন। সেইজন্য এখন, যখন ক্ষণকালের জন্যও তিনি আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যান তখন আমার সমস্ত অন্ধ দেহ উদ্যত হইয়া তাঁহাকে ধরিতে যায়, হাহাকার করিয়া তাঁহাকে ডাকে।

কিন্তু এত আকাঙ্ক্ষা, এত নির্ভর তো ভালো নয়। একে তো স্বামীর উপরে স্ত্রীর ভারই যথেষ্ট, তাহার উপরে আবার অন্ধতার প্রকাণ্ড ভার চাপাইতে পারি না। আমার এই বিশ্বজোড়া অন্ধকার, এ আমিই বহন করিব। আমি একাগ্রমনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমার এই অনন্ত অন্ধতা দ্বারা স্বামীকে আমি আমার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিব না।

অল্পকালের মধ্যেই কেবল শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের দ্বারা আমি আমার সমস্ত অভ্যস্ত কর্ম সম্পন্ন করিতে শিখিলাম। এমন-কি আমার অনেক গৃহকর্ম পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি নৈপুণ্যের সহিত নির্বাহ করিতে পারিলাম। এখন মনে হইতে লাগিল, দৃষ্টি আমাদের কাজের যতটা সাহায্য করে তাহার চেয়ে ঢের বেশি বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়।

যতটুকু দেখিলে কাজ ভালো হয় চোখ তাহার চেয়ে ঢের বেশি দেখে। এবং চোখ যখন পাহারার কাজ করে কান তখন অলস হইয়া যায়, যতটা তাহার শোনা উচিত তাহার চেয়ে সে কম শোনে। এখন চঞ্চল চোখের অবর্তমানে আমার অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয় তাহাদের কর্তব্য শান্ত এবং সম্পূর্ণভাবে করিতে লাগিল।

এখন আমার স্বামীকে আর আমার কোনো কাজ করিতে দিলাম না, এবং তাঁহার সমস্ত কাজ আবার পূর্বের মতো আমিই করিতে লাগিলাম।

স্বামী আমাকে কহিলেন, "আমার প্রায়শ্চিত্ত হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতেছ।"

আমি কহিলাম, "তোমার প্রায়শ্চিত্ত কিসের আমি জানি না, কিন্তু আমার পাপের ভার আমি বাড়াইব কেন।"

যাহাই বলুন, আমি যখন তাঁহাকে মুক্তি দিলাম তখন তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন; অন্ধ স্ত্রীর সেবাকে চিরজীবনের ব্রত করা পুরুষের কর্ম নহে।

আমার স্বামী ডাক্তারি পাস করিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া মফস্বলে গেলেন।

পাড়াগাঁয়ে আসিয়া যেন মাতৃক্রোড়ে আসিলাম মনে হইল। আমার আট বৎসর বয়সের সময় আমি গ্রাম ছাড়িয়া শহরে আসিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে দশ বৎসরে জন্মভূমি আমার মনের মধ্যে ছায়ার মতো অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছিল। যতদিন চক্ষু ছিল কলিকাতা শহর আমার চারি দিকে আর-সমস্ত স্মৃতিকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চোখ যাইতেই বুঝিলাম, কলিকাতা কেবল চোখ ভুলাইয়া রাখিবার শহর, ইহাতে মন ভরিয়া রাখে না। দৃষ্টি হারাইবামাত্র আমার সেই বাল্যকালের পল্লীগ্রাম দিবাবসানে নক্ষত্রলোকের মতো আমার মনের মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অগ্রহায়ণের শেষাশেষি আমরা হাসিমপুরে গেলাম। নূতন দেশ, চারি দিক দেখিতে কিরকম তাহা বুঝিলাম না, কিন্তু বাল্যকালের সেই গন্ধে এবং অনুভাবে আমাকে সর্বাঙ্গে বেষ্টন করিয়া ধরিল। সেই শিশিরে-ভেজা নূতন চষা খেত হইতে প্রভাতের হাওয়া, সেই সোনা-ঢালা অড়র এবং সরিষা-খেতের আকাশ-ভরা কোমল সুমিষ্ট গন্ধ, সেই রাখালের গান, এমন-কি ভাঙা রাস্তা দিয়া গোরুর গাড়ি চলার শব্দ পর্যন্ত আমাকে পুলকিত করিয়া তুলিল। আমার সেই জীবনারম্ভের অতীত স্মৃতি তাহার অনির্বচনীয় ধ্বনি ও গন্ধ লইয়া প্রত্যক্ষ বর্তমানের মতো আমাকে ঘিরিয়া বসিল; অন্ধ চক্ষু তাহার কোনো প্রতিবাদ করিতে পারিল না। সেই বাল্যকালের মধ্যে ফিরিয়া গেলাম, কেবল মাকে পাইলাম না। মনে মনে দেখিতে পাইলাম, দিদিমা তাঁহার বিরল কেশগুচ্ছ মুক্ত করিয়া রৌদ্রে পিঠ দিয়া প্রাঙ্গণে বড়ি দিতেছেন, কিন্তু তাঁহার সেই মৃদুকম্পিত প্রাচীন দুর্বল কণ্ঠে আমাদের গ্রাম্য সাধু ভজনদাসের

দেহতত্ত্ব-গান গুঞ্জনস্বরে শুনিতে পাইলাম না ; সেই নবান্নের উৎসব শীতের শিশির-স্নাত আকাশের মধ্যে সজীব হইয়া জাগিয়া উঠিল, কিন্তু ঢেঁকিশালে নূতন ধান কুটিবার জনতার মধ্যে আমার ছোটো ছোটো পল্লিসঙ্গিনীদের সমাগম কোথায় গেল! সন্ধ্যাবেলা অদূরে কোথা হইতে হাম্বাধ্বনি শুনিতে পাই, তখন মনে পড়ে, মা সন্ধ্যা-দীপ হাতে করিয়া গোয়ালে আলো দেখাইতে যাইতেছেন ; সেইসঙ্গে ভিজা জাবনার ও খড়-জ্বালানো ধোঁয়ার গন্ধ যেন হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে এবং শুনিতে পাই, পুকুরের পাড়ে বিদ্যালংকারদের ঠাকুরবাড়ি হইতে কাঁসরঘণ্টার শব্দ আসিতেছে। কে যেন আমার সেই শিশুকালের আটটি বৎসরের মধ্য হইতে তাহার সমস্ত বস্তু-অংশ ছাঁকিয়া লইয়া কেবল তাহার রসটুকু গন্ধটুকু আমার চারি দিকে রাশীকৃত করিয়াছে।

এইসঙ্গে আমার সেই ছেলেবেলাকার ব্রত এবং ভোরবেলায় ফুল তুলিয়া শিব-পূজার কথা মনে পড়িল। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, কলিকাতার আলাপ-আলোচনা আনাগোনার গোলমালে বুদ্ধির একটু বিকার ঘটেই। ধর্মকর্ম-ভক্তিশ্রদ্ধার মধ্যে নির্মল সরলতাটুকু থাকে না। সে দিনের কথা আমার মনের পড়ে যে দিন অন্ধ হওয়ার পরে কলিকাতায় আমার পল্লিবাসিনী এক সখী আসিয়া আমাকে বলিয়াছিল, "তোর রাগ হয় না, কুমু? আমি হইলে এমন স্বামীর মুখ দেখিতাম না।" আমি বলিলাম, "ভাই, মুখ দেখা তো বন্ধই বটে, সেজন্যে এ পোড়া চোখের উপর রাগ হয়, কিন্তু স্বামীর উপর রাগ করিতে যাইব কেন।" যথাসময়ে ডাক্তার ডাকেন নাই বলিয়া লাবণ্য আমার স্বামীর উপর অত্যন্ত রাগিয়াছিল এবং আমাকেও রাগাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। আমি তাহাকে বুঝাইলাম, সংসারে থাকিলে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় জ্ঞানে অজ্ঞানে ভুলে ভ্রান্তিতে দুঃখ সুখ নানারকম ঘটিয়া থাকে ; কিন্তু মনের মধ্যে যদি ভক্তি স্থির রাখিতে পারি তবে দুঃখের মধ্যেও একটা শান্তি থাকে, নহিলে কেবল রাগারাগি রেষারেষি বকাবকি করিয়াই জীবন কাটিয়া যায়। অন্ধ হইয়াছি এই তো যথেষ্ট দুঃখ, তাহার পরে স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ করিয়া দুঃখের বোঝা বাড়াইব কেন। আমার মতো বালিকার মুখে সেকেলে কথা শুনিয়া লাবণ্য রাগ করিয়া অবজ্ঞাভরে মাথা নাড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু যা-ই বলি, কথার মধ্যে বিষ আছে, কথা একেবারে ব্যর্থ হয় না। লাবণ্যের মুখ হইতে রাগের কথা আমার মনের মধ্যে দুটো-একটা স্ফুলিঙ্গ ফেলিয়া গিয়াছিল, আমি সেটা পা দিয়া মাড়াইয়া নিবাইয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু তবু দুটো-একটা দাগ থাকিয়াছিল ; তাই বলিতেছিলাম, কলিকাতায় অনেক তর্ক, অনেক কথা ; সেখানে দেখিতে দেখিতে বুদ্ধি অকালে পাকিয়া কঠিন হইয়া উঠে।

পাড়াগাঁয়ে আসিয়া আমার সেই শিবপূজার শীতল শিউলিফুলের গন্ধে হৃদয়ের সমস্ত আশা ও বিশ্বাস আমার সেই শিশুকালের মতোই নবীন ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দেবতায় আমার হৃদয় এবং আমার সংসার পরিপূর্ণ হইয়া গেল। আমি নতশিরে লুটাইয়া পড়িলাম। বলিলাম, "হে দেব, আমার চক্ষু গেছে বেশ হইয়াছে, তুমি তো আমার আছ।"

হায় ভুল বলিয়াছিলাম। তুমি আমার আছ, এ কথাও স্পর্ধার কথা। আমি তোমার আছি, কেবল এইটুকু বলিবারই অধিকার আছে। ওগো, একদিন কণ্ঠ চাপিয়া আমার দেবতা এই কথাটা আমাকে বলাইয়া লইবে। কিছুই না থাকিতে পারে, কিন্তু আমাকে থাকিতেই হইবে। কাহারো উপরে কোনো জোর নাই; কেবল নিজের উপরেই আছে।

কিছুকাল বেশ সুখে কাটিল। ডাক্তারিতে আমার স্বামীরও প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। হাতে কিছু টাকাও জমিল।

কিন্তু টাকা জিনিসটা ভালো নয়। উহাতে মন চাপা পড়িয়া যায়। মন যখন রাজত্ব করে তখন সে আপনার সুখ আপনি সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু ধন যখন সুখ-সঞ্চয়ের ভার নেয় তখন মনের আর কাজ থাকে না। তখন, আগে যেখানে মনের সুখ ছিল জিনিসপত্র আসবাব আয়োজন সেই জায়গাটুকু জুড়িয়া বসে। তখন সুখের পরিবর্তে কেবল সামগ্রী পাওয়া যায়।

কোনো বিশেষ কথা বা বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিতে পারি না কিন্তু অন্ধের অনুভবশক্তি বেশি বলিয়া, কিম্বা কী কারণ জানি না, অবস্থার সচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বামীর পরিবর্তন আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম। যৌবনারম্ভে ন্যায়-অন্যায় ধর্ম-অধর্ম সম্বন্ধে আমার স্বামীর যে একটি বেদনাবোধ ছিল সেটা যেন প্রতিদিন অসাড় হইয়া আসিতেছিল। মনে আছে, তিনি একদিন বলিতেন, "ডাক্তারি যে কেবল জীবিকার জন্য শিখিতেছি তাহা নহে, ইহাতে অনেক গরিবের উপকার করিতে পারিব।" যে-সব ডাক্তার দরিদ্র মুমূর্ষুর দ্বারে আসিয়া আগাম ভিজিট না লইয়া নাড়ি দেখিতে চায় না তাহাদের কথা বলিতে গিয়া ঘৃণায় তাঁহার বাক্‌রোধ হইত। আমি বুঝিতে পারি, এখন আর সে দিন নাই। একমাত্র ছেলের প্রাণরক্ষার জন্য দরিদ্র নারী তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়াছে, তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়াছেন; শেষে আমি মাথার দিব্য দিয়া তাঁহাকে চিকিৎসায় পাঠাইয়াছি, কিন্তু মনের সঙ্গে কাজ করেন নাই। যখন আমাদের টাকা অল্প ছিল তখন অন্যায় উপার্জনকে আমার স্বামী কী চক্ষে দেখিতেন, তাহা আমি জানি। কিন্তু ব্যাঙ্কে এখন অনেক টাকা

জমিয়াছে, এখন একজন ধনী লোকের আমলা আসিয়া তাঁহার সঙ্গে গোপনে দুই দিন ধরিয়া অনেক কথা বলিয়া গেল, কী বলিল আমি কিছুই জানি না, কিন্তু তাহার পরে যখন তিনি আমার কাছে আসিলেন, অত্যন্ত প্রফুল্লতার সঙ্গে অন্য নানা বিষয়ে নানা কথা বলিলেন, তখন আমার অন্তঃকরণের স্পর্শশক্তিদ্বারা বুঝিলাম, তিনি আজ কলঙ্ক মাখিয়া আসিয়াছেন।

অন্ধ হইবার পূর্বে আমি যাঁহাকে শেষবার দেখিয়াছিলাম আমার সে স্বামী কোথায়। যিনি আমার দৃষ্টিহীন দুই চক্ষুর মাঝখানে একটি চুম্বন করিয়া আমাকে এক-দিন দেবীপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার কী করিতে পারিলাম। একদিন একটা রিপুর ঝড় আসিয়া যাহাদের অকস্মাৎ পতন হয় তাহারা আর-একটা হৃদয়াবেগে আবার উপরে উঠিতে পারে, কিন্তু এই-যে দিনে দিনে পলে পলে মজ্জার ভিতর হইতে কঠিন হইয়া যাওয়া, বাহিরে বাড়িয়া উঠিতে উঠিতে অন্তরকে তিলে তিলে চাঁপিয়া ফেলা, ইহার প্রতিকার ভাবিতে গেলে কোনো রাস্তা খুঁজিয়া পাই না।

স্বামীর সঙ্গে আমার চোখে-দেখার যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে সে কিছুই নয়; কিন্তু প্রাণের ভিতরটা যেন হাঁপাইয়া ওঠে যখন মনে করি, আমি যেখানে তিনি সেখানে নাই; আমি অন্ধ, সংসারে আলোকবর্জিত অন্তরপ্রদেশে আমার সেই প্রথম বয়সের নবীন প্রেম, অক্ষুণ্ণ ভক্তি, অখণ্ড বিশ্বাস লইয়া বসিয়া আছি— আমার দেবমন্দিরে জীবনের আরম্ভে আমি বালিকার করপুটে যে শেফালিকার অর্ঘ্যদান করিয়াছিলাম তাহার শিশির এখনো শুকায় নাই; আর, আমার স্বামী এই ছায়াশীতল চিরনবীনতার দেশ ছাড়িয়া টাকা-উপার্জনের পশ্চাতে সংসারমরুভূমির মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া চলিয়া যাইতেছেন! আমি যাহা বিশ্বাস করি, যাহাকে ধর্ম বলি, যাহাকে সকল সুখ-সম্পত্তির অধিক বলিয়া জানি, তিনি অতিদূর হইতে তাহার প্রতি হাসিয়া কটাক্ষপাত করেন! কিন্তু একদিন এ বিচ্ছেদ ছিল না, প্রথম বয়সে আমরা এক পথেই যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলাম; তাহার পরে কখন যে পথের ভেদ হইতে আরম্ভ হইতেছিল তাহা তিনিও জানিতে পারেন নাই, আমিও জানিতে পারি নাই; অবশেষে আজ আমি আর তাঁহাকে ডাকিয়া সাড়া পাই না।

এক-এক সময়ে ভাবি, হয়তো অন্ধ বলিয়া সামান্য কথাকে আমি বেশি করিয়া দেখি। চক্ষু থাকিলে আমি হয়তো সংসারকে ঠিক সংসারের মতো করিয়া চিনিতে পারিতাম।

আমার স্বামীও আমাকে এক দিন তাহাই বুঝাইয়া বলিলেন। সে দিন সকালে একটি বৃদ্ধ মুসলমান তাহার পৌত্রীর ওলাউঠার চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ডাকিতে

আসিয়াছিল। আমি শুনিতে পাইলাম সে কহিল, "বাবা আমি গরিব, কিন্তু আল্লা তোমার ভালো করিবেন।" আমার স্বামী কহিলেন, "আল্লা যাহা করিবেন কেবল তাহাতেই আমার চলিবে না, তুমি কী করিবে সেটা আগে শুনি।" শুনিবামাত্র ভাবিলাম, ঈশ্বর আমাকে অন্ধ করিয়াছেন, কিন্তু বধির করেন নাই কেন। বৃদ্ধ গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত 'হে আল্লা' বলিয়া বিদায় হইয়া গেল। আমি তখনই ঝিকে দিয়া তাহাকে অন্তঃপুরের খিড়কিদ্বারে ডাকাইয়া আনিলাম; কহিলাম, "বাবা, তোমার নাতনির জন্য এই ডাক্তারের খরচা কিছু দিলাম, তুমি আমার স্বামীর মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া পাড়া হইতে হরিশ ডাক্তারকে ডাকিয়া লইয়া যাও।"

কিন্তু সমস্ত দিন আমার মুখে অন্ন রুচিল না। স্বামী অপরাহ্ণে নিদ্রা হইতে জাগিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে বিমর্ষ দেখিতেছি কেন।" পূর্বকালের অভ্যস্ত উত্তর একটা মুখে আসিতেছিল— 'না, কিছুই হয় নাই'; কিন্তু ছলনার কাল গিয়াছে, আমি স্পষ্ট করিয়া বলিলাম, "কতদিন তোমাকে বলিব মনে করি, কিন্তু বলিতে গিয়া ভাবিয়া পাই না, ঠিক কী বলিবার আছে। আমার অন্তরের কথাটা আমি বুঝাইয়া বলিতে পারিব কি না জানি না, কিন্তু নিশ্চয় তুমি নিজের মনের মধ্যে বুঝিতে পার, আমরা দুজনে যেমনভাবে এক হইয়া জীবন আরম্ভ করিয়াছিলাম আজ তাহা পৃথক হইয়া গেছে।" স্বামী হাসিয়া কহিলেন, "পরিবর্তনই তো সংসারের ধর্ম।" আমি কহিলাম, "টাকাকড়ি রূপযৌবন সকলেরই পরিবর্তন হয়, কিন্তু নিত্য জিনিস কি কিছুই নাই।" তখন তিনি একটু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "দেখো, অন্য স্ত্রীলোকেরা সত্যকার অভাব লইয়া দুঃখ করে— কাহারো স্বামী উপার্জন করে না, কাহারো স্বামী ভালোবাসে না, তুমি আকাশ হইতে দুঃখ টানিয়া আন।" আমি তখনই বুঝিলাম, অন্ধতা আমার চোখে এক অঞ্জন মাখাইয়া আমাকে এই পরিবর্তমান সংসারের বাহিরে লইয়া গেছে, আমি অন্য স্ত্রীলোকের মতো নহি, আমাকে আমার স্বামী বুঝিবেন না।

ইতিমধ্যে আমার এক পিসশাশুড়ি দেশ হইতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের সংবাদ লইতে আসিলেন। আমরা উভয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিতেই তিনি প্রথম কথাতেই বলিলেন, "বলি, বউমা, তুমি তো কপালক্রমে দুইটি চক্ষু খোয়াইয়া বসিয়াছ, এখন আমাদের অবিনাশ অন্ধ স্ত্রীকে লইয়া ঘরকন্না চালাইবে কী করিয়া। উহার আর-একটা বিয়ে-থাওয়া দিয়া দাও।" স্বামী যদি ঠাট্টা করিয়া বলিতেন 'তা বেশ তো পিসিমা, তোমরা দেখিয়া শুনিয়া একটা ঘটকালি করিয়া দাও-না'— তাহা হইলে সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইত। কিন্তু তিনি কুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, "আঃ, পিসিমা, কী

বলিতেছ।" পিসিমা উত্তর করিলেন, "কেন, অন্যায় কী বলিতেছি। আচ্ছা, বউমা, তুমিই বলো তো, বাছা।" আমি হাসিয়া কহিলাম, "পিসিমা, ভালো লোকের কাছে পরামর্শ চাহিতেছ। যাহার গাঁঠ কাটিতে হইবে তাহার কি কেহ সম্মতি নেয়।" পিসিমা উত্তর করিলেন, "হাঁ, সে কথা ঠিক বটে। তা, তোতে আমাতে গোপনে পরামর্শ করিব, কী বলিস, অবিনাশ। তাও বলি, বউমা, কুলীনের মেয়ের সতিন যত বেশি হয়, তাহার স্বামিগৌরব ততই বাড়ে। আমাদের ছেলে ডাক্তারি না করিয়া যদি বিবাহ করিত, তবে উহার রোজগারের ভাবনা কী ছিল। রোগী তো ডাক্তারের হাতে পড়িলেই মরে, মরিলে তো আর ভিজিট দেয় না, কিন্তু বিধাতার শাপে কুলীনের স্ত্রীর মরণ নাই এবং সে যতদিন বাঁচে ততদিনই স্বামীর লাভ।"

দুই দিন বাদে আমার স্বামী আমার সম্মুখে পিসিমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিসিমা, আত্মীয়ের মতো করিয়া বউয়ের সাহায্য করিতে পারে, এমন একটি ভদ্রঘরের স্ত্রীলোক দেখিয়া দিতে পার? উনি চোখে দেখিতে পান না, সর্বদা ওঁর একটি সঙ্গিনী কেহ থাকিলে আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।" যখন নূতন অন্ধ হইয়াছিলাম তখন এ কথা বলিলে খাটিত, কিন্তু এখন চোখের অভাবে আমার কিম্বা ঘরকন্নার বিশেষ কী অসুবিধা হয় জানি না; কিন্তু প্রতিবাদমাত্র না করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। পিসিমা কহিলেন, "অভাব কী। আমারই তো ভাসুরের এক মেয়ে আছে, যেমন সুন্দরী তেমনি লক্ষ্মী। মেয়েটির বয়স হইল, কেবল উপযুক্ত বরের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিয়া আছে; তোমার মতো কুলীন পাইলে এখনই বিবাহ দিয়া দেয়।" স্বামী চকিত হইয়া কহিলেন, "বিবাহের কথা কে বলিতেছে।" পিসিমা কহিলেন, "ওমা, বিবাহ না করিলে ভদ্রঘরের মেয়ে কি তোমার ঘরে অমনি আসিয়া পড়িয়া থাকিবে।" কথাটা সংগত বটে এবং স্বামী তাহার কোনো সদুত্তর দিতে পারিলেন না।

আমার রুদ্ধ চক্ষুর অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে আমি একলা দাঁড়াইয়া ঊর্ধ্বমুখে ডাকিতে লাগিলাম, 'ভগবান আমার স্বামীকে রক্ষা করো।'

তাহার দিনকয়েক পরে একদিন সকালবেলায় আমার পূজা-আহ্নিক সারিয়া বাহিরে আসিতেই পিসিমা কহিলেন, "বউমা, যে ভাসুরঝির কথা বলিয়াছিলাম সেই আমাদের হেমাঙ্গিনী আজ দেশ হইতে আসিয়াছে। হিমু, ইনি তোমার দিদি, ইঁহাকে প্রণাম করো।"

এমন সময় আমার স্বামী হঠাৎ আসিয়া যেন অপরিচিত স্ত্রীলোককে দেখিয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। পিসিমা কহিলেন, "কোথা যাস, অবিনাশ।" স্বামী

জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে।" পিসিমা কহিলেন, "এই মেয়েটিই আমার সেই ভাসুরঝি হেমাঙ্গিনী।" ইহাকে কখন আনা হইল, কে আনিল, কী বৃত্তান্ত, লইয়া আমার স্বামী বারম্বার অনেক অনাবশ্যক বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

আমি মনে মনে কহিলাম, 'যাহা ঘটিতেছে তাহা তো সবই বুঝিতেছি, কিন্তু ইহার উপরে আবার ছলনা আরম্ভ হইল? লুকাচুরি, ঢাকাঢাকি, মিথ্যাকথা! অধর্ম করিতে যদি হয় তো করো, সে নিজের অশান্ত প্রবৃত্তির জন্য, কিন্তু আমার জন্য কেন হীনতা করা। আমাকে ভুলাইবার জন্য কেন মিথ্যাচরণ।'

হেমাঙ্গিনীর হাত ধরিয়া আমি তাহাকে আমার শয়নগৃহে লইয়া গেলাম। তাহার মুখে গায়ে হাত বুলাইয়া তাহাকে দেখিলাম, মুখটি সুন্দর হইবে, বয়সও চোদ্দ-পনেরোর কম হইবে না।

বালিকা হঠাৎ মধুর উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল; কহিল, "ও কী করিতেছ। আমার ভূত ঝাড়াইয়া দিবে নাকি।"

সেই উন্মুক্ত সরল হাস্যধ্বনিতে আমাদের মাঝখানের একটা অন্ধকার মেঘ যেন একমুহূর্তে কাটিয়া গেল। আমি দক্ষিণবাহুতে তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া কহিলাম, "আমি তোমাকে দেখিতেছি, ভাই।" বলিয়া তাহার কোমল মুখখানিতে আর-একবার হাত বুলাইলাম।

"দেখিতেছ?" বলিয়া সে আবার হাসিতে লাগিল। কহিল, "আমি কি তোমার বাগানের সিম না বেগুন যে হাত বুলাইয়া দেখিতেছ কতবড়োটা হইয়াছি?"

তখন আমার হঠাৎ মনে হইল, আমি যে অন্ধ তাহা হেমাঙ্গিনী জানে না। কহিলাম, "বোন, আমি যে অন্ধ।" শুনিয়া সে কিছুক্ষণ আশ্চর্য হইয়া গম্ভীর হইয়া রহিল। বেশ বুঝিতে পারিলাম, তাহার কুতূহলী তরুণ আয়ত নেত্র দিয়া সে আমার দৃষ্টিহীন চক্ষু এবং মুখের ভাব মনোযোগের সহিত দেখিল; তাহার পরে কহিল, "ওঃ, তাই বুঝি কাকিকে এখানে আনাইয়াছ?"

আমি কহিলাম, "না, আমি ডাকি নাই। তোমার কাকি আপনি আসিয়াছেন।"

বালিকা আবার হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "দয়া করিয়া? তাহা হইলে দয়াময়ী শীঘ্র নড়িতেছেন না! কিন্তু, বাবা আমাকে এখানে কেন পাঠাইলেন।"

এমন সময় পিসিমা ঘরে প্রবেশ করিলেন। এতক্ষণ আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁহার কথাবার্তা চলিতেছিল। ঘরে আসিতেই হেমাঙ্গিনী কহিল, "কাকি, আমরা বাড়ি ফিরিব কবে বলো।"

পিসিমা কহিলেন, "ওমা! এইমাত্র আসিয়াই অমনি যাই-যাই। অমন চঞ্চল মেয়েও তো দেখি নাই।"

হেমাঙ্গিনী কহিল, "কাকি, তোমার তো এখান হইতে শীঘ্র নড়িবার গতিক দেখি না। তা, তোমার এ হল আত্মীয়ঘর, তুমি যতদিন খুশি থাকো, আমি কিন্তু চলিয়া যাইব, তা তোমাকে বলিয়া রাখিতেছি।" এই বলিয়া আমার হাত ধরিয়া কহিল, "কী বলো ভাই, তোমরা তো আমার ঠিক আপন নও।" আমি তাহার এই সরল প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়া তাহাকে আমার বুকের কাছে টানিয়া লইলাম। দেখিলাম, পিসিমা যতই প্রবলা হউন এই কন্যাটিকে তাঁহার সামলাইবার সাধ্য নাই। পিসিমা প্রকাশ্যে রাগ না দেখাইয়া হেমাঙ্গিনীকে একটু আদর করিবার চেষ্টা করিলেন; সে তাহা যেন গা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল। পিসিমা সমস্ত ব্যাপারটাকে আদুরে মেয়ের একটা পরিহাসের মতো উড়াইয়া দিয়া হাসিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। আবার কী ভাবিয়া ফিরিয়া আসিয়া হেমাঙ্গিনীকে কহিলেন, "হিমু, চল্ তোর স্নানের বেলা হইল।" সে আমার কাছে আসিয়া কহিল, "আমরা দুইজনে ঘাটে যাইব, কী বলো ভাই।" পিসিমা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্ষান্ত দিলেন; তিনি জানিতেন, টানাটানি করিতে গেলে হেমাঙ্গিনীরই জয় হইবে এবং তাঁহাদের মধ্যেকার বিরোধ অশোভনরূপে আমার সম্মুখে প্রকাশ হইবে।

খিড়কির ঘাটে যাইতে যাইতে হেমাঙ্গিনী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ছেলেপুলে নাই কেন।" আমি ঈষৎ হাসিয়া কহিলাম, "কেন তাহা কী করিয়া জানিব, ঈশ্বর দেন নাই।" হেমাঙ্গিনী কহিল, "অবশ্য, তোমার ভিতরে কিছু পাপ ছিল।" আমি কহিলাম, "তাহাও অন্তর্যামী জানেন।" বালিকা প্রমাণস্বরূপে কহিল, "দেখো-না, কাকির ভিতরে এত কুটিলতা যে উঁহার গর্ভে সন্তান জন্মিতে পায় না।" পাপপুণ্য সুখদুঃখ দণ্ডপুরস্কারের তত্ত্ব নিজেও বুঝি না, বালিকাকেও বুঝাইলাম না; কেবল একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে তাঁহাকে কহিলাম, তুমিই জান! হেমাঙ্গিনী তৎক্ষণাৎ আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "ওমা, আমার কথা শুনিয়াও তোমার নিশ্বাস পড়ে! আমার কথা বুঝি কেহ গ্রাহ্য করে।"

দেখিলাম, স্বামীর ডাক্তারি ব্যবসায়ে ব্যাঘাত হইতে লাগিল। দূরে ডাক পড়িলে তো যানই না, কাছে কোথাও গেলেও চট্‌পট্ সারিয়া চলিয়া আসেন। পূর্বে যখন কর্মের অবসরে ঘরে থাকিতেন, মধ্যাহ্নে আহার এবং নিদ্রার সময়ে কেবল বাড়ির ভিতরে আসিতেন। এখন পিসিমাও যখন-তখন ডাকিয়া পাঠান, তিনিও অনাবশ্যক পিসিমার খবর লইতে আসেন। পিসিমা যখন ডাক ছাড়িয়া বলেন

'হিমু, আমার পানের বাটাটা নিয়ে আয় তো', আমি বুঝিতে পারি, পিসিমার ঘরে আমার স্বামী আসিয়াছেন। প্রথম প্রথম দিন-দুই-তিন হেমাঙ্গিনী পানের বাটা, তেলের বাটি, সিঁদুরের কৌটো প্রভৃতি যথাদিষ্ট লইয়া যাইত। কিন্তু, তাহার পরে ডাক পড়িলে সে আর কিছুতেই নড়িত না, ঝির হাত দিয়া আদিষ্ট দ্রব্য পাঠাইয়া দিত। পিসি ডাকিতেন, 'হেমাঙ্গিনী, হিমু, হিমি'— বালিকা যেন আমার প্রতি একটা করুণার আবেগে আমাকে জড়াইয়া থাকিত; একটা আশঙ্কা এবং বিষাদে তাহাকে আচ্ছন্ন করিত। ইহার পর হইতে আমার স্বামীর কথা সে আমার কাছে ভ্রমেও উল্লেখ করিত না।

ইতিমধ্যে আমার দাদা আমাকে দেখিতে আসিলেন। আমি জানিতাম, দাদার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। ব্যাপারটা কিরূপ চলিতেছে তাহা তাঁহার নিকট গোপন করা প্রায় অসাধ্য হইবে। আমার দাদা বড়ো কঠিন বিচারক। তিনি লেশমাত্র অন্যায়কে ক্ষমা করিতে জানেন না। আমার স্বামী যে তাঁহারই চক্ষের সম্মুখে অপরাধীরূপে দাঁড়াইবেন, ইহাই আমি সবচেয়ে ভয় করিতাম। আমি অতিরিক্ত প্রফুল্লতা দ্বারা সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিলাম। আমি বেশি কথা বলিয়া, বেশি ব্যস্তসমস্ত হইয়া, অত্যন্ত ধুমধাম করিয়া চারি দিকে যেন একটা ধুলা উড়াইয়া রাখিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু, সেটা আমার পক্ষে এমন অস্বাভাবিক যে তাহাতেই আরো বেশি ধরা পড়িবার কারণ হইল। কিন্তু, দাদা বেশি দিন থাকিতে পারিলেন না, আমার স্বামী এমনি অস্থিরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, তাহা প্রকাশ্য রূঢ়তার আকার ধারণ করিল। দাদা চলিয়া গেলেন। বিদায় লইবার পূর্বে পরিপূর্ণ স্নেহের সহিত আমার মাথার উপর অনেকক্ষণ কম্পিত হস্ত রাখিলেন; মনে মনে একাগ্রচিত্তে কী আশীর্বাদ করিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম; তাঁহার অশ্রু আমার অশ্রুসিক্ত কপোলের উপর আসিয়া পড়িল।

মনে আছে, সে দিন চৈত্রমাসের সন্ধ্যাবেলায় হাটের বারে লোকজন বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছে। দূর হইতে বৃষ্টি লইয়া একটা ঝড় আসিতেছে, তাহারই মাটি-ভেজা গন্ধ এবং বাতাসের আর্দ্রভাব আকাশে ব্যাপ্ত হইয়াছে, সঙ্গচ্যুত সাথিগণ অন্ধকার মাঠের মধ্যে পরস্পরকে ব্যাকুল ঊর্ধ্বকণ্ঠে ডাকিতেছে। অন্ধের শয়নগৃহে যতক্ষণ আমি একলা থাকি ততক্ষণ প্রদীপ জ্বালানো হয় না; পাছে শিখা লাগিয়া কাপড় ধরিয়া উঠে বা কোনো দুর্ঘটনা হয়। আমি সেই নির্জন অন্ধকার কক্ষের মধ্যে মাটিতে বসিয়া দুই হাত জুড়িয়া আমার অনন্ত অন্ধজগতের জগদীশ্বরকে ডাকিতেছিলাম, বলিতেছিলাম, "প্রভু, তোমার দয়া যখন অনুভব হয় না, তোমার অভিপ্রায় যখন

বুঝি না, তখন এই অনাথ ভগ্ন হৃদয়ের হালটাকে প্রাণপণে দুই হাতে বক্ষে চাপিয়া ধরি ; বুক দিয়া রক্ত বাহির হইয়া যায় তবু তুফান সামলাইতে পারি না ; আমার আর কত পরীক্ষা করিবে, আমার কতটুকুই বা বল।” এই বলিতে বলিতে অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, খাটের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। সমস্ত দিন ঘরের কাজ করিতে হয়। হেমাঙ্গিনী ছায়ার মতো কাছে কাছে থাকে, বুকের ভিতরে যে অশ্রু ভরিয়া উঠে সে আর ফেলিবার অবসর পাই না। অনেক দিন পরে আজ চোখের জল বাহির হইল। এমন সময় দেখিলাম, খাট একটু নড়িল, মানুষ চলার উস্‌খুস্‌ শব্দ হইল এবং মুহূর্তপরে হেমাঙ্গিনী আসিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া নিঃশব্দে অঞ্চল দিয়া আমার চোখ মুছাইয়া দিতে লাগিল। সে-যে সন্ধ্যার আরম্ভে কী ভাবিয়া কখন আসিয়া খাটেই শুইয়াছিল, আমি জানিতে পারি নাই। সে একটি প্রশ্নও করিল না, আমিও তাহাকে কোনো কথাই বলিলাম না। সে ধীরে ধীরে তাহার শীতল হস্ত আমার ললাটে বুলাইয়া দিতে লাগিল। ইতিমধ্যে কখন মেঘগর্জন এবং মুষলধারে বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝড় হইয়া গেল বুঝিতেই পারিলাম না ; বহুকাল পরে একটি স্নিগ্ধ শান্তি আসিয়া আমার জ্বরদাহদগ্ধ হৃদয়কে জুড়াইয়া দিল।

পরদিন হেমাঙ্গিনী কহিল, “কাকি, তুমি যদি বাড়ি না যাও আমি আমার কৈবর্ত-দাদার সঙ্গে চলিলাম, তাহা বলিয়া রাখিতেছি।” পিসিমা কহিলেন, “তাহাতে কাজ কী, আমিও কাল যাইতেছি ; একসঙ্গেই যাওয়া হইবে। এই দেখ্‌ হিমু, আমার অবিনাশ তোর জন্যে কেমন একটি মুক্তা-দেওয়া আংটি কিনিয়া দিয়াছে।” বলিয়া সগর্বে পিসিমা আংটি হেমাঙ্গিনীর হাতে দিলেন। হেমাঙ্গিনী কহিল, “এই দেখো কাকি, আমি কেমন সুন্দর লক্ষ করিতে পারি।” বলিয়া জানলা হইতে তাক করিয়া আংটি খিড়কি পুকুরের মাঝখানে ফেলিয়া দিল। পিসিমা রাগে দুঃখে বিস্ময়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন। আমাকে বারবার করিয়া হাতে ধরিয়া বলিয়া দিলেন, “বউমা, এই ছেলেমানষির কথা অবিনাশকে খবরদার বলিয়ো না ; ছেলে আমার তাহা হইলে মনে দুঃখ পাইবে। মাথা খাও, বউমা।” আমি কহিলাম, “আর বলিতে হইবে না পিসিমা, আমি কোনো কথাই বলিব না।”

পরদিনে যাত্রার পূর্বে হেমাঙ্গিনী আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, “দিদি, আমাকে মনে রাখিস।” আমি দুই হাত বারবার তাহার মুখে বুলাইয়া কহিলাম, “অন্ধ কিছু ভোলে না, বোন ; আমার তো জগৎ নাই, আমি কেবল মন লইয়াই আছি।” বলিয়া তাহার মাথাটা লইয়া একবার আঘ্রাণ করিয়া চুম্বন করিলাম। ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া তাহার কেশরাশির মধ্যে আমার অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

হেমাঙ্গিনী বিদায় লইলে আমার পৃথিবীটা শুষ্ক হইয়া গেল— সে আমার প্রাণের মধ্যে যে সৌগন্ধ্য সৌন্দর্য সংগীত যে উজ্জ্বল আলো এবং যে কোমল তরুণতা আনিয়াছিল তাহা চলিয়া গেলে একবার আমার সমস্ত সংসার, আমার চারি দিকে, দুই হাত বাড়াইয়া দেখিলাম, কোথায় আমার কী আছে! আমার স্বামী আসিয়া বিশেষ প্রফুল্লতা দেখাইয়া কহিলেন, "ইহারা গেলেন, এখন বাঁচা গেল, একটু কাজকর্ম করিবার অবসর পাওয়া যাইবে।" ধিক্ ধিক্, আমাকে। আমার জন্য কেন এত চাতুরী। আমি কি সত্যকে ডরাই। আমি কি আঘাতকে কখনো ভয় করিয়াছি। আমার স্বামী কি জানেন না? যখন আমি দুই চক্ষু দিয়াছিলাম তখন আমি কি শান্তমনে আমার চিরান্ধকার গ্রহণ করি নাই?

এতদিন আমার এবং আমার স্বামীর মধ্যে কেবল অন্ধতার অন্তরাল ছিল, আজ হইতে আর-একটা ব্যবধান সৃজন হইল। আমার স্বামী ভুলিয়াও কখনো হেমাঙ্গিনীর নাম আমার কাছে উচ্চারণ করিতেন না, যেন তাঁহার সম্পর্কীয় সংসার হইতে হেমাঙ্গিনী একেবারে লুপ্ত হইয়া গেছে, যেন সেখানে সে কোনোকালে লেশমাত্র রেখাপাত করে নাই। অথচ পত্র দ্বারা তিনি যে সর্বদাই তাহার খবর পাইতেছেন, তাহা আমি অনায়াসে অনুভব করিতে পারিতাম; যেমন পুকুরের মধ্যে বন্যার জল যে দিন একটু প্রবেশ করে সেই দিনই পদ্মের ডাঁটায় টান পড়ে, তেমনি তাঁহার ভিতরে একটুও যে দিন স্ফীতির সঞ্চার হয় সে দিন আমার হৃদয়ের মূলের মধ্য হইতে আমি আপনি অনুভব করিতে পারি। কবে তিনি খবর পাইতেন এবং কবে পাইতেন না তাহা আমার কাছে কিছু অগোচর ছিল না। কিন্তু, আমিও তাঁহাকে তাহার কথা শুধাইতে পারিতাম না। আমার অন্ধকার হৃদয়ে সেই যে উন্মত্ত উদ্দাম উজ্জ্বল সুন্দর তারাটি ক্ষণকালের জন্য উদয় হইয়াছিল তাহার একটু খবর পাইবার এবং তাহার কথা আলোচনা করিবার জন্য আমার প্রাণ তৃষিত হইয়া থাকিত, কিন্তু আমার স্বামীর কাছে মুহূর্তের জন্য তাহার নাম করিবার অধিকার ছিল না। আমাদের দুজনার মাঝখানে বাক্যে এবং বেদনায় পরিপূর্ণ এই একটা নীরবতা অটল ভাবে বিরাজ করিত।

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি একদিন ঝি আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মাঠাকরুন, ঘাটে যে অনেক আয়োজনে নৌকা প্রস্তুত হইতেছে, বাবামশায় কোথায় যাইতেছেন?" আমি জানিতাম, একটা কী উদ্যোগ হইতেছে; আমার অদৃষ্টাকাশে প্রথম কিছুদিন ঝড়ের পূর্বকার নিস্তব্ধতা এবং তাহার পরে প্রলয়ের ছিন্নবিচ্ছিন্ন মেঘ আসিয়া জমিতেছিল, সংহারকারী শংকর নীরব অঙ্গুলির ইঙ্গিতে তাঁহার সমস্ত

প্রলয়শক্তিকে আমার মাথার উপরে জড়ো করিতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম। ঝিকে বলিলাম, “কই, আমি তো এখনো কোনো খবর পাই নাই।” ঝি আর-কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে সাহস না করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল।

অনেক রাত্রে আমার স্বামী আসিয়া কহিলেন, “দূরে এক জায়গায় আমার ডাক পড়িয়াছে, কাল ভোরেই আমাকে রওনা হইতে হইবে। বোধ করি ফিরিতে দিন-দুই-তিন বিলম্ব হইতে পারে।”

আমি শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, “কেন আমাকে মিথ্যা বলিতেছ।”

আমার স্বামী কম্পিত অস্ফুট কণ্ঠে কহিলেন, “মিথ্যা কী বলিলাম।”

আমি কহিলাম, “তুমি বিবাহ করিতে যাইতেছ!”

তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। আমিও স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ ধরে কোনো শব্দ রহিল না। শেষে আমি বলিলাম, “একটা উত্তর দাও। বলো, হাঁ, আমি বিবাহ করিতে যাইতেছি।”

তিনি প্রতিধ্বনির ন্যায় উত্তর দিলেন, “হাঁ, আমি বিবাহ করিতে যাইতেছি।”

আমি কহিলাম, “না, তুমি যাইতে পারিবে না। তোমাকে আমি এই মহাবিপদ মহাপাপ হইতে রক্ষা করিব। এ যদি না পারি তবে আমি তোমার কিসের স্ত্রী; কী জন্য আমি শিবপূজা করিয়াছিলাম।”

আবার অনেকক্ষণ গৃহ নিঃশব্দ হইয়া রহিল। আমি মাটিতে পড়িয়া স্বামীর পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিলাম, “আমি তোমার কী অপরাধ করিয়াছি, কিসে আমার *ত্রুটি* হইয়াছে, অন্য স্ত্রীতে তোমার কিসের প্রয়োজন। মাথা খাও, সত্য করিয়া বলো।”

তখন আমার স্বামী ধীরে ধীরে কহিলেন, “সত্যই বলিতেছি, আমি তোমাকে ভয় করি। তোমার অন্ধতা তোমাকে এক অনন্ত আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, সেখানে আমার প্রবেশ করিবার জো নাই। তুমি আমার দেবতা, তুমি আমার দেবতার ন্যায় ভয়ানক, তোমাকে লইয়া প্রতিদিন গৃহকার্য করিতে পারি না। যাহাকে বকিব ঝকিব, রাগ করিব, সোহাগ করিব, গহনা গড়াইয়া দিব, এমন একটি সামান্য রমণী আমি চাই।”

“আমার বুকের ভিতরে চিরিয়া দেখো! আমি সামান্য রমণী, আমি মনের মধ্যে সেই নববিবাহের বালিকা বৈ কিছু নই; আমি বিশ্বাস করিতে চাই, নির্ভর করিতে চাই, পূজা করিতে চাই; তুমি নিজেকে অপমান করিয়া আমাকে দুঃসহ দুঃখ দিয়া

তোমার চেয়ে আমাকে বড়ো করিয়া তুলিয়ো না— আমাকে সর্ববিষয়ে তোমার পায়ের নীচে রাখিয়া দাও।"

আমি কী কী কথা বলিয়াছিলাম সে কি আমার মনে আছে। ক্ষুব্ধ সমুদ্র কি নিজের গর্জন নিজে শুনিতে পায়। কেবল মনে পড়ে বলিয়াছিলাম, "যদি আমি সতী হই তবে ভগবান সাক্ষী রহিলেন, তুমি কোনোমতেই তোমার ধর্মশপথ লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। সে মহাপাপের পূর্বে হয় আমি বিধবা হইব, নয় হেমাঙ্গিনী বাঁচিয়া থাকিবে না।" এই বলিয়া আমি মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলাম।

যখন আমার মূর্ছা ভঙ্গ হইয়া গেল তখনো রাত্রিশেষের পাখি ডাকিতে আরম্ভ করে নাই এবং আমার স্বামী চলিয়া গেছেন।

আমি ঠাকুরঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পূজায় বসিলাম। সমস্ত দিন আমি ঘরের বাহির হইলাম না। সন্ধ্যার সময়ে কালবৈশাখী ঝড়ে দালান কাঁপিতে লাগিল। আমি বলিলাম না যে, 'হে ঠাকুর, আমার স্বামী এখন নদীতে আছেন, তাঁহাকে রক্ষা করো।' আমি কেবল একান্তমনে বলিতে লাগিলাম, 'ঠাকুর, আমার অদৃষ্টে যাহা হইবার তা হউক, কিন্তু আমার স্বামীকে মহাপাতক হইতে নিবৃত্ত করো।' সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। তাহার পরদিনও আসন পরিত্যাগ করি নাই। এই অনিদ্রা-অনাহারে কে আমাকে বল দিয়াছিল জানি না, আমি পাষাণমূর্তির সম্মুখে পাষাণমূর্তির মতোই বসিয়া ছিলাম।

সন্ধ্যার সময় বাহির হইতে দ্বার-ঠেলাঠেলি আরম্ভ হইল। দ্বার ভাঙিয়া যখন ঘরে লোক প্রবেশ করিল তখন আমি মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া আছি।

মূর্ছাভঙ্গে শুনিলাম, "দিদি।" দেখিলাম, হেমাঙ্গিনীর কোলে শুইয়া আছি। মাথা নাড়িতেই তাহার নূতন চেলি খস্‌খস্‌ করিয়া উঠিল। হা ঠাকুর, আমার প্রার্থনা শুনিলে না। আমার স্বামীর পতন হইল।

হেমাঙ্গিনী মাথা নিচু করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "দিদি, তোমার আশীর্বাদ লইতে আসিয়াছি।"

প্রথম একমুহূর্ত কাঠের মতো হইয়া পরক্ষণেই উঠিয়া বসিলাম; কহিলাম, "কেন আশীর্বাদ করিব না, বোন। তোমার কী অপরাধ।"

হেমাঙ্গিনী তাহার সুমিষ্ট উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল; কহিল, "অপরাধ! তুমি বিবাহ করিলে অপরাধ হয় না, আর আমি করিলেই অপরাধ?"

হেমাঙ্গিনীকে জড়াইয়া ধরিয়া আমিও হাসিলাম। মনে মনে কহিলাম, জগতে আমার প্রার্থনাই কি চূড়ান্ত। তাঁহার ইচ্ছাই কি শেষ নহে। যে আঘাত পড়িয়াছে

সে আমার মাথার উপরেই পড়ুক, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে যেখানে আমার ধর্ম, আমার বিশ্বাস আছে, সেখানে পড়িতে দিব না। আমি যেমন ছিলাম তেমনি থাকিব।

হেমাঙ্গিনী আমার পায়ের কাছে পড়িয়া আমার পায়ের ধুলা লইল। আমি কহিলাম, "তুমি চিরসৌভাগ্যবতী, চিরসুখিনী হও।"

হেমাঙ্গিনী কহিল, "কেবল আশীর্বাদ নয়, তোমার সতীর হস্তে আমাকে এবং তোমার ভগ্নীপতিকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। তুমি তাঁহাকে লজ্জা করিলে চলিবে না। যদি অনুমতি কর তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া আসি।"

আমি কহিলাম, "আনো।"

কিছুক্ষণ পরে আমার ঘরে নূতন পদশব্দ প্রবেশ করিল। সস্নেহ প্রশ্ন শুনিলাম, "ভালো আছিস, কুমু?"

আমি ত্রস্ত বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া কহিলাম, "দাদা!"

হেমাঙ্গিনী কহিল, "দাদা কিসের। কান মলিয়া দাও, ও তোমার ছোটো ভগ্নীপতি।"

তখন সমস্ত বুঝিলাম। আমি জানিতাম, দাদার প্রতিজ্ঞা ছিল বিবাহ করিবেন না; মা নাই, তাঁহাকে অনুনয় করিয়া বিবাহ করাইবার কেহ ছিল না। এবার আমিই তাঁহার বিবাহ দিলাম। দুই চক্ষু বাহিয়া হুহু করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, কিছুতেই থামাইতে পারি না। দাদা ধীরে ধীরে আমার চুলের মধ্যে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন; হেমাঙ্গিনী আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কেবল হাসিতে লাগিল।

রাত্রে ঘুম হইতেছিল না; আমি উৎকণ্ঠিতচিত্তে স্বামীর প্রত্যাগমন প্রত্যাশা করিতেছিলাম। লজ্জা এবং নৈরাশ্য তিনি কিরূপভাবে সম্বরণ করিবেন, তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছিলাম না।

অনেক রাত্রে অতি ধীরে দ্বার খুলিল। আমি চমকিয়া উঠিয়া বসিলাম। আমার স্বামীর পদশব্দ। বক্ষের মধ্যে হৃৎপিণ্ড আছাড় খাইতে লাগিল।

তিনি বিছানার মধ্যে আসিয়া আমার হাত ধরিয়া কহিলেন, "তোমার দাদা আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। আমি ক্ষণকালের মোহে পড়িয়া মরিতে যাইতেছিলাম। সে দিন আমি যখন নৌকায় উঠিয়াছিলাম, আমার বুকের মধ্যে যে কী পাথর চাপিয়াছিল তাহা অন্তর্যামী জানেন; যখন নদীর মধ্যে ঝড়ে পড়িয়াছিলাম তখন প্রাণের ভয়ও হইতেছিল, সেই সঙ্গে ভাবিতেছিলাম, যদি ডুবিয়া যাই তাহা হইলেই আমার উদ্ধার হয়। মথুরগঞ্জে পৌঁছিয়া শুনিলাম, তাহার পূর্বদিনেই তোমার দাদার সঙ্গে হেমাঙ্গিনীর

বিবাহ হইয়া গেছে। কী লজ্জায় এবং কী আনন্দে নৌকায় ফিরিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। এই কয়দিনে আমি নিশ্চয় করিয়া বুঝিয়াছি, তোমাকে ছাড়িয়া আমার কোনো সুখ নাই। তুমি আমার দেবী।"

আমি হাসিয়া কহিলাম, "না, আমার দেবী হইয়া কাজ নাই, আমি তোমার ঘরের গৃহিণী, আমি সামান্য নারী মাত্র।"

স্বামী কহিলেন, "আমারও একটা অনুরোধ তোমাকে রাখিতে হইবে। আমাকে আর দেবতা বলিয়া কখনো অপ্রতিভ করিয়ো না।"

পরদিন হুলুরব ও শঙ্খধ্বনিতে পাড়া মাতিয়া উঠিল। হেমাঙ্গিনী আমার স্বামীকে আহারে উপবেশনে প্রভাতে রাত্রে, নানা প্রকারে পরিহাস করিতে লাগিল; নির্যাতনের আর সীমা রহিল না, কিন্তু তিনি কোথায় গিয়াছিলেন, কী ঘটিয়াছিল, কেহ তাহার লেশমাত্র উল্লেখ করিল না।

পৌষ ১৩০৫

প্রবন্ধ

বিজ্ঞপ্তি

বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে যতকিছু আলোচনা করেছি এই গ্রন্থে প্রকাশ করা হল। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আমার কিছু বাদপ্রতিবাদ হয়েছে, তাঁদের তর্কের উত্তর এই গ্রন্থের অন্তর্গত করেছি। এই উপলক্ষে বলা আবশ্যক, তাঁদের সঙ্গে আমার কিছু কিছু মতভেদ সত্ত্বেও ছন্দের বিচারে তাঁদের প্রবীণতা আমি শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকার করে থাকি।
ইতি ২০ আষাঢ় ১৩৪৩

শান্তিনিকেতন — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উৎসর্গ

কল্যাণীয়

শ্রীমান দিলীপকুমার রায়কে

ছন্দ

ছন্দের অর্থ

শুধু কথা যখন খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তখন কেবলমাত্র অর্থকে প্রকাশ করে। কিন্তু সেই কথাকে যখন তির্যক্ ভঙ্গি ও বিশেষ গতি দেওয়া যায় তখন সে আপন অর্থের চেয়ে আরো কিছু বেশি প্রকাশ করে। সেই বেশিটুকু যে কী তা বলাই শক্ত। কেননা তা কথার অতীত, সুতরাং অনির্বচনীয়। যা আমরা দেখছি শুনছি জানছি তার সঙ্গে যখন অনির্বচনীয়ের যোগ হয় তখন তাকেই আমরা বলি রস। অর্থাৎ সে জিনিসটাকে অনুভব করা যায়, ব্যাখ্যা করা যায় না। সকলে জানেন, এই রসই হচ্ছে কাব্যের বিষয়।

এইখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার, অনির্বচনীয় শব্দটার মানে অভাবনীয় নয়। তা যদি হত তা হলে ওটা কাব্যে অকাব্যে কুকাব্যে কোথাও কোনো কাজে লাগত না। বস্তু-পদার্থের সংজ্ঞা নির্ণয় করা যায় কিন্তু রস-পদার্থের করা যায় না। অথচ রস আমাদের একান্ত অনুভূতির বিষয়। গোলাপকে আমরা বস্তুরূপে জানি, আর গোলাপকে আমরা রসরূপে পাই। এর মধ্যে বস্তু-জানাকে আমরা সাদা কথায় তার আকার আয়তন ভার কোমলতা প্রভৃতি বহুবিধ পরিচয়ের দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারি, কিন্তু রস-পাওয়া এমন একটি অখণ্ড ব্যাপার যে তাকে তেমন করে সাদা কথায় বর্ণনা করা যায় না; কিন্তু তাই বলেই সেটা অলৌকিক অদ্ভুত অসামান্য কিছুই নয়। বরঞ্চ রসের অনুভূতি বস্তুজ্ঞানের চেয়ে আরো নিকটতর প্রবলতর গভীরতর। এইজন্য গোলাপের আনন্দকে আমরা যখন অন্যের মনে সঞ্চার করতে চাই তখন একটা সাধারণ অভিজ্ঞতার রাস্তা দিয়েই করে থাকি। তফাত এই বস্তু-অভিজ্ঞতার ভাষা সাদা কথার বিশেষণ, কিন্তু রস-অভিজ্ঞতার ভাষা আকার ইঙ্গিত সুর এবং রূপক। পুরুষমানুষের যে পরিচয়ে তিনি আপিসের বড়োবাবু সেটা আপিসের খাতাপত্র দেখলেই জানা যায়, কিন্তু মেয়ের যে পরিচয়ে তিনি গৃহলক্ষ্মী সেটা প্রকাশের জন্যে তাঁর সিঁথের সিঁদুর, তাঁর হাতে কঙ্কণ। অর্থাৎ, এটার মধ্যে রূপক চাই, অলংকার চাই, কেননা কেবলমাত্র তথ্যের চেয়ে এ যে

বেশি ; এর পরিচয় শুধু জ্ঞানে নয়, হৃদয়ে। ওই যে গৃহলক্ষ্মীকে লক্ষ্মী বলা গেল এইটেই তো হল একটা কথার ইশারামাত্র ; অথচ আপিসের বড়োবাবুকে তো আমাদের কেরানি-নারায়ণ বলবার ইচ্ছাও হয় না, যদিও ধর্মতত্ত্বে বলে থাকে সকল নরের মধ্যেই নারায়ণের আবির্ভাব আছে। তা হলেই বোঝা যাচ্ছে, আপিসের বড়োবাবুর মধ্যে অনির্বচনীয়তা নেই। কিন্তু যেখানে তাঁর গৃহিণী সাধ্বী সেখানে তাঁর মধ্যে আছে। তাই বলে এমন কথা বলা যায় না যে, ওই বাবুটিকেই আমরা সম্পূর্ণ বুঝি আর মা-লক্ষ্মীকে বুঝি নে, বরঞ্চ উলটো। কেবল কথা এই যে, বোঝবার বেলায় মা-লক্ষ্মী যত সহজ বোঝাবার বেলায় তত নয়।

'কেবা শুনাইল শ্যামনাম'। ব্যাপারটা ঘটনা হিসাবে সহজ। কোনো এক ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে তৃতীয় ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করেছে। এমন কাণ্ড দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার ঘটে। এইটুকু বলবার জন্যে কথাকে বেশি নাড়া দেবার দরকার হয় না। কিন্তু নাম কানের ভিতর দিয়ে যখন মরমে গিয়ে পশে, অর্থাৎ এমন জায়গায় কাজ করতে থাকে যে জায়গা দেখা-শোনার অতীত, এবং এমন কাজ করতে থাকে যাকে মাপা যায় না, ওজন করা যায় না, চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে যার সাক্ষ্য নেওয়া যায় না, তখন কথাগুলোকে নাড়া দিয়ে তাদের পুরো অর্থের চেয়ে তাদের কাছ থেকে আরো অনেক বেশি আদায় করে নিতে হয়। অর্থাৎ, আবেগকে প্রকাশ করতে গেলে কথার মধ্যে সেই আবেগের ধর্ম সঞ্চার করতে হয়। আবেগের ধর্ম হচ্ছে বেগ। কথা যখন সেই বেগ গ্রহণ করে তখনই আমাদের হৃদয়ভাবের সঙ্গে তার মিল ঘটে।

এই বেগের কত বৈচিত্র্যই যে আছে তার ঠিকানা নেই। এই বেগের বৈচিত্র্যেই তো আলোকের রঙ বদল হচ্ছে, শব্দের সুর বদল হচ্ছে, এবং লীলাময়ী সৃষ্টি রূপ থেকে রূপান্তর গ্রহণ করছে। এমন-কি সৃষ্টির বাইরের পর্দা সরিয়ে ভিতরের রহস্যনিকেতনে যতই প্রবেশ করা যায় ততই বস্তুত্ব ঘুচে গিয়ে কেবল বেগই প্রকাশ পেতে থাকে। শেষকালে এই কথাই মনে হয়, প্রকাশবৈচিত্র্যের মূলে বুঝি এই বেগবৈচিত্র্য। যদিদং সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।

মানুষের সত্তার মধ্যে এই অনুভূতিলোকই হচ্ছে সেই রহস্যলোক যেখানে বাহিরের রূপজগতের সমস্ত বেগ অন্তরে আবেগ হয়ে উঠছে, এবং সেই অন্তরের আবেগ আবার বাহিরে রূপ গ্রহণ করবার জন্যে উৎসুক হচ্ছে। এইজন্যে বাক্য যখন আমাদের অনুভূতিলোকের বাহনের কাজে ভর্তি হয় তখন তার গতি না হলে চলে না। সে তার অর্থের দ্বারা বাহিরের ঘটনাকে ব্যক্ত করে, গতির দ্বারা অন্তরের গতিকে প্রকাশ করে।

শ্যামের নাম রাধা শুনেছে। ঘটনাটা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু যে-একটা অদৃশ্য বেগ জন্মালো তার আর শেষ নেই। আসল ব্যাপারটাই হল তাই। সেইজন্যে কবি ছন্দের ঝংকারের মধ্যে এই কথাটাকে দুলিয়ে দিলেন। যতক্ষণ ছন্দ থাকবে ততক্ষণ এই দোলা আর থামবে না। 'সই, কেবা শুনাইল শ্যামনাম'। কেবলই ঢেউ উঠতে লাগল। ওই কটি কথা ছাপার অক্ষরে যদিও ভালোমানুষের মতো দাঁড়িয়ে থাকার ভান করে, কিন্তু ওদের অন্তরের স্পন্দন আর কোনোদিনই শান্ত হবে না। ওরা অস্থির হয়েছে, এবং অস্থির করাই ওদের কাজ।

আমাদের পুরাণে ছন্দের উৎপত্তির কথা যা বলেছে তা সবাই জানেন। দুটি পাখির মধ্যে একটিকে যখন ব্যাধ মারলে তখন বাল্মীকি মনে যে ব্যথা পেলেন সেই ব্যথাকে শ্লোক দিয়ে না জানিয়ে তাঁর উপায় ছিল না। যে পাখিটা মারা গেল এবং আর যে একটি পাখি তার জন্যে কাঁদল তারা কোন্‌কালে লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এই নিদারুণতার ব্যথাটিকে তো কেবল কালের মাপকাঠি দিয়ে মাপা যায় না। সে-যে অনন্তের বুকে বেজে রইল। সেইজন্যে কবির শাপ ছন্দের বাহনকে নিয়ে কাল থেকে কালান্তরে ছুটতে চাইলে। হায় রে, আজও সেই ব্যাধ নানা অস্ত্র হাতে নানা বীভৎসতার মধ্যে নানা দেশে নানা আকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সেই আদিকবির শাপ শাশ্বতকালের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে রইল। এই শাশ্বতকালের কথাকে প্রকাশ করবার জন্যেই তো ছন্দ।

আমরা ভাষায় বলে থাকি, কথাকে ছন্দে বাঁধা। কিন্তু এ কেবল বাইরে বাঁধন, অন্তরে মুক্তি। কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছন্দ। সেতারের তার বাঁধা থাকে বটে কিন্তু তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ হচ্ছে সেই তার-বাঁধা সেতার, কথার অন্তরের সুরকে সে ছাড়া দিতে থাকে। ধনুকের সে ছিলা, কথাকে সে তীরের মতো লক্ষ্যের মর্মের মধ্যে প্রক্ষেপ করে।

গোড়াতেই ছন্দ সম্বন্ধে এতখানি ওকালতি করা হয়তো বাহুল্য বলে অনেকের মনে হতে পারে। কিন্তু আমি জানি, এমন লোক আছেন যাঁরা ছন্দকে সাহিত্যের একটা কৃত্রিম প্রথা বলে মনে করেন। তাই আমাকে এই গোড়ার কথাটা বুঝিয়ে বলতে হল যে পৃথিবী ঠিক চব্বিশ ঘণ্টার ঘূর্ণিলয়ে তিনশো পঁয়ষট্টি মাত্রার ছন্দে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, সেও যেমন কৃত্রিম নয়, ভাবাবেগ তেমনি ছন্দকে আশ্রয় করে আপন গতিকে প্রকাশ করবার যে চেষ্টা করে সেও তেমনি কৃত্রিম নয়।

এইখানে কাব্যের সঙ্গে গানের তুলনা করে আলোচ্য বিষয়টাকে পরিষ্কার করবার চেষ্টা করা যাক।

সুর পদার্থটাই একটা বেগ। সে আপনার মধ্যে আপনি স্পন্দিত হচ্ছে। কথা যেমন অর্থের মোক্তারি করবার জন্যে, সুর তেমন নয়, সে আপনাকে আপনিই প্রকাশ করে। বিশেষ সুরের সঙ্গে বিশেষ সুরের সংযোগে ধ্বনিবেগের একটা সমবায় উৎপন্ন হয়। তাল সেই সমবেত বেগটাকে গতিদান করে। ধ্বনির এই গতিবেগে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে গতি সঞ্চার করে সে একটা বিশুদ্ধ আবেগ মাত্র, তার যেন কোনো অবলম্বন নেই। সাধারণত সংসারে আমরা কতকগুলি বিশেষ ঘটনা আশ্রয় করে সুখে দুঃখে বিচলিত হই। সেই ঘটনা সত্যও হতে পারে, কাল্পনিকও হতে পারে অর্থাৎ আমাদের কাছে সত্যের মতো প্রতিভাত হতে পারে। তারই আঘাতে আমাদের চেতনা নানা রকমে নাড়া পায়, সেই নাড়ার প্রকারভেদে আমাদের আবেগের প্রকৃতি-ভেদ ঘটে। কিন্তু গানের সুরে আমাদের চেতনাকে যে নাড়া দেয় সে কোনো ঘটনার উপলক্ষ দিয়ে নয়, সে একেবারে অব্যবহিত ভাবে। সুতরাং তাতে যে আবেগ উৎপন্ন হয় সে অহৈতুক আবেগ। তাতে আমাদের চিত্ত নিজের স্পন্দনবেগেই নিজেকে জানে, বাইরের সঙ্গে কোনো ব্যবহারের যোগে নয়।

সংসারে আমাদের জীবনে যে-সব ঘটনা ঘটে তার সঙ্গে নানা দায় জড়ানো আছে। জৈবিক দায়, বৈষয়িক দায়, সামাজিক দায়, নৈতিক দায়। তার জন্যে নানা চিন্তায় নানা কাজে আমাদের চিত্তকে বাইরে বিক্ষিপ্ত করতে হয়। শিল্পকলায়, কাব্যে এবং রসসাহিত্যমাত্রেই আমাদের চিত্তকে সেই-সমস্ত দায় থেকে মুক্তি দেয়। তখন আমাদের চিত্ত সুখদুঃখের মধ্যে আপনারই বিশুদ্ধ প্রকাশ দেখতে পায়। সেই প্রকাশই আনন্দ। এই প্রকাশকে আমরা চিরন্তন বলি এইজন্যে যে, বাইরের ঘটনাগুলি সংসারের জাল বুনতে বুনতে, নানা প্রয়োজন সাধন করতে করতে, সরে যায়, চলে যায়— তাদের নিজের মধ্যে নিজের কোনো চরম মূল্য নেই। কিন্তু আমাদের চিত্তের যে আত্মপ্রকাশ তার আপনাতেই আপনার চরম, তার মূল্য তার আপনার মধ্যেই পর্যাপ্ত। তমসাতীরে ক্রৌঞ্চবিরহিণীর দুঃখ কোনোখানেই নেই, কিন্তু আমাদের চিত্তের আত্মানুভূতির মধ্যে সেই বেদনার তার বাঁধা হয়েই আছে। সে ঘটনা এখন ঘটছে না, বা সে ঘটনা কোনোকালেই ঘটে নি, এ কথা তার কাছে প্রমাণ করে কোনো লাভ নেই।

যা হোক, দেখা যাচ্ছে গানের স্পন্দন আমাদের চিত্তের মধ্যে যে আবেগ জন্মিয়ে দেয় সে কোনো সাংসারিক ঘটনামূলক আবেগ নয়। তাই মনে হয়, সৃষ্টির গভীরতার মধ্যে যে একটি বিশ্বব্যাপী প্রাণকম্পন চলছে, গান শুনে সেইটেরই বেদনাবেগ যেন আমরা চিত্তের মধ্যে অনুভব করি। ভৈরবী যেন সমস্ত সৃষ্টির অন্তরতম বিরহব্যাকুলতা,

দেশমল্লার যেন অভ্রংলিহ গঙ্গোত্রীর কোন্ আদিনির্ঝরের কলকল্লোল। এতে করে আমাদের চেতনা দেশকালের সীমা পার হয়ে নিজের চঞ্চল প্রাণধারাকে বিরাটের মধ্যে উপলব্ধি করে।

কাব্যেও আমরা আমাদের চিত্তের এই আত্মানুভূতিকে বিশুদ্ধ এবং মুক্তভাবে অথচ বিচিত্র আকারে পেতে চাই। কিন্তু কাব্যের প্রধান উপকরণ হল কথা। সে তো সুরের মতো স্বপ্রকাশ নয়। কথা অর্থকে জানাচ্ছে। অতএব কাব্যে এই অর্থকে নিয়ে কারবার করতেই হবে। তাই গোড়ায় দরকার, এই অর্থটা যেন রসমূলক হয়। অর্থাৎ, সেটা এমন কিছু হয় যা স্বতই আমাদের মনে স্পন্দন সঞ্চার করে, যাকে আমরা বলি আবেগ।

কিন্তু যেহেতু কথা জিনিসটা স্বপ্রকাশ নয়, এইজন্যে সুরের মতো কথার সঙ্গে আমাদের চিত্তের সাধর্ম্য নেই। আমাদের চিত্ত বেগবান্, কিন্তু কথা স্থির। এ প্রবন্ধের আরম্ভেই আমরা এই বিষয়টার আলোচনা করেছি। বলেছি, কথাকে বেগ দিয়ে আমাদের চিত্তের সামগ্রী করে তোলবার জন্যে ছন্দের দরকার। এই ছন্দের বাহন-যোগে কথা কেবল যে দ্রুত আমাদের চিত্তে প্রবেশ করে তা নয়, তার স্পন্দনে নিজের স্পন্দন যোগ করে দেয়।

এই স্পন্দনের যোগে শব্দের অর্থ যে কী অপরূপতা লাভ করে তা আগে থাকতে হিসাব করে বলা যায় না। সেইজন্যে কাব্যরচনা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। তার বিষয়টা কবির মনে বাঁধা, কিন্তু কাব্যের লক্ষ্য হচ্ছে বিষয়কে অতিক্রম করা; সেই বিষয়ের চেয়ে বেশিটুকুই হচ্ছে অনির্বচনীয়। ছন্দের গতি কথার মধ্য থেকে সেই অনির্বচনীয়কে জাগিয়ে তোলে।

রজনী শাঙনঘন, ঘন দেয়া-গরজন,
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে, বিগলিত চীর অঙ্গে,
নিন্দ যাই মনের হরিষে।

বাদলার রাত্রে একটি মেয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে, বিষয়টা এইমাত্র কিন্তু ছন্দ এই বিষয়টিকে আমাদের মনে কাঁপিয়ে তুলতেই এই মেয়ের ঘুমোনো ব্যাপারটি যেন নিত্যকালকে আশ্রয় করে একটি পরম ব্যাপার হয়ে উঠল— এমন-কি, জর্মন কাইজার আজ যে চার বছর ধরে এমন দুর্দান্ত প্রতাপে লড়াই করছে সেও এর তুলনায় তুচ্ছ এবং অনিত্য। ওই লড়াইয়ের তথ্যটাকে একদিন বহুকষ্টে ইতিহাসের বই থেকে মুখস্থ করে ছেলেদের এক্‌জামিন পাস করতে হবে; কিন্তু 'পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে, বিগলিত চীর

অন্দে, নিন্দ যাই মনের হরিষে', এ পড়া-মুখস্থ করার জিনিস নয়। এ আমরা আপনার প্রাণের মধ্যে দেখতে পাব, এবং যা দেখব সেটা একটি মেয়ের বিছানায় শুয়ে ঘুমোনোর চেয়ে অনেক বেশি। এই কথাটাকেই আর-এক ছন্দে লিখলে বিষয়টা ঠিকই থাকবে, কিন্তু বিষয়ের চেয়ে বেশি যেটা তার অনেকখানি বদল হবে।

শ্রাবণমেঘে তিমিরঘন শর্বরী,
বরিষে জল কাননতল মর্মরি।
জলদরব-ঝংকারিত ঝঞ্ঝাতে
বিজন ঘরে ছিলাম সুখ-তন্দ্রাতে,
অলস মম শিথিল তনু-বল্লরী।
মুখর শিখী শিখরে ফিরে সঞ্চরি॥

এই ছন্দে হয়তো বাইরের ঝড়ের দোলা কিছু আছে কিন্তু মেয়েটির ভিতরের গভীর কথা ফুটল না। এ আর-এক জিনিস হল।

ছন্দ কবিতার বিষয়টির চার দিকে আবর্তন করছে। পাতা যেমন গাছের ডাঁটার চার দিকে ঘুরে ঘুরে তাল রেখে ওঠে এও সেইরকম। গাছের বস্তু-পদার্থ তার ডালের মধ্যে, গুঁড়ির মধ্যে, মজ্জাগত হয়ে রয়েছে; কিন্তু তার লাবণ্য, তার চাঞ্চল্য, বাতাসের সঙ্গে তার আলাপ, আকাশের সঙ্গে তার চাউনির বদল, এ সমস্ত প্রধানত তার পাতার ছন্দে।

পৃথিবীর আহ্নিক এবং বার্ষিক গতির মতো কাব্যে ছন্দের আবর্তনের দুটি অঙ্গ আছে, একটি বড়ো গতি, আর-একটি ছোটো গতি। অর্থাৎ চাল এবং চলন। প্রদক্ষিণ এবং পদক্ষেপ। দৃষ্টান্ত দেখাই।

শারদ চন্দ্র পবন মন্দ, বিপিন ভরল কুসুমগন্ধ।

এরই প্রত্যেকটি হল চলন। এমন আটটি চলনে এই ছন্দের চাল সারা হচ্ছে। অর্থাৎ, ছয়ের মাত্রায় এ পা ফেলছে এবং আটের মাত্রায় ঘুরে আসছে। 'শারদ চন্দ্র' এই কথাটি ছয় মাত্রার, 'শারদ' তিন এবং 'চন্দ্র'ও তিন। বলা বাহুল্য, যুক্ত অক্ষরে দুই অক্ষরের মাত্রা আছে, এই কারণে 'শারদ চন্দ্র' এবং 'বিপিন ভরল' ওজনে একই।

১ ২ ৩ ৪
শারদ চন্দ্র পবন মন্দ, বিপিন ভরল কুসুমগন্ধ,
৫ ৬ ৭ ৮
ফুল্ল মল্লি মালতি যূথি মত্তমধুপ- ভোরনী।

প্রদক্ষিণের মাত্রার চেয়ে পদক্ষেপের মাত্রার 'পরেই ছন্দের বিশেষত্ব বেশি নির্ভর

করছে। কেননা এই আট পদক্ষেপের আবর্তন সকল ছন্দেই চলে। বস্তুত এইটেই হচ্ছে অধিকাংশ ছন্দের চলিত কায়দা। যথা—

১	২	৩	৪
মহাভার-	তের কথা	অমৃত স-	মান,
৫	৬	৭	৮
কাশীরাম	দাস কহে	শুনে পুণ্য-	বান্।

এও আট পদক্ষেপ।

এই জাত নির্ণয় করতে হলে চালের দিকে ততটা নয় কিন্তু চলনের দিকেই দৃষ্টি দিতে হবে। দিলে দেখা যাবে, ছন্দকে মোটের উপর তিন জাতে ভাগ করা যায়। সমচলনের ছন্দ, অসমচলনের ছন্দ এবং বিষমচলনের ছন্দ। দুই মাত্রার চলনকে বলি সমমাত্রার চলন, তিন মাত্রার চলনকে বলি অসমমাত্রার চলন এবং দুই-তিনের মিলিত মাত্রার চলনকে বলি বিষমমাত্রার ছন্দ।

ফিরে ফিরে আঁখি- নীরে পিছু পানে চায়।
পায়ে পায়ে বাধা প'ড়ে চলা হল দায়।

এ হল দুই মাত্রার চলন। দুইয়ের গুণফল চার বা আটকেও আমরা এক জাতিরই গণ্য করি।

নয়ন- ধারায় পথ সে হারায়, চায় সে পিছন পানে,
চলিতে চলিতে চরণ চলে না, ব্যথার বিষম টানে।

এ হল তিন মাত্রার চলন। আর—

যতই চলে চোখের জলে নয়ন ভ'রে ওঠে,
চরণ বাধে, পরান কাঁদে, পিছনে মন ছোটে।

এ হল দুই-তিনের যোগে বিষমমাত্রার ছন্দ।

তা হলেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, চলনের ভেদেই ছন্দের প্রকৃতি-ভেদ।

বৈষ্ণবপদাবলীতে বাংলাসাহিত্যে ছন্দের প্রথম ঢেউ ওঠে। কিন্তু দেখা যায়, তার লীলাবৈচিত্র্য সংস্কৃত ছন্দের দীর্ঘহ্রস্ব মাত্রা অবলম্বন করেই প্রধানত প্রকাশ পেয়েছে। প্রাকৃত বাংলায় যত কবিতা আছে তার ছন্দসংখ্যা বেশি নয়। সমমাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত—

কেন তোরে আনমন দেখি।
কাহে নখে ক্ষিতিতল লেখি।

এ ছাড়া পয়ার এবং ত্রিপদী আছে, সেও সমমাত্রার ছন্দ। অসমমাত্রার অর্থাৎ তিনের ছন্দ চার রকমের পাওয়া যায়—

মলিন বদন ভেল,
ধীরে ধীরে চলি গেল।
আওল রাইর পাশ।
কি কহিব জ্ঞান- দাস॥ ১॥

জাগিয়া জাগিয়া হইল খীন
অসিত চাঁদের উদয়দিন॥ ২॥

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ন- তারা।
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমত যোগিনী- পারা॥ ৩॥

বেলি অবসান- কালে
কবে গিয়াছিলা জলে।
তাহারে দেখিয়া ইষত হাসিয়া
ধরিলি সখীর গলে॥ ৪॥

বিষমমাত্রার দৃষ্টান্ত কেবল একটা চোখে পড়েছে, সেও কেবল গানের আরম্ভে—শেষ পর্যন্ত টেকে নি।

চিকনকালা, গলায় মালা,
বাজন নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে ভ্রমর বুলে,
তেরছ নয়ানে চায়॥

বাংলায় সমমাত্রার ছন্দের মধ্যে পয়ার এবং ত্রিপদীই সবচেয়ে প্রচলিত। এই দুটি ছন্দের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, এদের চলন খুব লম্বা। এদের প্রত্যেক পদক্ষেপে আট মাত্রা। এই আট মাত্রার মোট ওজন রেখে পাঠক এর মাত্রাগুলিকে অনেকটা ইচ্ছামত চালাচালি করতে পারেন।

পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে।

এর মধ্যে যে কতটা ফাঁক আছে তা যুক্তাক্ষর বসালেই টের পাওয়া যায়।

পাষাণ মূর্ছিয়া যায় গায়ের বাতাসে।

ভারী হল না।

পাষাণ মূর্ছিয়া যায় অঙ্গের বাতাসে।

এতেও বিশেষ ভিড় বাড়ল না।

পাষাণ মূর্ছিয়া যায় অঙ্গের উচ্ছ্বাসে।

এও বেশ সহ্য হয়।

সংগীত তরঙ্গি উঠে অঙ্গের উচ্ছ্বাসে।

এতেও অত্যন্ত ঠেসাঠেসি হল না।

সংগীততরঙ্গরঙ্গ অঙ্গের উচ্ছ্বাস।

অনুপ্রাসের ভিড় হল বটে কিন্তু এখনো অন্ধকূপহত্যা হবার মতো হয় নি। কিন্তু এর বেশি আর সাহস হয় না। তবু যদি আরো প্যাসেঞ্জার নেওয়া যায় তা হলে যে একেবারে পয়ারের নৌকাডুবি হবে তা নয়, তবে কিনা হাঁপ ধরবে। যথা—

দুর্দান্তপাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত।

কিন্তু দুই মাত্রার ছন্দ মাত্রেরই যে এইরকম অসাধারণ শোষণশক্তি তা বলতে পারি নে। যেখানে পদক্ষেপ ঘন ঘন সেখানে ঠিক উলটো। যথা—

২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
ধরণীর আঁখিনীর মোচনের ছলে
২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
দেবতার অবতার বসুধার তলে।

এও পয়ার কিন্তু যেহেতু এর পদক্ষেপ আটে নয়, দুইয়ে, সেইজন্যে এর উপরে বোঝা সয় না। যে দ্রুত চলে তাকে হালকা হতে হয়। যদি লেখা যায়—

ধরিত্রীর চক্ষুনীর মুক্ষনের ছলে
কংসারির শঙ্খরব সংসারের তলে।

তা হলে ও একটা স্বতন্ত্র ছন্দ হয়ে যায়। সংস্কৃতেও দেখো, সমমাত্রার ছন্দ যেখানে দুয়ের লয়ে চলে সেখানে দৌড় বেশি। যেমন—

২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
হরি রিহ বিহরতি সর সব সঙ্গে।

অসম অর্থাৎ তিন মাত্রার চলনও দ্রুত।

পাষাণ মিলায় গায়ের বাতাসে।

এর লয়টা দুরন্ত। পড়লেই বোঝা যায়, এর প্রত্যেক তিন মাত্রা পরবর্তী তিন মাত্রাকে চাচ্ছে, কিছুতে তর সচ্ছে না। তিনের মাত্রাটা টল্‌টলে, গড়িয়ে যাবার দিকে তার ঝোঁক। এইজন্যে তিনকে গুণ করে ছয় বা বারো করলেও তার চাপল্য ঘোচে না।

দুই মাত্রার চলন ক্ষিপ্র, তিন মাত্রার চঞ্চল, চার মাত্রার মন্থর, আট মাত্রার গম্ভীর। তিন মাত্রার ছন্দে যে পয়ারের মতো ফাঁক নেই তা যুক্তাক্ষর জুড়তে গেলেই ধরা পড়বে। যথা—

গিরির গুহায় ঝরিছে নিঝর

এই পদটিকে যদি লেখা যায়

পর্বত- কন্দরে ঝরিছে নির্ঝর

তা হলে ছন্দের পক্ষে সাংঘাতিক হয়। অথচ পয়ারে

গিরিগুহাতল বেয়ে ঝরিছে নিঝর

এবং

পর্বতকন্দরতলে ঝরিছে নির্ঝর

ছন্দের পক্ষে দুই-ই সমান।

বিষমমাত্রার ছন্দের স্বভাব হচ্ছে, তার প্রত্যেক পদে এক অংশে গতি, আর-এক অংশে বাধা। এই গতি এবং বাধার সম্মিলনে তার নৃত্য।

অহহ কল- য়ামি বল- য়াদিমণি- ভূষণং
হরিবিরহ- দহনবহ- নেন বহু- দূষণং।

তিন মাত্রার 'অহহ' যে ছাঁদে চলবার জন্যে বেগ সঞ্চয় করলে, দুই মাত্রার 'কল' তাকে হঠাৎ টেনে থামিয়ে দিলে, আবার পরক্ষণেই তিন যেই নিজমূর্তি ধরলে অমনি আবার দুই এসে তার লাগামে টান দিলে। এই বাধা যদি সত্যকার বাধা হত তা হলে ছন্দই হত না; এ কেবল বাধার ছল, এতে গতিকে আরো উস্‌কিয়ে দেয় এবং বিচিত্র করে তোলে। এইজন্যে অন্য ছন্দের চেয়ে বিষমমাত্রার ছন্দে গতিকে আরো যেন বেশি অনুভব করা যায়।

যাই হোক আমার বক্তব্য এই, ছন্দের পরিচয়ের মূলে দুটি প্রশ্ন আছে। এক হচ্ছে, তার প্রত্যেক পদক্ষেপে কটি করে মাত্রা আছে। দুই হচ্ছে, সে মাত্রা সম, অসম, না বিষম অথবা সম-বিষমের যোগ। আমরা যখন মোটা করে বলে থাকি যে, এটা চোদ্দ মাত্রার ছন্দ, বা, ওটা দশ মাত্রার, তখন আসল কথাটাই বলা হয় না। তার কারণ পূর্বেই বলেছি, চাল অর্থাৎ প্রদক্ষিণের মাত্রায় ছন্দকে চেনা যায় না, চলন অর্থাৎ পদক্ষেপের মাত্রায় তার পরিচয়। চোদ্দ মাত্রায় শুধু যে পয়ার হয় না, আরো অনেক ছন্দ হয়, তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

বসন্ত পাঠায় দূত রহিয়া রহিয়া,
যে কাল গিয়েছে তারি নিশ্বাস বহিয়া।

এই তো পয়ার, এর প্রত্যেক প্রদক্ষিণে দুটি পদক্ষেপ। প্রথম পদক্ষেপে আটটি উচ্চারিত মাত্রা, দ্বিতীয় পদক্ষেপে ছয়টি উচ্চারিত মাত্রা এবং দুটি অনুচ্চারিত অর্থাৎ যতির মাত্রা। অর্থাৎ, প্রত্যেক প্রদক্ষিণে মোটের উপর উচ্চারিত মাত্রা চোদ্দ। আমরা পয়ারের পরিচয় দেওয়ার কালে প্রত্যেক প্রদক্ষিণের উচ্চারিত মাত্রার সমষ্টির হিসাব দিয়ে থাকি। তার প্রধান কারণ, কিছুকাল পূর্বে পয়ার ছাড়া চোদ্দ মাত্রা-সমষ্টির ছন্দ আমাদের ব্যবহারে লাগত না। নিম্নলিখিত চোদ্দ মাত্রার ছন্দেও ঠিক পয়ারের মতোই প্রত্যেক প্রদক্ষিণে দুটি করে পদক্ষেপ।

ফাগুন এল দ্বারে কেহ যে ঘরে নাই,
পরান ডাকে কারে ভাবিয়া নাহি পাই।

অথচ এটা মোটেই পয়ার নয়। তফাত হল কিসে যাচাই করে দেখলে দেখা যাবে যে, এর প্রতি পদক্ষেপে আটের বদলে সাত উচ্চারিত মাত্রা। আর অনুচ্চারিত মাত্রা প্রতি পদক্ষেপের শেষে একটি করে দেওয়া যেতে পারে। যেমন—

ফাগুন এল দ্বারে-এ কেহ যে ঘরে না-আ-ই।

কিম্বা কেবল শেষ ছেদে একটি দেওয়া যেতে পারে। যেমন—

ফাগুন এল দ্বারে কেহ যে ঘরে না-আ-ই।

কিম্বা যতি একেবারেই না দেওয়া যেতে পারে।

পুনশ্চ এই ছন্দেরই মাত্রাসমষ্টি সমান রেখে এরই পদক্ষেপমাত্রার পরিবর্তন করে যদি পড়া যায় তা হলে শ্লোকটি চোখে দেখতে একই রকম থাকবে কিন্তু কানে শুনতে অন্যরকম হবে। এইখানে বলে রাখি, ছন্দের প্রত্যেক ভাগে একটা করে তালি দিলে পড়বার সুবিধা হবে এবং এই তালি অনুসারে ভিন্ন ছন্দের ভিন্ন লয় ধরা পড়বে। প্রথমে সাত মাত্রাকে তিন এবং চারে স্বতন্ত্র ভাগ করে পড়া যাক। যেমন—

তালি	তালি	তালি	তালি
ফাগুন	এল দ্বারে	কেহ যে	ঘরে নাই,
পরান	ডাকে কারে	ভাবিয়া	নাহি পাই।

তার পরে পাঁচ-দুই ভাগ করা যাক। যেমন—

তালি	তালি	তালি	তালি
ফাগুন এল	দ্বারে	কেহ যে ঘরে	নাই,
পরান ডাকে	কারে	ভাবিয়া নাহি	পাই।

এই চোদ্দ মাত্রা-সমষ্টির ছন্দ আরো কতরকম হতে পারে তার কতকগুলি নমুনা দেওয়া

যাক। দুই-পাঁচ দুই-পাঁচ ভাগের ছন্দ, যথা[১]—

| | | |
সে যে আপন মনে শুধু দিবস গণে,
তার চোখের বারি কাঁপে আঁখির কোণে।

চার-তিন চার-তিন ভাগ—

| | | |
নয়নের সলিলে যে কথাটি বলিলে
রবে তাহা স্মরণে জীবনে ও মরণে।

কিম্বা এক-ছয় এক-ছয় ভাগ—

| | | |
যে কথা নাহি শোনে সে থাক্ নিজমনে,
কে বৃথা নিবেদনে রে ফিরে তার সনে।

সাত-চার-তিনের ভাগ—

| | |
চাহিছ বারে বারে আপনারে ঢাকিতে,
মন না মানে মানা মেলে ডানা আঁখিতে।

এই কবিতাটাকেই অন্য লয়ে পড়া যায়—

| | | |
চাহিছ বারে বারে আপনারে ঢাকিতে,
মন না মানে মানা মেলে ডানা আঁখিতে।

তিন-তিন-তিন-তিন-দুইয়ের ভাগ—

| | | | |
ব্যাকুল বকুল ঝরিল পড়িল ঘাসে,
বাতাস উদাস আমের বোলের বাসে।

একেই ছয়-আটের ভাগে পড়া যায়—

| |
ব্যাকুল বকুল ঝরিল পড়িল ঘাসে,
বাতাস উদাস আমের বোলের বাসে।

১ এই প্রত্যেক দণ্ডচিহ্নের অনুসরণ করে তাল দেওয়া আবশ্যক।

পাঁচ-চার-পাঁচের ভাগ—

নীরবে গেলে	ম্লানমুখে	আঁচল টানি
কাঁদিছে দুখে	মোর বুকে	না-বলা বাণী।

এই শ্লোককেই তিন-ছয়-পাঁচ ভাগ করা যায়—

নীরবে	গেলে ম্লানমুখে	আঁচল টানি
কাঁদিছে	দুখে মোর বুকে	না-বলা বাণী।

এর থেকে এই বোঝা যাচ্ছে, প্রদক্ষিণের সমষ্টিমাত্রা চোদ্দ হলেও সেই সমষ্টির অংশের হিসাব কে কী ভাবে নিকাশ করছে তারই উপর ছন্দের প্রভেদ ধরা পড়ে। কেবল ছন্দরসায়নে নয়, বস্তুরসায়নেও এইরকম উপাদানের মাত্রা-ভাগ নিয়েই বস্তুর প্রকৃতিভেদ ঘটে, রাসায়নিকেরা বোধ করি এই কথা বলেন।

পয়ার-ছন্দের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, তাকে প্রায় গাঁঠে গাঁঠে ভাগ করা চলে, এবং প্রত্যেক ভাগেই মূল ছন্দের একটা আংশিক রূপ দেখা যায়। যথা—

ওহে পান্থ, চলো পথে, পথে বন্ধু আছে
একা বসে ম্লানমুখে, সে যে সঙ্গ যাচে।

'ওহে পান্থ', এইখানে একটা থামবার স্টেশন মেলে। তার পরে যথাক্রমে, 'ওহে পান্থ চলো', 'ওহে পান্থ চলো পথে', 'ওহে পান্থ চলো পথে পথে'। তার পরে 'বন্ধু আছে', এই ভগ্নাংশটার সঙ্গে পরের লাইন জোড়া যায়, যেমন—'বন্ধু আছে একা', 'বন্ধু আছে একা বসে', 'বন্ধু আছে একা বসে সে যে'। কিন্তু তিনের ছন্দকে তার ভাগে ভাগে পাওয়া যায় না, এইজন্যে তিনের ছন্দে ইচ্ছামত থামা চলে না। যেমন, 'নিশি দিল ডুব অরুণসাগরে'। 'নিশি দিল', এখানে থামা যায়, কিন্তু তা হলে তিনের ছন্দ ভেঙে যায়; 'নিশি দিল ডুব' পর্যন্ত এসে ছয় মাত্রা পুরিয়ে দিয়ে তবেই তিনের ছন্দ হাঁফ ছাড়তে পারে। কিন্তু আবার, 'নিশি দিল ডুব অরুণ' এখানেও থামা যায় না; কেননা তিন এমন একটি মাত্রা যা আর একটা তিনকে পেলে তবে দাঁড়াতে পারে, নইলে টলে পড়তে চায়; এইজন্য 'অরুণসাগর' এর মাঝখানে থামতে গেলে রসনা কূল পায় না। তিনের ছন্দে গতির প্রাবল্যই বেশি, স্থিতি কম। সুতরাং তিনের ছন্দ চাঞ্চল্যপ্রকাশের পক্ষে ভালো কিন্তু তাতে গাম্ভীর্য এবং প্রসার অল্প। তিনের মাত্রার ছন্দে অমিত্রাক্ষর রচনা করতে গেলে বিপদে পড়তে হয়, সে যেন চাকা নিয়ে লাঠিখেলার চেষ্টা। পয়ার আট পায়ে চলে বলে তাকে যে কতরকমে চালানো যায় মেঘনাদবধ কাব্যে তার প্রমাণ

আছে। তার অবতারণাটি পরখ করে দেখা যাক। এর প্রত্যেক ভাগে কবি ইচ্ছামত ছোটো বড়ো নানা ওজনের নানা সুর বাজিয়েছেন; কোনো জায়গাতেই পয়ারকে তার প্রচলিত আড্ডায় এসে থামতে দেন নি। প্রথম আরম্ভেই বীরবাহুর বীরমর্যাদা সুগম্ভীর হয়ে বাজল— 'সম্মুখসমরে পড়ি বীরচূড়ামণি বীরবাহু'। তার পরে তার অকালমৃত্যুর সংবাদটি যেন ভাঙা রণপতাকার মতো ভাঙা ছন্দে ভেঙে পড়ল— 'চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে'। তার পরে ছন্দ নত হয়ে নমস্কার করলে— 'কহ হে দেবি অমৃতভাষিণি'। তার পরে আসল কথাটা, যেটা সবচেয়ে বড়ো কথা, সমস্ত কাব্যের ঘোর পরিণামের যেটা সূচনা, সেটা যেন আসন্ন ঝটিকার সুদীর্ঘ মেঘগর্জনের মতো এক দিগন্ত থেকে আর-এক দিগন্তে উদ্‌ঘোষিত হল— 'কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতিপদে পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি রাঘবারি'।

বাংলা ভাষায় অধিকাংশ শব্দই দুই মাত্রার এবং তিন মাত্রার, এবং ত্রৈমাত্রিক শব্দের উপর বিভক্তিযোগে চার মাত্রার। পয়ারের পদবিভাগটি এমন যে, দুই, তিন এবং চার মাত্রার শব্দ তাতে সহজেই জায়গা পায়।

> চৈত্রের সেতারে বাজে বসন্তবাহার,
> বাতাসে বাতাসে ওঠে তরঙ্গ তাহার।

এ পয়ারে তিন অক্ষরের ভিড়। আবার—

> চকমকি-ঠোকাঠুকি-আগুনের প্রায়
> চোখোচোখি ঘটিতেই হাসি ঠিকরায়।

এই পয়ারে চারের প্রাধান্য।

> তারাগুলি সারারাতি কানে কানে কয়,
> সেই কথা ফুলে ফুলে ফুটে বনময়।

এইখানে দুই মাত্রার আয়োজন।

> প্রেমের অমরাবতী প্রেয়সীর প্রাণে,
> কে সেথা দেবাধিপতি সে কথা কে জানে।

এই পয়ারে এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত সকল রকম মাত্রারই সমাবেশ। এর থেকে জানা যায় পয়ারের আতিথেয়তা খুব বেশি, আর সেইজন্যেই বাংলা কাব্যসাহিত্যে প্রথম থেকেই পয়ারের এত অধিক চলন।

পয়ারের চেয়ে লম্বা দৌড়ের সমমাত্রার ছন্দ আজকাল বাংলাকাব্যে চলছে। স্বপ্নপ্রয়াণে এর প্রথম প্রবর্তন দেখা গেছে। স্বপ্নপ্রয়াণ থেকেই তার নমুনা তুলে দেখাই।

গম্ভীর পাতাল, যেথা কালরাত্রি করালবদনা
বিস্তারে একাধিপত্য। শ্বসয়ে অযুত ফণিফণা
দিবানিশি ফাটি রোষে ; ঘোরনীল বিবর্ণ অনল
শিখাসংঘ আলোড়িয়া দাপাদাপি করে দেশময়
তমোহন্ত এড়াইতে— প্রাণ যথা কালের কবল।

উচ্চারিত এবং অনুচ্চারিত মাত্রা নিয়ে পয়ার যেমন আট পদমাত্রায় সমান দুই ভাগে বিভক্ত এ তা নয়। এর এক ভাগে উচ্চারিত মাত্রা আট, অন্য ভাগে উচ্চারিত মাত্রা দশ। এইরকম অসমান ভাগে ছন্দের গাম্ভীর্য বাড়ে। ছন্দে পদে পদে ঠিক সমান ওজন দাবি করা কানের যেন একটা বাঁধা মৌতাতের মতো দাঁড়ায়, সেইটি ভেঙে দিলে ছন্দের গৌরব আরো বাড়ে। সংস্কৃত মন্দাক্রান্তার অসমান ভাগের গাম্ভীর্য সবাই জানেন—

কশ্চিৎকান্তা- বিরহগুরুণা স্বাধিকার- প্রমত্তঃ।

এর প্রথম ভাগে আট, দ্বিতীয় ভাগে সাত, তৃতীয় ভাগে সাত, এবং চতুর্থ ভাগে চার[১] মাত্রা। এমনতরো ভাগে কানের কোনো সংকীর্ণ অভ্যাস হবার জো নেই।

সংস্কৃতের সঙ্গে সাধু বাংলা সাহিত্যের ছন্দের যে-একটি বিশেষ প্রভেদ আছে সেইটির কথা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। সংস্কৃত-উচ্চারণের বিশেষত্ব হচ্ছে তার ধ্বনির দীর্ঘহ্রস্বতা। সেইজন্য সংস্কৃতছন্দ কেবলমাত্র পদক্ষেপের মাত্রা গণনা করেই নিশ্চিন্ত থাকে না, নির্দিষ্ট নিয়মে দীর্ঘহ্রস্ব মাত্রাকে সাজানো তার ছন্দের অঙ্গ। আমি একটি বাংলা বই থেকে এর দৃষ্টান্ত তুলছি। বইটির নাম 'ছন্দঃকুসুম'। আর চুয়ান্ন বছর পূর্বের এটি রচনা। লেখক ভুবনমোহন রায়চৌধুরী রাধাকৃষ্ণের লীলাচ্ছলে বাংলা ভাষায় সংস্কৃতছন্দের দৃষ্টান্ত দিয়ে ছন্দ শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছেন। কৃষ্ণবিরহিণী রাধা কালো রঙটারই দূষণীয়তা প্রমাণ করবার জন্যে যখন কালো কোকিল, কালো ভ্রমর, কালো পাথর, কালো লোহার নিন্দা করলেন তখন অপর পক্ষের উকিল লোহার দোষ ক্ষালন করতে প্রবৃত্ত হলেন।

॥ । ।	॥ । ।	॥ । ।	॥ । ।	॥ । ।	॥ । ।	॥ । ।	॥ । ।
দেখহ	সুন্দর	লৌহর-	থে চড়ি	লৌহপ-	থে কত	লোক চ-	লে . . ,
ষষ্ঠ মু-	হূর্তক	মধ্য ক-	রে গতি	যোজন	পঞ্চ দ-	শের প-	থে . . ।
লৌহবি-	নির্মিত	তার ত-	রে বহু	দূর অ-	বস্থিত	লোক স-	বে . . ,
দূর অ-	বস্থিত	বন্ধু স-	নে সুখ-	চিত্ত প-	রস্পর	বাক্য ক-	হে . . ॥

১ পাঁচ?

এই কবিতাটির যুক্তি ও আধ্যাত্মিক রসমাধুর্যের বিচারভার আধুনিককালের বস্তুতান্ত্রিক উকিল রসিকদের উপর অর্পণ করা গেল। তা ছাড়া লোকশিক্ষায় এর প্রয়োজনীয়তার তর্ক তোলবার অধিকারীও আমি নই। আমি ছন্দের দিক দিয়ে বলছি, এর প্রত্যেক পদভাগে একটি দীর্ঘ ও দুইটি হ্রস্ব মাত্রা, সেই দীর্ঘহ্রস্বের ওঠাপড়ার পর্যায়ই হচ্ছে এই ছন্দের প্রকৃতি। বাংলায় স্বরের দীর্ঘহ্রস্বতা নাই কিম্বা নাই বললেই হয়, এবং যুক্তব্যঞ্জনকে সাধু বাংলা কোনো গৌরব দেয় না, অযুক্তের সঙ্গে একই বাটখারায় তার ওজন চলে। অতএব মাত্রাসংখ্যা মিলিয়ে ওই লোহার স্তব যদি বাংলা ছন্দে লেখা যায় তা হলে তার দশা হয় এই—

দেখ দেখ   মনোহর   লোহার গা-   ড়িতে চড়ি
লোহাপথে   কত শত   মানুষ চ-   লিছে
দেখিতে দে-   খিতে তারা   যোজন যো-   জন পথ
অনায়াসে   তরে যায়   টিকিট কি-   নিয়া।
যেসব মা-   নুষ আছে   অনেক দূ-   রের দেশে,
লোহা দিয়ে   গড়া তার   রয়েছে ব-   লিয়া,
সুদূর বঁ-   ধুর সাথে   কত যে ম-   নের সুখে
কথা চালা-   চালি করে   নিমেষে নি-   মেষে॥

বাংলায় আর সবই রইল— মাত্রাও রইল, আর সম্ভবত আধ্যাত্মিকতারও হানি হয় নি, কেননা ভক্তির টিকিট থাকলে লোহার গাড়ি যে কঠিন লোহার পথও তরিয়ে দেয় এবং বঁধুর সঙ্গে যতই দূরত্ব থাক্‌ স্বয়ং লোহার তারে তাদের কথা চালাচালি হতে পারে এ ভাবটা বাংলাতেও প্রকাশ পাচ্ছে— কিন্তু মূল ছন্দের প্রকৃতিটা বাংলায় রক্ষা পায় নি। এ কেমন, যেমন ঢেউ-খেলানো দেশের জমির পরিমাণ সমতল দেশে জরিপের দ্বারা মিলিয়ে নেওয়া। তাতে জমি পাওয়া গেল কিন্তু ঢেউ পাওয়া গেল না। অথচ ঢেউটা ছন্দের একটা প্রধান জিনিস। সমতল বাংলা আপন কাব্যের ভাষাকে সমতল করে দিয়েছে। এ হচ্ছে কাজকে সহজ করবার একটা কৃত্রিম বাঁধা নিয়ম। আমরা যখন বলি থার্ড্‌ক্লাসের ছেলে, তখন মনে ধরে নিই যেন সব ছেলেই সমান মাত্রার। কিন্তু আসলে থার্ড্‌ক্লাসের আদর্শকে যদি একটা সরল রেখা বলে ধরে নিই তবে কোনো ছেলে সেই রেখার উপরে চড়ে কেউ-বা তার নীচে নামে। ভালো শিক্ষাপ্রণালী তাকেই বলে যাতে প্রত্যেক ছেলেকে তার নিজের স্বতন্ত্র বুদ্ধি ও শক্তির মাত্রা অনুসারে ব্যবহার করা যায়, থার্ড্‌ক্লাসের একটা কাল্পনিক মাত্রা ক্লাসের সকল ছেলের উপরে সমানভাবে আরোপ না করা যায়। কিন্তু কাজ

সহজ করবার জন্য বহু অসমানকে এক সমান কাঠগড়ায় বন্দী করবার নিয়ম আছে। সাধু বাংলার ছন্দে তারই প্রমাণ পাই। হলন্ত[১]ই হোক, হসন্তই হোক, আর যুক্তবর্ণই হোক, এই ছন্দে সকলেরই সমান মাত্রা।

অথচ প্রাকৃত-বাংলার প্রকৃতি সমতল নয়। সংস্কৃতের নিয়মে না হোক, নিজের নিয়মে তার একটা ঢেউখেলা আছে। তার কথার সকল অংশ সমান ওজনের নয়। বস্তুত পদে পদেই তার শব্দ বন্ধুর হয়ে ওঠে। তার কারণ, প্রাকৃত-বাংলায় হসন্তের প্রাদুর্ভাব খুব বেশি। এই হসন্তের দ্বারা ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে সংঘাত জন্মাতে থাকে, সেই সংঘাতে ধ্বনি গুরু হয়ে ওঠে। প্রাকৃত-বাংলার এই গুরুধ্বনির প্রতি যদি সদ্ব্যবহার করা যায় তা হলে ছন্দের সম্পদ বেড়ে যায়। প্রাকৃত-বাংলার দৃষ্টান্ত—

বৃষ্টি পড়ে   টাপুর্ টুপুর্   নদেয় এল   বান্।
শিব্ ঠাকুরের্   বিয়ে হবে   তিন্ কন্যে   দান্॥
এক্ কন্যে   রাঁধেন্ বাড়েন্   এক্ কন্যে   খান্।
এক্ কন্যে   না পেয়ে   বাপের্ বাড়ি   যান্॥

এই ছড়াটিতে দুটি জিনিস দেখবার আছে। এক হচ্ছে, বিসর্গের[২] ঘটকালিতে ব্যঞ্জনের সঙ্গে ব্যঞ্জনের সম্মিলন, আর-এক হচ্ছে 'বৃষ্টি' এবং 'কন্যে' কথার যুক্তবর্ণকে যথোচিত মর্যাদা দেওয়া। এই ছড়া সাধু বাংলার ছন্দে বাঁধলে পালিশ-করা আবলুস কাঠের মতো পিছল হয়ে ওঠে।

বারি ঝরে   ঝর ঝর   নদিয়ায় বান।
শিবুঠাকুরের বিয়ে তিন মেয়ে দান॥
এক মেয়ে রাঁধিছেন এক মেয়ে খান।
এক মেয়ে ক্ষুধাভরে পিতৃঘরে যান॥

এতে যুক্তবর্ণের সংযোগ হলেও ছন্দের উল্লাস তাতে বিশেষ বাড়ে না। যথা—

মন্দ মন্দ   বৃষ্টি পড়ে   নবদ্বীপে   বান।
শিবুঠাকুরের বিয়া তিন কন্যা দান॥
এক কন্যা রান্ধিছেন এক কন্যা খান।
এক কন্যা ঊর্ধ্বশ্বাসে পিতৃগৃহে যান॥

এই-সব যুক্তবর্ণের যোগে এ ছন্দ বন্ধুর হয়ে উঠেছে বটে কিন্তু তরঙ্গিত হয় নি, কেননা যুক্তবর্ণ যথেচ্ছ ছড়ানো হয়েছে মাত্র, তাদের মর্যাদা অনুসারে জায়গা দেওয়া হয় নি।

১ 'স্বরান্ত' অর্থে ব্যবহৃত।

২ স্বর-বিসর্জনের।

অর্থাৎ, হাটের মধ্যে ছোটোয় বড়োয় যেমন গায়ে গায়ে ভিড় করে তেমনি, সভার মধ্যে যেমন তারা যথাযোগ্য আসন পায় তেমন নয়।

ছন্দঃকুসুম বইটির লেখক প্রাকৃত-বাংলার ছন্দ সম্বন্ধে অনুষ্টুভ ছন্দে বিলাপ করে বলছেন—

পাঁচালী নাম বিখ্যাতা সাধারণ-মনোরমা।
পয়ার ত্রিপদী আদি প্রাকৃতে হয় চালনা॥
দ্বিপাদে শ্লোক সংপূর্ণ তুল্যসংখ্যার অক্ষরে।
পাঠে দুই পদে মাত্র শেষাক্ষর সদা মিলে॥
পঠনে সে সব ছন্দঃ রাখিতে তালগৌরব।
পঠিছে সর্বদা লোকে উচ্চারণ-বিপর্যয়ে॥
লঘুকে গুরু সম্ভাষে দীর্ঘবর্ণে কহে লঘু।
হ্রস্বে দীর্ঘে সমজ্ঞানে উচ্চারণ করে সবে॥

কবির এই বিলাপের সঙ্গে আমিও যোগ দিচ্ছি। কেবল আমি এই বলতে চাই, প্রাকৃত বাংলার ছন্দে এমনতরো দুর্ঘটনা ঘটে না, এ-সব ঘটে সংস্কৃত-বাংলার ছন্দে। প্রাকৃত-বাংলার যে স্বকীয় দীর্ঘহ্রস্বতা আছে তার ছন্দে তার বিপর্যয় দেখি নে, কিন্তু সাধু ভাষায় দেখি।

এই প্রাকৃত-বাংলা মেয়েদের ছড়ায়, বাউলের গানে, রামপ্রসাদের পদে আপন স্বভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সাধুসভায় তার সমাদর হয় নি বলে সে মুখ ফুটে নিজের সব কথা বলতে পারে নি এবং তার শক্তি যে কত তারও সম্পূর্ণ পরিচয় হল না। আজকের দিনের ডিমক্রেসির যুগেও সে ভয়ে ভয়ে দ্বিধা করে চলেছে; কোথায় যে তার পঙ্‌ক্তি এবং কোথায় নয় তা স্থির হয় নি। এই সংকোচে তার আত্মপরিচয়ের খর্বতা হচ্ছে। আমরা একটা কথা ভুলে যাই প্রাকৃত-বাংলার লক্ষ্মীর পেট্রায় সংস্কৃত, পারসি, ইংরেজি প্রভৃতি নানা ভাষা থেকেই শব্দসঞ্চয় হচ্ছে, সেইজন্যে শব্দের দৈন্য প্রাকৃত-বাংলার স্বভাবগত বলে মনে করা উচিত নয়। প্রয়োজন হলেই আমরা প্রাকৃত-ভাণ্ডারে সংস্কৃত শব্দের আমদানি করতে পারব। কাজেই যেখানে অর্থের বা ধ্বনির প্রয়োজনবশত সংস্কৃত শব্দই সংগত সেখানে প্রাকৃত-বাংলায় তার বাধা নেই। আবার ফার্সি কথাও তার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা একসারে বসিয়ে দিতে পারি। সাধুবাংলায় তার বিঘ্ন আছে, কেননা সেখানে জাতি রক্ষা করাকেই সাধুতা রক্ষা করা বলে। প্রাকৃত ভাষার এই ঔদার্য গদ্যে পদ্যে আমাদের সাহিত্যের একটি পরম সম্পদ, এই কথা মনে রাখতে হবে।

চৈত্র ১৩২৪

ছন্দের হসন্ত হলন্ত[1]

আমার নিজের বিশ্বাস যে, আমরা ছন্দ রচনা করি স্বতই কানের ওজন রেখে, বাজারে প্রচলিত কোনো বাইরের মানদণ্ডের দ্বারা মেপে মেপে এ কাজ করি নে, অন্তত সজ্ঞানে নয়। কিন্তু ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন এই বলে আমাদের দোষ দিয়েছেন যে—আমরা একটা কৃত্রিম মানদণ্ড দিয়ে, পাঠকের কানকে ফাঁকি দিয়ে, তার চোখ ভুলিয়ে এসেছি; আমরা ধ্বনি চুরি করে থাকি অক্ষরের আড়ালে।

ছন্দোবিৎ কী বলছেন ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করা যাক। তাঁর প্রবন্ধে আমার লেখা থেকে কিছু লাইন তুলে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তস্বরূপে ব্যবহার করেছেন। যথা—

+ । + । ।
উদয়দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে।
+ ।
মোর চিত্ত মাঝে,
+
চিরনূতনেরে দিল ডাক
। +
পঁচিশে বৈশাখ।

তিনি বলেন, "এখানে দণ্ডচিহ্নিত যুগ্মধ্বনিগুলিকে এক বলে ধরা হয়েছে, কারণ এগুলি শব্দের মধ্যে অবস্থিত; আর যোগচিহ্নিত যুগ্মধ্বনিগুলিকে দুই বলে ধরা হয়েছে, যেহেতু এগুলি শব্দের অন্তে অবস্থিত।" অর্থাৎ 'উদয়'-এর অয়্ হয়েছে দুই মাত্রা অথচ 'দিগন্ত'-এর অন্ হয়েছে এক মাত্রা, এইজন্যে 'উদয়' শব্দকেও তিন মাত্রা এবং 'দিগন্ত' শব্দকেও তিন মাত্রা গণনা করা হয়েছে। 'যুগ্মধ্বনি' শব্দটার পরিবর্তে ইংরেজি সিলেব্‌ল্ শব্দ ব্যবহার করলে অনেকের পক্ষে সহজ হবে। আমি তাই করব।

বহুকালপূর্বে একদিন বাংলার শব্দতত্ত্ব আলোচনা করেছিলুম। সেই প্রসঙ্গে ধ্বনিতত্ত্বের কথাও মনে উঠেছিল। তখন দেখেছিলুম, বাংলায় স্বরবর্ণ যদিও সংস্কৃত বানানের হ্রস্বদীর্ঘতা মানে না তবু এ সম্বন্ধে তার নিজের একটি স্বকীয় নিয়ম আছে। সে হচ্ছে বাংলায় হসন্ত শব্দের পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন জল, চাঁদ। এ দুটি শব্দের

১ 'হলন্ত' শব্দটি কবিকর্তৃক স্বরান্ত অর্থে ব্যবহৃত।

উচ্চারণে জ-এর অ এবং চাঁ-এর আ আমরা দীর্ঘ করে টেনে পরবর্তী হসন্তের ক্ষতিপূরণ করে থাকি। জল এবং জলা, চাঁদ এবং চাঁদা শব্দের তুলনা করলে এ কথা ধরা পড়বে। এ সম্বন্ধে বাংলার বিখ্যাত ধ্বনিতত্ত্ববিৎ সুনীতিকুমারের বিধান নিলে নিশ্চয়ই তিনি আমার সমর্থন করবেন। বাংলায় ধ্বনির এই নিয়ম স্বাভাবিক বলেই আধুনিক বাঙালি কবি ও ততোধিক আধুনিক বাঙালি ছন্দোবিৎ জন্মাবার বহু পূর্বেই বাংলা ছন্দে প্রাক্‌হসন্ত স্বরকে দুই মাত্রার পদবি দেওয়া হয়েছে। আজ পর্যন্ত কোনো বাঙালির কানে ঠেকে নি ; এই প্রথম দেখা গেল, নিয়মের ধাঁধায় পড়ে বাঙালি পাঠক কানকে অবিশ্বাস করলেন। কবিতা লেখা শুরু করবার বহুপূর্বে সবে যখন দাঁত উঠেছে তখন পড়েছি, "জল পড়ে, পাতা নড়ে।" এখানে 'জল' যে 'পাতা'র চেয়ে মাত্রা-কৌলীন্যে কোনো অংশে কম, এমন সংশয় কোনো বাঙালি শিশু বা তার পিতামাতার কানে বা মনেও উদয় হয় নি। এইজন্যে ওই দুটো কথা অনায়াসে এক পঙ্‌ক্তিতে বসে গেছে, আইনের ঠেলা খায় নি। ইংরেজি মতে 'জল' সর্বত্রই এক সিলেব্‌ল্, 'পাতা' তার ডবল ভারী। কিন্তু জল শব্দটা ইংরেজি নয়। 'কাশীরাম' নামের 'কাশী' এবং 'রাম' যে একই ওজনের এ কথাটা কাশীরামের স্বজাতীয় সকলকেই মানতেই হয়েছে। 'উদয়দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে' এই লাইনটা নিয়ে আজ পর্যন্ত প্রবোধচন্দ্র ছাড়া আর কোনো পাঠকের কিছুমাত্র খটকা লেগেছে বলে আমি জানি নে, কেননা তারা সবাই কান পেতে পড়েছে, নিয়ম পেতে নয়। যদি কর্তব্যবোধে নিতান্তই খটকা লাগা উচিত হয়, তা হলে সমস্ত বাংলাকাব্যের পনেরো-আনা লাইনের এখনই প্রুফ সংশোধন করতে বসতে হবে।

লেখক আমার একটা মস্ত ফাঁকি ধরেছেন। তিনি বলেন, আমি ইচ্ছামত কোথাও 'ঐ' লিখি, কোথাও লিখি 'ওই', এই উপায়ে পাঠকের চোখ ভুলিয়ে অক্ষরের বাটখারার চাতুরীতে একই উচ্চারণকে জায়গা বুঝে দুইরকমের মূল্য দিয়েছি।

তা হলে গোড়াকার ইতিহাসটা বলি। তখনকার দিনে বাংলা কবিতায় এক-একটি অক্ষর এক সিলেব্‌ল্ বলেই চলত। অথচ সে দিন কোনো কোনো ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে দ্বৈমাত্রিক বলে গণ্য করার দরকার আছে বলে অনুভব করেছিলুম।

আকাশের ওই আলোর কাঁপন
নয়নেতে এই লাগে,
সেই মিলনের তড়িৎ-তাপন
নিখিলের রূপে জাগে।

আজকের দিনে এমন কথা অতি অর্বাচীনকেও বলা অনাবশ্যক যে, ওই ত্রৈমাত্রিক ভূমিকায় ছন্দকে নীচের মতো রূপান্তরিত করা অপরাধ—

ঐ যে তপনের রশ্মির কম্পন
এই মস্তিষ্কেতে লাগে,
সেই সম্মিলনে বিদ্যুৎ-ঝম্পন
বিশ্বমূর্তি হয়ে জাগে।

অথচ সে দিন বৃত্রসংহারে এইজাতীয় ছন্দে হেমচন্দ্র ঐন্দ্রিলার রূপবর্ণনায় অসংকোচে লিখতে পেরেছিলেন—

বদনমণ্ডলে ভাসিছে ব্রীড়া।

বেশ মনে আছে, সে দিন স্থানবিশেষে 'ঐ' শব্দের বানান নিয়ে আমাকে ভাবতে হয়েছিল। প্রবোধচন্দ্র নিশ্চয় বলবেন, "ভেবে যা হয় একটা স্থির ক'রে ফেলাই ভালো ছিল। কোথাও বা 'ঐ', কোথাও বা 'ওই' বানান কেন।" তার উত্তর এই, বাংলায় স্বরের হ্রস্বদীর্ঘতা সংস্কৃতের মতো বাঁধা নিয়ম মানে না, ওর মধ্যে অতি সহজেই বিকল্প চলে। "ও—ই দেখো, খোকা ফাউন্টেন পেন মুখে পুরেছে", এখানে দীর্ঘ ওকারে কেউ দোষ ধরবে না। আবার যদি বলি "ঐ দেখো, ফাউণ্টেন পেনটা খেয়ে ফেললে বুঝি", তখন হ্রস্ব ঐকার নিয়ে বচসা করবার লোক মিলবে না। বাংলা উচ্চারণে স্বরের ধ্বনিতে টান দিয়ে অতি সহজেই বাড়ানো-কমানো যায় বলেই ছন্দে তার গৌরব বা লাঘব নিয়ে আজ পর্যন্ত দলাদলি হয় নি।

এ-সব কথা দৃষ্টান্ত না দিলে স্পষ্ট হয় না, তাই দৃষ্টান্ত তৈরি করতে হল।

মনে পড়ে দুইজনে জুঁই তুলে বাল্যে
নিরালায় বনছায় গেঁথেছিনু মাল্যে।
দোঁহার তরুণ প্রাণ বেঁধে দিল গন্ধে
আলোয়-আঁধারে-মেশা নিভৃত আনন্দে॥

এখানে 'দুই' 'জুঁই' আপন আপন উকারকে দীর্ঘ করে দুই সিলেব্‌ল্-এর টিকিট পেয়েছে, কান তাদের সাধুতায় সন্দেহ করলে না, দ্বার ছেড়ে দিলে। উলটো দৃষ্টান্ত দেখাই।

এই যে এল সেই আমারি স্বপ্নে দেখা রূপ,
কই দেউলে দেউটি দিলি, কই জ্বালালি ধূপ।
যায় যদি রে যাক-না ফিরে, চাই নে তারে রাখি,
সব গেলেও হায় রে তবু স্বপ্ন রবে বাকি॥

এখানে 'এই' 'সেই' 'কই' 'যায়' 'হায়' প্রভৃতি শব্দ এক সিলেব্‌ল্‌-এর বেশি মান দাবি করলে না। বাঙালি পাঠক সেটাকে অন্যায় না মনে করে সহজ ভাবেই নিলে।

কাঁধে মই, বলে, "কই ভুঁইচাঁপা গাছ।"
দইভাঁড়ে ছিপ ছাড়ে, খোঁজে কইমাছ।
ঘুঁটে ছাই মেখে লাউ রাঁধে ঝাউপাতা,
কী খেতাব দেব তায় ঘুরে যায় মাথা॥

এখানে 'মই' 'কই' 'ভুঁই' 'দই' 'ছাই' 'লাউ' প্রভৃতি সকলেরই সমান দৈর্ঘ্য, যেন গ্র্যানেডিয়ারের সৈন্যদল। যে পাঠক এটা পড়ে দুঃখ পান নি সেই পাঠককেই অনুরোধ করি, তিনি পড়ে দেখুন—

দুইজনে জুঁই তুলতে যখন
গেলেম বনের ধারে,
সন্ধ্যা-আলোর মেঘের ঝালর
ঢাকল অন্ধকারে।
কুঞ্জে গোপন গন্ধ বাজায়
নিরুদ্দেশের বাঁশি,
দোঁহার নয়ন খুঁজে বেড়ায়
দোঁহার মুখের হাসি॥

এখানে যুগ্মধ্বনিগুলো এক সিলেব্‌ল্‌-এর চাকার গাড়িতে অনায়াসে ধেয়ে চলেছে। চণ্ডীদাসের গানে রাধিকা বলেছেন, "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো।" বাঁশি-ধ্বনির এই তো ঠিক পথ, নিয়মের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করলে মরমে পৌঁছত না। কবিরাও সেই কান লক্ষ্য করে চলেন, নিয়ম যদি চৌমাথার পাহারাওয়ালার মতো সিগ্‌ন্যাল তোলে তবু তাঁদের রুখতে পারে না।

আমার দুঃখ এই, তথাচ আইনবিৎ বলছেন যে, লিপিপদ্ধতির দোষে 'অক্ষর গুনে ছন্দরচনার অন্ধ অভ্যাস' আমাদের পেয়ে বসেছে। আমার বক্তব্য এই যে, ছন্দরচনার অভ্যাসটাই অন্ধ অভ্যাস। অন্ধের কান খুব সজাগ, ধ্বনির সংকেতে সে চলতে পারে, কবিরও সেই দশা। তা যদি না হত তা হলেই পায়ে পায়ে কবিকে চোখে চশমা এঁটে অক্ষর গ'নে গ'নে চলতে হত।

'বৎসর' 'উৎসব' প্রভৃতি খণ্ড ৎ-ওয়ালা কথাগুলোকে আমরা ছন্দের মাপে বাড়াই কমাই, এরকম চাতুরী সম্ভব হয় যেহেতু খণ্ড ৎ-কে কখনো আমরা চোখে দেখার সাক্ষ্যে এক অক্ষর ধরি, আবার কখনো কানে শোনার দোহাই দিয়ে তাকে আধ অক্ষর বলে

চালাই— প্রবন্ধলেখক এই অপবাদ দিয়েছেন। অভিযোগকারীর বোঝা উচিত, এটা একেবারেই অসম্ভব, কেননা ছন্দের কাজ চোখ-ভোলানো নয়, কানকে খুশি করা— সেই কানের জিনিসে ইঞ্চি-গজের মাপ চলেই না। 'বৎসর' প্রভৃতি শব্দ গেঞ্জিজামার মতো ; মধুপুরের স্বাস্থ্যকর হাওয়ায় দেহ এক-আধ ইঞ্চি বাড়লেও চলে, আবার শহরে এসে এক-আধ ইঞ্চি কমলেও সহজে খাপ খেয়ে যায়। কান যদি সম্মতি না দিত তা হলে কোনো কবির সাধ্য ছিল না ছন্দ নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারে।

বৎসরে বৎসরে হাঁকে কালের গোমায়ু—
যায় আয়ু, যায় আয়ু, যায় যায় আয়ু।

এখানে 'বৎসর' তিন মাত্রা। কিন্তু সেতারে মীড় লাগাবার মতো অল্প একটু টানলে বেসুর লাগে না। যথা—

সখা-সনে উৎসবে বৎসর যায়
শেষে মরি বিরহের ক্ষুৎপিপাসায়।
ফাগুনের দিনশেষে মউমাছি ও যে
মধুহীন বনে বৃথা মাধবীরে খোঁজে।

টান কমিয়ে দেওয়া যাক—

উৎসবের রাত্রিশেষে মৃৎপ্রদীপ হায়,
তারকার মৈত্রী ছেড়ে মৃত্তিকারে চায়।

দেখা যাচ্ছে, এটুকু কমিবেশিতে মামলা চলে না, বাংলাভাষার স্বভাবের মধ্যেই যথেষ্ট প্রশ্রয় আছে। যদি লেখা যেত

সখাসনে মহোৎসবে বৎসর যায়

তা হলে নিয়ম বাঁচত, কারণ পূর্ববর্তী ওকারের সঙ্গে খণ্ড ৎ মিলে এক মাত্রা ; কিন্তু কর্ণধার বলছে ওইখানটায় তরণী যেন একটু কাত হয়ে পড়ল। আমি এক জায়গায় লিখেছি 'উদয়-দিক্‌প্রান্ত-তলে'। ওটাকে বদলে 'উদয়ের দিক্‌প্রান্ত-তলে' লিখলে কানে খারাপ শোনাত না এ কথা প্রবন্ধলেখক বলেছেন, সালিসির জন্যে কবিদের উপর বরাত দিলুম।

অপর পক্ষে দেখা যাক, চোখ ভুলিয়ে ছন্দের দাবিতে ফাঁকি চালানো যায় কি না।

এখনই আসিলাম দ্বারে,
অমনই ফিরে চলিলাম।
চোখও দেখে নি কভু তারে,
কানই শুনিল তার নাম।

'তোমারি', 'যখনি' শব্দগুলির ই-কারকে বাংলা বানানে অনেক সময় বিচ্ছিন্ন করে লেখা হয়, সেই সুযোগ অবলম্বন করে কোনো অলস কবি ওগুলোকে চার মাত্রার কোঠায় বসিয়ে ছন্দ ভরাট করেছেন কি না জানি নে, যদি করে থাকেন বাঙালি পাঠক তাঁকে শিরোপা দেবে না। ওদের উকিল তখন 'বৎসর' 'উৎসব' 'দিক্‌প্রান্ত' প্রভৃতি শব্দগুলির নজির দেখিয়ে তর্ক করবে। তার একমাত্র উত্তর এই যে, কান যেটাকে মেনে নিয়েছে কিম্বা মেনে নেয় নি, চোখের সাক্ষ্য নিয়ে কিম্বা বাঁধানিয়মের দোহাই দিয়ে সেখানে তর্ক তোলা অগ্রাহ্য। যে-কোনো কবি উপরের ছড়াটাকে অনায়াসে বদল করে লিখতে পারে—

এখনি আসিনু তার দ্বারে,
অমনি ফিরিয়া চলিলাম।
চোখেও দেখি নি কভু তারে,
কানেই শুনেছি তার নাম।

'বৎসর' 'উৎসব' প্রভৃতি শব্দ যদি তিন মাত্রার কোঠা পেরোতে গেলেই স্বভাবতই খুঁড়িয়ে পড়ত তা হলে তার স্বাভাবিক ওজন বাঁচিয়ে ছন্দ চালানো এতই দুঃসাধ্য হত যে, ধ্বনিকে এড়িয়ে অক্ষরগণনার আশ্রয়ে শেষে মান-বাঁচানো আবশ্যক হত। ওটা চলে বলেই চালানো হয়েছে, দায়ে পড়ে না। কেবল অক্ষর সাজিয়ে অচল রীতিকে ছন্দে চালানো যদি সম্ভব হত তা হলে খোকাবাবুকে কেবল লম্বা টুপি পরিয়ে দাদামশায় বলে চালানো অসাধ্য হত না।

পৌষ ১৩৩৮

২

দিলীপকুমার আশ্বিনের 'উত্তরা'য় ছন্দ সম্বন্ধে আমার দুই-একটি চিঠির খণ্ড ছাপিয়েছেন। সর্বশেষে যে নোটটুকু দিয়েছেন তার থেকে বোঝা গেল, আমি যে কথা বলতে চেয়েছি এখনো সেটা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয় নি।

তিনি আমারই লেখার নজির তুলে দেখিয়েছেন যে, নিম্নলিখিত কবিতায় আমি 'একেকটি' শব্দটাকে চার মাত্রার ওজন দিয়েছি।

ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত
গল্প লিখি একেকটি করে।

এ দিকে নীরেনবাবুর রচনায় "একটি কথা এতবার হয় কলুষিত" পদটিতে 'একটি'

শব্দটাকে দুই মাত্রায় গণ্য করতে আপত্তি করি নি বলে তিনি দ্বিধা বোধ করছেন। তর্ক না করে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

একটি কথার লাগি তিনটি রজনী জাগি,
একটুও নাহি মেলে সাড়া।
সখীরা যখন জোটে মুখে তব বন্যা ছোটে,
গোলমালে তোলপাড় পাড়া॥

'একটি' 'তিনটি' 'একটু' শব্দগুলি হসন্তমধ্য, 'গোলমাল' 'তোলপাড়'ও সেই জাতের। অথচ হসন্তে ধ্বনিলাঘবতার অভিযোগে ওদের মাত্রা জরিমানা দিতে হয় নি। তিন মাত্রা ও চার মাত্রার গৌরবেই রয়ে গেল। কেউ কেউ বলেন, কেবলমাত্র অক্ষরগণনার দোহাই দিয়েই এরা মান বাঁচিয়েছে, অর্থাৎ যদি যুক্ত অক্ষরের ছাঁদে লেখা যেত তা হলেই ছন্দে ধ্বনির কমতি ধরা পড়ত। আমার বক্তব্য এই যে, চোখ দিয়ে ছন্দ পড়া আর বাইসিক্‌ল্-এর চাকা দিয়ে হামাগুড়ি দেওয়া একই কথা, ওটা হবার জো নেই। বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা বোঝা যাবে।

টোট্‌কা এই মুষ্টিযোগ লট্‌কানের ছাল,
সিট্‌কে মুখ খাবি, জ্বর আট্‌কে যাবে কাল।

বলে রাখা ভালো এটা ভিষক-ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন নয়, সাহিত্য-ডাক্তারের বানানো ছড়া, ছন্দ সম্বন্ধে মতসংশয় নিবারণের উদ্দেশ্যে; এর থেকে অন্য কোনো রোগের প্রতিকার কেউ যেন আশা না করেন। আরো একটা—

একটি কথা শুনিবারে তিন্‌টে রাত্রি মাটি,
এর পরে ঝগ্‌ড়া হবে, শেষে দাঁত্‌কপাটি॥

অথবা—

একটি কথা শোনো, মনে খট্‌কা নাহি রেখে,
টাট্‌কা মাছ জুট্‌ল না তো, শুঁট্‌কি দেখো চেখে।

শেষের তিনটি ছড়ায় অক্ষর গুনতি করতে গেলে দৃশ্যত পয়ারের সীমা ছাড়িয়ে যায়, কিন্তু তাই বলেই যে পয়ার ছন্দের নির্দিষ্ট ধ্বনি বেড়ে গেল তা নয়। আপাতত মনে হয়, এটা যথেচ্ছাচার। কিন্তু হিসাব করে দেখলেই দেখা যাবে ছন্দের নীতি নষ্ট করা হয় নি। কেননা, তার জো নেই। এ তো রাজত্ব করা নয় কবিত্ব করা, এখানে লক্ষ্য হল মনোরঞ্জন; খামকা একটা জবরদস্তির আইন জারি করে তার পরে পাহারাওয়ালা লাগিয়ে দেওয়া, ব্যাপারটা এত সহজ নয়। ধ্বনির রাজ্যে গোঁয়ার্তমি করে কেউ জিতে যাবে এমন সাধ্য আছে কার। চব্বিশ ঘণ্টা কান রয়েছে সতর্ক।

আমি এই কথাটি বোঝাতে চেষ্টা করছি যে, আক্ষরিক ছন্দ বলে কোনো অদ্ভুত পদার্থ বাংলায় কিম্বা অন্য কোনো ভাষাতেই নেই। অক্ষর ধ্বনির চিহ্নমাত্র। যেমন 'জল' শব্দটাকে দিয়ে 'জল' পদার্থটার প্রতিবাদ চলে না, অক্ষরকে ধ্বনির প্রতিপক্ষ দাঁড় করানো তেমনি বিড়ম্বনা।

প্রশ্ন উঠবে, তাই যদি হয়, তা হলে খোঁড়া হসন্তবর্ণকে কখনো আধ মাত্রা কখনো পুরোমাত্রার পদবিতে বসানো হয় কেন। উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, স্বয়ং ভাষা যদি নিজেই আসন পেতে দেয় তবে তার উপরে অন্য কোনো আইন চলে না। ভাষাও বর্ণভেদে পঙ্‌ক্তির ব্যবস্থা নিজের ধ্বনির নিয়ম বাঁচিয়ে তবে করতে পারে। বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণের ধ্বনিমাত্রা বিকল্পে দীর্ঘ ও হ্রস্ব হয়ে থাকে, ধনুকের ছিলের মতো, টানলে বাড়ে, টান ছেড়ে দিলে কমে। সেটাকে গুণ বলেই গণ্য করি। তাতে ধ্বনিরসের বৈচিত্র্য হয়। আমরা দ্রুত লয়ে বলতে পারি 'এইরে', আবার তাকে টানলে ডবল করে বলতে পারি 'এ-ইরে'। তার কারণ আমাদের স্বরবর্ণগুলো জীবধর্মী, ব্যবহারের প্রয়োজনে একটা সীমার মধ্যে তাদের সংকোচন-প্রসারণ চলে। চারটে পাথরের মূর্তি ধরাবার মতো জায়গায় পাঁচটা ধরাতে গেলে মুশকিল বাধে; কিন্তু চারজন প্যাসেঞ্জার বসবার বেঞ্চিতে পাঁচজন মানুষ বসালে দুর্ঘটনার আশঙ্কা নেই, যদি তারা পরস্পর রাজি থাকে। বাংলা ভাষার স্বরবর্ণগুলিও পাথুরে নয়, নিজের স্থিতিস্থাপকতার গুণে তারা প্রতিবেশীর জন্যে একটু-আধটু জায়গার ব্যবস্থা করতে সহজেই রাজি থাকে। এইজন্যেই অক্ষরের সংখ্যা গণনা করে ছন্দের ধ্বনিমাত্রা গণনা বাংলায় চলে না। এটা বাঙালির আত্মীয়সভার মতন। সেখানে যতগুলো চৌকি তার চেয়ে মানুষ বেশি থাকা কিছুই অসম্ভব নয়, অথবা পাশে ফাঁক পেলে দুইজনের জায়গা একজনে হাত পা মেলে আরামে দখল করাও এই জনতার অভ্যস্ত। বাংলার প্রাকৃতছন্দ ধরে তার প্রমাণ দেওয়া যাক।

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান।
শিবঠাকুরের বিয়ে হবে, তিন কন্যে দান।

এটা তিন মাত্রার ছন্দ। অর্থাৎ চার পোয়ায় সেরওয়ালা এর ওজন নয়, তিন পোয়ায় এর সের। এর প্রত্যেক পা ফেলার লয় হচ্ছে তিনের।

বৃষ্‌টি | পড়ে- | টাপুর | টুপুর | নদেয় | এল | বা-ন |
শিবঠা | কুরের | বিয়ে- | হবে- | তিনক | ন্‌নে- | দা-ন |

দেখা যাচ্ছে, তিন গণনায় যেখানে যেখানে ফাঁক, পার্শ্ববর্তী স্বরবর্ণগুলি সহজেই ধ্বনি প্রসারিত করে সেই পোড়ো জায়গা দখল করে নিয়েছে। এত সহজে যে, হাজার

হাজার ছেলেমেয়ে এই ছড়া আউড়েছে, তবু ছন্দের কোনো গর্তে তাদের কারো কণ্ঠ স্খলিত হয় নি। ফাঁকগুলো যদি ঠেসে ভরাতে কেউ ইচ্ছা করেন— দোহাই দিচ্ছি, না করেন যেন— তবে এইরকম দাঁড়াবে—

বৃষ্টি পড়ছে টাপুর টুপুর নদেয় আসছে বন্যা,
শিব ঠাকুরের বিয়ের বাসরে দান হবে তিন কন্যা।

রামপ্রসাদের একটি গান আছে—

মা আমায় ঘুরাবি কত
চোখবাঁধা বলদের মতো

এটাও তিন মাত্রা লয়ের ছন্দ।

মা-আ | মায় ঘু | রাবি- | কত- |

ফাঁক ভরাট করতে হলে হবে এই চেহারা—

হে মাতা আমারে ঘুরাবি কতই
চক্ষুবদ্ধ বৃষের মতোই।

যাঁরা অক্ষর গণনা করে নিয়ম বাঁধেন তাঁদের জানিয়ে রাখা ভালো যে, স্বরবর্ণে টান দিয়ে মিড় দেবার জন্যেই প্রাকৃত-বাংলা ছন্দে কবিরা বিনা দ্বিধায় ফাঁক রেখে দেন; সেই ফাঁকগুলো ছন্দেরই অঙ্গ, সে-সব জায়গায় ধ্বনির রেশ কিছু কাজ করবার অবকাশ পায়।

হারিয়ে ফেলা বাঁশি আমার পালিয়েছিল বুঝি
লুকোচুরির ছলে।

এর মধ্যে প্রায় প্রত্যেক যতিতে ফাঁক আছে।

১ ২ ৩ ৪
হারিয়ে ফেলা- | বাঁশি আমা-র | পালিয়েছিল | বুঝি— |
৫ ৬
লুকোচুরি-র | ছলে— |

কিছু বৈচিত্র্যও দেখছি। প্রথম দুটি বিভাগে সমান্তরাল ফাঁক। কিন্তু তিনের ভাগে ফাঁক বাদ গিয়ে একেবারে চতুর্থ ভাগের শেষে দীর্ঘ ফাঁক পড়েছে। পাঠক 'হারিয়ে ফেলা'র পরেও ফাঁক না দিয়ে একেবারে দ্বিতীয় ভাগের শেষে যদি সেটা পূরণ করে দেন তবে ভালোই শুনতে হবে। কিন্তু যদি বেফাঁক ঠাসবুনানির বিশেষ ফরমাশ থাকে তা হলে সেটাও চেষ্টা করলে মন্দ হবে না।

স্বপ্ন আমার বন্ধনহীন সন্ধ্যাতারার সঙ্গী
মরণযাত্রীদলে,
স্বর্ণবরণ কুজ্ঝটিকায় অন্তশিখর লঙ্ঘি
লুকায় মৌনতলে।

এই কথাটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে, হসন্তবর্ণের হ্রস্ব বা দীর্ঘ যে মাত্রাই থাক পাঠ করতে বাঙালি পাঠকের একটুও বাধে না, ছন্দের ঝোঁক আপনিই অবিলম্বে তাকে ঠিকমত চালনা করে।

পাৎলা করিয়া কাটো কাৎলা মাছেরে,
উৎসুক নাৎনি যে চাহিয়া আছে রে।

এই ছড়াটা পড়তে গেলে বাঙালি নিঃসংশয়ে স্বতই খণ্ড ৎ-এর পূর্ববর্তী স্বরবর্ণকে দীর্ঘ করে পড়বে। আবার যেমনি নিম্নের ছড়াটি সামনে ধরা—

পাৎলা করি কাটো, প্রিয়ে, কাৎলা মাছটিরে,
টাট্‌কা তেলে ফেলে দাও সরষে আর জিরে,
ভেট্‌কি যদি জোটে তাহে মাখো লঙ্কাবাঁটা,
যত্ন করে বেছে ফেলো টুক্‌রো যত কাঁটা—

অমনি প্রাক্‌-হসন্ত স্বরগুলিকে ঠেসে দিতে এক মুহূর্তও দেরি হবে না। এই যে বাংলা স্বরবর্ণের সজীবতা, একে কোনো কড়া নিয়মের চাপে আড়ষ্ট করে তাকে সর্বত্র সমানভাবে ব্যবহারযোগ্য করা উচিত— এ মত চালালে বাংলা ভাষাকে ফাঁকি দেওয়া হবে। শুকনো আমসত্ত্বের মধ্যেই সাম্য, কিন্তু সরস আমের মধ্যে বৈচিত্র্য, ভোজে কোন্‌টার দাম বেশি তা নিয়ে তর্ক অনাবশ্যক।

বাংলা প্রাকৃত ভাষার কাব্যে স্বরধ্বনির যে প্রাণবান্‌ স্বচ্ছন্দতা আছে সংস্কৃত বাংলা ভাষা, যাকে আমরা সাধুভাষা বলি, তার মধ্যে পড়ে সে কেন জেনানা মেয়ের মতো দেয়ালে আটকা পড়ে গেল। তার কারণ, সংস্কৃত-বাংলা কৃত্রিম ভাষা, ওখানে বাইরের নিয়মের প্রাধান্য, তার আপন নিয়ম অনেক জায়গায় কুণ্ঠিত। সভাস্থলে একটি আসনে একটি মানুষের স্থান নির্দিষ্ট; কারো বা দেহ ক্ষীণ, আসনে ফাঁক থেকে যায়, কারো বা স্থূল দেহ, আসনে ঠেসে বসতে হয়; কিন্তু গোনাগন্‌তি চৌকি, সীমা নির্দিষ্ট। যদি ফরাশে বসতে হত তা হলে কলেবরের তারতম্য ধরে মর্যাদার আসনের সীমানায় কমিবেশি স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটত। কিন্তু সভ্যতার মর্যাদার দিকে দৃষ্টি রেখে স্বভাবের নিয়মকে বাঁধানিয়মে পাকা করে দিতে হয়। তাতে কিছু পীড়ন ঘটলেও গাম্ভীর্যের পক্ষে তার একটা সার্থকতা আছে। সেইজন্যেই সভার

রীতি ও ঘরের রীতিতে কিছু ভেদ থাকেই। শকুন্তলার বাকল দেখে দুষ্মন্ত বলেছিলেন : কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্। কিন্তু যখন তাঁকে রাজান্তঃপুরে নিয়েছিলেন তখন তাঁকে নিশ্চয়ই বাকল পরান নি। তখন শকুন্তলার স্বাভাবিক শোভাকে অলংকৃত করেছিলেন, সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্যে নয়, মর্যাদারক্ষার জন্যে। রাজরানীর সৌন্দর্য ব্যক্তি-বিশেষে বিচিত্র, কিন্তু তাঁর মর্যাদার আদর্শ সকল রাজরানীর মধ্যে এক। ওটা প্রকৃতির হাতে তৈরি নয়, রাজসমাজের দ্বারা নির্দিষ্ট। অর্থাৎ, ওটা প্রাকৃত নয়, সংস্কৃত। তাই দুষ্মন্ত স্বীকার করেছিলেন বটে বনলতার দ্বারা উদ্যানলতা পরাভূত, তবু উদ্যানকে বনের আদর্শে রমণীয় করে তুলতে নিশ্চয় তাঁর সাহস হয় নি। তাই, আমি নিজে আকন্দফুল ভালোবাসি, কিন্তু আমার সাধুসমাজের মালি ওই গাছের অঙ্কুর দেখবামাত্র উপড়ে ফেলে। সে যদি কবি হত, সাধুভাষায় ছাড়া কবিতা লিখত না। সাধুভাষার ছন্দের বাঁধারীতি যে-জাতীয় ছন্দে চলে এবং শোভা পায় সে হচ্ছে পয়ারজাতীয় ছন্দ। এখানে ফাঁক-ফাঁক নির্দিষ্ট আসনের উপর নানা ওজনেরই ধ্বনিকে চড়ানো নিরাপদ। এখানে ঠিক চোদ্দটা অক্ষরকে বাহন করে যুগ্ম-অযুগ্ম নানারকমের ধ্বনিই একত্র সভা জমাতে পারে।

কাব্যলীলা একদিন যখন শুরু করেছিলেম তখন বাংলাসাহিত্যে সাধুভাষারই ছিল একাধিপত্য। অর্থাৎ, তখন ছিল কাটা-কাটা পিঁড়িতে ভাগ-করা ছন্দ। এই আইনের অধীনে যতক্ষণ পয়ারের এলাকায় থাকি ততক্ষণ আসনপীড়া ঘটে না। কিন্তু, তিনমাত্রামূলক ছন্দের দিকে আমার কলমের একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। ওই ছন্দে প্রত্যেক অক্ষরে স্বতন্ত্র-আরূঢ় সকল ওজনের ধ্বনিকেই সমান দরের একক বলে ধরে নিতে বারম্বার কানে বাজত। সেইজন্যে যুক্ত-অক্ষর অর্থাৎ যুগ্মধ্বনি বর্জন করবার একটা দুর্বল অভ্যাস আমাকে ক্রমেই পেয়ে বসছিল। ঠোকর খাবার ভয়ে পদগুলোকে একেবারে সমতল করে যাচ্ছিলুম। সব জায়গায় পেরে উঠি নি, কিন্তু মোটের উপর চেষ্টা ছিল। 'ছবি ও গান'-এ 'রাহুর প্রেম' কবিতা পড়লে দেখা যাবে যুক্ত-অক্ষর ঝেঁটিয়ে দেবার প্রয়াস আছে তবু তারা পাথরের টুকরোর মতো রাস্তার মাঝে মাঝে উঁচু হয়ে রইল। তাই যখন লিখেছিলুম—

কঠিন বাঁধনে চরণ বেড়িয়া
চিরকাল তোরে রব আঁকড়িয়া
লৌহশৃঙ্খলের ডোর—

মনে খটকা লেগেছিল, কান প্রসন্ন হয় নি। কিন্তু, তখন কলম ছিল অপটু এবং অলস মন ছিল অসতর্ক। কেননা, পাঠকদের তরফ থেকে বিপদের আশঙ্কা ছিল না। তখন

ছন্দের সদর রাস্তাও গ্রাম্য রাস্তার মতো এবড়ো-খেবড়ো থাকত, অভ্যাসের গতিকে কেউ সেটাকে নিন্দনীয় বলে মনেও করে নি।

অক্ষরের দাসত্বে বন্দী বলে প্রবোধচন্দ্র বাঙালি কবিদেরকে যে দোষ দিয়েছেন সেটা এই সময়কার পক্ষে কিছু অংশে খাটে। অর্থাৎ, অক্ষরের মাপ সমান রেখে ধ্বনির মাপে ইতরবিশেষ করা তখনকার শৈথিল্যের দিনে চলত, এখন চলে না। তখন পয়ারের রীতি সকল ছন্দেরই সাধারণ রীতি বলে সাহিত্যসমাজে চলে গিয়েছিল। তার প্রধান কারণ পয়ারজাতীয় ছন্দই তখন প্রধান, অন্যজাতীয় অর্থাৎ ত্রৈমাত্রিক ছন্দের ব্যবহার তখন অতি অল্পই। তাই এই মাইনরিটির স্বতন্ত্র দাবি সে দিন বিধিবদ্ধ হয় নি।

তার পরে 'মানসী' লেখার সময় এল। তখন ছন্দের কান আর ধৈর্য রাখতে পারছে না। এ কথা তখন নিশ্চিত বুঝেছি যে, ছন্দের প্রধান সম্পদ যুগ্মধ্বনি; অথচ এটাও জানছি যে, পয়ারসম্প্রদায়ের বাইরে নির্বিচারে যুগ্মধ্বনির পরিবেশন চলে না।

রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা

এ লাইন-বেচারাকে পয়ারের বাঁধাপ্রথাটা শৃঙ্খল হয়েই বেঁধেছে, তিন মাত্রার স্কন্ধকে চার মাত্রার বোঝা বইতে হচ্ছে। সেই 'মানসী' লেখবার বয়সে আমি যুগ্মধ্বনিকে দুই মাত্রার মূল্য দিয়ে ছন্দরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি।

প্রথম প্রথম পয়ারেও সেই নিয়ম প্রয়োগ করেছিলুম। অনতিকাল পরেই দেখা গেল, তার প্রয়োজন নেই। পয়ারে যুগ্মধ্বনির উপযুক্ত ফাঁক যথেষ্ট আছে। (এই প্রবন্ধে আমি ত্রিপদী প্রভৃতি পয়ারজাতীয় সমস্ত দ্বৈমাত্রিক ছন্দকেই 'পয়ার' নাম দিচ্ছি।)

পয়ারে ধ্বনিবিন্যাসের এই যে স্বচ্ছন্দতা, দুই মাত্রার লয় তার একমাত্র কারণ নয়। পয়ারের পদগুলিতে তার ধ্বনিভাগের বৈচিত্র্য একটা মস্ত কথা। সাধারণ ভাগ হচ্ছে ৩+৩+২+৩+৩, যথা—

নিখিল আকাশভরা আলোর মহিমা
তৃণের শিশির মাঝে লভিল প্রতিমা।

অন্যরকম, যথা—

তপনের পানে চেয়ে সাগরের ঢেউ
বলে ওই পুতলিরে এনে দে-না কেউ।

অথবা—

রাখি যাহা তার বোঝা কাঁধে চেপে রহে,
দিই যাহা তার ভার চরাচর বহে।

অথবা—

সারা দিবসের হায় যত কিছু আশা
রজনীর কারাগারে হারাবে কি ভাষা।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে পয়ারের প্রবর্তন হয়েছে এই কারণেই। সে কোনো কোনো আদিম জীবের মতো বহুগ্রন্থিল, তাকে নষ্ট না করেও যেখানে-সেখানে ছিন্ন করা যায়। এই ছেদের বৈচিত্র্য থাকাতেই প্রয়োজন হলে সে পদ্য হলেও গদ্যের অবন্ধ গতি অনেকটা অনুকরণ করতে পারে। সে গ্রামের মেয়ের মতো; যদিও থাকে অন্তঃপুরে, তবুও হাটে-ঘাটে তার চলাফেরায় বাধা নেই।

উপরের দৃষ্টান্তগুলিতে ধ্বনির বোঝা হালকা। যুগ্মবর্ণের ভার চাপানো যাক।

সুরাঙ্গনা নন্দনের নিকুঞ্জপ্রাঙ্গণে
মন্দারমঞ্জরি তোলে চঞ্চলকঙ্কণে।
বেণীবন্ধ তরঙ্গিত কোন্ ছন্দ নিয়া,
স্বর্গবীণা গুঞ্জরিছে তাই সন্ধানিয়া।

আধুনিক বাংলা ছন্দে সবচেয়ে দীর্ঘ পয়ার আঠারো অক্ষরে গাঁথা। তার প্রথম যতি পদের মাঝখানে আট অক্ষরের পরে, শেষ যতি দশ অক্ষরের পরে পদের শেষে। এতেও নানাপ্রকারের ভাগ চলে। তাই অমিত্রাক্ষরের লাইন-ডিঙোনো চালে এর ধ্বনিশ্রেণীকে নানারকমে কুচকাওয়াজ করানো যায়।

হিমাদ্রির ধ্যানে যাহা | স্তব্ধ হয়ে ছিল রাত্রিদিন
সপ্তর্ষির দৃষ্টিতলে | বাক্যহীন স্তব্ধতায় লীন,
সেই নির্ঝরিণীধারা | রবিকরস্পর্শে উচ্ছুসিতা
দিগ্দিগন্তে প্রচারিছে | অন্তহীন আনন্দের গীতা।

বাংলায় এই আর-একটি গুরুভারবহ ছন্দ। এরা সবাই মহাকাব্য বা আখ্যান বা চিন্তাগর্ভ বড়ো বড়ো কথার বাহন। ছোটো পয়ার আর এই বড়ো পয়ার, বাংলাকাব্যে এরা যেন ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা আর ঐরাবত। অন্তত, এই বড়ো পয়ারকে গীতিকাব্যের কাজে খাটাতে গেলে বেমানান হয়। এর নিজের গড়নের মধ্যেই একটা সমারোহ আছে, সেইজন্যে এর প্রয়োজন সমারোহসূচক ব্যাপারে।

ছোটো পয়ারকে চেঁচে-ছুলে হালকা কাজে লাগানো যায়, যেমন বাঁশের কঞ্চিকে ছিপ করা চলে। পয়ারের দেহসংস্থানেই গুরুর সঙ্গে লঘুর যোগ আছে। তার প্রথম অংশে আট, দ্বিতীয় অংশে ছয়; অর্থাৎ, হালের দিকে সে চওড়া কিন্তু দাঁড়ের দিকে সরু; তাকে নিয়ে মাল-বওয়ানোও যায়, বাচ-খেলানোও চলে। বড়ো পয়ারের

দেহসংস্থান এর উলটো ; তার প্রথমভাগে আট, শেষভাগে দশ ; তার গৌরবটা ক্রমেই প্রশস্ত হয়ে উঠেছে। ছোটো পয়ারের ছিব্‌লেমির একটা পরিচয় দেওয়া যাক।

খুব তার বোল্‌চাল, সাজ ফিট্‌ফাট,
তক্‌রার হলে আর নাই মিট্‌মাট।
চশ্‌মায় চম্‌কায় আড়ে চায় চোখ,
কোনো ঠাঁই ঠেকে নাই কোনো বড়ো লোক।

এর ভাগগুলোকে কাটা-কাটা ছোটো-ছোটো করে হ্রস্বস্বরে হসন্তবর্ণে ঘনঘন ঝোঁক দিয়ে এর চটুলতা বাড়িয়ে দেওয়া গেছে। এখানে এটা পাতলা কিরিচের মতো। একেই আবার যুগ্মধ্বনির যোগে মজবুত করে খাড়া করে তোলা যায়।

বাক্য তার অনর্গল মল্লসজ্জাশালী,
তর্কযুদ্ধে উগ্র তেজ, শেষ যুক্তি গালি।
ভ্রূকুটিপ্রচ্ছন্ন চক্ষু কটাক্ষিয়া চায়,
কুত্রাপিও মহত্ত্বের চিহ্ন নাহি পায়।

যেখানে-সেখানে নানাপ্রকার অসমান ভার নিয়েও পয়ারের পদস্খলন হয় না, এই তত্ত্বটির মধ্যে অসামান্যতা আছে। অন্য কোনো ভাষার কোনো ছন্দে এরকম স্বচ্ছন্দতা এতটা পরিমাণে আছে বলে আমি তো জানি নে।

এর কৌশলটা কোন্‌খানে যখন ভেবে দেখা যায় তখন দেখি, পয়ারে প্রত্যেক পদের মাঝখানে ও শেষে যে দুটো হাঁফ ছাড়বার যতি আছে সেইখানেই তার ভারসামঞ্জস্য হয়ে থাকে।

নিঃস্বতাসংকোচে দিন | অবসন্ন হলে
নিভৃতে নিঃশব্দ সন্ধ্যা | নেয় তারে কোলে।

গণনা করে দেখলে ধরা পড়ে, এই পয়ারের দুই লাইনে ধ্বনিভারের সাম্য নেই। তবু যে টলমল করতে করতে ছন্দটা কাত হয়ে পড়ে না, তার কারণ ডাইনে-বাঁয়ে যতির লগির ঠেকা দিয়ে দিয়ে তাকে চালিয়ে নেওয়া হয়। চতুষ্পদ জন্তু যেমন তার ভারী দেহটাকে দুইজোড়া পায়ের দ্বারা দুই দিকে ঠেকাতে ঠেকাতে চলে সেইরকম। পয়ারের প্রকৃত রূপ চোদ্দটা অক্ষরে নয়, সেটা প্রথম অংশের আট অক্ষর ও দ্বিতীয় অংশের ছয় অক্ষরের পরবর্তী দুই যতিতে। অজগর সমস্ত দেহটা নিয়ে চলে। তার দেহে মুণ্ড এবং ধড়ের মধ্যে ভাগ নেই। ঘোড়ার দেহে সেই ভাগ আছে। তার মুণ্ডটার পরে যেখানে গলা সেখানে একটা যতি, ধড়ের শেষ ভাগে যেখানে ক্ষীণ কটি সেখানেও আর-একটা। এই বিভক্তভাবের দেহকে সামলিয়ে নিয়ে সে চার পা ফেলে চলে। পয়ারেরও

সেইরকম বিশেষভাবে বিভক্ত দেহ এবং চার পা ফেলতে ফেলতে চলা। চতুষ্পদ জন্তুর দুই পায়ের সমান বিন্যাস। যদি এমন হত যে, কোনো জানোয়ারের পা দুটো বাঁয়ের চেয়ে ডাইনে এক ফুট বেশি লম্বা তা হলে তার চলনে-স্থিতির চেয়ে অস্থিতিই বেশি হত; সুতরাং তার পিঠে সওয়ার চাপালে কোনো পক্ষেই আরাম থাকত না। ছন্দে তার একটা দৃষ্টান্ত দিই—

তরণী বেয়ে শেষে | এসেছি ভাঙা ঘাটে,
স্থলে না মেলে ঠাঁই | জলে না দিন কাটে।

এ ছড়ায় প্রত্যেক লাইনে চোদ্দ অক্ষর, এবং মাঝে আর শেষে দুই যতিও আছে। তবু ওকে পয়ার বলবার জো নেই। ওর পা-ফেলার ভাগ অসমান।

তরণী | বেয়ে শেষে ॥ এসেছি | ভাঙা ঘাটে।

এক পায়ে তিন মাত্রা, আর-এক পায়ে চার। সাত মাত্রার পরে একটা করে যতি আছে, কিন্তু বেজোড় অঙ্কের অসাম্য ওই যতিতে পুরো বিরাম পায় না। সেইজন্যে সমস্ত পদটার মধ্যে নিয়তই একটা অস্থিরতা থাকে, যে পর্যন্ত না পদের শেষে এসে একটা সম্পূর্ণ স্থিতি ঘটে। এই অস্থিরতাই এরকম ছন্দের স্বভাব, অর্থাৎ পয়ারের ঠিক বিপরীত। এই অস্থিরতার সৌন্দর্যকে ব্যবহার করবার জন্যেই এইরকম ছন্দের রচনা। এর পিঠের উপর যেমন-তেমন করে যুগ্মধ্বনির সওয়ার চাপালে অস্বস্তি ঘটে। যদি লেখা যায়

সায়াহ্ন-অন্ধকারে এসেছি ভগ্ন ঘাটে

তা হলে ছন্দটার কোমর ভেঙে যাবে। তবুও যদি যুগ্মবর্ণ দেওয়াই মত হয় তা হলে তার জন্যে বিশেষভাবে জায়গা করে দিতে হবে। পয়ারের মতো উদারভাবে যেমন খুশি ভার চাপিয়ে দিলেই হল না।

অন্ধরাতে যবে | বন্ধ হল দ্বার,
ঝঞ্ঝাবাতে ওঠে | উচ্চ হাহাকার।

মনে রাখা দরকার, এই শ্লোক অবিকৃত রেখেও এর ভাগের যদি পরিবর্তন করে পড়া যায়, দুই ভাগের বদলে প্রত্যেক লাইনে যদি তিন ভাগ বসানো যায়, তা হলে এটা আর-এক ছন্দ হয়ে যাবে। একে নিম্নলিখিত-রকম ভাগ করে পড়া যাক—

অন্ধরাতে | যবে বন্ধ | হল দ্বার,
ঝঞ্ঝাবাতে | ওঠে উচ্চ | হাহাকার।

পশুপক্ষীদের চলন সমান মাত্রার দুই বা চার পায়ের উপর। এই পা'কে কেবল যে চলতে হয় তা নয়, দেহভার বইতে হয়। পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই বিরাম আছে বলে

বোঝা সামলিয়ে চলা সম্ভব। আজ পর্যন্ত জীবলোকে জুড়িওয়ালা পায়ের পরিবর্তে চাকার উদ্ভব কোথাও হল না; কেননা, চাকা না থেমে গড়িয়ে চলে, চলার সঙ্গে থামার সামঞ্জস্য তার মধ্যে নেই। দুইমূলক সমমাত্রায় দুই পায়ের চাল, তিনমূলক অসমমাত্রায় চাকার চাল। দুই-পা-ওয়ালা জীব উঁচুনিচু পথের বাধা ডিঙিয়ে চলে যায়, পয়ারের সেই শক্তি। চাকা বাধায় ঠেকলে ধাক্কা খায়, ত্রৈমাত্রিক ছন্দের সেই দশা। তার পথে যুগ্মস্বর যাতে বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সেই চেষ্টা করতে হবে।

অধীর বাতাস এল সকালে,
বনেরে বৃথাই শুধু বকালে।
দিনশেষে দেখি চেয়ে,
ঝরা ফুলে মাটি ছেয়ে—
লতারে কাঙাল ক'রে ঠকালে।

এ ছন্দ পয়ারজাতীয়, টেনিস-খেলোয়াড়ের আধা পায়জামার মতো বহরটা নীচের দিকে ছাঁটা। এ ছন্দে তাই যুগ্মস্বর যেমন খুশি চলে।

নবারুণচন্দনের তিলকে
দিক্‌ললাট এঁকে আজি দিল কে।
বরণের পাত্র হাতে
উষা এল সুপ্রভাতে,
জয়শঙ্খ বেজে ওঠে ত্রিলোকে।

শরতে শিশিরবাতাস লেগে
জল ভ'রে আসে উদাসী মেঘে।
বরষন তবু হয় না কেন,
ব্যথা নিয়ে চেয়ে রয়েছে যেন।

এখানে তিন মাত্রার ছন্দ গড়িয়ে চলেছে। চাকার চাল, পা-ফেলার চাল নয়; তাই যুগ্মবর্ণের স্বেচ্ছাচারিতা এর সইবে না।

চাষের সময়ে যদিও করি নি হেলা,
ভুলিয়া ছিলাম ফসল-কাটার বেলা।

পয়ারের মতোই চোদ্দটা অক্ষরে পদ, কিন্তু জাত আলাদা। তিন মাত্রায় চাকায় চলেছে। পদাতিকের সঙ্গে চক্রীর মেলে না।

শ্যামলঘন | বকুলবন | ছায়ে ছায়ে
যেন কী সুর | বাজে মধুর | পায়ে পায়ে।

এখানেও চোদ্দ অক্ষর। কিন্তু এর চালে পয়ারের মতো সমমাত্রার পদচারণের শান্তি নেই বলে বিষমমাত্রার ভাগগুলি যতির মধ্যেও গতির ঝোঁক রেখে দেয়। খোঁড়া মানুষের চলার মতো, যতক্ষণ না লক্ষ্যস্থানে গিয়ে বসে পড়ে থেমেও ভালো করে থামতে পারে না।

বাংলা চলতি ভাষার মূল সংস্কৃত শব্দের অনেকগুলি স্বরবর্ণ ই কোনোটা আধখানা কোনোটা পুরোপুরি ক্ষয়ে যাওয়াতে ব্যঞ্জনগুলো তাল পাকিয়ে অত্যন্ত পরস্পরের গায়ে-পড়া হয়ে গেছে। স্বরের ধ্বনিই ব্যঞ্জনের ধ্বনিকে অবকাশ দেয়, তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে; সেগুলো সরে গেলেই ব্যঞ্জনধ্বনি পিণ্ডীভূত হয়ে পড়ে। চলিত এবং চল্‌তি, ঘৃণা এবং ঘেন্না, বসতি এবং বস্‌তি, শব্দগুলো তুলনা করে দেখলেই বোঝা যাবে। সংস্কৃত ভাষায় স্বরধ্বনির দাক্ষিণ্য, আর প্রাকৃত-বাংলায় তার কার্পণ্য, এইটেই হল দুটো ভাষার ধ্বনিগত মূল পার্থক্য। স্বরবর্ণবহুল ধ্বনিসংগীত এবং স্বরবর্ণবিরল ধ্বনিসংগীতে প্রভূত প্রভেদ। এই দুইয়েরই বিশেষ মূল্য আছে। বাঙালি কবি তাঁদের কাব্যে যথাস্থানে দুটোরই সুযোগ নিতে চান। তাঁরা ধ্বনিরসিক বলেই কোনোটাকেই বাদ দিতে ইচ্ছা করেন না।

প্রাকৃত-বাংলার ধ্বনির বিশেষত্ববশত দেখতে পাই, তার ছন্দ তিন মাত্রার দিকেই বেশি ঝুঁকেছে। অর্থাৎ, তার তালটা স্বভাবতই একতালাজাতীয়, কাওয়ালিজাতীয় নয়; সংস্কৃত ভাষায় এই 'তাল' শব্দটা দুই সিলেব্‌ল্‌এর; বাংলায় 'ল' আপন অন্তিম অকার খসিয়ে ফেলেছে, তার জায়গায় টি বা টা যোগ করে শব্দটাকে পুষ্ট করবার দিকে তার ঝোঁক। টি টা-এর ব্যবধান যদি না থাকে তবে ঐ নিঃস্বর ধ্বনিটি প্রতিবেশী যে-কোনো ব্যঞ্জন বা স্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পূর্ণতা পেতে চায়।

রূপসাগরের তলে ডুব দিনু আমি

এটা সংস্কৃত-বাংলার ছাঁদে লেখা। এখানে শব্দগুলো পরস্পর গা-ঘেঁষা নয়। বাংলা প্রাকৃতের অনিবার্য নিয়মে এই পদের যে শব্দগুলি হসন্ত, তারা আপনারই স্বরধ্বনিকে প্রসারিত করে ফাঁক ভরতি করে নিয়েছে। 'রূপ' এবং 'ডুব' আপন উকারধ্বনিকে টেনে বাড়িয়ে দিলে। 'সাগরের' শব্দ আপন একারকে পরবর্তী হসন্ত র-এর পঙ্গুতা চাপা দিতে লাগিয়েছে। এই উপায়ে ওই পদটার প্রত্যেক শব্দ নিজের মধ্যেই নিজের মর্যাদা বাঁচিয়ে চলেছে। অর্থাৎ এ ছন্দে ডিমক্রেসির প্রভাব নেই। এই-রকমের ছন্দে দুই মাত্রার ধ্বনি আপন পদক্ষেপের প্রত্যেক পর্যায়ে যে অবকাশ পায় তা

নিয়ে তার গৌরব। বস্তুত, এই অবকাশের সুযোগ গ্রহণ করে তার ধ্বনিসমারোহ বাড়িয়ে তুললে এ ছন্দের সার্থকতা। যথা—

চৈতন্য নিমগ্ন হল রূপসিন্ধুতলে।

প্রাকৃত-বাংলা দেখা যাক।

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা ক'রে

এখানে 'রূপ' আপন হসন্ত 'প'এর ঝোঁকে 'সাগরে'র 'সা'টাকে টেনে আপন করে নিয়েছে, মাঝে ব্যবধান থাকতে দেয় নি। 'রূপ-সা' তাই আপনিই তিন মাত্রা হয়ে গেল। 'সাগরে'র বাকি টুকরো রইল 'গরে'। সে আপন ওজন বাঁচাবার জন্যে 'রে'টাকে দিলে লম্বা করে, তিন মাত্রা পুরল। 'ডুব' আপনার হসন্তর টানে 'দিয়েছি'র 'দি'টাকে করলে আত্মসাৎ। এমনি করে আগাগোড়া তিন মাত্রা জমে উঠল। হসন্ত-প্রধান ভাষা সহজেই তিন মাত্রার দানা পাকায়, এটা দেখেছি। এমন-কি, যেখানে হসন্তের ভিড় নেই সেখানেও তার ওই একই চাল। এটা যেন তার অভ্যস্ত হয়ে মজ্জাগত হয়ে গেছে। যেমন—

অচে- | তনে- | ছিলেম | ভালো- |
আমায় | চেতন | করলি | কেনে- |

প্রাকৃত-বাংলার এই তিন মাত্রার ভঙ্গি চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিরা সাধুভাষাতেও গ্রহণ করেছেন। যেমন—

হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখিয়া
মধুর কথাটি কয়।
ছায়ার সহিতে ছায়া মিশাইতে
পথের নিকটে রয়।

কিন্তু প্রাকৃত-বাংলার ক্রিয়াপদ নিয়ে একটু ভাববার বিষয় আছে।

মত্তরোষে বীরভদ্র ছুটল ঊর্ধ্বশ্বাসে,
ঘূর্ণিবেগে উড়্‌ল ধুলো রক্ত সন্ধ্যাকাশে।

কিম্বা—

ছুটল কেন মহেন্দ্রের আনন্দের ঘোর,
টুটল কেন উর্বশীর মঞ্জীরের ডোর।
বৈকালে বৈশাখী এল আকাশলুণ্ঠনে,
শুক্লরাতি ঢাক্‌ল মুখ মেঘাবগুণ্ঠনে।

এদের সম্বন্ধে কী বলা যাবে।

প্রধানত ক্রিয়াপদেরই বিশেষ রূপটাতে প্রাকৃত-বাংলার চেহারা ধরা পড়ে। উপরের ছড়াগুলিতে 'উড়্‌ল' 'ছুট্‌ল' 'টুট্‌ল' 'ঢাক্‌ল' প্রভৃতি প্রয়োগ নিয়ে তর্কটা ছন্দের তর্ক নয়, ভাষারীতির। এইরকম ক্রিয়াপদ যদি ব্যবহার করি তবে ধরে নিতে হবে ওই ছড়াগুলি প্রাকৃত-বাংলাতেই লেখা হচ্ছে। আমি যে প্রবন্ধ লিখছি এও প্রাকৃত-বাংলার ঠাটে। যদি আমাকে কারো সঙ্গে মুখে মুখে আলোচনা করতে হত তা হলে এই লেখার সঙ্গে আমার মুখের কথার কোনো তফাত থাকত না। মাঝে মাঝে অভ্যাসদোষে হয়তো ইংরেজি শব্দ মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেত, কিন্তু কখনোই 'করিয়াছিল' 'গিয়াছে' ধরনের ক্রিয়াপদ ভুলেও ব্যবহার করতে পারতুম না। আবার প্রাকৃত-বাংলার ক্রিয়াপদ সংস্কৃত-বাংলায় ব্যবহার করাও চলে না। প্রবোধচন্দ্র 'বিচিত্রা'য় লিখেছেন যে, বাঙালি কবিরা সাহস করে কবিতায় 'করিব' 'চলিব' প্রভৃতি প্রয়োগ না করে কেন 'করব' 'চলব' প্রয়োগ না করেন। যদি প্রশ্নটার অর্থ এই হয় যে, অযথাস্থানে কেন করি নে তবে তার উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক। যদি বলেন, যথাস্থানেও কেন করি নে, তবে তার উত্তরে বলব, যথাস্থানে করে থাকি।

যে তর্ক নিয়ে লেখা শুরু করেছিলেম সেটাতে ফিরে আসা যাক। বাংলায় হসন্তমধ্য শব্দগুলোয় কয় মাত্রা গণনা করা হবে, তাই নিয়ে সংশয় উঠেছে।

যেগুলি ক্রিয়াপদ নয় সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এ প্রবন্ধে গোড়াতেই আলোচনা করেছি। বলেছি, নিয়মের বিকল্প চলে ; কেননা, বাঙালির কান সাধারণ ব্যবহারে সেই বিকল্প মঞ্জুর করেছে। এ ক্ষেত্রে হিসাবে একটা মাত্রার কমিবেশি নিয়ে তর্ক ওঠে না।

> চিম্‌নি ভেঙে গেছে দেখে গিন্নি রেগে খুন ;
> ঝি বলে, আমার দোষ নেই, ঠাকরুন।

অন্তত 'চিমনি'কে দুই মাত্রা করায় কবির দোষ হয় নি। আবার

> চিমনি ফেটেছে দেখে গৃহিণী সরোষ ;
> ঝি বলে, ঠাক্‌রুন মোর নাই কোনো দোষ।

এরকম বিপর্যয়ও চলে। একই ছড়ায় 'চিম্‌নি'কে এক মাত্রা গ্রেস মার্কা দেওয়া হয়েছে, অথচ 'ঠাক্‌রুন'কে খর্ব করে তিন মাত্রায় নামানো গেল। অপরাধ ঘটেছে বলে মনে করি নি।

> কুস্তির আখড়ায় ভিত্তিকে ধরে
> জল ছিটাইয়া দাও, ধুলা যাক মরে।

অপর পক্ষে—

রাস্তা দিয়ে কুস্তিগির চলে ঘেঁষাঘেঁষি,
একটা নয় দুটো নয় একশোর বেশি।

প্রয়োজনমত এটাও চলে, ওটাও চলে। নিখতির মাপে বিচার করতে গেলে বিশুদ্ধ ওজনের পয়ার হচ্ছে—

পালোয়ানে পালোয়ানে চলে ঘেঁষাঘেঁষি।

তাতে প্রত্যেক অক্ষর নিখুঁত এক মাত্রা, সবসুদ্ধ চোদ্দটা। 'রাস্তা' 'কুস্তি' প্রভৃতি শব্দে ওজন বেড়ে যায়, তবুও বহুসহিষ্ণু পয়ারকে কাবু করতে পারে না।

প্রাকৃত-বাংলার ক্রিয়াপদ নিয়ে কথা হচ্ছিল। ক্রিয়াপদেই তার আপন চেহারা। ওইটুকু ছাড়া তার আর কোনো উপসর্গ নেই বললেই চলে। বাংলা-সংস্কৃত ভাষার মতো সে শুচিবায়ুগ্রস্ত নয়। ভোজে বসে গেছে ব্রাহ্মণ, তাকে পরিবেশনকর্তা জিজ্ঞাসা করলে, নিরামিষ না আমিষ। সে বললে, দ্বৌ কর্তব্যৌ। তেমনি শব্দ-বাছাই নিয়ে যদি প্রাকৃত-বাংলাকে প্রশ্ন করা যায় 'কী চাই, প্রাকৃত শব্দ না সংস্কৃত শব্দ' সে বলবে, দ্বৌ কর্তব্যৌ। তার জাতবিচার নেই বললেই হয়। পছন্দ হবামাত্র ইংরেজি পারসি সব শব্দই সে আত্মসাৎ করে। আবার অমরকোষবিহারী বড়ো বড়ো বহরওয়ালা সংস্কৃত শব্দকে ওদেরই ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে নেয়। সংস্কৃত ভাষার প্রতি সম্ভ্রমবশত তার মুখে বাধবে না—

রূপযৌবন উপঢৌকন দেবেন কন্যা তাহারে,
তাই পরেছেন চীনাংশুকের পট্টবসন বাহারে।

নন-কো-অপরেশনের দিনেও ইংরেজি শব্দ চালিয়ে দিতে পিকেটিঙের ভয় নেই। যথা—

আইডিয়াল নিয়ে থাকে, নাহি চড়ে হাঁড়ি,
প্রাক্‌টিক্যাল লোকে বলে, এ যে বাড়াবাড়ি।
শিবনেত্র হল বুঝি, এইবার মোলো,
অক্‌সিজেন নাকে দিয়ে চাঙ্গা করে তোলো।

কিন্তু সংস্কৃত-বাংলায় বাছবিচার খুব কড়া। আধুনিকদের হাতে পড়ে ম্লেচ্ছপনা কিছু-কিছু সয়ে গেছে; কিন্তু সেটুকু বড়োজোর বাইরের রোয়াকে, ভিতরমহলে রীতরক্ষা সম্বন্ধে কষাকষি।

কর্ণে দিলা ঝুম্‌কাফুল, নাসিকায় নথ,
অঙ্গসজ্জাসমাধানে ভূরি মেহন্নৎ।

এটাকে প্রহসন বলে পাঠক হয়তো মাপ করতে পারেন, কিন্তু প্রাকৃত-বাংলায় এইরকম

ভিন্নপর্যায়ের শব্দগুলো যখন কাছাকাছি বসানো যায় তাদের আওয়াজের মধ্যে অত্যন্ত বেশি বেমিল হয় না। আমার এই গদ্যপ্রবন্ধ পড়ে দেখলে পাঠকেরা সেটা লক্ষ্য করতে পারবেন। কিন্তু এটাও দেখে থাকবেন, এটার মধ্যে 'করিব' 'করিয়াছে' 'করিয়াছিল' প্রভৃতি ক্রিয়ারূপ কলমের কোনো ভুলে ঢুকে পড়বার কোনো সম্ভাবনা নেই। সেইজন্যে আমরা বাংলায় সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে দুই ভিন্ন নিয়মেই চলি, তার অন্যথা করা অসম্ভব। তাই বাংলা কাব্যে এই দুই ভাষার ধারায় ছন্দের রীতি যদি দুই ভিন্ন পথ নিয়ে থাকে তবে সেই আপত্তিতে শুদ্ধির গোময়লেপনে সমস্ত একাকার করবার পক্ষপাতী আমি নই। আমি বলি, দ্বৌ কর্তব্যৌ। কারণ, ছন্দের এই দ্বিবিধ রসেই আমার রসনার লোভ।[১]

মাঘ ১৩৩৮

ছন্দের মাত্রা

বহুকাল পূর্বে একটি গান রচনা করেছিলেম। 'সবুজ পত্রে' সেটি উদ্‌ধৃত হয়েছিল।

আঁধার রজনী পোহালো,
জগৎ পুরিল পুলকে,
বিমল প্রভাতকিরণে
মিলিল দ্যুলোক ভূলোকে।

তা ছাড়া এই ছন্দে পরবর্তী কালে দুই-একটি শ্লোক লিখেছিলুম। যথা—

গোড়াতেই ঢাক বাজনা,
কাজ করা তার কাজ না।

আর-একটি—

শকতিহীনের দাপনি
আপনারে মারে আপনি।

বলা বাহুল্য এগুলি ৯ মাত্রার চালে লেখা।

'সবুজ পত্রে'র প্রবন্ধে তার পরে দেখিয়েছিলুম ধ্বনিসংখ্যার কতরকম হেরফের করে এই ছন্দের বৈচিত্র্য ঘটতে পারে, অর্থাৎ তার চলন কত ভঙ্গির হয়। তাতে যে দৃষ্টান্ত রচনা করেছিলেম তার পুনরুক্তি না করে নতুন বাণী প্রয়োগ করা যাক।

১ পরিশিষ্টে 'ছন্দে হসন্ত' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

এইখানে বলে রাখা ভালো এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত উদাহরণগুলিতে প্রত্যেক ভাগে তাল দিলে ছন্দের পার্থক্য ধরা সহজ হয়।

উপরের ছন্দে ৩+৩+৩-এর লয়। নীচের ছন্দে ৩+২+৪-এর লয়।

আসন | দিলে | অনাহূতে,
ভাষণ | দিলে | বীণাতানে,
বুঝি গো | তুমি | মেঘদূতে |
পাঠায়ে | ছিলে | মোর পানে।

বাদল রাতি এল যবে
বসিয়াছিনু একা একা,
গভীর গুরু গুরু রবে
কী ছবি মনে দিল দেখা।

পথের কথা পুবে হাওয়া
কহিল মোরে থেকে থেকে ;
উদাস হয়ে চলে যাওয়া,
খ্যাপামি সেই রোধিবে কে।

আমার তুমি অচেনা যে
সে কথা নাহি মানে হিয়া,
তোমারে কবে মনোমাঝে
জেনেছি আমি না জানিয়া

ফুলের ডালি কোলে দিনু,
বসিয়াছিলে একাকিনী,
তখনি ডেকে বলেছিনু,
তোমারে চিনি, ওগো চিনি॥

তার পরে ৪+৩+২—

বলেছিনু | বসিতে | কাছে,
দেবে কিছু | ছিল না | আশা,
দেব ব'লে | যেজন | যাচে
বুঝিলে না | তাহারো | ভাষা।

শুকতারা চাঁদের সাথি
বলে, "প্রভু, বেসেছি ভালো,

নিয়ে যেয়ো আমার বাতি
যেথা যাবে তোমার আলো।"
ফুল বলে, "দখিনহাওয়া,
বাঁধিব না বাহুর ডোরে,
ক্ষণতরে তোমারে পাওয়া
চিরতরে দেওয়া যে মোরে।"

তার পরে ৩+৬—

বিজুলি | কোথা হতে এলে,
তোমারে | কে রাখিবে বেঁধে।
মেঘের | বুক চিরি গেলে
অভাগা | মরে কেঁদে কেঁদে।
আগুনে গাঁথা মণিহারে
ক্ষণেক সাজায়েছ যারে,
প্রভাতে মরে হাহাকারে
বিফল রজনীর খেদে।

দেখা যাক ৪+৫—

মোর বনে | ওগো গরবী,
এলে যদি | পথ ভুলিয়া,
তবে মোর | রাঙা করবী
নিজ হাতে | নিয়ো তুলিয়া।

আর-একটা—

জলে ভরা | নয়নপাতে
বাজিতেছে | মেঘরাগিণী,
কী লাগিয়া | বিজনরাতে
উড়ে হিয়া, | হে বিবাগিনী।
ম্লান মুখে | মিলালো হাসি,
গলে দোলে | নবমালিকা।
ধরাতলে | কী ভুলে আসি
সুর ভোলে | সুরবালিকা।

তার পরে ৪+৪+১। বলে রাখা ভালো এই ছন্দটি পড়বার সময় সবশেষ ধ্বনিটিকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

বারে বারে | যায় চলি | য়া,
ভাসায় ন | য়ননীরে | সে,
বিরহের | ছলে ছলি | য়া
মিলনের | লাগি ফিরে | সে।
যায় নয়নের আড়া লে,
আসে হৃদয়ের মাঝে গো।
বাঁশিটিরে পায়ে মাড়া লে
বুকে তার সুর বাজে গো।
ফুলমালা গেল শুকা য়ে,
দীপ নিবে গেল বাতা সে,
মোর ব্যথাখানি লুকা য়ে
মনে তার রহে গাঁথা সে।
যাবার বেলায় ছুয়া রে
তালা ভেঙে নেয় ছিনি য়ে,
ফিরিবার পথ উহা রে
ভাঙা দ্বার দেয় চিনি য়ে॥

৩+২+৪-এর লয় পূর্বে দেখানো হয়েছে। ৫+৪-এর লয় এখানে দেওয়া গেল।

আলো এল যে | দ্বারে তব,
ওগো মাধবী | বনছায়া।
দোঁহে মিলিয়া | নবনব
তৃণে বিছায়ে | গাঁথো মায়া।
চাঁপা, তোমার আঙিনাতে
ফেরে বাতাস কাছে কাছে,
আজি ফাগুনে একসাথে
দোলা লাগিয়ো নাচে নাচে॥
বধূ, তোমার দেহলিতে
বর আসিছে দেখিছ কি।

আজি তাহার বাঁশরিতে
হিয়া মিলায়ে দিয়ো, সখি।

৬+৩-এর ঠাটেও ৯ মাত্রাকে সাজানো চলে। যেমন—

সেতারের তারে | ধানশী
মিড়ে মিড়ে উঠে | বাজিয়া।
গোধূলির রাগে | মানসী
সুরে যেন এল | সাজিয়া।

আর-একটা—

তৃতীয়ার চাঁদ | বাঁকা সে,
আপনারে দেখে | ফাঁকা সে।
তারাদের পানে | তাকিয়ে
কার নাম যায় | ডাকিয়ে,
সাথি নাহি পায় | আকাশে।

এতক্ষণ এই যে ৯ মাত্রার ছন্দটাকে নিয়ে নয়-ছয় করছিলুম সেটা বাহাদুরি করবার জন্যে নয়, প্রমাণ করবার জন্যে যে এতে বিশেষ বাহাদুরি নেই। ইংরেজি ছন্দে একসেন্‌টের প্রভাব; সংস্কৃত ছন্দে দীর্ঘহ্রস্বের সুনির্দিষ্ট ভাগ। বাংলায় তা নেই, এইজন্যে লয়ের দাবিরক্ষা ছাড়া বাংলা ছন্দে মাত্রা বাড়িয়ে-কমিয়ে চলার আর-কোনো বাধা নেই। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' থেকে আরম্ভ করে পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ মাত্রা পর্যন্ত বাংলা ছন্দে আমরা দেখি। এই সুযোগে কেউ বলতে পারেন, এগারো মাত্রায় ছন্দ বানিয়ে নতুন কীর্তি স্থাপন করব। আমি বলি, তা করো কিন্তু পুলকিত হোয়ো না, কেননা কাজটা নিতান্তই সহজ। দশ মাত্রার পরে আর-একটা মাত্রা যোগ করা একেবারেই দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। যেমন—

চামেলির ঘনছায়া-বিতানে
বনবীণা বেজে ওঠে কী তানে।
স্বপনে মগন সেথা মালিনী
কুসুমমালায় গাঁথা শিখানে।

অন্যরকমের মাত্রাভাগ করতে চাও সেও কঠিন নয়। যেমন—

মিলনসুলগনে | কেন বল্‌,
নয়ন করে তোর | ছল্‌ছল্‌।

বিদায়দিনে যবে | ফাটে বুক,
সেদিনো দেখেছি তো | হাসিমুখ।

তার পরে তেরো মাত্রার প্রস্তাবটা শুনতে লাগে খাপছাড়া এবং নতুন, কিন্তু পয়ার থেকে এক মাত্রা হরণ করতে দুঃসাহসের দরকার হয় না। সে কাজ অনেকবার করেছি, তা নিয়ে নালিশ ওঠে নি। যথা—

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।

এক মাত্রা যোগ করে পয়ারের জাতিবৃদ্ধি করাও খুবই সহজ। যথা—

হে বীর, জীবন দিয়ে মরণেরে জিনিলে,
নিজেরে নিঃস্ব করি বিশ্বেরে কিনিলে।

ষোলো মাত্রার ছন্দ দুর্লভ নয়। অতএব দেখা যাক সতেরো মাত্রা—

নদীতীরে দুই | কূলে কূলে |
কাশবন দুলি | ছে।
পূর্ণিমা তারি | ফুলে ফুলে |
আপনারে ভুলি | ছে।

আঠারো মাত্রার ছন্দ সুপরিচিত। তার পরে উনিশ—

ঘন মেঘভার গগনতলে,
বনে বনে ছায়া তারি,
একাকিনী বসি নয়নজলে
কোন্ বিরহিণী নারী।

তার পরে কুড়ি মাত্রার ছন্দ সুপ্রচলিত। একুশ মাত্রা, যথা—

বিচলিত কেন মাধবীশাখা,
মঞ্জরি কাঁপে থরথর।
কোন্ কথা তার পাতায় ঢাকা
চুপিচুপি করে মরমর।

তার পরে— আর কাজ নেই। বোধ হয় যথেষ্ট প্রমাণ করতে পেরেছি যে, বাংলায় নতুন ছন্দ তৈরি করতে অসাধারণ নৈপুণ্যের দরকার করে না।

সংস্কৃত ভাষায় নূতন ছন্দ বানানো সহজ নয়, পুরানো ছন্দ রক্ষা করাও কঠিন। যথানিয়মে দীর্ঘহ্রস্ব স্বরের পর্যায় বেঁধে তার সংগীত। বাংলায় সেই দীর্ঘধ্বনিগুলিকে দুইমাত্রায় বিশ্লিষ্ট করে একটা ছন্দ দাঁড় করানো যেতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে মূলের মর্যাদা থাকবে না। মন্দাক্রান্তার বাংলা রূপান্তর দেখলেই তা বোঝা যাবে।

যক্ষ সে কোনো জনা আছিল আনমনা, সেবার অপরাধে প্রভুশাপে
হয়েছে বিলয়গত মহিমা ছিল যত, বরষকাল যাপে দুখতাপে।
নির্জন রামগিরি শিখরে মরে ফিরি একাকী দূরবাসী প্রিয়াহারা
যেথায় শীতল ছায় ঝরনা বহি যায় সীতার স্নানপূত জলধারা।
মাস পরে কাটে মাস, প্রবাসে করে বাস প্রেয়সীবিচ্ছেদে বিমলিন ;
কনকবলয়-খসা বাহুর ক্ষীণ দশা, বিরহদুখে হল বলহীন।
একদা আষাঢ় মাসে প্রথম দিন আসে, যক্ষ নিরখিল গিরি'পর
ঘনঘোর মেঘ এসে লেগেছে সানুদেশে, দন্ত হানে যেন করিবর।

কার্তিক ১৩৩৯

২

উপরের প্রবন্ধে লিখেছি 'আঁধার রজনী পোহালো' গানটি নয় মাত্রার ছন্দে রচিত। ছন্দতত্ত্বে প্রবীণ অমূল্যবাবু ওর নয়-মাত্রিকতার দাবি একেবারে নামঞ্জুর করে দিলেন। আর কারো হাত থেকে এ রায় এলে তাকে আপিল করবার যোগ্য বলেও গণ্য করতুম না, এ ক্ষেত্রে ধাঁধা লাগিয়ে দিলে। রাস্তার লোক এসে যদি আমাকে বলে তোমার হাতে পাঁচটা আঙুল নেই, তা হলে মনে উদ্‌বেগের কোনো কারণ ঘটে না। কিন্তু, শারীরতত্ত্ববিদ্‌ এসে যদি এই সংবাদটা জানিয়ে যান তা হলে দশবার করে নিজের আঙুল গুনে দেখি, মনে ভয় হয়, অঙ্ক বুঝি ভুলে গেছি। অবশেষে নিতান্ত হতাশ হয়ে স্থির করি, যে-কটাকে এতদিন আঙুল বলে নিশ্চিন্ত ছিলুম বৈজ্ঞানিক মতে তার সব-কটা আঙুলই নয় ; হয়তো শাস্ত্রবিচারে জানা যাবে যে, আমার আঙুল আছে মাত্র তিনটি, বাকি দুটো বুড়ো আঙুল আর কড়ে আঙুল, তারা হরিজন-শ্রেণীয়।

বর্তমান তর্কে আমার মনে সেইরকম উদ্‌বেগ জন্মেছে। 'আঁধার রজনী পোহালো' চরণের মাত্রাসংখ্যা যে দিক থেকে যেমন করে গ'নে দেখি, নয় মাত্রায় গিয়ে ঠেকে। অমূল্যবাবু বললেন, এটা তো নয় মাত্রার ছন্দ নয়ই, বাংলা ভাষায় আজও নয় মাত্রার উদ্ভব হয় নি, হয়তো নিরবধিকালে কোনো এক সময়ে হতেও পারে। তিনি বলেন, বাংলা ছন্দ দশ মাত্রাকে মেনেছে, নয় মাত্রাকে মানে নি। এ কথায় আরো আমার ধাঁধা লাগল।

অমূল্যবাবু পরীক্ষা করে বলছেন, এ ছন্দে জোড়ের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। 'আঁধার রজনী' পর্যন্ত এক পর্ব, এইখানে একটা ফাঁক ; তার পরে 'পোহালো' শব্দে তিন মাত্রার একটা পঙ্গু পর্বাঙ্গ ; তার পরে পুরো যতি। অর্থাৎ, এ ছন্দে ছয়

মাত্রারই প্রাধান্য। এর ধড়টা ছয় মাত্রার, ল্যাজটা তিন মাত্রার। চোখ দিয়ে এক পঙ্‌ক্তিতে নয় মাত্রা দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু অমূল্যবাবুর মতে, কান দিয়ে দেখলে ওর দুটো অসমান ভাগ বেরিয়ে পড়ে।

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, আমার অঙ্কবিদ্যায় আমি যে সংখ্যাকে ৯ বলি অমূল্যবাবুর অঙ্কশাস্ত্রেও তাকেই ৯ বলে বটে, কিন্তু ছন্দের মাত্রানির্ণয় সম্বন্ধে তাঁর পদ্ধতির সঙ্গে আমার পদ্ধতির মূলেই প্রভেদ আছে। কথাটা পরিষ্কার করে নেওয়া ভালো।

পৃথিবী চলছে, তার একটা ছন্দ আছে। অর্থাৎ, তার গতিকে মাত্রাসংখ্যায় ভাগ করা যায়। এই ছন্দের পূর্ণায়তনকে নির্ণয় করব কোন্‌ লক্ষণ মতে। পৃথিবী নিয়মিত কালে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। আমাদের পঞ্জিকা-অনুসারে পয়লা বৈশাখ থেকে আরম্ভ করে চৈত্রসংক্রান্তিতে তার আবর্তনের এক পর্যায় শেষ হয়, তার পরে আবার সেই পরিমিতকালে পয়লা বৈশাখ থেকে পুনর্বার তার আবর্তন শুরু হয়। এই পুনরাবর্তনের দিকে লক্ষ করে আমরা বলতে পারি, পৃথিবীর সূর্যপ্রদক্ষিণের মাত্রাসংখ্যা ৩৬৫ দিন।

মহাভারতের কথা অমৃতসমান,
কাশীরামদাস কহে শুনে পুণ্যবান্‌।

এই ছন্দের যাত্রাপথে পুনরাবর্তন আরম্ভ হয়েছে কোথায় সে তো জানা কথা। সেই অনুসারে সর্বজনে বলে থাকে, এর মাত্রাসংখ্যা চোদ্দ। বলা বাহুল্য, এই চোদ্দ মাত্রা একটা অখণ্ড নিরেট পদার্থ নয়। এর মধ্যে জোড় দেখা যায়, সেই জোড় আট মাত্রার অবসানে, অর্থাৎ 'মহাভারতের কথা' একটুখানি দাঁড়িয়েছে যেখানে এসে। পয়ারে এই দাঁড়াবার আড্ডা দু জায়গায়, প্রথম আট ধ্বনিমাত্রার পরে ও শেষার্ধের ছয় ধ্বনি-মাত্রার ও দুই যতিমাত্রার শেষে। পৃথিবীর প্রদক্ষিণ-ছন্দের মধ্যেও দুইভাগ আছে, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন। যতি-সমেত ষোলো মাত্রা পয়ারেও তেমনি আছে উত্তরভাগ ও দক্ষিণভাগ, কিন্তু সেই দুটি ভাগ সমগ্রেরই অন্তর্গত।

মহাভারতের বাণী
অমৃতসমান মানি,
কাশীরামদাস ভনে
শোনে তাহা সর্বজনে।

যদিও পয়ারের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তবু একে অন্য ছন্দ বলব, কারণ এর পুনরাবর্তন আট মাত্রায়, ষোলো মাত্রায় নয়।

আঁধার রজনীপোহালো,
জগৎ পুরিল পুলকে।

এই ছন্দের আবর্তন ছয় মাত্রার পর্যায়ে ঘটে না, তার কক্ষপথ সম্পূর্ণ হয়েছে ৯ মাত্রায়। নয় মাত্রায় তার প্রদক্ষিণ নিজেকে বারে বারে বহুগুণিত করছে। এই নয় মাত্রায় মাঝে-মাঝে সমভাগে জোড়ের বিচ্ছেদ আছে। সেই জোড় ছয় মাত্রায় না, তিন মাত্রায়।

এই ছন্দের লক্ষণ কী। প্রশ্নের উত্তর এই যে, এর পূর্ণভাগ নয় মাত্রা নিয়ে, আংশিক ভাগ তিন, এবং সেই প্রত্যেক ভাগের মাত্রাসংখ্যা তিন। কোনো পাঠক যদি ছয় মাত্রার পরে এসে হাঁপ ছাড়েন, তাঁকে বাধা দেবার কোনো দণ্ডবিধি নেই; সুতরাং সেটা তিনি নিজের স্বচ্ছন্দেই করবেন, আমার ছন্দে করবেন না। আমার ছন্দের লক্ষণ এই— প্রত্যেক পদে তিন কলা, প্রত্যেক কলায় তিন মাত্রা, অতএব সমগ্র পদের মাত্রাসমষ্টি ৯। অমূল্যবাবু এটিকে নিয়ে যে ছন্দ বানিয়েছেন তার প্রত্যেক পদে দুই কলা। প্রথম কলার মাত্রাসংখ্যা ছয়, দ্বিতীয় কলার তিন, অতএব সমগ্র পদের মাত্রাসমষ্টি ৯। দুটি ছন্দেরই মোট আয়তন একই হবে, কানে শোনাবে ভিন্নরকম।

ছান্দসিক যাই বলুন, এখানে ছন্দরচয়িতা হিসাবে আমার আবেদন আছে। ছন্দের তত্ত্ব সম্বন্ধে আমি যা বলি সেটা আমার অশিক্ষিত বলা, সুতরাং তাতে দোষ স্পর্শ করতে পারে; কিন্তু ছন্দের রস সম্বন্ধে আমি যদি কিছু আলোচনা করি, সংকোচ করব না, কেননা ছন্দসৃষ্টিতে অশিক্ষিতপটুত্বের মূল্য উপেক্ষা করবার নয়। 'আঁধার রজনী পোহালো' রচনাকালে আমার কান যে আনন্দ পেয়েছিল সেটা অন্যছন্দোজনিত আনন্দ থেকে বিশেষভাবে স্বতন্ত্র। কারণটা বলি।

অন্যত্র বলেছি, দুই মাত্রায় স্থৈর্য আছে, কিন্তু বেজোড় বলেই তিন মাত্রা অস্থির। ত্রৈমাত্রিক ছন্দে সেই অস্থিরতার বেগটাকে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়।

বিংশতি কোটি মানবের বাস
এ ভারতভূমি যবনের দাস
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা।

এ ছন্দে শব্দগুলি পরস্পরকে অস্থিরভাবে ঠেলা দিচ্ছে। একে জোড়মাত্রার ছন্দে রূপান্তরিত করা যাক।

যেথায় বিংশতি কোটি মানবের বাস
সেই তো ভারতবর্ষ যবনের দাস
শৃঙ্খলেতে বাঁধা পড়ে আছে।

এর চালটা শান্ত।

আলোচ্য নয় মাত্রার ছন্দে তিন সংখ্যার অস্থিরতা শেষপর্যন্তই রয়ে গেছে। সেটা উচিত নয়, ছয় মাত্রার পরে থামবার একটুখানি অবকাশ দেওয়া ভালো— এমন তর্ক

তোলা যেতে পারে। কিন্তু ছন্দের সিদ্ধান্ত তর্কে হয় না, ওটার মীমাংসা কানে। সৌভাগ্যক্রমে এ সভায় সুযোগ পেয়েছি কানের দরবারে আরজি পেশ করবার। নয় মাত্রার চঞ্চল ভঙ্গিতে কান সায় দিচ্ছে না, এ কথা যদি সুধীজন বলেন তা হলে অগত্যা চুপ করে যাব, কিন্তু তবুও নিজের কানের স্বীকৃতিকে অশ্রদ্ধা করতে পারব না।

'আঁধার রজনী পোহালো' কবিতাটি গানরূপে রচিত। সংগীতাচার্য ভীমরাও শাস্ত্রী মৃদঙ্গের বোলে একে যে তালের রূপ দিয়েছিলেন তাতে দুটি আঘাত এবং একটি ফাঁক। যথা—

১ ২ •

আঁধার | রজনী | পোহালো।

এ কথা সকলেরই জানা আছে যে, ফাঁকটা তালের শেষ ঝোঁক, তার পরে পুনরাবর্তন। এই গানের স্বাভাবিক ঝোঁক প্রত্যেক তিন মাত্রায় এবং এর তালের অর্থাৎ ছন্দের সম্পূর্ণতা তিনমাত্রাঘটিত তিন ভাগে। অমূল্যবাবু বা শৈলেন্দ্রবাবু যদি অন্য কোনো রকমের ভাগ ইচ্ছা করেন তবে রচয়িতার ইচ্ছার সঙ্গে তার ঐক্য হবে না, এর বেশি আমার আর কিছু বলবার নাই।

উত্তরদিগন্ত ব্যাপি দেবতাত্মা হিমাদ্রি বিরাজে,
দুই প্রান্তে দুই সিন্ধু, মানদণ্ড যেন তারি মাঝে;

এই ছন্দকে আঠারো মাত্রা যখন বলি তখন সমগ্র পদের মাত্রাসংখ্যা গণনা করেই বলে থাকি। আট মাত্রার পরে এর একটা সুস্পষ্ট বিরাম আছে বলে এর আঠারো মাত্রার সীমানার বিরুদ্ধে নালিশ চলে না।

আমাদের হাতে তিন পর্ব আছে। মণিবন্ধ পর্যন্ত এক; এটি ছোটো পর্ব, কনুই পর্যন্ত দুই; কনুই থেকে কাঁধ পর্যন্ত তিন; যাকে আমরা সমগ্র বাহু বলি সে এই তিন পর্ব মিলিয়ে। আমাদের দেহে এক বাহু অন্য বাহুর অবিকল পুনরাবৃত্তি। প্রত্যেক ছন্দেরই এমনিতরো একটি সম্পূর্ণ রূপকল্প অর্থাৎ প্যাটার্‌ন্‌ আছে। ছন্দোবদ্ধ কাব্যে সেই প্যাটার্‌ন্‌কেই পুনঃপুনিত করে। সেই প্যাটার্‌নের সম্পূর্ণ সীমার মধ্যেই তার নানা পর্ব পর্বাঙ্গ প্রভৃতি যা-কিছু। সেই সমগ্র প্যাটার্‌নের মাত্রাই সেই ছন্দের মাত্রা। 'আঁধার রজনী পোহালো' গানটিকে এইজন্যেই নয় মাত্রার বলেছি। যেহেতু প্রত্যেক নয় মাত্রাকে নিয়েই তার পুনঃপুন আবর্তন।

কোন্‌ ছন্দ কী রকম ভাগ করে পড়তে হবে, এ নিয়ে মতান্তর হওয়া অসম্ভব নয়। পুরাতন ছন্দগুলির নাম-অনুসারে সংজ্ঞা আছে। নতুন ছন্দের নামকরণ হয় নি। এইজন্যে তার আবৃত্তির কোনো নিশ্চিত নির্দেশ নেই। কবির কল্পনা এবং

পাঠকের রুচিতে যদি অনৈক্য হয় তবে কোনো আইন নেই যা নিয়ে নালিশ চলতে পারে। বর্তমান প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এই যে, আমি যখন স্পষ্টতই আমার কোনো কাব্যের ছন্দকে নয় মাত্রার বলছি তখন সেটা অনুসরণ করাই বিহিত। হতে পারে তাতে কানের তৃপ্তি হবে না। না যদি হয় তবে সে দায় কবির। কবিকে নিন্দা করবার অধিকার সকলেরই আছে, তার রচনাকে সংশোধন করবার অধিকার কারো নেই।

এই উপলক্ষে একটা গল্প মনে পড়ছে। গল্পটা বানানো নয়। পার্লামেন্টে দর্শকদের বসবার আসনে দুটি শ্রেণীভাগ আছে। সম্মুখভাগের আসনে বসেন যাঁরা খ্যাতনামা, পশ্চাতের ভাগে বসেন অপর-সাধারণ। দুই বিভাগের মাঝখানে কেবল একটিমাত্র দড়ি বাঁধা। একজন ভারতীয় দর্শক সেই সামনের দিক নির্দেশ করে প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : Can I go over there ? প্রহরী উত্তর করেছিল : 'Yes, sir, you *can* but you *mayn't*.

ছন্দেও যতিবিভাগ সম্বন্ধে কোনো কোনো ক্ষেত্রে can-এর নিষেধ বলবান নয়, কিন্তু তবু mayর নিষেধ স্বীকার্য। একটা দৃষ্টান্ত দেখা যাক। পাঠকমহলে স্বনামখ্যাত পয়ার ছন্দের একটা পাকা পরিচয় আছে, এইজন্যে তার পদে কোথায় আধা যতি কোথায় পুরো যতি তা নিয়ে বচসার আশঙ্কা নেই। নিম্নলিখিত কবিতার চেহারা অবিকল পয়ারের। সেই চোখের দলিলের জোরে তার সঙ্গে পয়ারের চালে ব্যবহার অবৈধ হয় না।

মাথা তুলে তুমি যবে চল তব রথে
তাকাও না কোথা আমি ফিরি পথে পথে,
অবসাদজাল মোরে ঘেরে পায় পায়।
মনে পড়ে, এই হাতে নিয়েছিলে সেবা,
তবু হায় আজ মোরে চিনিবে সে কেবা,
তোমারি চাকার ধুলা মোরে ঢেকে যায়।

কিন্তু যদি পয়ার নাম বদলিয়ে এর নাম দেওয়া যায় 'ষড়ঙ্গী' এবং এর যথোচিত সংজ্ঞা নির্দেশ করি তা হলে বিনা প্রতিবাদে নিম্নলিখিত ভাগেই একে পড়া উচিত হবে।

মাথা তুলে তুমি
যবে চল তব
রথে

তাকাও না কোথা
আমি ফিরি পথে
পথে,
অবসাদজাল
ঘেরে মোরে পায়ে
পায়।
মনে পড়ে, এই
হাতে নিয়েছিলে
সেবা—
তবু হায় আজ
মোরে চিনিবে সে
কেবা—
তোমারি চাকার
ধুলা মোরে ঢেকে
যায়।

এর প্রত্যেক পদে ১৪ মাত্রা, ৩ কলা, সেই কলার মাত্রাসংখ্যা যথাক্রমে ৬, ৬, ২।

অমূল্যবাবুর মতে, বাংলায় নয় মাত্রার ছন্দ নেই, আছে দশ মাত্রার, কিন্তু দশ মাত্রার ঊর্ধ্বে আর ছন্দ চলে না। আমি অনেক চিন্তা করেও তাঁর এই মতের তাৎপর্য বুঝতে পারি নি। একাদিক্রমে মাত্রাগণনা গণিতশাস্ত্রের সবচেয়ে সহজ কাজ, তাতেও যদি তিনি বাধা দেন তা হলে বুঝতে হবে, তাঁর মতে গণনার বাইরে আরো কিছু গণ্য করবার আছে। হয়তো মোট মাত্রার ভাগগুলো নিয়ে তর্ক। ভাগ সকল ছন্দেই আছে। দশ মাত্রার ছন্দ, যথা—

প্রাণে মোর আছে তার বাণী,
তার বেশি তারে নাহি জানি।

এর সহজ ভাগ এই—

প্রাণে মোর
আছে তার
বাণী।

একে অন্তরকমেও ভাগ করা চলে। যথা—

প্রাণে মোর আছে

তার বাণী।

অথবা 'প্রাণে' শব্দটাকে একটু আড় করে রেখে—

প্রাণে

মোর আছে তার

বাণী।

এই তিনটেই ১০ মাত্রার ছন্দের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। তা হলেই দেখা যাচ্ছে, ছন্দকে চিনতে হলে প্রথম দেখা চাই, তার পদের মোট মাত্রা, তার পরে তার কলাসংখ্যা, তার পরে প্রত্যেক কলার মাত্রা।

১ ২

সকল বেলা | কাটিয়া গেল, |

৩ ৪

বিকাল নাহি | যায়।

এই ছন্দের প্রত্যেক পদে ১৭ মাত্রা। এর ৪ কলা। অন্ত্য কলাটিতে দুই ও অন্য তিনটি কলায় পাঁচ-পাঁচ মাত্রা। এই ১৭ মাত্রা বজায় রেখে অন্যজাতীয় ছন্দ রচনা চলে কলাবৈচিত্র্যের দ্বারা। যথা—

১ ২ ৩

মন চায় | চলে আসে | কাছে, |

৪ ৫

তবুও পা | চলে না।

বলিবার | কত কথা | আছে, |

তবু কথা | বলে না।

এ ছন্দে পদের মাত্রা ১৭, কলার সংখ্যা ৫, তার মাত্রাসংখ্যা যথাক্রমে— ৪+৪+২+৪+৩। আঠারো মাত্রার দীর্ঘপয়ারে প্রথম আট মাত্রার পরে যেমন স্পষ্ট যতি আছে, এই ছন্দের প্রথম দশ মাত্রার পরে তেমনি।

নয়নে | নিঠুর | চাহনি |

হৃদয়ে | করুণা | ঢাকা।

গভীর | প্রেমের | কাহিনী |

গোপন | করিয়া | রাখা।

এরও পদের মাত্রা ১৭, কলার সংখ্যা ৬, শেষ কলাটি ছাড়া প্রত্যেক কলার মাত্রা ৩।

অন্তর তার | কী বলিতে চায় | চঞ্চল চর | ণে,
কণ্ঠের হার | নয়ন ডুবায় | চম্পক বর | নে।

এরও সমগ্র পদের মাত্রা ১৭*। এর চারটি কলা। প্রথম তিনটি কলায় মাত্রাসংখ্যা ৬, চতুর্থ কলায় ১। সতেরো মাত্রার ছন্দকে কলাবৈচিত্র্যের দ্বারা আরো নব নব রূপ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সাক্ষী আর বাড়াবার দরকার নেই।

শেষের যে দৃষ্টান্ত দেওয়া গেছে তাতে মাত্রাসংখ্যাগণনা উপলক্ষে 'চরণে' শব্দকে ভাগ করে দিয়ে এক মাত্রার 'ণে' ধ্বনিকে স্বতন্ত্র কলায় বসিয়েছি। ওটা যে স্বতন্ত্রকলা-ভুক্ত তার প্রমাণ এই ছন্দের তাল দেবার সময় ঐ 'ণে' ধ্বনিটির উপর তাল পড়ে।

ইতিপূর্বে অন্যত্র একটি নয় মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত দেবার সময় নিম্নলিখিত শ্লোকটি ব্যবহার করেছি। তাল দেবার রীতি বদল করে একে দুরকম করে পড়া যায়, দুটোই পৃথক্ ছন্দ।

বারে বারে যায় | চলিয়া
ভাসায় গো আঁখি | নীরে সে।
বিরহের ছলে | ছলিয়া
মিলনের লাগি | ফিরে সে।

এটা ৯ মাত্রার শ্রেণীর ছন্দ; এর দুই কলা এবং কলাগুলি ত্রৈমাত্রিক। এর পদকে তিন কলায় ভাগ করে কলাগুলিকে দুই মাত্রার ছাঁদ দিলে এই একই ছড়া সম্পূর্ণ নূতন ছন্দে গিয়ে পৌঁছাবে। যথা—

১ ২ ৩
বারে বারে | যায় চলি | য়া
ভাসায় গো | আঁখিনীরে | সে।
বিরহের | ছলে ছলি | য়া
মিলনের | লাগি ফিরে | সে।
সারাদিন | দহে তিয়া | যা,
বারেক না | দেখি উহা | রে।
অসময়ে | লয়ে কী আ | শা
অকারণে | আসে দুয়া | রে।

অমূল্যবাবু বলেন, এর প্রথম দুই কলায় চার চার আট এবং শেষের কলায় এক মাত্রার

১৯?

ছন্দ কৃত্রিম শুনতে হয়। বোধ হয় অখণ্ড শব্দকে খণ্ডিত করা হচ্ছে বলে তাঁর কাছে এটা কৃত্রিম ঠেকছে। কিন্তু, ছন্দের ঝোঁকে অখণ্ড শব্দকে দু ভাগ করার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। এরকম তর্কে বিশুদ্ধ হাঁ এবং না -এর দ্বন্দ্ব; কোনো পক্ষে কোনো যুক্তিপ্রয়োগের ফাঁক নেই। আমি বলছি, কৃত্রিম শোনায় না; তিনি বলছেন, শোনায়। আমি এখনো বলি, এইরকম কলাভাগে এই ছন্দে একটি নূতন নৃত্যভঙ্গি জেগে ওঠে, তার একটা রস আছে।

দশের বেশি মাত্রাভার বাংলা ছন্দ বহন করতে অক্ষম, এ কথা মানতে পারব না। নিম্নে বারো মাত্রার একটি শ্লোক দেওয়া গেল।

মেঘ ডাকে গম্ভীর গরজনে,
ছায়া নামে তমালের বনে বনে,
ঝিল্লি ঝনকে নীপবীথিকায়।
সরোবর উচ্ছল কূলে কূলে,
তটে তারি বেণুশাখা দুলে দুলে
মেতে ওঠে বর্ষণগীতিকায়।

শ্রোতারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, আবৃত্তিকালে পদান্তের পূর্বে কোনো যতিই দিই নি, অর্থাৎ বারো মাত্রা একটি ঘনিষ্ঠ গুচ্ছের মতোই হয়েছে। এই পদগুলিকে বারো মাত্রার পদ বলবার কোনো বাধা আছে বলে আমি কল্পনা করতে পারি নে। উল্লিখিত শ্লোকের ছন্দে বারো মাত্রা, প্রত্যেক পদে তিন কলা, প্রত্যেক কলায় চার মাত্রা। বারো মাত্রার পদকে চার কলায় বিভক্ত করে ত্রৈমাত্রিক করলে আর-এক ছন্দ দেখা দেবে। যথা—

শ্রাবণগগন, ঘোর ঘনঘটা,
তাপসী যামিনী এলায়েছে জটা,
দামিনী ঝলকে রহিয়া রহিয়া।

এ ছন্দ বাংলা ভাষায় সুপরিচিত।

তমালবনে ঝরিছে বারিধারা,
তড়িৎ ছুটে আঁধারে দিশাহারা।
ছিঁড়িয়া ফেলে কিরণকিঙ্কিণী
আত্মঘাতী যেন সে পাগলিনী।

পঞ্চমাত্রাঘটিত এই বারো মাত্রাকেও কেন যে বারো মাত্রা বলে স্বীকার করব না, আমি বুঝতেই পারি নে।

কেবল নয় মাত্রার পদ বলার দ্বারা ছন্দের একটা সাধারণ পরিচয় দেওয়া হয়, সে

পরিচয় বিশেষভাবে সম্পূর্ণ হয় না। আমার সাধারণ পরিচয়, আমি ভারতীয়; বিশেষ পরিচয়, আমি বাঙালি; আরো বিশেষ পরিচয়, আমি বিশেষ পরিবারের বিশেষ নামধারী মানুষ। নয় মাত্রার পদবিশিষ্ট ছন্দ সাধারণভাবে অনেক হতে পারে। আরো বিশেষ পরিচয় দাবি করলে, এর কলাসংখ্যা এবং সেই কলার মাত্রাসংখ্যার হিসাব দিতে হয়।

কোনো কোনো ছন্দে কলাবিভাগ করতে ভুল হবার আশঙ্কা আছে। যেমন— গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা। পয়ারের ১৪ মাত্রা থেকে এক মাত্রা হরণ করে এই ১৩ মাত্রার ছন্দ গঠিত। অর্থাৎ 'গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরিষণ' এবং এই ছন্দটি বস্তুত এক, এমন মনে হতে পারে। আমি তা স্বীকার করি নে; তার সাক্ষী শুধু কান নয়, তালও বটে। এই দুটি ছন্দে তালের ঘা পড়েছে কী রকম তা দেখা উচিত।

১ ২
গগনে গরজে মেঘ | ঘন বরিষণ।

সাধারণ পয়ারের নিয়মে এতে দুটি আঘাত।

১ ২ ৩
গগনে গরজে মেঘ | ঘন বর | ষা।

এতে তিনটি আঘাত। পদটি তিন অসমান ভাগে বিভক্ত। পদের শেষবর্ণে স্বতন্ত্র ঝোঁক দিলে তবেই এর ভঙ্গিটাকে রক্ষা করা হয়। 'বরষা' শব্দের শেষ আকার যদি হরণ করা যায় তা হলে ঝোঁক দেবার জায়গা পাওয়া যায় না, তা হলে অক্ষরসংখ্যা সমান হলেও ছন্দ কাত হয়ে পড়ে।

'আঁধার রজনী পোহালো' পদের অন্তবর্ণে দীর্ঘস্বর আছে, কিন্তু নয় মাত্রার ছন্দের পক্ষে সেটা অনিবার্য নয়। তারই একটি প্রমাণ নীচে দেওয়া গেল।

জ্বেলেছে পথের আলোক
সূর্যরথের চালক,
অরুণরক্ত গগন।
বক্ষে নাচিছে রুধির,
কে রবে শান্ত সুধীর
কে রবে তন্দ্রামগন।
বাতাসে উঠিছে হিল্লোল,
সাগর-ঊর্মি বিলোল,
এল মহেন্দ্রলগন,
কে রবে তন্দ্রামগন।

এই তর্কক্ষেত্রে আর-একটি আমার কৈফিয়ত দেবার আছে। অমূল্যবাবুর নালিশ এই যে, ছন্দের দৃষ্টান্তে কোনো কোনো স্থলে দুই পঙ্‌ক্তিকে মিলিয়ে আমি কবিতার এক পদ বলে চালিয়েছি। আমার বক্তব্য এই, লেখার পঙ্‌ক্তি এবং ছন্দের পদ এক নয়। আমাদের হাঁটুর কাছে একটা জোড় আছে বলে আমরা প্রয়োজনমত পা মুড়ে বসতে পারি, তৎসত্ত্বেও গণনায় ওটাকে এক পা বলেই স্বীকার করি এবং অনুভব করে থাকি। নইলে চতুষ্পদের কোঠায় পড়তে হয়। ছন্দেও ঠিক তাই—

সকল বেলা কাটিয়া গেল,
বিকাল নাহি যায়।

অমূল্যবাবু এঁকে দুই চরণ বলেন, আমি বলি নে। এই দুটি ভাগকে নিয়েই ছন্দের সম্পূর্ণতা। যদি এমন হত—

সকল বেলা কাটিয়া গেল,
বকুলতলে আসন মেলো—

তা হলে নিঃসংশয়ে একে দুই চরণ বলতুম।

পুনর্বার বলি যে, যে বিরামস্থলে পৌঁছিয়ে পদ্যছন্দ অনুরূপ ভাগে পুনরাবর্তন করে সেই পর্যন্ত এসে তবেই কোন্‌টা কোন্ ছন্দ এবং তার মাত্রার পরিমাণ কত তার নির্ণয় সম্ভব, মাঝখানে কোনো একটা জোড়ের মুখে গণনা শেষ করা অসংগত। সংস্কৃত বা প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে এই নিয়মেরই অনুসরণ করা হয়। দৃষ্টান্ত—

পৈঙ্গল-ছন্দঃসূত্রাণি

ভংজিঅ মলঅচোলবই ণিবলিঅ
গংজিঅ গুজ্জরা।
মালবরাঅ মলঅগিরি লুক্কিঅ
পরিহরি কুংজরা।
খুরাসাণ খুহিঅ রণমহ মুহিঅ
লংঘিঅ সাঅরা।
হম্মীর চলিঅ হারব পলিঅ
রিউগণহ কাঅরা॥

গ্রন্থকার বলছেন 'বিংশত্যক্ষরাণি' এবং 'পঞ্চবিংশতিমাত্রাঃ প্রতিপাদং দেয়াঃ'। এর পদে পদে কুড়িটি অক্ষর ও পঁচিশটা মাত্রা, ছন্দের এই পরিচয়।

পচম দহ দিজ্জিআ
পুণবি তহ কিজ্জিআ

পুণবি দহ সত্ত তহ বিরই জাআ।
এম পরি বিবিহুদল
মত্ত সততীস পল
এহু কহ ঝুল্লণা ণাঅরআ ॥

ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা এই : প্রথমং দশমাত্রা দীয়ন্তে। অর্থাৎ তত্র বিরতিঃ ক্রিয়তে। পুনরপি তথা কর্তব্যা। পুনরপি সপ্তদশমাত্রাসু বিরতির্জাতা চ। অনয়ৈব রীত্যা দলদ্বয়েপি মাত্রা সপ্তত্রিংশৎ পতন্তি। এমনি করে দলগুলিকে মিলিয়ে যে ছন্দের সাঁইত্রিশ মাত্রা 'তামিমাং নাগরাজঃ পিঙ্গলো ঝুল্লণামিতি কথয়তি'। আমি যাকে ছন্দোবিশেষের রূপকল্প বা প্যাটর্ন্ বলছি 'ঝুল্লণা' ছন্দে সেইটে সাঁইত্রিশ মাত্রায় সম্পূর্ণ, তার পরে তার অনুরূপ পুনরাবৃত্তি। অমূল্যবাবু হয়তো এর কথাগুলির প্রতি লক্ষ রেখে একে পাঁচ বা দশ মাত্রার ছন্দ বলবেন, কিন্তু পাঁচ বা দশ মাত্রায় এর পদের সম্পূর্ণতা নয়।

যার ভাগগুলি অসমান এমন ছন্দ দেখা যাক—

কুংতঅরু ধণুদ্ধরু
হঅবর গঅবরু
ছক্কলু বিবি পা-
ইক্ক দলে।

এই ছন্দ সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'দ্বাত্রিংশন্মাত্রাঃ পাদে সুপ্রসিদ্ধাঃ'। এই ছন্দকে বাংলায় ভাঙতে গেলে এইরকম দাঁড়ায়।

কুঞ্জপথে জ্যোৎস্নারাতে
চলিয়াছে সখীসাথে
মল্লিকাকলিকার
মাল্য হাতে।

চার পঙ্‌ক্তিতে এই ছন্দের পূর্ণরূপ এবং সেই পূর্ণরূপের মাত্রাসংখ্যা বত্রিশ। ছন্দে মাত্রাগণনার এই ধারা আমি অনুসরণ করা কর্তব্য মনে করি। মনে নেই, আমার কোনো পূর্বতন প্রবন্ধে অন্য মত প্রকাশ করেছি কি না; যদি করে থাকি তবে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

সবশেষে পুনরায় বলি, ছন্দের স্বরূপনির্ণয় করতে হলে সমগ্রের মাত্রাসংখ্যা, তার কলাসংখ্যা ও কলাগুলির মাত্রাসংখ্যা জানা আবশ্যক। শুধু তাই নয়, যেখানে ছন্দের রূপকল্প একাধিক পদের দ্বারা সম্পূর্ণ হয় সেখানে পদসংখ্যাও বিচার্য। যথা—

বর্ষণশান্ত
পাণ্ডুর মেঘ যবে ক্লান্ত
বন ছাড়ি মনে এল নীপরেণুগন্ধ,
ভরি দিল কবিতার ছন্দ।

এখানে চারিটি পদ এবং প্রত্যেক পদ নানা অসমান মাত্রায় রচিত, সমস্তটাকে নিয়ে ছন্দের রূপকল্প। বিশেষজাতীয় ছন্দে এইরূপ পদ ও মাত্রা গণনাতেও আমি পিঙ্গলাচার্যের অনুবর্তী।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১

বাংলা ছন্দের প্রকৃতি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত

আমাদের দেহ বহন করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভার, আর তাকে চালন করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতিবেগ; এই দুই বিপরীত পদার্থ যখন পরস্পরমিলনে লীলায়িত হয় তখন জাগে নাচ। দেহের ভারটাকে দেহের গতি নানা ভঙ্গিতে বিচিত্র করে, জীবিকার প্রয়োজনে নয়, সৃষ্টির অভিপ্রায়ে; দেহটাকে দেয় চলমান শিল্পরূপ। তাকে বলি নৃত্য।

রূপসৃষ্টির প্রবাহই তো বিশ্ব। সেই রূপটা জাগে ছন্দে, আধুনিক পরমাণুতত্ত্বে সে কথা সুস্পষ্ট। সাধারণ বিদ্যুৎপ্রবাহ আলো দেয়, তাপ দেয়, তার থেকে রূপ দেখা দেয় না। কিন্তু, বিদ্যুৎকণা যখন বিশেষ সংখ্যায় ও গতিতে আমাদের চৈতন্যের দ্বারে ঘা মারে তখনই আমাদের কাছে প্রকাশ পায় রূপ, কোনোটা দেখা দেয় সোনা হয়ে, কোনোটা হয় সীসে। বিশেষসংখ্যক মাত্রা ও বিশেষবেগের গতি এই দুই নিয়েই ছন্দ, সেই ছন্দের মায়ামন্ত্র না পেলে রূপ থাকে অব্যক্ত। বিশ্বসৃষ্টির এই ছন্দোরহস্য মানুষের শিল্পসৃষ্টিতে। তাই ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলছেন: শিল্পানি শংসন্তি দেবশিল্পানি। মানুষের সব শিল্পই দেবশিল্পের স্তবগান করছে। এতেষাং বৈ শিল্পানামনুকৃতীহ শিল্পম্ অধিগম্যতে। মানবলোকের সব শিল্পই এই দেবশিল্পের অনুকৃতি, অর্থাৎ বিশ্বশিল্পের রহস্যকেই অনুসরণ করে মানবশিল্প। সেই মূলরহস্য ছন্দে, সেই রহস্য আলোকতরঙ্গে, শব্দতরঙ্গে, রক্তভরঙ্গে, স্নায়ুতন্তুর বৈদ্যুততরঙ্গে।

মানুষ তার প্রথম ছন্দের সৃষ্টিকে জাগিয়েছে আপন দেহে। কেননা তার দেহ ছন্দরচনার উপযোগী। ভূতলের টান থেকে মুক্ত করে দেহকে সে তুলেছে ঊর্ধ্ব দিকে।

চলমান মানুষের পদে পদে ভারসাম্যের অপ্রতিষ্ঠতা, unstable equilibrium। এতেই তার বিপদ, এতেই তার সম্পদ। চলার চেয়ে পড়াই তার পক্ষে সহজ। ছাগলের ছানা চলা নিয়েই জন্মেছে, মানুষের শিশু চলাকে আপনি সৃষ্টি করেছে ছন্দে। সামনে-পিছনে ডাইনে-বাঁয়ে পায়ে-পায়ে দেহভারকে মাত্রাবিভক্ত করে ওজন বাঁচিয়ে তবেই তার চলা সম্ভব হয়। সেটা সহজ নয়, মানবশিশুর চলার ছন্দসাধনা দেখলেই তা বোঝা যায়। যে পর্যন্ত আপন ছন্দকে সে আপনি উদ্ভাবন না করে সে পর্যন্ত তার হামাগুড়ি, অর্থাৎ, ভারাকর্ষণের কাছে তার অবনতি, সে পর্যন্ত সে নৃত্যহীন।

চতুষ্পদ জন্তুর নিত্যই হামাগুড়ি। তার চলা মাটির কাছে হার মেনে চলা। লাফ দিয়ে যদি-বা সে উপরে ওঠে, পরক্ষণেই মাটির দরবারে ফিরে এসেই তার মাথা হেঁট। বিদ্রোহী মানুষ মাটির একান্ত শাসন থেকে দেহভারকে মুক্ত করে নিয়ে তাতেই চালায় প্রয়োজনের কাজ এবং অপ্রয়োজনের লীলা। ভূমির টানের বিরুদ্ধে ছন্দের সাহায্যে তার এই জয়লব্ধ শক্তি।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলছেন: আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি। শিল্পই হচ্ছে আত্মসংস্কৃতি। সম্যক্ রূপদানই সংস্কৃতি, তাকেই বলে শিল্প। আত্মাকে সুসংযত করে মানুষ যখন আত্মার সংস্কার করে, অর্থাৎ তাকে দেয় সম্যক্ রূপ, সেও তো শিল্প। মানুষের শিল্পের উপাদান কেবল তো কাঠপাথর নয়, মানুষ নিজে। বর্বর অবস্থা থেকে মানুষ নিজেকে সংস্কৃত করেছে। এই সংস্কৃতি তার স্বরচিত বিশেষ ছন্দোময় শিল্প। এই শিল্প নানা দেশে, নানা কালে, নানা সভ্যতায়, নানা আকারে প্রকাশিত, কেননা বিচিত্র তার ছন্দ। ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে। শিল্পযজ্ঞের যজমান আত্মাকে সংস্কৃত করেন, তাকে করেন ছন্দোময়।

যেমন মানুষের আত্মার তেমনি মানুষের সমাজেরও প্রয়োজন ছন্দোময় সংস্কৃতি। সমাজও শিল্প। সমাজে আছে নানা মত, নানা ধর্ম, নানা শ্রেণী। সমাজের অন্তরে সৃষ্টিতত্ত্ব যদি সক্রিয় থাকে, তা হলে সে এমন ছন্দ উদ্ভাবন করে যাতে তার অংশ-প্রত্যংশের মধ্যে কোথাও ওজনের অত্যন্ত বেশি অসাম্য না হয়। অনেক সমাজ পঙ্গু হয়ে আছে ছন্দের এই ত্রুটিতে, অনেক সমাজ মরেছে ছন্দের এই অপরাধে। সমাজে যখন হঠাৎ কোনো একটা সংরাগ অতিপ্রবল হয়ে ওঠে তখন মাতাল সমাজ পা ঠিক রাখতে পারে না, ছন্দ থেকে হয় ভ্রষ্ট। কিম্বা যখন এমন সকল মতের, বিশ্বাসের, ব্যবহারের বোঝা অচল হয়ে কাঁধে চেপে থাকে, যাকে ছন্দ বাঁচিয়ে সম্মুখে বহন করে চলা সমাজের পক্ষে অসম্ভব হয়, তখন সেই সমাজের পরাভব ঘটে। যেহেতু

জগতের ধর্মই চলা, সংসারের ধর্ম স্বভাবতই সরতে থাকা, সেইজন্তেই তার বাহন ছন্দ। যে গতি ছন্দ রাখে না, তাকেই বলে দুর্গতি।

মানুষের ছন্দোময় দেহ কেবল প্রাণের আন্দোলনকে নয় তার ভাবের আন্দোলনকেও যেমন সাড়া দেয়, এমন আর কোনো জীবে দেখি নে। অন্য জন্তুর দেহেও ভাবের ভাষা আছে কিন্তু মানুষের দেহভঙ্গির মতো সে ভাষা চিন্ময়তা লাভ করে নি, তাই তার তেমন শক্তি নেই, ব্যঞ্জনা নেই।

কিন্তু, এই যথেষ্ট নয়। মানুষ সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টি করতে গেলে ব্যক্তিগত তথ্যকে দাঁড় করাতে হয় বিশ্বগত সত্যে। সুখদুঃখ-রাগবিরাগের অভিজ্ঞতাকে আপন ব্যক্তিগত ঐকান্তিকতা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেটাকে রূপসৃষ্টির উপাদান করতে চায় মানুষ। 'আমি ভালোবাসি' এই কথাটিকে ব্যক্তিগত ভাষায় প্রকাশ করা যেতে পারে ব্যক্তিগত সংবাদ বহন করবার কাজে। আবার, 'আমি ভালোবাসি' এই কথাটিকে 'আমি' থেকে স্বতন্ত্র করে সৃষ্টির কাজে লাগানো যেতে পারে, যে সৃষ্টি সর্বজনের, সর্বকালের। যেমন সাজাহানের বিরহশোক দিয়ে সৃষ্ট হয়েছে তাজমহল, সাজাহানের সৃষ্টি অপরূপ ছন্দে অতিক্রম করেছে ব্যক্তিগত সাজাহানকে।

নৃত্যকলার প্রথম ভূমিকা দেহচাঞ্চল্যের অর্থহীন সুষমায়। তাতে কেবলমাত্র ছন্দের আনন্দ। গানেরও আদিম অবস্থায় একঘেয়ে তালে একঘেয়ে সুরের পুনরাবৃত্তি; সে কেবল তালের নেশা-জমানো, চেতনাকে ছন্দের দোল-দেওয়া। তার সঙ্গে ক্রমে ভাবের দোলা মেশে। কিন্তু, এই ভাবব্যক্তি যখন আপনাকে ভোলে, অর্থাৎ ভাবের প্রকাশটাই যখন লক্ষ্য না হয়, তাকে উপলক্ষ করে রূপসৃষ্টিই হয় চরম, তখন নাচটা হয় সর্বজনের ভোগ্য; সেই নাচটা ক্ষণকালের পরে বিস্মৃত হলেও যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তার রূপে চিরকালের স্বাক্ষর লাগে।

নাচতে দেখেছি সারসকে। সেই নাচকে কেবল আঙ্গিক বলা যায় না, অর্থাৎ টেক্‌নিকেই তার পরিশেষ নয়। আঙ্গিকে মন নেই, আছে নৈপুণ্য। সারসের নাচের মধ্যে দেখেছি ভাব এবং তার চেয়েও আরো কিছু বেশি। সারস যখনই মুগ্ধ করতে চেয়েছে আপন দোসরকে তখনই তার মন সৃষ্টি করতে চেয়েছে নৃত্যভঙ্গির সংস্কৃতি, বিচিত্র ছন্দের পদ্ধতি। সারসের মন আপন দেহে এই নৃত্যশিল্প রচনা করতে পেরেছে, তার কারণ তার দেহভারটা অনেক মুক্ত।

কুকুরের মনে আবেগের প্রবলতা যথেষ্ট, কিন্তু তার দেহটা বন্ধক দেওয়া মাটির কাছে। মুক্ত আছে কেবল তার ল্যাজ। ভাবাবেগের চাঞ্চল্যে কুক্কুরীর ছন্দে ওই ল্যাজটাতেই চঞ্চল হয় তার নৃত্য, দেহ আঁকুবাঁকু করে বন্দীর মতো।

মানুষের সমগ্র মুক্ত দেহ নাচে ; নাচে মানুষের মুক্ত কণ্ঠের ভাষা। তাদের মধ্যে ছন্দের সৃষ্টিরহস্য যথেষ্ট জায়গা পায়। সাপ অপদস্থ জীব, মানুষের মতো পদস্থ নয়। সমস্ত দেহ সে মাটিকে সমর্পণ করে বসেছে। সে কখনো নিজে নাচে না। সাপুড়ে তাকে নাচায়। বাহিরের উত্তেজনায় ক্ষণকালের জন্য দেহের এক অংশকে সে মুক্ত করে নেয়, তাকে দোলায় ছন্দে। এই ছন্দ সে পায় অন্যের কাছ থেকে, এ তার আপন ইচ্ছার ছন্দ নয়। ছন্দ মানেই ইচ্ছা। মানুষের ভাবনা রূপগ্রহণের ইচ্ছা করেছে নানা শিল্পে, নানা ছন্দে। কত বিলুপ্ত সভ্যতার ভগ্নাবশেষে বিস্মৃত যুগের ইচ্ছার বাণী আজও ধ্বনিত হচ্ছে তার কত চিত্রে, জলপাত্রে, কত মূর্তিতে। মানুষের আনন্দময় ইচ্ছা সেই ছন্দোলীলার নটরাজ, ভাষায় ভাষায় তার সাহিত্যে সেই ইচ্ছা নব নব নৃত্যে আন্দোলিত।

মানুষের সহজ চলায় অব্যক্ত থাকে নৃত্য, ছন্দ যেমন প্রচ্ছন্ন থাকে গদ্যভাষায়। কোনো মানুষের চলাকে বলি সুন্দর, কোনোটাকে বলি তার উলটো। তফাতটা কিসে। সে কেবল একটা সমস্যাসমাধান নিয়ে। দেহের ভার সামলিয়ে দেহের চলা একটা সমস্যা। ভারটাই যদি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়, তা হলেই অসাধিত সমস্যা প্রমাণ করে অপটুতা। যে চলায় সমস্যার সমুৎকৃষ্ট মীমাংসা সেই চলাই সুন্দর।

পালে-চলা নৌকো সুন্দর, তাতে নৌকোর ভারটার সঙ্গে নৌকোর গতির সম্পূর্ণ মিলন ; সেই পরিণয়ে শ্রী উঠেছে ফুটে, অতিপ্রয়াসের অবমান হয়েছে অন্তর্হিত। এই মিলনেই ছন্দ। দাঁড়ি দাঁড় টানে, সে লগি ঠেলে, কঠিন কাজের ভারটাকে সে কমিয়ে আনে কেবল ছন্দ রেখে। তখন কাজের ভঙ্গি হয় সুন্দর। বিশ্ব চলেছে প্রকাণ্ড ভার নিয়ে বিপুল দেশে নিরবধি কালে সুপরিমিতির ছন্দে। এই সুপরিমিতির প্রেরণায় শিশিরের ফোঁটা থেকে সূর্যমণ্ডল পর্যন্ত সুগোল ছন্দে গড়া। এইজন্যেই ফুলের পাপড়ি সুবঙ্কিম, গাছের পাতা সুঠাম, জলের ঢেউ সুডোল।

জাপানে ফুলদানিতে ফুল সাজাবার একটি কলাবিদ্যা আছে। যেমন-তেমন আকারে পুঞ্জীকৃত পুষ্পিত শাখায় বস্তুভারটাই প্রত্যক্ষ ; তাকে ছন্দ দিয়ে যেই শিল্প করা যায়, তখন সেই ভারটা হয় অগোচর, হালকা হয়ে গিয়ে অন্তরে প্রবেশ করে সহজে।

প্রাচীন জাপানের একজন বিখ্যাত বীর এই ফুল সাজানো দেখতে ভালোবাসতেন। তিনি বলতেন, এই সজ্জাপ্রকরণ থেকে তাঁর মনে আসত আপন যুদ্ধব্যবসায়ের প্রেরণা। যুদ্ধও ছন্দে-বাঁধা শিল্প, ছন্দের সমুৎকর্ষ থেকেই তার শক্তি। এই কারণেই লাঠি-খেলাও নৃত্য।

জাপানে দেখেছি চা-উৎসব। তাতে চা-তৈরি, চা-পরিবেশনের প্রত্যেক অংশই সযত্ন, সুন্দর। তার তাৎপর্য এই যে কর্মের সৌষ্ঠব এবং কর্মের নৈপুণ্য একসঙ্গে গাঁথা। গৃহিণীপনা যদি সত্য হয় তাকে সুন্দর হতেই হবে; অকৌশল ধরা পড়ে কুশ্রীতায়, কর্মের ও লোক-ব্যবহারের ছন্দোভঙ্গে। ভাঙা ছন্দের ছিদ্র দিয়েই লক্ষ্মী বিদায় নেন।

এতক্ষণ ছন্দকে দেখা গেল নৃত্যে। কেননা ছন্দের প্রথম উল্লাস মানুষের বাক্যহীন দেহই। তার পরে দেহের ইশারা মেলে ভাষার ইশারায়। এবার ভাষার ক্ষেত্রে দেখা যাক ছন্দকে।

সেই একই কথা, ভার আর গতি, সেই দুইয়ের যোগে ওজন বাঁচিয়ে চলা। জন্তুর আওয়াজের পরিধি কতটুকুই বা; তাতে জোর থাকতে পারে কিন্তু ভার সামান্য। কুকুর যতই ডাকুক, শেয়াল যতই চেঁচাক, ধ্বনির ওজন বাঁচিয়ে চলবার সমস্যা তাদের নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু আভাস পাওয়া যায়। গাধার 'পরে অবিচার করতে চাই নে। সে শুধু পরের ময়লা কাপড় বহন করে তা নয়, এ-পর্যন্ত কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে আপন প্রভূত অখ্যাতি বহন করে এসেছে। কিন্তু, যখনই সে নিজের ডাককে দীর্ঘায়িত করে, তখনই পর্যায়ে পর্যায়ে তাকে ধ্বনির ওজন ভাগ করতে হয়। নিজের ব্যবসায়ের প্রতি লক্ষ রেখে এই ব্যাপারকে ছন্দ বলতে কুণ্ঠিত হচ্ছি। কিন্তু, আর কী বলব জানি নে।

মানুষকে বহন করতে হয় ভাষার সুদীর্ঘতা। প্রলম্বিত ভাষার ওজন তাকে রাখতেই হয়। মানুষের সেই বাক্যের সঙ্গে তার গানের সুর যখন মিশল, তখন গীতিকলা হল দীর্ঘায়ত। নানাবিধ তাল নিযুক্ত হয়েছে তার ভার বইতে। কিন্তু, তাল অর্থাৎ ছন্দকে কেবল ভারবাহক বললে চলবে না। সে তো ধ্বনিভারের ঝাঁকামুটে নয়। ভারগুলিকে নানা আয়তনে বিভক্ত করে যেই সে তাকে গতি দেয়, অমনি রূপ নিয়ে সংগীত আমাদের চৈতন্যকে আঘাত করে। ভাষা অবলম্বন করে যখন আমরা খবর দিতে চাই তখন বিবরণের সত্যতা রক্ষা করাই আমাদের একমাত্র দায়িত্ব; কিন্তু যখন রূপ দিতে চাই তখন সত্যতার চেয়ে বেশি আবশ্যক হয় ছন্দের।

'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল', এটা নিছক খবর। গল্প হিসাবে বা ঘটনা হিসাবে সত্য হলে এর আর কোনোই জবাবদিহি নেই। কিন্তু, গলায়-হাড়-বেঁধা জন্তুটার ল্যাজ যদি প্রত্যক্ষভাবে চৈতন্যের মধ্যে আছড়িয়ে নিতে চাই তবে ভাষায় লাগাতে হবে ছন্দের মন্ত্র।

বিদ্যুৎ-লাঙ্গুল করি ঘন তর্জন
বজ্রবিদ্ধ মেঘ করে বারি বর্জন।
তদ্রূপ যাতনায় অস্থির শার্দূল
অস্থিবিদ্ধগলে করে ঘোর গর্জন।

কাব্যসাহিত্য কেবল রসসাহিত্য নয়, তা রূপসাহিত্য। সাধারণত, ভাষায় শব্দগুলি অর্থবহন করে, কিন্তু ছন্দে তারা রূপগ্রহণ করে।

ছন্দ সম্বন্ধে এই গেল আমার সাধারণ বক্তব্য। বিশ্বের ভাষায় মানুষের ভাষায় রূপ দেওয়া তার কাজ। এখন বাংলা কাব্যছন্দ সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু বলবার চেষ্টা করা যাক।

২

প্রত্যেক ভাষার একটি স্বকীয় ধ্বনি-উদ্ভাবনা আছে। তার থেকে তার স্বরূপ চেনা যায়। ইংরেজিতে বেশির ভাগ শব্দে স্বরবর্ণের মধ্যস্থতা নেই বলে সে যেন হয়েছে সরদ যন্ত্রের মতো, আঙুলের আঘাতে তার ঐকমাত্রিক ধ্বনিগুলি উচ্চকিত, ইটালিয়ানে ছড়ির লম্বা টানে বেহালার টানা সুর।

বাংলাভাষাও নিজের একটা বিশেষ ধ্বনিস্বরূপ আছে। তার ধ্বনির এই চেহারা হসন্তবর্ণের যোগে। যে বাংলা আমাদের মায়ের কণ্ঠগত, জ্যেষ্ঠতাতের লেখনীগত নয়, ইংরেজির মতো তারও সুর ব্যঞ্জনবর্ণের সংঘাতে। আজ সাধুভাষার ছন্দে জোর দেবার অভিপ্রায়ে অভিধান ঘেঁটে যুক্তবর্ণের আয়োজনে লেগেছি, অথচ প্রাকৃতবাংলায় হসন্তের প্রাধান্য আছে বলেই যুক্তবর্ণের জোর তার মধ্যে আপনি এসে পড়ে। এই ভাষায় একটি শ্লোক রচনা করা যাক একটিও যুক্তবর্ণ না দিয়ে।

দূর সাগরের পারের পবন
আসবে যখন কাছের কূলে
রঙিন আগুন জ্বালবে ফাগুন,
মাতবে অশোক সোনার ফুলে।

হসন্তের ধাক্কায় যুক্তবর্ণের ঢেউ আপনি উঠছে।

চীনদেশের সাংঘাই নগরে একটি আরামবাগ আছে। অনেককাল সেখানে চীনের লোকেরই প্রবেশ নিষেধ ছিল। তেমনি বাংলাদেশের সাহিত্য-আরামবাগ থেকে বাংলাভাষার স্বকীয় ধ্বনিরূপটি পণ্ডিত-পাহারাওয়ালার ধাক্কা খেয়ে অনেক কাল বাইরে বাইরে ফিরেছিল।

ভাষার শব্দে অর্থ আছে, স্বর আছে। অর্থ জিনিসটা সকল ভাষাতেই এক, স্বরটা প্রত্যেক ভাষাতেই স্বতন্ত্র। 'জল' শব্দে যা বোঝায় 'water' শব্দেও তাই বুঝি, কিন্তু ওদের সুর আলাদা। ভাষা এই সুর নিয়ে শিল্প রচনা করে, ধ্বনির শিল্প। সেই রূপসৃষ্টির যে ধ্বনিতত্ত্ব বাংলাভাষার আপন সম্বল পণ্ডিতরা তাকে অবজ্ঞা করতে পারেন, কেননা, তাঁরা অর্থের মহাজন; কিন্তু, যাঁরা রূপরসিক তাঁদের মূলধন ধ্বনি। প্রাকৃত-বাংলার দুয়োরানীকে যারা সুয়োরানীর অপ্রতিহতপ্রভাবে সাহিত্যের গোয়াল-ঘরে বাসা না দিয়ে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে, সেই 'অশিক্ষিত'-লাঞ্ছনাধারীর দল যথার্থ বাংলাভাষার সম্পদ নিয়ে আনন্দ করতে বাধা পায় না। তাদের প্রাণের গভীর কথা তাদের প্রাণের সহজ ভাষায় উদ্ধৃত করে দিই।

আছে যার মনের মানুষ আপন মনে
সে কি আর জপে মালা।
নির্জনে সে বসে বসে দেখছে খেলা।
কাছে রয়, ডাকে তারে
উচ্চস্বরে
কোন্ পাগেলা,
ওরে যে যা বোঝে তাই সে বুঝে
থাকে ভোলা।
যেথা যার ব্যথা নেহাত
সেইখানে হাত
ডলামলা,
তেমনি জেনো মনের মানুষ মনে তোলা।
যে জনা দেখে সে রূপ
করিয়া চুপ,
রয় নিরালা।
ওরে লালন-ভেড়ের লোক-দেখানো
মুখে 'হরি হরি' বোলা।

আর-একটি—

এমন মানব-জনম আর কি হবে।
যা কর মন ত্বরায় করো
এই ভবে।

অনন্তরূপ ছিষ্টি করেন সাঁই,
শুনি মানবের তুলনা কিছুই নাই।
দেব-দেবতাগণ
করে আরাধন
জন্ম নিতে মানবে।···
এই মানুষে হবে মাধুর্যভজন
তাইতে মানুষ-রূপ গঠিল নিরঞ্জন।
এবার ঠকলে আর
না দেখি কিনার,
লালন কয় কাতরভাবে।

এই ছন্দের ভঙ্গি একঘেয়ে নয়। ছোটো বড়ো নানা ভাগে বাঁকে বাঁকে চলেছে। সাধুপ্রসাধনে মেজে-ঘষে এর শোভা বাড়ানো চলে, আশা করি এমন কথা বলবার সাহস হবে না কারো।

এই খাঁটি বাংলায় সকল রকম ছন্দেই সকল কাব্যই লেখা সম্ভব, এই আমার বিশ্বাস। ব্যঙ্গকবিতায় এ ভাষার জোর কত ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা থেকে তার নমুনা দিই। কুইন ভিক্টোরিয়াকে সম্বোধন করে কবি বলছেন—

তুমি মা কল্পতরু,
আমরা সব পোষা গোরু
শিখি নি শিঙ-বাঁকানো,
কেবল খাব খোল-বিচিলি ঘাস।
যেন রাঙা আমলা তুলে মামলা
গামলা ভাঙে না,
আমরা ভুষি পেলেই খুশি হব
ঘুষি খেলে বাঁচব না।

কেবল এর হাসিটা নয়, এর ছন্দের বিচিত্র ভঙ্গিটা লক্ষ করে দেখবার বিষয়।

অথচ, এই প্রাকৃত-বাংলাতেই 'মেঘনাদবধ' কাব্য লিখলে যে বাঙালিকে লজ্জা দেওয়া হত সে কথা স্বীকার করব না। কাব্যটা এমন ভাবে আরম্ভ করা যেত—

যুদ্ধ তখন সাঙ্গ হল বীরবাহু বীর যবে
বিপুল বীর্য দেখিয়ে হঠাৎ গেলেন মৃত্যুপুরে

যৌবনকাল পার না হতেই। কও মা সরস্বতী,
অমৃতময় বাক্য তোমার, সেনাধ্যক্ষপদে
কোন্ বীরকে বরণ করে পাঠিয়ে দিলেন রণে
রঘুকুলের পরম শত্রু, রক্ষকুলের নিধি।

এতে গাম্ভীর্যের ত্রুটি ঘটেছে এ কথা মানব না। এই যে বাংলা বাঙালির দিনরাত্রির ভাষা এর একটি মস্ত গুণ, এ ভাষা প্রাণবান্। এইজন্যে সংস্কৃত বলো, ফার্সি বলো, ইংরেজি বলো, সব শব্দকেই প্রাণের প্রয়োজনে আত্মসাৎ করতে পারে। খাঁটি হিন্দি ভাষারও সেই গুণ। যারা হেড্‌পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে পড়ে নি তাদের একটা লেখা তুলে দিই—

চক্ষু আঁধার দিলের ধোঁকায়
কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়,
কী রঙ্গ সাঁই দেখছে সদাই
বসে নিগম ঠাঁই।
এখানে না দেখলেম তারে
চিনব তবে কেমন ক'রে,
ভাগ্যেতে আখেরে তারে
চিনতে যদি পাই।

প্রাকৃত-বাংলাকে গুরুচণ্ডালি দোষ স্পর্শই করে না। সাধু ছাঁদের ভাষাতেই শব্দের মিশোল সয় না।

চলতি বাংলাভাষার প্রসঙ্গটা দীর্ঘ হয়ে পড়ল। তার কারণ, এ ভাষাকে যাঁরা প্রতিদিন ঘরে দেন স্থান, তাঁদের অনেকে সাহিত্যে একে অবজ্ঞা করেন। সেটাতে সাহিত্যকে তার প্রাণরসের মূল আধার থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে জেনে আমার আপত্তিকে বড়ো করেই জানালুম। ছন্দের তত্ত্ববিচারে ভাষার অন্তর্নিহিত ধ্বনিপ্রকৃতির বিচার অত্যাবশ্যক, সেই কথাটা এই উপলক্ষে বোঝাবার চেষ্টা করেছি।

বাংলা ছন্দের তিনটি শাখা। একটি আছে পুঁথিগত কৃত্রিম ভাষাকে অবলম্বন করে, সেই ভাষায় বাংলার স্বাভাবিক ধ্বনিরূপকে স্বীকার করে নি। আর-একটি সচল বাংলার ভাষাকে নিয়ে, এই ভাষা বাংলার হসন্ত-শব্দের ধ্বনিকে আপন বলে গ্রহণ করেছে। আর-একটি শাখার উদ্গম হয়েছে সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় ভেঙে নিয়ে।

শিখরিণী মালিনী মন্দাক্রান্তা শার্দূলবিক্রীড়িত প্রভৃতি বড়ো বড়ো গম্ভীরচালের ছন্দ গুরুলঘুস্বরের যথানির্দিষ্ট বিন্যাসে অসমান মাত্রাভাগের ছন্দ। বাংলায় আমরা

বিষমমাত্রামূলক ছন্দ কিছু কিছু চালিয়েছি, কিন্তু বিষমমাত্রার ঘনঘন পুনরাবৃত্তির দ্বারা তারও একটা সম্মিতি রক্ষা হয়।

শিমূল রাঙা রঙে
চোখেরে দিল ভরে।
নাকটা হেসে বলে,
হায় রে যাই মরে।
নাকের মতে, গুণ
কেবলি আছে ঘ্রাণে,
রূপ যে রঙ খোঁজে
নাকটা তা কি জানে।

এখানে বিষমমাত্রার পদগুলি জোড়ে-জোড়ে এসে চলনের অসমানতা ঘুচিয়ে দিয়েছে। কিন্তু, সংস্কৃত ভাষায় বিষমমাত্রার বিস্তার আরো অনেক বড়ো। এই সংস্কৃত ছন্দের দীর্ঘহ্রস্ব স্বরকে সমান করে নিয়ে কেবলমাত্র মাত্রা মিলিয়ে ছন্দ রচনা বাংলায় দেখেছি, সে বহুকাল পূর্বে 'স্বপ্নপ্রয়াণ'এ।

লজ্জা বলিল, "হবে
কি লো তবে,
কতদিন পরান রবে
অমন করি।
হইয়ে জলহীন
যথা মীন
রহিবি ওলো কতদিন
মরমে মরি।"

এর প্রত্যেক ভাগে মাত্রাসংখ্যা স্বতন্ত্র।

সংস্কৃত ছন্দে বিবিধ মাত্রার এই গতিবৈচিত্র্য যা সম্মিতি উপেক্ষা করেও ভঙ্গিলীলা বাঁচিয়ে চলে, বাংলায় তার অনুকৃতি এখনো যথেষ্ট প্রচলিত হয় নি। নূতন ছন্দ বাংলায় সৃষ্টি করবার শখ যাঁদের প্রবল, এই পথে তাঁরা অনেক নূতনত্বের সন্ধান পাবেন। তবু বলে রাখি, তাতে তাঁরা সংস্কৃত ছন্দের মোট আয়তনটা পাবেন, তার ধ্বনিতরঙ্গ পাবেন না। মন্দাক্রান্তার মাত্রা-গোনা একটা বাংলা ছন্দের নমুনা দেওয়া যাক—

সারা প্রভাতের
বিকালে গেঁথে আনি
ভাবিনু হারখানি
দিব গলে।
ভয়ে ভয়ে অবশেষে
তোমার কাছে এসে
কথা যে যায় ভেসে
আঁখিজলে।
দিন যবে হয় গত
না-বলা কথা যত
খেলার ভেলা-মতো
হেলাভরে
লীলা তার করে সারা
যে পথে ঠাঁইহারা
রাতের যত তারা
যায় সরে।

শিখরিণীকেও এই ভাবে বাংলায় রূপান্তরিত করা যেতে পারে—

কেবলি অহরহ মনে-মনে
নীরবে তোমা-সনে
যা-খুশি কহি কত;
বিরহব্যথা মম নিজে নিজে
তোমারি মুরতি যে
গড়িছে অবিরত।
এ পূজা ধায় যবে তোমা-পানে
বাজে কি কোনোখানে,
কাঁপে কি মন তব।
জান কি দিবানিশি বহুদূরে
গোপনে বাজে সুরে
বেদনা অভিনব।

ছন্দ সম্বন্ধে আরো কিছু বলা বাকি রইল, আর কোনো সময়ে পরে বলবার ইচ্ছা আছে। উপসংহারে আজ কেবল এই কথাটি বলতে চাই যে, ছন্দের একটা দিক আছে যেটাকে বলা যেতে পারে কৌশল। কিন্তু, তার চেয়ে আছে বড়ো জিনিস যেটাকে বলি সৌষ্ঠব। বাহাদুরি তার মধ্যে নেই, সমগ্র কাব্যসৃষ্টির কাছে ছন্দের আত্মবিস্মৃত আত্মনিবেদনে তার উদ্ভব। কাব্য পড়তে গিয়ে যদি অনুভব করি যে, ছন্দ পড়ছি, তা হলে সেই প্রগল্‌ভ ছন্দকে ধিক্‌কার দেব। মস্তিষ্ক হৃৎপিণ্ড পাকস্থলী অতি আশ্চর্য যন্ত্র, সৃষ্টিকর্তা তাদের স্বাতন্ত্র্য ঢাকা দিয়েছেন। দেহ তাদেরকে ব্যবহার করে, প্রকাশ করে না। করে প্রকাশ যখন রোগে ধরে; তখন যকৃৎটা হয় প্রবল, তার কাছে মাথা হেঁট করে লাবণ্য। শরীরে স্বাস্থ্যের মতোই কবি ছন্দকে ভুলে থাকে, ছন্দ যখন তার যথার্থ আপন হয়।

বৈশাখ ১৩৪১

গদ্যছন্দ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত

কথা যখন খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তখন সে কেবলমাত্র আপন অর্থটুকু নিবেদন করে। যখন তাকে ছন্দের আঘাতে নাড়া দেওয়া যায় তখন তার কাছ থেকে অর্থের বেশি আরো কিছু বেরিয়ে পড়ে। সেটা জানার জিনিস নয়, বেদনার জিনিস। সেটাতে পদার্থের পরিচয় নয়, রসের সম্ভোগ।

আবেগকে প্রকাশ করতে গেলে কথার মধ্যে আবেগের ধর্ম সঞ্চার করতে হয়। আবেগের ধর্ম হচ্ছে বেগ; সে চলে, চালায়। কথা যখন সেই বেগ গ্রহণ করে তখন স্পন্দিত হৃদয়ভাবের সঙ্গে তার সাধর্ম্য ঘটে।

চলতি ভাষায় আমরা বলি কথাকে ছন্দে বাঁধা। বাঁধা বটে, কিন্তু সে বাঁধন বাইরে, রূপের দিকে; ভাবের দিকে মুক্তি। যেমন সেতারে তার বাঁধা, তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ সেই সেতারের বাঁধা তার, সুরের বেগে কথাকে অন্তরে দেয় মুক্তি।

উপনিষদে আছে, আত্মার লক্ষ্য ব্রহ্ম, ওঙ্কারের ধ্বনিবেগ তাকে ধনুর মতো লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেয়। এতে বলা হচ্ছে, বাক্যের দ্বারা যুক্তির দ্বারা ব্রহ্ম জানবার বিষয় নন, তিনি আত্মার সঙ্গে একাত্ম হবার বিষয়। এই উপলব্ধিতে ধ্বনিই সহায়তা করে, শব্দার্থ করে না।

জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় উভয়ের মধ্যে মোকাবিলা হয় মাত্র; অর্থাৎ সান্নিধ্য হয়, সাযুজ্য

হয় না। কিন্তু, এমন-সকল বিষয় আছে যাকে জানার দ্বারা পাওয়া যায় না, যাকে আত্মস্থ করতে হয়। আম বস্তুটাকে সামনে রেখে জানা চলে, কিন্তু তার রসটাকে আত্মগত করতে না পারলে বুদ্ধিমূলক কোনো প্রণালীতে তাকে জানবার উপায় নেই। রসসাহিত্য মুখ্যত জ্ঞানের জিনিস নয়, তা মর্মের অধিগম্য। তাই, সেখানে কেবল অর্থ যথেষ্ট নয়, সেখানে ধ্বনির প্রয়োজন; কেননা ধ্বনি বেগবান্। ছন্দের বন্ধনে এই ধ্বনিবেগ পায় বিশিষ্টতা, পায় প্রবলতা।

নিত্যব্যবহারের ভাষাকে ব্যাকরণের নিয়মজাল দিয়ে বাঁধতে হয়। রসপ্রকাশের ভাষাকে বাঁধতে হয় ধ্বনিসংগতের নিয়মে। সমাজেই বলো, ভাষাতেই বলো, সাধারণ ব্যবহারবিধির প্রয়োজন বাইরের দিকে, কিন্তু তাতেই সম্পূর্ণতা নেই। আর-একটা বিধি আছে যেটা আত্মিকতার বিধি। সমাজের দিক থেকে একটা দৃষ্টান্ত দেখানো যাক।

জাপানে গিয়ে দেখা গেল জাপানি সমাজস্থিতি। সেই স্থিতি ব্যবস্থাবন্ধনে। সেখানে চোরকে ঠেকায় পুলিস, জুয়াচোরকে দেয় সাজা, পরস্পরের দেনাপাওনা পরস্পরকে আইনের তাড়ায় মিটিয়ে দিতে হয়। এই যেমন স্থিতির দিক তেমনি গতির দিক আছে; সে চরিত্রে, যা চলে যা চালায়। এই গতি হচ্ছে অন্তর থেকে উদ্গত সৃষ্টির গতি, এই গতিপ্রবাহে জাপানি মনুষ্যত্বের আদর্শ নিয়ত রূপ গ্রহণ করে। জাপানি সেখানে ব্যক্তি, সর্বদাই তার ব্যঞ্জনা চলছে। সেখানে জাপানির নিত্য-উদ্ভাবিত সচল সত্তার পরিচয় পাওয়া গেল। দেখতে পেলেম, স্বভাবতই জাপানি রূপকার। কেবল যে শিল্পে সে আপন সৌষম্যবোধ প্রকাশ করছে তা নয়, প্রকাশ করছে আপন ব্যবহারে। প্রতিদিনের আচরণকেও সে শিল্পসামগ্রী করে তুলেছে, সৌজন্যে তার শৈথিল্য নেই। আতিথেয়তায় তার দাক্ষিণ্য আছে, হৃদ্যতা আছে, বিশেষভাবে আছে সুষমা। জাপানের বৌদ্ধমন্দিরে গেলেম। মন্দিরসজ্জায়, উপাসকদের আচরণে অনিন্দ্যনির্মল শোভনতা; বহুনৈপুণ্যে নির্মিত মন্দিরের ঘণ্টার গম্ভীর মধুর ধ্বনি মনকে আনন্দে আন্দোলিত করে। কোথাও সেখানে এমন কিছুই নেই যা মানুষের কোনো ইন্দ্রিয়কে কদর্যতা বা অপারিপাট্যে অবমানিত করতে পারে। এই সঙ্গে দেখা যায় পৌরুষের অভিমানে জাপানির প্রাণপণ নির্ভীকতা। চারুতা ও বীর্যের সম্মিলনে এই যে তার আত্মপ্রকাশ, এ তো ফৌজদারি দণ্ডবিধির সৃষ্টি নয়। অথচ, জাপানির ব্যক্তিস্বরূপ বন্ধনের সৃষ্টি, তার পরিপূর্ণতা সীমার দ্বারাতেই। নিয়ত প্রকাশমান চলমান এই তার প্রকৃতিকে শক্তিদান রূপদান করে যে আন্তরিক বন্ধন, যে সজীব সীমা, তাকেই বলি ছন্দ। আইনের শাসনে সমাজস্থিতি, অন্তরের ছন্দে আত্মপ্রকাশ।

বিংশতিকোটি মানবের বাস
এ ভারতভূমি যবনের দাস
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা।
আর্যাবর্তজয়ী মানব যাহারা
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা,
জন কত শুধু প্রহরী-পাহারা
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা।

দেখা যাচ্ছে, ছন্দের বন্ধনে শব্দগুলোকে শৈথিল্য থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে, এলিয়ে পড়ছে না, তারা একটা বিশেষ রূপ নিয়ে চলেছে। বাঁধন ভেঙে দেওয়া যাক।

'ভারতভূমিতে বিংশতিকোটি মানব বাস করিয়া থাকে, তথাপি এই দেশ দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া আছে। যাহারা একদা আর্যাবর্ত জয় করিয়াছিল ইহারা কি সেই বংশ হইতে উদ্ভূত। কয়েকজনমাত্র প্রহরীর পরিক্রমণ দেখিয়াই ইহাদের চক্ষুতে কি দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়াছে।'

কথাগুলোর কোনো লোকসান হয় নি, বরঞ্চ হিসাব করে দেখলে কয়েক পার্সেন্ট মুনফাই দেখা যায়। কিন্তু কেবল ব্যাকরণের বাঁধনে কথাগুলোকে অন্তরের দিকে সংঘবদ্ধ করে নি, তারই অভাবে সে শক্তি হারিয়েছে। উদাস মনের রুদ্ধ দ্বার ভাঙবার উদ্দেশে সবাই মিলে এক হয়ে ঘা দিতে পারছে না।[১]

ছন্দর সঙ্গে অছন্দর তফাত এই যে, কথা একটাতে চলে, আর-একটাতে শুধু বলে কিন্তু চলে না। যে চলে সে কখনো খেলে, কখনো নাচে, কখনো লড়াই করে, হাসে কাঁদে; যে স্থির বসে থাকে সে আপিস চালায়, তর্ক করে, বিচার করে, হিসাব দেখে, দল পাকায়। ব্যবসায়ীর শুষ্ক প্রবীণতা ছন্দোহীন বাক্যে, অব্যবসায়ীর সরসচঞ্চল প্রাণের বেগ ছন্দোময় ছবিতে কাব্যে গানে।

এই ছবি-গান-কাব্যকে আমরা গড়ে-তোলা জিনিস বলে অনুভব করি নে; মনে লাগে, যেন তারা হয়ে-ওঠা পদার্থ। তাদের মধ্যে উপাদানের বাহ্য সংঘটনটা অত্যন্ত বেশি ধরা দেয় না; দেখা যায় উদ্ভাবনার একটা অখণ্ড প্রকাশ, যে প্রকাশ একান্তভাবে আমাদের বোধের সঙ্গে মেলে। বিশ্বসৃষ্টিতে স্পন্দিত আকাশ, কম্পিত বাতাস, চঞ্চল হৃদয়াবেগ স্নায়ুতন্তুতে ছন্দোবিভঙ্গিত হয়ে আলোতে গানেতে বেদনায় আমাদের চৈতন্যে কেবলই এঁকে দিচ্ছে আলিম্পন। ছবি-গান-কাব্যও আপন ছন্দঃস্পন্দনের

১ আরম্ভ হইতে প্রবন্ধের এই অনুচ্ছেদ পর্যন্ত অংশ সাময়িক পত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে।

চলদ্‌বেগে আমাদের চৈতন্যকে গতিমান্‌ আকৃতিমান্‌ করে তুলছে নানাপ্রকার চাঞ্চল্যে। অন্তরে যেটা এসে প্রবেশ করছে সেটা মিলে যাচ্ছে আমাদের চৈতন্যে, সে আর স্বতন্ত্র থাকছে না।

ঘোড়ার ছবি দেখি প্রাণিতত্ত্বের বইয়ে। সেখানে ঘোড়ার আকৃতির সঙ্গে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমস্ত হিসাব ঠিকঠাক মেলে। তাতে খবর পাই, সে খবর বাইরের খবর; তাতে জ্ঞানলাভ করি, ভিতরটা খুশি হয়ে ওঠে না। এই খবরটা স্থাবর পদার্থ। রূপকার ঘোড়ার যে ছবি আঁকে তার চরম উদ্দেশ্য খবর নয় খুশি, এই খুশিটা বিচলিত চৈতন্যের বিশেষ উদ্‌বোধন। ভালো ছবির মধ্যে বরাবরের মতো একটা সচলতার বেগ রয়েই গেল, তাকে বলা চলে পর্‌পেচুয়ল মুভ্‌মেন্ট; প্রাণিতত্ত্বের বইয়ে ঘোড়ার ছবিটা চারি দিকেই সঠিক করে বাঁধা, খাঁটি খবরের যাথার্থ্যে পিলপে-গাড়ি করা তার সীমানা। রূপকারের রেখায় রেখায় তার তুলি মৃদঙ্গের বোল বাজিয়েছে, দিয়েছে সুষমার নাচের দোলা। সেই ঘোড়ার ছবিতে চতুষ্পদজাতীয় জীবের খাঁটি খবর না মিলতেও পারে, মিলবে ছন্দ যার নাড়া খেয়ে সচকিত চৈতন্য সাড়া দিয়ে বলে ওঠে 'হাঁ এই তো বটে'। আপনারই মধ্যে সেই সৃষ্টিকে সে স্বীকার করে, সেই থেকে চিরকালের মতো সেই ধ্বনিময় রূপ আমাদের বিশ্বপরিচয়ের অন্তর্গত হয়ে থাকে। আকাশ কালো মেঘে স্নিগ্ধ, বনভূমি তমালগাছে শ্যামবর্ণ, ব্যাপারটা এর বেশি কিছুই নয়; খবরটা একবারের বেশি দুবার বললে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিই; কবি বরাবরকার মতো বলতে থাকলেন—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ।

কবির মনের মেঘলা দিনের সংবেগ চড়ে বসল ছন্দ-পক্ষিরাজের পিঠে, চলল চিরকালের মনোহরণ করতে।

গদ্যে প্রধানত অর্থবান শব্দকে ব্যূহবদ্ধ করে কাজে লাগাই, পদ্যে প্রধানত ধ্বনিমান্‌ শব্দকে ব্যূহবদ্ধ করে সাজিয়ে তোলা হয়। ব্যূহ শব্দটা এখানে অসার্থক নয়। ভিড় জমে রাস্তায়, তার মধ্যে সাজাই-বাছাই নেই, কেবল এলোমেলো চলাফেরা। সৈন্যের ব্যূহ সংহত সংযত, সাজাই-বাছাইয়ের দ্বারা সবগুলি মানুষের যে সম্মিলন ঘটে তার থেকে একটা প্রবল শক্তি উদ্‌ভাবিত হয়। এই শক্তি স্বতন্ত্রভাবে যথেচ্ছভাবে প্রত্যেক সৈনিকের মধ্যে নেই। মানুষকে উপাদান করে নিয়ে ছন্দোবিন্যাসের দ্বারা সেনাপতি এই শক্তিরূপের সৃষ্টি করে। এ যেন বহু-ইন্ধনের হোমহুতাশন থেকে যাজ্ঞসেনীর আবির্ভাব। ছন্দঃসজ্জিত শব্দব্যূহে ভাষায় তেমনি একটি শক্তিরূপের সৃষ্টি।

চিত্রসৃষ্টিতেও এ কথা খাটে। তার মধ্যে রেখার ও রঙের একটা সামঞ্জস্যবদ্ধ

সাজাই-বাছাই আছে। সে প্রতিরূপ নয়, সে স্বরূপ। তার উদ্দেশ্য রিপোর্ট করা নয়, তার উদ্দেশ্য চৈতন্যকে কবুল করিয়ে নেওয়া 'এই তো স্বয়ং দেখলুম'। গুণীর হাতে রেখা ও রঙের ছন্দোবন্ধন হলেই ছবির নাড়ির মধ্যে প্রাণের স্পন্দন চলতে থাকে, আমাদের চিৎস্পন্দন তার লয়টাকে স্বীকার করে, ঘটতে থাকে গতির সঙ্গে গতির সহযোগিতা বাতাসের হিল্লোলের সঙ্গে সমুদ্রের তরঙ্গের মতো।

ভারতবর্ষে বেদমন্ত্রে ছন্দ প্রথম দেখা দিল, মন্ত্রে প্রবেশ করল প্রাণের বেগ, সে প্রবাহিত হতে পারল নিশ্বাসে প্রশ্বাসে, আবর্তিত হতে থাকল মননধারায়। মন্ত্রের ক্রিয়া কেবল জ্ঞানে নয়, তা প্রাণে মনে; স্মৃতির মধ্যে তা চিরকাল স্পন্দিত হয়ে বিরাজ করে। ছন্দের এই গুণ।

ছন্দকে কেবল আমরা ভাষায় বা রেখায় স্বীকার করলে সব কথা বলা হয় না। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দ আছে ভাবের বিন্যাসে, সে কানে শোনবার নয়, মনে অনুভব করবার। ভাবকে এমন করে সাজানো যায় যাতে সে কেবলমাত্র অর্থবোধ ঘটায় না, প্রাণ পেয়ে ওঠে আমাদের অন্তরে। বাছাই করে সুবিন্যস্ত সুবিভক্ত করে ভাবের শিল্প রচনা করা যায়। বর্জন গ্রহণ সজ্জীকরণের বিশেষ প্রণালীতে ভাবের প্রকাশে সঞ্চারিত হয় চলৎশক্তি। যেহেতু সাহিত্যে ভাবের বাহন ভাষা, সেই কারণে সাহিত্যে যে ছন্দ আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ সে ছন্দ ভাষার সঙ্গে জড়িত। তাই, অনেক সময়ে এ কথাটা ভুলে যাই যে, ভাবের ছন্দই তাকে অতিক্রম করে আমাদের মনকে বিচলিত করে। সেই ছন্দ ভাবের সংযমে, তার বিন্যাসনৈপুণ্যে।

জ্ঞানের বিষয়কে প্রাঞ্জল ও যথার্থ করে ব্যক্ত করতে হলেও প্রকাশের উপাদানকে আঁট করে তাকে ঠিকমত শ্রেণীবদ্ধ করা চাই। সে তাকে প্রাণের বেগ দেবার জন্যে নয়, তাকে প্রকৃষ্ট অর্থ দেবার জন্যেই। শংকরের বেদান্তভাষ্য তার একটি নিদর্শন। তার প্রত্যেক শব্দই সার্থক, তার কোনো অংশেই বাহুল্য নেই, তাই তত্ত্বব্যাখ্যা সম্বন্ধে তা এমন সুস্পষ্ট। কিন্তু, এই শব্দযোজনার সংযমটি যৌক্তিকতার সংযম, আর্থিক যাথাতথ্যের সংযম, শব্দগুলি লজিক-সংগত পঙ্‌ক্তিবন্ধনে সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু শংকরাচার্যের নামে যে আনন্দলহরী কাব্য প্রচলিত তার ভাবের প্রকাশ লজিকের পক্ষ থেকে অসংযত, অথচ প্রাণবান্ গতিমান্ রূপসৃষ্টির পক্ষ থেকে তার কলাকৌশল দেখতে পাই।

বহন্তী সিন্দূরং প্রবলকবরীভারতিমির-
দ্বিষাং বৃন্দৈর্বন্দীকৃতমিব নবীনার্ককিরণম্।

তনোতু ক্ষেমং নস্তব বদনসৌন্দর্যলহরী-
পরীবাহস্রোতঃসরণিরিব সীমন্তসরণিঃ ॥

ওই সিঁথির রেখা আমাদের কল্যাণ দিক যে-রেখাটি তোমার মুখসৌন্দর্যধারার স্রোতঃপথের মতো। আর যে-সিঁদুর আঁকা রয়েছে তোমার ওই সিঁথিতে সে যেন নবীন সূর্যের আলো, তাকে ঘনকবরীভারের অন্ধকার শত্রু হয়ে বন্দী করে রেখেছে।

আনন্দলহরীতে যে নারীরূপের কথা পাই সে সাধারণ নারী নয়, সে বিশ্বসৌন্দর্যের প্রতিমা। নিরত বয়ে চলেছে তার সৌন্দর্যের প্রবাহ, পিছনে তার ঘনকবরীপুঞ্জে রাত্রি, সম্মুখে তার সীমন্তরেখার সিন্দুররাগে তরুণসূর্যকিরণ, এই অল্প কথায় ভাবের যে স্তবক-গুলি সংবদ্ধ তাতে কবিহৃদয়ের আনন্দ দিয়ে আঁকা একটি ছবি দেখতে পাচ্ছি, সেই ছবিটি বিশ্বপ্রকৃতির নারীরূপ।

যে ছন্দ দিয়ে এই ছবি আঁকা এ শুধু ভাষার ছন্দ নয়, এ ভাবের ছন্দ। এতে ভাবের গুটিকয়েক উপকরণ উপমার গুচ্ছে সাজানো, তাই দিয়েই ওর জাদু। ওর নিত্যসচল কটাক্ষে অনেক না-বলা কথার ইশারা রয়ে গেল।

একদিন ছিল যখন ছাপার অক্ষরের সাম্রাজ্যপত্তন হয় নি। যেমন কল-কারখানার আবির্ভাবে পণ্যবস্তুর ভূরি-উৎপাদন সম্ভবপর হল তেমনি লিখিত ও মুদ্রিত অক্ষরের প্রসাদে সাহিত্যে শব্দসংকোচের প্রয়োজন চলে গেছে। আজ সরস্বতীর আসনই বল, আর তাঁর ভাণ্ডারই বল প্রকাণ্ড আয়তনের। সাবেক সাহিত্যের দুই বাহন, তার উচ্চৈঃশ্রবা আর তার ঐরাবত, তার শ্রুতি ও স্মৃতি; তারা নিয়েছে ছুটি। তাদের জায়গায় যে যান এখন চলল, তার নাম দেওয়া যেতে পারে লিখিতি। সে রেলগাড়ির মতো, তাতে কোনোটা যাত্রীর কামরা, কোনোটা মালের। কোনোটাতে বস্তুর পিণ্ড, সংবাদপুঞ্জ, কোনোটাতে সজীব যাত্রী অর্থাৎ রসসাহিত্য। তার অনেক চাকা, অনেক কক্ষ; একসঙ্গে মস্ত মস্ত চালান। স্থানের এই অসংকোচে গদ্যের ভূরিভোজ।

সাহিত্যে অক্ষরের অতিথিশালায় বাক্যের এত বড়ো সদাব্রতের আয়োজন যখন ছিল না তখন ছন্দের সাহায্য ছিল অপরিহার্য। তাতে বাধা পেত শব্দের অতিব্যয়িতা, আর ছন্দ আপন সাংগীতিক গতিবেগের দ্বারা স্মৃতিকে রাখত সচল করে। সেদিন পদ্যছন্দের সতিন ছিল না ভাষায়, সেদিন বাণীর ছন্দের সঙ্গে ভাবের ছন্দের অন্বয়-বিবাহ অর্থাৎ মনোগেমি ছিল প্রচলিত। এখন বই-পড়াটা অনেকস্থলেই নিঃশব্দ পড়া, কানের একান্ত শাসন তাই উপেক্ষিত হতে পারে। এই সুযোগেই আজকাল কাব্যশ্রেণীর রচনা অনেক স্থলে পদ্যছন্দের বিশেষ অধিকার এড়িয়ে ভাবছন্দের মুক্তি দাবি করছে।

গদ্যসাহিত্যের আরম্ভ থেকেই তার মধ্যে মধ্যে প্রবেশ করেছে ছন্দের অন্তঃশীলা ধারা। রস যেখানেই চঞ্চল হয়েছে, রস যেখানেই চেয়েছে রূপ নিতে, সেখানেই শব্দগুচ্ছ স্বতই সজ্জিত হয়ে উঠেছে। ভাবরসপ্রধান গদ্য-আবৃত্তির মধ্যে সুর লাগে অথচ তাকে রাগিণী বলা চলে না, তাতে তালমানসুরের আভাসমাত্র আছে। তেমনি গদ্যরচনায় যেখানে রসের আবির্ভাব সেখানে ছন্দ অতিনির্দিষ্ট রূপ নেয় না, কেবল তার মধ্যে থেকে যায় ছন্দের গতিলীলা।

করবী গাছের প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায়, তার ডালে-ডালে জুড়ি-জুড়ি সমানভাগে পত্রবিন্যাস। কিন্তু, বটগাছে সেই প্রশাখাগত সুনিয়মিত পত্রপর্যায় চোখে পড়ে না। তাতে দেখি বহু শাখা-প্রশাখায় পত্রপুঞ্জের বড়ো-বড়ো স্তবক। এই অনতিসমান রাশীকৃত ভাগগুলি বনস্পতির মধ্যে একটি সামঞ্জস্য পেয়েছে, তাকে দিয়েছে একটি বৃহৎ চরিত্ররূপ। অথচ, পাথরের যে পিণ্ডীকৃত স্থাবর বিভাগগুলি দেখা যায় পাহাড়ে, এ সেরকম নয়। এর মধ্যে দেখতে পাই প্রাণশক্তি অবলীলাক্রমে আপন নানায়তন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওজন প্রতিনিয়ত বিশেষ মহিমার সঙ্গে বাঁচিয়ে চলেছে; তার মধ্যে দেখি যেন মহাদেবের তাণ্ডব, বলদেবের নৃত্য, সে অপ্সরীর নাচ নয়। একেই তুলনা করা যায় সেই আধুনিক কাব্যরীতির সঙ্গে, গদ্যের সঙ্গে যার বাহ্য রূপ মেলে আর পদ্যের সঙ্গে আন্তর রূপ।

সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর 'পালামৌ' গ্রন্থে কোল নারীদের নাচের বর্ণনা করেছেন। নৃতত্ত্বে যেমন করে বিবরণ লেখা হয় এ তা নয়, লেখক ইচ্ছা করেছেন নাচের রূপটা রসটা পাঠকদের সামনে ধরতে। তাই এ লেখায় ছন্দের ভঙ্গি এসে পৌচেছে অথচ কোনো বিশেষ ছন্দের কাঠামো নেই। এর গদ্য সমমাত্রায় বিভক্ত নয়, কিন্তু শিল্পপ্রচেষ্টা আছে এর গতির মধ্যে।

গদ্যসাহিত্যে এই-যে বিচিত্র মাত্রার ছন্দ মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসিত হয়, সংস্কৃত বিশেষত প্রাকৃত আর্যা প্রভৃতি ছন্দে তার তুলনা মেলে। সে-সকল ছন্দে সমান পদক্ষেপের নৃত্য নেই, বিচিত্রপরিমাণ ধ্বনিপুঞ্জ কানকে আঘাত করতে থাকে। যজুর্বেদের গদ্যমন্ত্রের ছন্দকে ছন্দ বলেই গণ্য করা হয়েছে। তার থেকে দেখা যায়, প্রাচীনকালেও ছন্দের মূলতত্ত্বটি গদ্যে পদ্যে উভয়ত্রই স্বীকৃত। অর্থাৎ, যে পদবিভাগ বাণীকে কেবল অর্থ দেবার জন্যে নয়, তাকে গতি দেবার জন্যে, তা সমমাত্রায় না হলেও তাতে ছন্দের স্বভাব থেকে যায়।

পদ্যছন্দের প্রধান লক্ষণ পঙ্‌ক্তিসীমানায় বিভক্ত তার কাঠামো। নির্দিষ্টসংখ্যক ধ্বনিগুচ্ছে এক-একটি পঙ্‌ক্তি সম্পূর্ণ। সেই পঙ্‌ক্তিশেষে একটি করে বড়ো যতি। বলা বাহুল্য, গদ্যে এই নিয়মের শাসন নেই। গদ্যে বাক্য যেখানে আপন অর্থ সম্পূর্ণ

করে সেইখানেই তার দাঁড়াবার জায়গা। পদ্যছন্দ যেখানে আপন ধ্বনিসংগতিকে অপেক্ষাকৃত বড়ো রকমের সমাপ্তি দেয়, অর্থনির্বিচারে সেইখানে পঙ্‌ক্তি শেষ করে। পদ্য সব-প্রথমে এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে অমিত্রাক্ষর ছন্দে, পঙ্‌ক্তির বাইরে পদচারণা শুরু করলে। আধুনিক পদ্যে এই স্বৈরাচার দেখা দিল পয়ারকে আশ্রয় করে।

বলা বাহুল্য, এক মাত্রা চলে না। বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ। যেই দুইয়ের সমাগম অমনি হল চলা শুরু। থাম আছে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থেমে। জন্তুর পা, পাখির পাখা, মাছের পাখনা দুই সংখ্যার যোগে চলে। সেই নিয়মিত গতির উপরে যদি আর-একটা একের অতিরিক্ত ভার চাপানো যায় তবে সেই গতিতে ভারসাম্যের অপ্রতিষ্ঠতা প্রকাশ পায়। এই অনিয়মের ঠেলায় নিয়মিত গতির বেগ বিচিত্র হয়ে ওঠে। মানুষের দেহটা তার দৃষ্টান্ত। আদিমকালের চারপেয়ে মানুষ আধুনিক কালে দুই পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার কোমর থেকে পদতল পর্যন্ত দুই পায়ের সাহায্যে মজবুত, কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত টলমলে। এই দুই ভাগের অসামঞ্জস্যকে সামলাবার জন্যে মানুষের গতিতে মাথা হাত কোমর পা বিচিত্র হিল্লোলে হিল্লোলিত। পাখিও দুই পায়ে চলে, কিন্তু তার দেহ স্বভাবতই দুই পায়ের ছন্দে নিয়মিত। টলবার ভয় নেই তার। দুই মাত্রায় অর্থাৎ জোড় মাত্রায় যে পদ বাঁধা হয় তার মধ্যে দাঁড়ানোও আছে, চলাও আছে; বেজোড় মাত্রায় চলার ঝোঁকটাই প্রধান। এইজন্যে অমিত্রাক্ষরে যেখানে-সেখানে থেমে যাবার যে নিয়ম আছে সেটা পালন করা বিষম মাত্রার ছন্দের পক্ষে দুঃসাধ্য। এইজন্যে বেজোড় মাত্রায় পদ্যধর্মই একান্ত প্রবল। চেষ্টা করে দেখা যাক বেজোড় মাত্রার দরজাটা খুলে দিয়ে। প্রথম পরীক্ষা হোক তিন মাত্রার মহলে।

> বিরহী গগন ধরণীর কাছে
> পাঠালো লিপিকা। দিকের প্রান্তে
> নামে তাই মেঘ, বহিয়া সজল
> বেদনা; বহিয়া তড়িৎ-চকিত
> ব্যাকুল আকূতি। উৎসুক ধরা
> ধৈর্য হারায়, পারে না লুকাতে
> বুকের কাঁপন পল্লবদলে।
> বকুলকুঞ্জে রচে সে প্রাণের
> মুগ্ধ প্রলাপ, উল্লাস ভাসে
> চামেলিগন্ধে পূর্বপবনে।

পয়ার ছন্দের মতো এর গতি সিধে নয়। এই তিন মাত্রার এবং জোড়-বিজোড় মাত্রার ছন্দে পদক্ষেপ মাঘনৈষধের নায়িকাদের মতো মরালগমনে, ডাইনে-বাঁয়ে ঝোঁকে-ঝোঁকে হেলতে-দুলতে।

এবার যে-ছন্দের নমুনা দেব সেটা তিন-দুই মাত্রার, গানের ভাষায় ঝাঁপতাল-জাতীয়।

চিত্ত আজি দুঃখদোলে
আন্দোলিত। দূরের সুর
বক্ষে লাগে। অঙ্গনের
সম্মুখেতে পান্থ মম
ক্লান্তপদে গিয়েছে চলি
দিগন্তরে। বিরহবেণু
ধ্বনিছে তাই মন্দবায়ে।
ছন্দে তারি কুন্দফুল
ঝরিছে কত, চঞ্চলিয়া
কাঁপিছে কাশগুচ্ছশিখা।

এ ছন্দ পাঁচ মাত্রার মাঝখানে ভাগ করে থামতে পারে না; এর যতিস্থাপনায় বৈচিত্র্যের যথেষ্ট স্বাধীনতা নেই।

এবার দেখানো যাক তিন-চার মাত্রার ছন্দ।

মালতী সারাবেলা ঝরিছে রহি রহি
কেন যে বুঝি না তো। হায় রে উদাসিনী,
পথের ধূলিরে কি করিলি অকারণে
মরণসহচরী। অরুণ গগনের
ছিলি তো সোহাগিনী। শ্রাবণবরিষনে
মুখর বনভূমি তোমারি গন্ধের
গর্ব প্রচারিছে সিক্ত সমীরণে
দিশে দিশান্তরে। কী অনাদরে তবে
গোপনে বিকশিয়া বাদল-রজনীতে
প্রভাত-আলোকেরে কহিলি 'নহে নহে'।

উপরের দৃষ্টান্তগুলি থেকে দেখা যায়, অসম ও বিষম মাত্রার ছন্দে পঙ্‌ক্তিলঙ্ঘন চলে বটে, কিন্তু তার এক-একটি ধ্বনিগুচ্ছ সমান মাপের, তাতে ছোটো-বড়ো ভাগের বৈচিত্র্য নেই। এইজন্যেই একমাত্র পয়ারছন্দই অমিত্রাক্ষর রীতিতে কতকটা গদ্য-জাতীয় স্বাধীনতা পেয়েছে।

এইবার আমার শ্রোতাদের মনে করিয়ে দেবার সময় এল যে, এই-সব পঙ্‌ক্তিলঙ্ঘক ছন্দের কথাটা উঠেছে প্রসঙ্গক্রমে। মূলকথাটা এই যে, কবিতায় ক্রমে-ক্রমে ভাষাগত ছন্দের আঁটা-আঁটির সমান্তরে ভাবগত ছন্দ উদ্‌ভাবিত হচ্ছে। পূর্বেই বলেছি, তার প্রধান কারণ, কবিতা এখন কেবলমাত্র শ্রাব্য নয়, তা প্রধানত পাঠ্য। যে সুনিবিড় সুনিয়মিত ছন্দ আমাদের স্মৃতির সহায়তা করে তার অত্যাবশ্যকতা এখন আর নেই। একদিন খনার বচনে চাষবাসের পরামর্শ লেখা হয়েছিল ছন্দে। আজকালকার বাংলায় যে 'কৃষ্টি' শব্দের উদ্‌ভব হয়েছে খনার এই-সমস্ত কৃষির ছড়ায় তাকে নিশ্চিত এগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এই ধরনের কৃষ্টি প্রচারের ভার আজকাল গদ্য নিয়েছে। ছাপার অক্ষর তার বাহন, এইজন্যে ছন্দের পুঁটুলিতে ওই বচনগুলো মাথায় করে বয়ে বেড়াবার দরকার হয় না। একদিন পুরুষও আপিসে যেত পালকিতে, মেয়েও সেই উপায়েই যেত শ্বশুর-বাড়িতে। এখন রেলগাড়ির প্রভাবে উভয়ে একত্রে একই রথে জায়গা পায়। আজকাল গদ্যের অপরিহার্য প্রভাবের দিনে ক্ষণে-ক্ষণে দেখা যাবে কাব্যও আপন গতিবিধির জন্যে বাঁধাছন্দের ময়ূরপংখিটাকে অত্যাবশ্যক বলে গণ্য করবে না। পূর্বেই বলেছি, অমিত্রাক্ষর ছন্দে সব-প্রথমে পালকির দরজা গেছে খুলে, তার ঘটাটোপ হয়েছে বর্জিত। তবুও পয়ার যখন পঙ্‌ক্তির বেড়া ডিঙিয়ে চলতে শুরু করেছিল তখনো সাবেকি চালের পরিশেষরূপে গণ্ডির চিহ্ন পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে রয়ে গেছে। ঠিক যেন পুরানো বাড়ির অন্দরমহল ; তার দেয়ালগুলো সরানো হয় নি, কিন্তু আধুনিককালের মেয়েরা তাকে অস্বীকার করে অনায়াসে সদরে যাতায়াত করছে। অবশেষে হাল-আমলের তৈরি ইমারতে সেই দেওয়ালগুলো ভাঙা শুরু হয়েছে। চোদ্দ অক্ষরের গণ্ডিভাঙা পয়ার একদিন 'মানসী'র এক কবিতায় লিখেছিলুম, তার নাম নিষ্ফল-প্রয়াস[১]। অবশেষে আরো অনেক বছর পরে বেড়াভাঙা পয়ার দেখা দিতে লাগল 'বলাকা'য়, 'পলাতকা'য়। এতে করে কাব্যছন্দ গদ্যের কতকটা কাছে এল বটে, তবু মেয়ে-কম্পার্টমেন্ট্ রয়ে গেল, পুরাতন ছন্দোরীতির বাঁধন খুলল না। এমন-কি, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় আর্যা প্রভৃতি ছন্দে ধ্বনিবিভাগ যতটা স্বাধীনতা পেয়েছে আধুনিক বাংলায় ততটা সাহসও

১ বস্তুত: 'নিষ্ফল-কামনা'।

প্রকাশ পায় নি। একটি প্রাকৃত ছন্দের শ্লোক উদ্ধৃত করি।

বরিস জল ভমই ঘণ গঅণ
সিঅল পবণ মণহরণ
কণঅ-পিঅরি ণচই বিজ্জুরি ফুল্লিআ ণীবা।
পত্থর-বিত্থর-হিঅলা
পিঅলা [ণিঅলং] ণ আবেই॥

মাত্রা মিলিয়ে এই ছন্দ বাংলায় লেখা যাক।

বৃষ্টিধারা শ্রাবণে ঝরে গগনে,
শীতল পবন বহে সঘনে,
কনক-বিজুরি নাচে রে, অশনি গর্জন করে।
নিষ্ঠুর-অন্তর মম প্রিয়তম নাই ঘরে।

বাঙালি পাঠকের কান একে রীতিমত ছন্দ বলে মানতে বাধা পাবে তাতে সন্দেহ নেই, কারণ এর পদবিভাগ প্রায় গদ্যের মতোই অসমান। যাই হোক, এর মধ্যে একটা ছন্দের কাঠামো আছে; সেটুকুও যদি ভেঙে দেওয়া যায় তা হলে কাব্যকেই কি ভেঙে দেওয়া হল। দেখা যাক।

অবিরল ঝরছে শ্রাবণের ধারা,
বনে বনে সজল হাওয়া বয়ে চলেছে,
সোনার বরন ঝলক দিয়ে নেচে উঠছে বিদ্যুৎ,
বজ্র উঠছে গর্জন করে।
নিষ্ঠুর আমার প্রিয়তম ঘরে এল না।

একেও বলতে হবে কাব্য, বুদ্ধির সঙ্গে এর বোঝাপড়া নয়, একে অনুভব করতে হয় রসবোধে। সেইজন্যেই যতই সামান্য হোক, এর মধ্যে বাক্যসংস্থানের একটা শিল্পকলা শব্দব্যবহারের একটা 'তেরছ চাহনি' রাখতে হয়েছে। সুবিহিত গৃহিণীপনার মধ্যে লোকে দেখতে পায় লক্ষ্মীশ্রী, বহু উপকরণে বহু অলংকারে তার প্রকাশ নয়। ভাষার কক্ষেও অনতিভূষিত গৃহস্থালি গদ্য হলেও তাকে সম্পূর্ণ গদ্য বলা চলবে না, যেমন চলবে না আপিসঘরের অসজ্জাকে অন্তঃপুরের সরল শোভনতার সঙ্গে তুলনা করা। আপিসঘরে ছন্দটা প্রত্যক্ষই বর্জিত, অন্যত্র ছন্দটা নিগূঢ় মর্মগত, বাহ্য ভাষায় নয়, অন্তরের ভাবে।

আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যে গদ্যে কাব্য রচনা করেছেন ওয়াল্ট্ হুইট্‌ম্যান। সাধারণ গদ্যের সঙ্গে তার প্রভেদ নেই, তবু ভাবের দিক থেকে তাকে কাব্য না বলে

থাকবার জো নেই। এইখানে একটা তর্জমা করে দিই।

লুইসিয়ানাতে দেখলুম একটি তাজা ওক গাছ বেড়ে উঠছে;
একলা সে দাঁড়িয়ে, তার ডালগুলো থেকে শ্যাওলা পড়ছে ঝুলে।
কোনো দোসর নেই তার, ঘন সবুজ পাতায় কথা কইছে তার খুশিটি।
তার কড়া খাড়া তেজালো চেহারা মনে করিয়ে দিলে আমারই নিজেকে।
আশ্চর্য লাগল, কেমন করে এ গাছ ব্যক্ত করছে খুশিতে ভরা
আপন পাতাগুলিকে,

যখন না আছে ওর বন্ধু না আছে দোসর।
আমি বেশ জানি, আমি তো পারতুম না।
গুটিকতক পাতাওয়ালা একটি ডাল তার ভেঙে নিলেম,
তাতে জড়িয়ে দিলেম শ্যাওলা।
নিয়ে এসে চোখের সামনে রেখে দিলেম আমার ঘরে;
প্রিয় বন্ধুদের কথা স্মরণ করাবার জন্যে যে তা নয়।
(সম্প্রতি ওই বন্ধুদের ছাড়া আর কোনো কথা আমার মনে ছিল না।)
ও রইল একটি অদ্ভুত চিহ্নের মতো,
পুরুষের ভালোবাসা যে কী তাই মনে করাবে।
তা যাই হোক, যদিও সেই তাজা ওক গাছ
লুইসিয়ানার বিস্তীর্ণ মাঠে একলা ঝল্‌মল্ করছে,
বিনা বন্ধু বিনা দোসরে খুশিতে ভরা পাতাগুলি প্রকাশ করছে
চিরজীবন ধরে,

তবু আমার মনে হয়, আমি তো পারতুম না।

এক দিকে দাঁড়িয়ে আছে কঠিন বলিষ্ঠ সতেজ ওক গাছ, একলা আপন আত্মসম্পূর্ণ নিঃসঙ্গতায় আনন্দময়; আর-এক দিকে একজন মানুষ, সেও কঠিন বলিষ্ঠ সতেজ, কিন্তু তার আনন্দ অপেক্ষা করছে প্রিয়সঙ্গের জন্যে— এটি কেবলমাত্র সংবাদরূপে গদ্যে বলবার বিষয় নয়। এর মধ্যে কবির আপন মনোভাবের একটি ইশারা আছে। একলা গাছের সঙ্গে তুলনায় একলা বিরহী-হৃদয়ের উৎকণ্ঠা আভাসে জানানো হল। এই প্রচ্ছন্ন আবেগের ব্যঞ্জনা, এই তো কাব্য; এর মধ্যে ভাববিন্যাসের শিল্প আছে, তাকেই বলব ভাবের ছন্দ।

চীন-কবিতার তরজমা থেকে একটি দৃষ্টান্ত দেখাই।

স্বপ্ন দেখলেম, যেন চড়েছি কোনো উঁচু ডাঙায় ;
সেখানে চোখে পড়ল গভীর এক ইঁদারা।
চলতে চলতে কণ্ঠ আমার শুকিয়েছে ;
ইচ্ছে হল, জল খাই।
ব্যগ্র দৃষ্টি নামতে চায় ঠাণ্ডা সেই কুয়োর তলার দিকে।
ঘুরলেম চার দিকে, দেখলেম ভিতরে তাকিয়ে,
জলে পড়ল আমার ছায়া।
দেখি এক মাটির ঘড়া কালো সেই গহ্বরে ;
দড়ি নাই যে তাকে টেনে তুলি।
ঘড়াটা পাছে তলিয়ে যায়
এই ভেবে প্রাণ কেন এমন ব্যাকুল হল।
পাগলের মতো ছুটলেম সহায় খুঁজতে।
গ্রামে গ্রামে ঘুরি, লোক নেই একজনও,
কুকুরগুলো ছুটে আসে টুঁটি কামড়ে ধরতে।
কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলেম কুয়োর ধারে।
জল পড়ে দুই চোখ বেয়ে, দৃষ্টি হল অন্ধপ্রায়।

শেষকালে জাগলেম নিজেরই কান্নার শব্দে।
ঘর নিস্তব্ধ, স্তব্ধ সব বাড়ির লোক ;
বাতির শিখা নিবো-নিবো, তার থেকে সবুজ ধোঁয়া উঠছে,
তার আলো পড়ছে আমার চোখের জলে।
ঘণ্টা বাজল, রাতদুপুরের ঘণ্টা,
বিছানায় উঠে বসলুম, ভাবতে লাগলুম অনেক কথা।

মনে পড়ল, যে ডাঙাটা দেখেছি সে চাং-আনের কবরস্থান ;
তিনশো বিঘে পোড়ো জমি,
ভারী মাটি তার, উঁচু-উঁচু সব ঢিবি :
নীচে গভীর গর্তে মৃতদেহ শোওয়ানো।
শুনেছি, মৃত মানুষ কখনো-কখনো দেখা দেয় সমাধির বাইরে।
আজ আমার প্রিয় এসেছিল ইঁদারায় ডুবে-যাওয়া সেই ঘড়া,
তাই দুচোখ বেয়ে জল পড়ে আমার কাপড় গেল ভিজে।

এতে পদ্যছন্দ নেই, এতে জমানো ভাবের ছন্দ। শব্দবিন্যাসে সুপ্রত্যক্ষ অলংকরণ নেই, তবুও আছে শিল্প।

উপসংহারে শেষকথা এই যে, কাব্যের অধিকার প্রশস্ত হতে চলেছে। গদ্যের সীমানার মধ্যে সে আপন বাসা বাঁধছে ভাবের ছন্দ দিয়ে। একদা কাব্যের পালা শুরু করেছি পদ্যে, তখন সে মহলে গদ্যের ডাক পড়ে নি। আজ পালা সাঙ্গ করবার বেলায় দেখি, কখন অসাক্ষাতে গদ্যে-পদ্যে রফানিষ্পত্তি চলছে। যাবার আগে তাদের রাজিনামায় আমিও একটা সই দিয়েছি। এক কালের খাতিরে অন্য কালকে অস্বীকার করা যায় না।

বৈশাখ ১৩৪১

পরিশিষ্ট

বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ

প্রকাশক সিন্ধুদূত[১]-এর ছন্দ সম্বন্ধে বলিতেছেন, "সিন্ধুদূতের ছন্দঃ প্রচলিত ছন্দঃসকল হইতে একরূপ স্বতন্ত্র ও নূতন। এই নূতনত্বহেতু অনেকেরই প্রথম প্রথম পড়িতে কিছু কষ্ট হইতে পারে।... বাঙ্গালা ছন্দের প্রাণগত ভাব কি ও তাহার স্বাভাবিক গতি কোন্‌দিকে এবং কি প্রণালীতেই বা ইচ্ছামতে উহার সুন্দর বৈচিত্র্য-সাধন করা যায়, ইহার নিগূঢ়তত্ত্ব সিন্ধুদূতের ছন্দঃ আলোচনা করিলে উপলব্ধ হইতে পারে।"

আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থের ছন্দ পড়িতে প্রথম-প্রথম কষ্ট বোধ হয় সত্য; কিন্তু, ছন্দের নূতনত্ব তাহার কারণ নহে, ছত্রবিভাগের ব্যতিক্রমই তাহার একমাত্র কারণ। নিম্নে গ্রন্থ হইতে একটি শ্লোক উদ্‌ধৃত করিয়া দিতেছি।

এ কি এ, আগত সন্ধ্যা, এখনো রয়েছি বসে সাগরের তীরে?
দিবস হয়েছে গত, না জানি ভেবেছি কত,
প্রভাত হইতে বসে রয়েছি এখানে বাহ্য জগৎ পাশরে,
ক্ষুধাতৃষ্ণা নিদ্রাহার কিছু নাহি মোর; সব ত্যেজেছে আমারে।

রীতিমত ছত্রবিভাগ করিলে উপরি-উদ্‌ধৃত শ্লোকটি নিম্নলিখিত আকারে প্রকাশ পায়।

এ কি এ, আগত সন্ধ্যা, এখনো রয়েছি বসে
সাগরের তীরে?
দিবস হয়েছে গত,
না জানি ভেবেছি কত,
প্রভাত হইতে বসে রয়েছি এখানে বাহ্য
জগৎ পাশরে,
ক্ষুধাতৃষ্ণা নিদ্রাহার কিছু নাই মোর; সব
ত্যেজেছে আমারে।

মাইকেল-রচিত নিম্নলিখিত কবিতাটি যাঁহাদের মনে আছে তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, সিন্ধুদূতের ছন্দ বাস্তবিক নূতন নহে।

১ 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'র (১৮৭৫-৭৭) কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের রচিত। 'সিন্ধুদূত' (১৮৮০) এঁর তৃতীয় কাব্য।

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে।
জীবনপ্রবাহ বহি কালসিন্ধু-পানে ধায়,
ফিরাব কেমনে ?

একটি ছত্রের মধ্যে দুইটি ছত্র পুরিয়া দিলে পর প্রথমত চোখে দেখিতে খারাপ হয়, দ্বিতীয়ত কোন্‌খানে হাঁপ ছাড়িতে হইবে পাঠকরা হঠাৎ ঠাহর পান না। এখানে-ওখানে হাতড়াইতে হাতড়াইতে অবশেষে ঠিক জায়গাটা বাহির করিতে হয়। প্রকাশক যে বলিয়াছেন, বাংলা ছন্দের প্রাণগত ভাব কী ও তাহার স্বাভাবিক গতি কোন্ দিকে তাহা সিন্ধুদূতের ছন্দ আলোচনা করিলে উপলব্ধ হইতে পারে, সে বিষয়ে আমাদের মতভেদ আছে। ভাষার উচ্চারণ-অনুসারে ছন্দ নিয়মিত হইলে তাহাকেই স্বাভাবিক ছন্দ বলা যায়, কিন্তু বর্তমান কোনো কাব্যগ্রন্থে (এবং সিন্ধুদূতেও) তদনুসারে ছন্দ নিয়মিত হয় নাই। আমাদের ভাষায় পদে পদে হসন্ত শব্দ দেখা যায়, কিন্তু আমরা ছন্দ পাঠ করিবার সময় তাহাদের হসন্ত উচ্চারণ লোপ করিয়া দিই। এইজন্ত যেখানে চোদ্দটা অক্ষর বিন্যস্ত হইয়াছে, বাস্তবিক বাংলার উচ্চারণ অনুসারে পড়িতে গেলে তাহা হয়তো আট বা নয় অক্ষরে পরিণত হয়। রামপ্রসাদের নিম্নলিখিত ছন্দটি পাঠ করিয়া দেখো।

মন্ বেচারির্ কী দোষ্ আছে,
তারে যেমন্ নাচাও্ তেম্‌নি নাচে।

দ্বিতীয় ছত্রের 'তারে' নামক অতিরিক্ত শব্দটি ছাড়িয়া দিলে দুই ছত্রে এগারোটি করিয়া অক্ষর থাকে। কিন্তু, উহাই আধুনিক ছন্দে পরিণত করিতে হইলে নিম্নলিখিতরূপ হয়—

মনের কী দোষ আছে,
যেমন নাচাও নাচে।

ইহাতে দুই ছত্রে আটটি অক্ষর হয়; তাল ঠিক সমান রহিয়াছে অথচ অক্ষর কম পড়িতেছে। তাহার কারণ, শেষোক্ত ছন্দে আমরা হসন্ত শব্দকে আমল দিই না। বাস্তবিক ধরিতে গেলে রামপ্রসাদের ছন্দেও আটটির অধিক অক্ষর নাই।

মন্বেচারি কী দোষাছে,
যেমন্নাচা তেম্নি নাচে।

দ্বিতীয় ছত্র হইতে 'নাচাও' শব্দের 'ও' অক্ষর ছাড়িয়া দিয়াছি; তাহার কারণ এই ও-টি 'হসন্ত' ও, পরবর্তী 'তে'-র সহিত ইহা যুক্ত।

উপরে দেখাইলাম বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ কী। আর, যদি কখনো স্বাভাবিক দিকে বাংলা ছন্দের গতি হয় তবে ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দের অনুযায়ী হইবে।

শ্রাবণ ১২৯০

বাংলা শব্দ ও ছন্দ

বাংলা শব্দ-উচ্চারণের মধ্যে কোথাও ঝোঁক নাই, অথবা যদি থাকে সে এত সামান্য যে তাহাকে নাই বলিলেও ক্ষতি হয় না। এইজন্যই আমাদের ছন্দে অক্ষর গণিয়া মাত্রা নিরূপিত হইয়াছে। কথার প্রত্যেক অক্ষরের মাত্রা সমান। কারণ, কোনো স্থানে বিশেষ ঝোঁক না থাকাতে অক্ষরের বড়ো ছোটো প্রায় নাই। সংস্কৃত উচ্চারণে যে দীর্ঘহ্রস্বের নিয়ম আছে তাহাও বাংলায় লোপ পাইয়াছে। এই কারণে উচ্চারণ-হিসাবে বাংলাভাষা বঙ্গদেশের সমতল-প্রসারিত প্রান্তরভূমির মতো সর্বত্র সমান। জিহ্বা কোথাও বাধা না পাইয়া ভাষার উপর দিয়া যেন একপ্রকার নিদ্রিত অবস্থায় চলিয়া যায়; কথাগুলি চিত্তকে পদে পদে প্রতিহত করিয়া অবিশ্রাম মনোযোগ জাগ্রত করিয়া রাখিতে পারে না। শব্দের সহিত শব্দের সংঘর্ষণে যে বিচিত্র সংগীত উৎপন্ন হয় তাহা সাধারণত বাংলাভাষায় অসম্ভব; কেবল একতান কলধ্বনি ক্রমে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চেতনা লোপ করিয়া দেয়। একটি শব্দের সম্পূর্ণ অর্থ হৃদয়ংগম হইবার পূর্বেই অবিলম্বে আর-একটি কথার উপরে স্খলিত হইয়া পড়িতে হয়। বৈষ্ণব কবির একটি গান আছে—

মন্দপবন, কুঞ্জভবন,
কুসুমগন্ধ-মাধুরী।

এই দুটি ছত্রে অক্ষরের গুরুলঘু নিরূপিত হওয়াতে এই সামান্য গুটিকয়েক কথার মধুর ভাবে সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া লয়। কিন্তু, এই ভাব সমমাত্রক[১] ছন্দে নিবিষ্ট হইলে অনেকটা নিষ্ফল হইয়া পড়ে। যেমন—

মৃদুল পবন, কুসুমকানন,
ফুলপরিমল-মাধুরী।

১ এখানে 'সমমাত্রক' শব্দে "দুই মাত্রার চলন" উদ্দিষ্ট নয়, ধ্বনির হ্রস্বদীর্ঘতা বা উচ্চনীচতা নাই এইমাত্র বুঝাইতেছে।

ইংরাজিতে অনেক সময় আট-দশ লাইনের একটি ছোটো কবিতা লঘুবাণের মতো ক্ষিপ্রগতিতে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া মর্মের মধ্যে বিদ্ধ হইয়া থাকে। বাংলায় ছোটো কবিতা আমাদের হৃদয়ের স্বাভাবিক জড়তায় আঘাত দিতে পারে না। বোধ করি কতকটা সেই কারণে আমাদের ভাষার এই খর্বতা আমরা অত্যুক্তি দ্বারা পূরণ করিয়া লইতে চেষ্টা করি। একটা কথা বাহুল্য করিয়া না বলিলে আমাদের ভাষায় বড়োই ফাঁকা শুনায় এবং সে কথা কাহারো কানে পৌছায় না। সেইজন্য সংক্ষিপ্ত সংহত রচনা আমাদের দেশে প্রচলিত নাই বলিলেই হয়। কোনো লেখা অত্যুক্তি পুনরুক্তি বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং আড়ম্বর -পূর্ণ না হইলে সাধারণত গ্রাহ্য হয় না।

বাংলা পড়িবার সময় অনেক পাঠক অধিকাংশ স্বরবর্ণকে দীর্ঘ করিয়া টানিয়া টানিয়া পড়েন। নচেৎ সমমাত্র হ্রস্বস্বরে হৃদয়ের সমস্ত আবেগ কুলাইয়া উঠে না। বাংলার বক্তারা অনেকেই দীর্ঘ উচ্চারণ প্রয়োগ করিয়া বক্তৃতা বৃহৎ ও গম্ভীর করিয়া তোলেন। ভালো ইংরাজ অভিনেতার অভিনয়ে দেখিতে পাওয়া যায়, এক-একটি শব্দকে সবলে বেষ্টন করিয়া প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ কিরূপ উদ্দামগতিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কিন্তু, বাংলা অভিনয়ে শিথিল কোমল কথাগুলি হৃদয়স্রোতের নিকট সহজেই মাথা নত করিয়া দেয়, তাহাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে পারে না। এইজন্য তাহাতে সর্বত্রই একপ্রকার দুর্বল সমায়ত সানুনাসিক ক্রন্দনস্বর ধ্বনিত হইতে থাকে। এইজন্য আমাদের অভিনেতারা যেখানে শ্রোতাদের হৃদয় বিচলিত করিতে চান সেখানে গলা চড়াইয়া অযথা-পরিমাণে চিৎকার করিতে থাকেন এবং তাহাতে প্রায়ই ফললাভ করেন।

মাইকেল তাঁহার মহাকাব্যে যে বড়ো বড়ো সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন—শব্দের স্থায়িত্ব, গাম্ভীর্য এবং পাঠকের সমগ্র মনোযোগ বদ্ধ করিবার চেষ্টাই তাহার কারণ বোধ হয়। 'যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে' দুর্বোধ হইতে পারে, কিন্তু 'সাগরের তট যথা তরঙ্গের ঘায়' দুর্বল ; 'উড়িল কলম্বকুল অম্বরপ্রদেশে' ইহার পরিবর্তে 'উড়িল যতেক তীর আকাশ ছাইয়া' ব্যবহার করিলে ছন্দের পরিপূর্ণ ধ্বনি নষ্ট হয়।

বাংলা শব্দের মধ্যে এই ধ্বনির অভাববশত বাংলায় পদ্যের অপেক্ষা গীতের প্রচলনই অধিক। কারণ, গীত সুরের সাহায্যে প্রত্যেক কথাটিকে মনের মধ্যে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট করিয়া দেয়। কথায় যে অভাব আছে সুরে তাহা পূর্ণ হয়। এবং গানে এক কথা বারবার ফিরিয়া গাহিলে ক্ষতি হয় না। যতক্ষণ চিত্ত না জাগিয়া উঠে ততক্ষণ সংগীত ছাড়ে না। এইজন্য প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে গান ছাড়া কবিতা নাই বলিলে হয়।

সংস্কৃতে ইহার বিপরীত দেখা যায়। বেদ ছাড়িয়া দিলে সংস্কৃত ভাষায় এত মহাকাব্য খণ্ডকাব্য সত্ত্বেও গান নাই। শকুন্তলা প্রভৃতি নাটকে যে দুই-একটি প্রাকৃত

গীত দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কাব্যের মধ্যে স্থান পাইতে পারে না। বাঙালি জয়দেবের গীতগোবিন্দ আধুনিক এবং তাহাকে এক হিসাবে গান না বলিলেও চলে। কারণ, তাহার ভাষালালিত্য ও ছন্দোবিন্যাস এমন সম্পূর্ণ যে তাহা সুরের অপেক্ষা রাখে না; বরং আমার বিশ্বাস সুরসংযোগে তাহার স্বাভাবিক শব্দনিহিত সংগীতের লাঘব করে। কিন্তু,

মনে রইল, সই, মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি বলি আর বলা হল না।

ইহা কাব্যকলায় অসম্পূর্ণ, অতএব সুরের প্রতি ইহার অনেকটা নির্ভর। সংস্কৃত শব্দ এবং ছন্দ ধ্বনিগৌরবে পরিপূর্ণ। সুতরাং সংস্কৃতে কাব্যরচনার সাধ গানে মিটাইতে হয় নাই, বরং গানের সাধ কাব্যে মিটিয়াছে। মেঘদূত সুরে বসানো বাহুল্য।

হিন্দীসাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না। কিন্তু, এ কথা বলিতে পারি, হিন্দীতে যে-সকল ধ্রুপদ খেয়াল প্রভৃতি পদ শুনা যায় তাহার অধিকাংশই কেবলমাত্র গান, একেবারেই কাব্য নহে। কথাকে সামান্য উপলক্ষমাত্র করিয়া সুর শুনানোই হিন্দী গানের প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু বাংলায় সুরের সাহায্য লইয়া কথার ভাবে শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করাই কবির উদ্দেশ্য। কবির গান, কীর্তন, রামপ্রসাদী গান, বাউলের গান প্রভৃতি দেখিলেই ইহার প্রমাণ হইবে। অতএব কাব্যরচনাই বাংলাগানের মুখ্য উদ্দেশ্য, সুরসংযোগ গৌণ। এই-সকল কারণে বাংলা সাহিত্য-ভাণ্ডারে রত্ন যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা গান।

শ্রাবণ ১২৯৯

সংগীত ও ছন্দ[১]

অনেক দিন হইতেই কবিতা লিখিতেছি, এইজন্য যতই বিনয় করি না কেন এটুকু না বলিয়া পারি না যে, ছন্দের তত্ত্ব কিছু কিছু বুঝি। সেই ছন্দের বোধ লইয়া যখন গান লিখিতে বসিলাম, তখন চাঁদ সদাগরের উপর মনসার যে-রকম আক্রোশ, আমার রচনার উপর তালের দেবতা তেমনি ফোঁস করিয়া উঠিলেন। আমার জানা ছিল, ছন্দের মধ্যে যে-নিয়ম আছে তাহা বিধাতার গড়া নিয়ম, তা কামারের গড়া-

১ সবুজ পত্রে মুদ্রিত 'সঙ্গীতের মুক্তি' প্রবন্ধের অংশ। মূলানুগত পাঠ। গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য।

নিগড় নয়। সুতরাং, তার সংযমে সংকীর্ণ করে না, তাহাতে বৈচিত্র্যকে উদ্‌ঘাটিত করিতে থাকে। সেই কথা মনে রাখিয়া বাংলা কাব্যে ছন্দকে বিচিত্র করিতে সংকোচ বোধ করি নাই।

কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে তালের সেই কাজ। অতএব, ছন্দ যে নিয়মে কবিতায় চলে তাল সেই নিয়মে গানে চলিবে এই ভরসা করিয়া গান বাঁধিতে চাহিলাম। তাহাতে কী উৎপাত ঘটিল একটা দৃষ্টান্ত দিই। মনে করা যাক, আমার গানের কথাটি এই—

কাঁপিছে দেহলতা থরথর,
চোখের জলে আঁখি ভরভর।
দোদুল তমালেরি বনছায়া
তোমার নীলবাসে নিল কায়া,
বাদল-নিশীথেরি ঝরঝর
তোমার আঁখি-'পরে ভরভর।
যে কথা ছিল তব মনে মনে
চমকে অধরের কোণে কোণে।
নীরব হিয়া তব দিল ভরি
কী মায়া-স্বপনে যে, মরি মরি,
নিবিড় কাননের মরমর
বাদল-নিশীথের ঝরঝর।

এ ছন্দে আমার পাঠকেরা কিছু আপত্তি করিলেন না। তাই সাহস করিয়া ওইটেই ওই ছন্দেই সুরে গাহিলাম। তখন দেখি, যাঁরা কাব্যের বৈঠকে দিব্য খুশি ছিলেন তাঁরাই গানের বৈঠকে রক্তচক্ষু। তাঁরা বলেন, এ ছন্দের এক অংশে সাত আর-এক অংশে চার, ইহাতে কিছুতেই তাল মেলে না। আমার জবাব এই, তাল যদি না মেলে সেটা তালেরই দোষ, ছন্দটাতে দোষ হয় নাই। কেন তাহা বলি। এই ছন্দ তিন এবং চার মাত্রার যোগে তৈরি। এইজন্যই 'তোমার নীলবাসে' এই সাত মাত্রার পর 'নিল কায়া' এই চার মাত্রা খাপ খাইল। তিন মাত্রা হইলেও ক্ষতি হইত না। যেমন, 'তোমার নীলবাসে মিলিল'। কিন্তু, ইহার মধ্যে ছয় মাত্রা কিছুতেই সইবে না। যেমন, 'তোমারি নীলবাসে ধরিল শরীর'। অথচ, প্রথম অংশে যদি ছয়ের ভাগ থাকিত তবে দিব্য চলিত। যেমন, 'তোমার সুনীল বাসে ধরিল শরীর'। এ আমি বলিতেছি কানের স্বাভাবিক রুচির কথা। এই কানের ভিতর দিয়া মরমে

পশিবার পথ। অতএব, এই কানের কাছে যদি ছাড় মেলে তবে ওস্তাদকে কেন ডরাইব।

আমার দৃষ্টান্তগত ছন্দটিতে প্রত্যেক লাইনেই সবসুদ্ধ ১১ মাত্রা আছে। কিন্তু এমন ছন্দ হইতে পারে যার প্রত্যেক লাইনে সমান মাত্রাবিভাগ নাই। যেমন—

বাজিবে, সখী, বাঁশি বাজিবে,
হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে।
বচন রাশি রাশি কোথা যে যাবে ভাসি,
অধরে লাজহাসি সাজিবে।
নয়নে আঁখিজল করিবে ছলছল
সুখবেদনা মনে বাজিবে।
মরমে মুরছিয়া মিলাতে চাবে হিয়া
সেই চরণযুগ-রাজীবে।

ইহার প্রথম দুই লাইনে মাত্রা ভাগ ৩+৪+৩=১০। তৃতীয় লাইনে ৩+৪+৩+৪=১৪। আমার মতে এই বৈচিত্র্যে ছন্দের মিষ্টতা বাড়ে। অতএব, উৎসাহ করিয়া গান ধরিলাম। কিন্তু, এক ফের ফিরিতেই তালওয়ালা পথ আটক করিয়া বসিল। সে বলিল, "আমার সমের মাসুল চুকাইয়া দাও।" আমি তো বলি, এটা বে-আইনি আবোয়াব। কান মহারাজার উচ্চ আদালতে দরবার করিয়া খালাস পাই। কিন্তু, সেই দরবারের বাহিরে খাড়া আছে মাঝারি শাসনতন্ত্রের দারোগা। সে খপ্ করিয়া হাত চাপিয়া ধরে, নিজের বিশেষ বিধি খাটায়, রাজার দোহাই মানে না।

কবিতায় যেটা ছন্দ, সংগীতে সেইটেই লয়। এই লয় জিনিসটি সৃষ্টি ব্যাপিয়া আছে, আকাশের তারা হইতে পতঙ্গের পাখা পর্যন্ত সমস্তই ইহাকে মানে বলিয়াই বিশ্বসংসার এমন করিয়া চলিতেছে অথচ ভাঙিয়া পড়িতেছে না। অতএব, কাব্যেই কী গানেই কী, এই লয়কে যদি মানি তবে তালের সঙ্গে বিবাদ ঘটিলেও ভয় করিবার প্রয়োজন নাই।

একটি দৃষ্টান্ত দিই—

ব্যাকুল বকুলের ফুলে
ভ্রমর মরে পথ ভুলে।
আকাশে কী গোপন বাণী
বাতাসে করে কানাকানি,
বনের অঞ্চলখানি
পুলকে উঠে দুলে দুলে।

বেদনা সুমধুর হয়ে
ভুবনে গেল আজি বয়ে।
বাঁশিতে মায়া তান পুরি
কে আজি মন করে চুরি,
নিখিল তাই মরে ঘুরি
বিরহসাগরের কূলে।

এটা যে কী তাল তা আমি আনাড়ি জানি না। এবং কোনো ওস্তাদও জানেন না। গণিয়া দেখিলে দেখি প্রত্যেক লাইনে নয় মাত্রা। যদি এমন বলা যায় যে, নাহয় নয় মাত্রায় একটা নূতন তালের সৃষ্টি করা যাক, তবে আর-একটা নয় মাত্রার গান পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক।

যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে
সে কাঁদনে সেও কাঁদিল।
যে বাঁধনে মোরে বাঁধিছে
সে বাঁধনে তারে বাঁধিল।
পথে পথে তারে খুঁজিনু
মনে মনে তারে পূজিনু,
সে পূজার মাঝে লুকায়ে
আমারেও সে যে সাধিল।
এসেছিল মন হরিতে
মহাপারাবার পারায়ে।
ফিরিল না আর তরীতে,
আপনারে গেল হারায়ে।
তারি আপনার মাধুরী
আপনারে করে চাতুরী,
ধরিবে কি ধরা দিবে সে
কী ভাবিয়া ফাঁদ ফাঁদিল।

এও নয় মাত্রা, কিন্তু এর ছন্দ আলাদা। প্রথমটার লয় ছিল তিনে-ছয়ে, দ্বিতীয়টার লয় ছয়ে-তিনে। আরো একটা নয়ের তাল দেখা যাক।

আঁধার রজনী পোহালো,
জগৎ পূরিল পুলকে,

বিমল প্রভাতকিরণে
মিলিল দ্যুলোকে ভূলোকে।

নয় মাত্রা বটে, কিন্তু এ ছন্দ স্বতন্ত্র। ইহার লয় তিন তিন তিনে। ইহাকে কোন্ নাম দিবে? আরো একটা দেখা যাক।

দুয়ার মম পথপাশে,
সদাই তারে খুলে রাখি।
কখন তার রথ আসে
ব্যাকুল হয়ে জাগে আঁখি।
শ্রাবণ শুনি দূর মেঘে
লাগায় গুরু গরগর,
ফাগুন শুনি বায়ুবেগে
জাগায় মৃদু মরমর,
আমার বুকে উঠে জেগে
চমক তারি থাকি থাকি।
কখন তার রথ আসে
ব্যাকুল হয়ে জাগে আঁখি।
সবাই দেখি যায় চলে
পিছন-পানে নাহি চেয়ে
উতল রোলে কল্লোলে
পথের গান গেয়ে গেয়ে।
শরৎ-মেঘ ভেসে ভেসে
উধাও হয়ে যায় দূরে,
যেথায় সব পথ মেশে
গোপন কোন্ সুরপুরে—
স্বপনে ওড়ে কোন্ দেশে
উদাস মোর প্রাণ-পাখি।
কখন তার রথ আসে
ব্যাকুল হবে জাগে আঁখি।

এও তো আর-এক ছন্দ। ইহার লয় পাঁচে চারে মিলিয়া, আবার এইটেকে উলটাইয়া দিয়া চারে পাঁচে করিলে নয়ের ছন্দকে লইয়া নয়-ছয় করা যাইতে পারে।

চৌতাল তো বারো মাত্রার ছন্দ। কিন্তু, এই বারো মাত্রা রক্ষা করিলেও চৌতালকে রক্ষা করা যায় না এমন হয়। এই তো বারো মাত্রা—

বনের পথে পথে বাজিছে বায়ে
নূপুর রুনুরুনু কাহার পায়ে।
কাটিয়া যায় বেলা মনের ভুলে,
বাতাস উদাসিছে আকুল চুলে,
ভ্রমরমুখরিত বকুলছায়ে
নূপুর রুনুরুনু কাহার পায়ে।

ইহা চৌতালও নহে, একতালাও নহে, ধামারও নয়, ঝাঁপতালও নয়। লয়ের হিসাব দিলেও তালের হিসাব মেলে না। তালওয়ালা সেই গরমিল লইয়া কবিকে দায়িক করে।

কিন্তু, হাল আমলে এ-সমস্ত উৎপাত চলিবে না। আমরা শাসন মানিব, তাই বলিয়া অত্যাচার মানিব না। কেননা, যে-নিয়ম সত্য সে-নিয়ম বাহিরের জিনিস নয়, তাহা বিশ্বের বলিয়াই তাহা আমার আপনার। যে-নিয়ম ওস্তাদের তাহা আমার ভিতরে নাই, বাহিরে আছে; সুতরাং তাকে অভ্যাস করিয়া বা ভয় করিয়া বা দায়ে পড়িয়া মানিতে হয়। এইরূপ মানার দ্বারাই শক্তির বিকাশ বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের সংগীতকে এই মানা হইতে মুক্তি দিলে তবেই তার স্বভাব তার স্বরূপকে নব নব উদ্‌ভাবনার ভিতর দিয়া ব্যক্ত করিতে থাকিবে।

ভাদ্র ১৩২৪

সংস্কৃত-বাংলা ও প্রাকৃত-বাংলার ছন্দ

সংস্কৃত-বাংলা এবং প্রাকৃত-বাংলার গতিভঙ্গিতে একটা লয়ের তফাত আছে। তার প্রকৃত কারণ প্রাকৃত-বাংলার দেহতত্ত্বটা হসন্তের ছাঁচে, সংস্কৃত-বাংলার হলন্তের।[১] অর্থাৎ, উভয়ের ধ্বনিস্বভাবটা পরস্পরের উলটো। প্রাকৃত-বাংলা স্বরবর্ণের মধ্যস্থতা থেকে মুক্ত হয়ে পদে পদে তার ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে আঁট করে তোলে। সুতরাং তার ছন্দের বুনানি সমতল নয়, তা তরঙ্গিত। সোজা লাইনের সুতো ধরে বিশেষ কোনো প্রাকৃত-বাংলার ছন্দকে মাপলে হয়তো বিশেষ কোনো সংস্কৃত-বাংলার ছন্দের সঙ্গে সে বহরে সমান হতে পারে, কিন্তু সুতোর মাপকে কি আদর্শ বলে ধরা যায়।

১ হলন্ত শব্দ স্বরান্ত অর্থে প্রযুক্ত।

মনে করা যাক, রাজমিস্ত্রি দেয়াল বানাচ্ছে; ওলনদণ্ড ঝুলিয়ে দেখা গেল, সেটা হল বারো ফিট। কিন্তু, মোটের উপর দেয়াল খাড়া দাঁড়িয়ে থাকলেও সেটার উপরিতল যদি ঢেউখেলানো হয়, তবে কারুবিচারে সেই তরঙ্গিত ভঙ্গিটাই বিশেষ আখ্যা পেয়ে থাকে। দৃষ্টান্তের সাহায্য নেওয়া যাক।

'বউ কথা কও, বউ কথা কও'
যতই গায় সে পাখি,
নিজের কথাই কুঞ্জবনের
সব কথা দেয় ঢাকি।

খাড়া সুতোর মাপে দাঁড়ায় এই—

১ ২ ১ ২ | ১ ২ ১ ২
বউ ক | থা কও | বউ ক | থা কও
১ ২ ১ ২ ১ ২
য তই | গায় সে | পা খি,
১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
নি জের | ক থাই | কুন্ জ | ব নের
১ ২ ১ ২ ১ ২
সব ক | থা দেয় | ঢা কি।

সেই সুতোর মাপে এর সংস্কৃত সংস্করণকে মাপা যাক—

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
ক থা | ক হ | ক থা | ক হ
১ ২ ১ ২ ১ ২
পা খি | য ত | ডা কে,
১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
নি জ | ক থা | কা ন | নে র
১ ২ ১ ২ ১ ২
স ব | ক থা | ঢা কে।

সুতোর মাপে সমান। কিন্তু, কান কি সেই মাপে আঙুল গুনে ছন্দের পরিচয় নেয়। ছন্দ যে ভঙ্গি নিয়ে, বস্তুর পরিমাপ নিয়ে নয়।

তোমার সঙ্গে আমার মিলন
বাধল কাছেই এসে।

তাকিয়ে ছিলেম আসন মেলে,
অনেক দূর যে পেরিয়ে এলে,
আঙিনাতে বাড়িয়ে চরণ
ফিরলে কঠিন হেসে।
তীরের হাওয়ায় তরী উধাও
পারের নিরুদ্দেশে।

এরই সংস্কৃত রূপান্তর দেওয়া যাক—

তোমা সনে মোর প্রেম
বাধে কাছে এসে।
চেয়েছিনু আঁখি মেলে,
বহুদূর হতে এলে,
আঙিনাতে পা বাড়িয়ে
ফিরে গেলে হেসে।
তীর-বায়ে তরী গেল
ওপারের দেশে।

মাপে মিলল, কিন্তু লয়ে মিলেছে কি। সমুদ্র যখন স্থির থাকে আর সমুদ্র যখন ঢেউ খেলিয়ে ওঠে তখন তার দৈর্ঘ্যপ্রস্থ সমান থাকে, কিন্তু তার ভঙ্গির বৈচিত্র্য ঘটে। এই ভঙ্গি নিয়েই ছন্দ। বিধাতা সেই ভঙ্গির দিকে তাকিয়েই মৃদঙ্গ বাজান, বোল বদলিয়ে দেন, তাই মনের মধ্যে ভিন্ন রকমের আঘাত লাগে।

আমি অন্যত্র বলেছি, প্রাকৃত-বাংলার ছন্দে যতিবিভাগ সকল সময় ঠিক কাটা কাটা সমান ভাগে নয়। পাঠক এক জায়গায় মাত্রা হরণ করে আর-এক জায়গায় ওজন রেখে তা পূরণ করে দিলে নালিশ চলে না। এইজন্যে একই কবিতা পাঠক আপন রুচি-অনুসারে কিছু পরিমাণে ভিন্নরকম করে পড়তে পারেন।

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপরতন আশা করি।
ঘাটে ঘাটে ফিরব না আর
ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।

এই কবিতাটি আমি পড়ি 'রূপ' এবং 'ডুব' এবং 'অরূপ' শব্দের ধ্বনিকে দীর্ঘ করে। অর্থাৎ ওই উকারগুলোর ওজন হয় দুই মাত্রার কিছু বেশি। তখন তারই পূরণস্বরূপে 'ডুব দিয়েছি'র পরে যতিকে থামতে দেওয়া যায় না। অপরপক্ষে 'ঘাটে ঘাটে' শব্দে

মাত্রাহ্রাসের ত্রুটি পূরণ করবার বরাত দেওয়া যায় 'ফিরব না' শব্দের উপর ; নইলে লিখতে হত 'সাতঘাটে আর ফিরব না ভাই'।

সংস্কৃত-বাংলা ও প্রাকৃত-বাংলার ছন্দে লয়ের যে ভেদ কানে লাগে তার কারণ সংস্কৃত-বাংলায় অনেক স্থলেই যে-শব্দের মাপ দুইয়ের তার ওজনও দুইয়ের। যেমন—

১	২	১	২
তো	মা	স	নে।

কিন্তু প্রাকৃত-বাংলায় প্রায়ই সে স্থলে মাপ দুইয়ের হলেও ওজন তিনের। যেমন—

১	২	১	২
তো	মার	সঙ্	গে।

এতে করে তিন-ঘেঁষা ছন্দের প্রকৃতি বদলে যায়।

'রূপসাগরে' গানটির পরিবর্তে লেখা যেতে পারত—

রূপরসে ডুব দিনু অরূপের আশা করি।
ঘাটে ঘাটে ফিরিব না বেয়ে মোর ভাঙা তরী।

যদি কেউ বলেন, দুটোর একই ছন্দ, তা হলে এইটুকু বলে চুপ করব যে, আমার সঙ্গে মতে মিলল না। কেননা, আমি ছন্দ গুনি নে, আমি ছন্দ শুনি।

শ্রাবণ ১৩৩৯

ছন্দে হসন্ত[১]

তব চিত্তগগনের দূর দিক্‌সীমা
বেদনার রাঙা মেঘে পেয়েছে মহিমা।

এখানে 'দিক্' শব্দের ক্ হসন্ত হওয়া সত্ত্বেও তাকে এক মাত্রার পদবি দেওয়া গেল। নিশ্চিত জানি, পাঠক সেই পদবির সম্মান স্বতই রক্ষা করে চলবেন।

মনের আকাশে তার দিক্‌সীমানা বেয়ে
বিবাগী স্বপনপাখি চলিয়াছে ধেয়ে।

১ রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' প্রবন্ধ এবং গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য।

অথবা—

দিগ্‌বলয়ে নবশশিলেখা
টুকরো যেন মানিকের রেখা।

এতেও কানের সম্মতি আছে।

দিক্‌প্রান্তে ওই চাঁদ বুঝি
দিক্‌-ভ্রান্ত মরে পথ খুঁজি।

আপত্তির বিশেষ কারণ নেই।

দিক্‌প্রান্তের ধূমকেতু উন্মত্তের প্রলাপের মতো
নক্ষত্রের আঙিনায় টলিয়া পড়িল অসংগত।

এও চলে। একের নজিরে অন্যের প্রামাণ্য ঘোচে না।

কিন্তু যাঁরা এ নিয়ে আলোচনা করছেন তাঁরা একটা কথা বোধ হয় সম্পূর্ণ মনে রাখছেন না যে, সব দৃষ্টান্তগুলিই পয়ারজাতীয় ছন্দের। আর এ কথা বলাই বাহুল্য যে, এই ছন্দ যুক্তধ্বনি ও অযুক্তধ্বনি উভয়কেই বিনা পক্ষপাতে এক মাত্রারূপে ব্যবহার করবার সনাতন অধিকার পেয়েছে। আবার যুক্তধ্বনিকে দুই ভাগে বিশ্লিষ্ট করে তাকে দুই মাত্রায় ব্যবহার করার স্বাধীনতা সে যে দাবি করতে পারে না তাও নয়।

যাকে আমি অসম বা বিষম মাত্রার ছন্দ বলি যুক্তধ্বনির বাছ-বিচার তাদেরই এলেকায়।

হৃৎ-ঘটে সুধারস ভরি

কিম্বা—

হৃৎ-ঘটে অমৃতরস ভরি
তৃষা মোর হরিলে সুন্দরী।

এ ছন্দে দুইই চলবে। কিন্তু—

অমৃতনির্ঝরে হৃৎপাত্রটি ভরি
কারে সমর্পণ করিলে সুন্দরী।

অগ্রাহ্য, অন্তত আধুনিক কালের কানে। অসম মাত্রার ছন্দে এরকম যুক্তধ্বনির বন্ধুরতা আবার একদিন ফিরে আসতেও পারে, কিন্তু আজ এটার চল নেই।

এই উপলক্ষে একটা কথা বলে রাখি, সেটা আইনের কথা নয়, কানের অভিরুচির কথা।

হৃৎপটে আঁকা ছবিখানি

ব্যবহার করা আমার পক্ষে সহজ, কিন্তু—

হৃৎপত্রে আঁকা ছবিখানি

অল্প একটু বাধে। তার কারণ খণ্ড ত'কে পূর্ণ ত'এর জাতে তুলতে হলে তার পূর্ববর্তী স্বরবর্ণকে দীর্ঘ করতে হয়; এই চুরিটুকুতে পীড়াবোধ হয় না যদি পরবর্তী স্বরটা হ্রস্ব থাকে। কিন্তু, পরবর্তী স্বরটাও যদি দীর্ঘ হয় তা হলে শব্দটার পায়া ভারী হয়ে পড়ে।

হৃৎপত্রে এঁকেছি ছবিখানি

আমি সহজে মঞ্জুর করি, কারণ এখানে 'হৃৎ' শব্দের স্বরটি ছোটো ও 'পত্র' শব্দের স্বরটি বড়ো। রসনা 'হৃৎ' শব্দ দ্রুত পেরিয়ে 'পত্র' শব্দে পুরো ঝোঁক দিতে পারে। এই কারণেই 'দিক্‌সীমা' শব্দকে চার মাত্রার আসন দিতে কুণ্ঠিত হই নে, কিন্তু 'দিক্‌প্রান্ত' শব্দের বেলা ঈষৎ একটু দ্বিধা হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়। 'দিক্‌সীমা' কথাটি দরিদ্র, 'দিক্‌প্রান্ত' কথাটি পরিপুষ্ট।

এ অসীম গগনের তীরে
মৃৎকণা জানি ধরণীরে।

'মৃৎকণা' না বলে যদি 'মৃৎপিণ্ড' বলা যায় তবে তাকে চালিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু একটু যেন ঠেলতে হয়, তবেই চলে।

মৃৎ-ভবনে এ কী সুধা
রাখিয়াছ হে বসুধা।

কানে বাধে না। কিন্তু—

মৃত-ভাণ্ডেতে এ কী সুধা
ভরিয়াছ হে বসুধা।

কিছু পীড়া দেয় না যে তা বলতে পারি নে। কিন্তু, অক্ষর গন্‌তি করে যদি বল ওটা ইন্‌ভীডিয়স্ ডিস্‌টিক্‌শন, তা হলে চুপ করে যাব। কারণ, কান-বেচারা প্রিমিটিভ্ ইন্দ্রিয়, তর্কবিদ্যায় অপটু।

কার্তিক ১৩৩৯

চিঠিপত্র

জে. ডি. এণ্ডার্সনকে লিখিত [১]

আপনি বলিয়াছেন, আমাদের উচ্চারণের ঝোঁকটা বাক্যের আরম্ভে পড়ে। ইহা আমি অনেক দিন পূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি। ইংরাজিতে প্রত্যেক শব্দেরই একটি নিজস্ব ঝোঁক আছে। সেই বিচিত্র ঝোঁকগুলিকে নিপুণভাবে ব্যবহার করার দ্বারাই আপনাদের ছন্দ সংগীতে মুখরিত হইয়া উঠে। সংস্কৃত ভাষার ঝোঁক নাই কিন্তু দীর্ঘহ্রস্বস্বর ও যুক্তব্যঞ্জনবর্ণের মাত্রাবৈচিত্র্য আছে, তাহাতে সংস্কৃত ছন্দ ঢেউ খেলাইয়া উঠে। যথা—

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা।

উক্ত বাক্যের যেখানে যেখানে যুক্তব্যঞ্জনবর্ণ বা দীর্ঘস্বর আছে সেখানেই ধ্বনি গিয়া বাধা পায়। সেই বাধার আঘাতে আঘাতে ছন্দ হিল্লোলিত হইয়া উঠে।

যে ভাষায় এইরূপ প্রত্যেক শব্দের একটি বিশেষ বেগ আছে সে ভাষার মস্ত সুবিধা এই যে, প্রত্যেক শব্দটিই নিজেকে জানান দিয়া যায়, কেহই পাশ কাটাইয়া আমাদের মনোযোগ এড়াইয়া যাইতে পারে না। এইজন্য যখন একটা বাক্য (sentence) আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় তখন তাহার উচ্চনীচতার বৈচিত্র্যবশত একটা সুস্পষ্ট চেহারা দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলা বাক্যের অসুবিধা এই যে, একটা ঝোঁকের টানে একসঙ্গে অনেকগুলা শব্দ অনায়াসে আমাদের কানের উপর দিয়া পিছলাইয়া চলিয়া যায়; তাহাদের প্রত্যেকটার সঙ্গে সুস্পষ্ট পরিচয়ের সময় পাওয়া যায় না। ঠিক যেন আমাদের একান্নবর্তী পরিবারের মতো। বাড়ির কর্তাটিকেই স্পষ্ট করিয়া অনুভব করা যায় কিন্তু তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার কত পোষ্য আছে, তাহারা আছে কি নাই, তাহার হিসাব রাখিবার দরকার হয় না।

এইজন্য দেখা যায়, আমাদের দেশে কথকতা যদিচ জনসাধারণকে শিক্ষা এবং আমোদ দিবার জন্য, তথাপি কথকমহাশয় ক্ষণে ক্ষণে তাহার মধ্যে ঘনঘটাচ্ছন্ন সংস্কৃত সমাসের আমদানি করিয়া থাকেন। সে-সকল শব্দ গ্রাম্যলোকেরা বোঝে না, কিন্তু এই-সমস্ত গম্ভীর শব্দের আওয়াজে তাহাদের মনটা ভালো করিয়া

১ সবুজ পত্রে প্রকাশিত 'সাধু' ভাষায় লিখিত মূল পাঠ।

জাগিয়া ওঠে। বাংলাভাষায় শব্দের মধ্যে আওয়াজ মৃদু বলিয়া অনেক সময় আমাদের কবিদিগকে দায়ে পড়িয়া অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে হয়।

এইজন্যই আমাদের যাত্রার ও পাঁচালির গানে ঘন ঘন অনুপ্রাস ব্যবহারের প্রথা আছে। সে অনুপ্রাস অনেক সময় অর্থহীন এবং ব্যাকরণবিরুদ্ধ; কিন্তু সাধারণ শ্রোতাদের পক্ষে তাহার প্রয়োজন এত অধিক যে বাছ-বিচার করিবার সময় পাওয়া যায় না। নিরামিষ তরকারি রাঁধিতে হইলে ঝাল-মসলা বেশি করিয়া দিতে হয়, নহিলে স্বাদ পাওয়া যায় না। এই মসলা পুষ্টির জন্য নহে; ইহা কেবলমাত্র রসনাকে তাড়া দিয়া উত্তেজিত করিবার জন্য। সেইজন্য দাশরথি রায়ের রামচন্দ্র যখন নিম্নলিখিত রীতিতে অনুপ্রাসচ্ছটা বিস্তার করিয়া বিলাপ করিতে থাকেন—

অতি অগণ্য কাজে ছি ছি জঘন্য সাজে
ঘোর অরণ্যমাঝে কত কাঁদিলাম—

তাহাতে শ্রোতার হৃদয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। আমাদের বন্ধু দীনেশবাবু-কর্তৃক পরমপ্রশংসিত কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাশয়ের গানের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রকারের আবর্জনা ঝুড়িঝুড়ি চাপিয়া আছে। তাহাতে কাহাকেও বাধা দেয় না।

পুনঃ যদি কোনক্ষণে দেখা দেয় কমলেক্ষণে
যতনে ধরে রক্ষণে জানাবি তৎক্ষণে।

এখানে কমলেক্ষণ এবং রক্ষণ শব্দটাতে এ-কার যোগ করা একেবারেই নিরর্থক; কিন্তু অনুপ্রাসের বন্যার মুখে অমন কত এ-কার উ-কার স্থানে অস্থানে ভাসিয়া বেড়ায় তাহাতে কাহারো কিছু আসে যায় না।

একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, বাংলা রামায়ণ, মহাভারত, অন্নদামঙ্গল, কবিকঙ্কণচণ্ডী প্রভৃতি সমস্ত পুরাতন কাব্য গানের সুরে কীর্তিত হইত। এইজন্য শব্দের মধ্যে যাহা কিছু ক্ষীণতা ও ছন্দের মধ্যে যাহা কিছু ফাঁক ছিল সমস্তই গানের সুরে ভরিয়া উঠিত; সঙ্গে সঙ্গে চামর দুলিত, করতাল চলিত এবং মৃদঙ্গ বাজিতে থাকিত। সেই-সমস্ত বাদ দিয়া যখন আমাদের সাধুসাহিত্য-প্রচলিত ছন্দগুলি পড়িয়া দেখি, তখন দেখিতে পাই একে তো প্রত্যেক কথাটিতে স্বতন্ত্র ঝোঁক নাই, তাহাতে প্রত্যেক অক্ষরটি একমাত্রা বলিয়া গণ্য হইয়াছে।···

গানের পক্ষে ইহাই সুবিধা। বাংলার সমতল ক্ষেত্রে নদীর ধারা যেমন স্বচ্ছন্দে চারি দিকে শাখায় প্রশাখায় প্রসারিত হইয়াছে, তেমনি সমমাত্রিক ছন্দে সুর আপন প্রয়োজনমত যেমন-তেমন করিয়া চলিতে পারে। কথাগুলা মাথা হেঁট করিয়া সম্পূর্ণ তাহার অনুগত হইয়া থাকে।

কিন্তু, সুর হইতে বিযুক্ত করিয়া পড়িতে গেলে এই ছন্দগুলি একেবারে বিধবার মতো হইয়া পড়ে। এইজন্য আজ পর্যন্ত বাংলা কবিতা পড়িতে হইলে আমরা সুর করিয়া পড়ি। এমন-কি, আমাদের গদ্য আবৃত্তিতেও যথেষ্ট পরিমাণে সুর লাগে। আমাদের ভাষার প্রকৃতি-অনুসারেই এরূপ ঘটিয়াছে। আমাদের এই অভ্যাসবশত ইংরেজি পড়িবার সময়েও আমরা সুর লাগাই; ইংরেজের কানে নিশ্চয়ই তাহা অদ্ভুত লাগে।

কিন্তু, আমাদের প্রত্যেক অক্ষরটিই যে বস্তুত এক মাত্রার এ কথা সত্য নহে। যুক্ত বর্ণ এবং অযুক্ত বর্ণ কখনোই এক মাত্রার হইতে পারে না।

কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্।

'পুণ্যবান্' শব্দটি 'কাশীরাম' শব্দের সমান ওজনের নহে। কিন্তু, আমরা প্রত্যেক বর্ণটিকে সুর করিয়া টানিয়া টানিয়া পড়ি বলিয়া আমাদের শব্দগুলির মধ্যে এতটা ফাঁক থাকে যে, হালকা ও ভারী দুইরকম শব্দই সমমাত্রা অধিকার করিতে পারে।...'

Equality, Fraternity প্রভৃতি পদার্থগুলি খুব মূল্যবান বটে, কিন্তু সেইজন্যই ঝুটা হইলে তাহা ত্যাজ্য হয়। আমাদের সাধুছন্দে বর্ণগুলির মধ্যে সাম্য ও সৌভ্রাত্র দেখা যায় তাহা গানের সুরে সাচ্চা হইতে পারে, কিন্তু আবৃত্তি করিয়া পড়িবার প্রয়োজনে তাহা ঝুটা। এই কথাটা অনেকদিন আমার মনে বাজিয়াছে। কোনো কোনো কবি ছন্দের এই দীনতা দূর করিবার জন্য বিশেষ জোর দিবার বেলায় বাংলা শব্দগুলিকে সংস্কৃতের রীতি-অনুযায়ী স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ রাখিয়া ছন্দে বসাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রে তাহার দুই-একটা নমুনা আছে। যথা—

মহারুদ্র বেশে মহাদেব সাজে।

বৈষ্ণব কবিদের রচনায় এরূপ অনেক দেখা যায়।... কিন্তু, এগুলি বাংলা নয় বলিলেই হয়। ভারতচন্দ্র যেখানে সংস্কৃত ছন্দে লিখিয়াছেন, সেখানে তিনি বাংলা শব্দ যতদূর সম্ভব পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং বৈষ্ণব কবিরা যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহা মৈথিলী ভাষার বিকার।

আমার বড়দাদা মাঝে মাঝে এ কাজ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কৌতুক করিয়া। যথা—

ইচ্ছা সম্যক্ ভ্রমণগমনে কিন্তু পাথেয় নাস্তি।
পায়ে শিক্লী মন উড়ু উড়ু এ কি দৈবেরি শাস্তি!

বাংলায় এ জিনিস চলিবে না; কারণ বাংলায় হ্রস্বদীর্ঘস্বরের পরিমাণভেদ সুব্যক্ত নহে। কিন্তু, যুক্ত ও অযুক্ত বর্ণের মাত্রাভেদ বাংলাতেও না ঘটিয়া থাকিতে পারে না।...

সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার একটা প্রভেদ এই যে, বাংলার প্রায় সর্বত্রই শব্দের অন্তস্থিত অ-স্বরবর্ণের উচ্চারণ হয় না। যেমন—ফল, জল, মাঠ, ঘাট, চাঁদ, ফাঁদ, বাঁদর, আদর ইত্যাদি। ফল শব্দ বস্তুত এক মাত্রার কথা। অথচ সাধু বাংলাভাষার ছন্দে ইহাকে দুই মাত্রা বলিয়া ধরা হয়। অর্থাৎ ফলা এবং ফল বাংলা ছন্দে একই ওজনের। এইরূপে বাংলা সাধুছন্দে হসন্ত জিনিসটাকে একেবারে ব্যবহারে লাগানো হয় না। অথচ জিনিসটা ধ্বনি উৎপাদনের কাজে ভারি মজবুত। হসন্ত শব্দটা স্বরবর্ণের বাধা পায় না বলিয়া পরবর্তী শব্দের ঘাড়ের উপর পড়িয়া তাহাকে ধাক্কা দেয় ও বাজাইয়া তোলে। 'করিতেছি' শব্দটা ভোঁতা। উহাতে কোনো সুর বাজে না কিন্তু 'কর্চি' শব্দে একটা সুর আছে। 'যাহা হইবার তাহাই হইবে' এই বাক্যের ধ্বনিটা অত্যন্ত ঢিলা; সেইজন্য ইহার অর্থের মধ্যেও একটা আলস্য প্রকাশ পায়। কিন্তু, যখন বলা যায় 'যা হবার তাই হবে' তখন 'হবার' শব্দের হসন্ত-'র' 'তাই' শব্দের উপর আছাড় খাইয়া একটা জোর জাগাইয়া তোলে; তখন উহার নাকী সুর ঘুচিয়া গিয়া ইহা হইতে একটা মরিয়া ভাবের আওয়াজ বাহির হয়। বাংলার হসন্তবর্জিত সাধু ভাষাটা বাবুদের আদুরে ছেলেটার মতো মোটাসোটা গোলগাল; চর্বির স্তরে তাহার চেহারাটা একেবারে ঢাকা পড়িয়া গেছে, এবং তাহার চিক্কণতা যতই থাক্, তাহার জোর অতি অল্পই।

কিন্তু, বাংলার অসাধু ভাষাটা খুব জোরালো ভাষা, এবং তাহার চেহারা বলিয়া একটা পদার্থ আছে। আমাদের সাধু ভাষার কাব্যে এই অসাধু ভাষাকে একেবারেই আমল দেওয়া হয় নাই; কিন্তু, তাই বলিয়া অসাধু ভাষা যে বাসায় গিয়া মরিয়া আছে তাহা নহে। সে আউলের মুখে, বাউলের মুখে, ভক্ত কবিদের গানে, মেয়েদের ছড়ায় বাংলাদেশের চিত্তটাকে একেবারে শ্যামল করিয়া ছাইয়া রহিয়াছে। কেবল ছাপার কালির তিলক পরিয়া সে ভদ্রসাহিত্যসভায় মোড়লি করিয়া বেড়াইতে পারে না। কিন্তু, তাহার কণ্ঠে গান থামে নাই, তাহার বাঁশের বাঁশি বাজিতেছেই। সেই-সব মেঠো-গানের ঝরনার তলায় বাংলাভাষার হসন্ত-শব্দগুলা নুড়ির মতো পরস্পরের উপর পড়িয়া ঠুন্‌ঠুন্ শব্দ করিতেছে। আমাদের ভদ্রসাহিত্যপল্লীর গম্ভীর দিঘিটার স্থির জলে সেই শব্দ নাই; সেখানে হসন্তর ঝংকার বন্ধ।

আমার শেষ বয়সের কাব্য-রচনায় আমি বাংলার এই চলতি ভাষার সুরটাকে ব্যবহারে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কেননা দেখিয়াছি, চলতি ভাষাটাই স্রোতের জলের মতো চলে, তাহার নিজের একটি কলধ্বনি আছে। গীতাঞ্জলি[১] হইতে আপনি

১ গীতিমাল্য?

আমার যে লাইনগুলি তুলিয়া দিয়াছেন তাহা আমাদের চলতি ভাষার হসন্ত স্বরের লাইন।

আমার্ সকল্ কাঁটা ধন্য করে
ফুট্‌বে গো ফুল্ ফুট্‌বে।
আমার্ সকল্ ব্যথা রঙিন্ হয়ে
গোলাপ্ হয়ে উঠ্‌বে।

আপনি লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন এই ছন্দের প্রত্যেক গাঁঠে গাঁঠে একটি করিয়া হসন্তের ভঙ্গি আছে। 'ধন্য' শব্দটার মধ্যেও একটা হসন্ত আছে। উহা "ধন্‌ন" এই বানানে লেখা যাইতে পারে। এইটে সাধু ভাষার ছন্দে লিখিলাম—

যত কাঁটা মম সফল করিয়া ফুটিবে কুসুম ফুটিবে।
সকল বেদনা অরুণ বরনে গোলাপ হইয়া উঠিবে।

অথবা যুক্তবর্ণকে যদি এক মাত্রা বলিয়া ধরা যায় তবে এমন হইতে পারে—

সকল কণ্টক সার্থক করিয়া কুসুমস্তবক ফুটিবে।
বেদনা যন্ত্রণা রক্তমূর্তি ধরি গোলাপ হইয়া উঠিবে।

এমনি করিয়া সাধু ভাষার কাব্যসভায় যুক্তবর্ণের মৃদঙ্গটা আমরা ফুটা করিয়া দিয়াছি এবং হসন্তর বাঁশির ফাঁকগুলি সীসা দিয়া ভর্তি করিয়াছি। ভাষার নিজের অন্তরের স্বাভাবিক সুরটাকে রুদ্ধ করিয়া দিয়া বাহির হইতে সুর যোজনা করিতে হইয়াছে। সংস্কৃতভাষার জরি-জহরতের ঝালরওয়ালা দেড়-হাত দুই-হাত ঘোমটার আড়ালে আমাদের ভাষাবধূটির চোখের জল মুখের হাসি সমস্ত ঢাকা পড়িয়া গেছে, তাহার কালো চোখের কটাক্ষে যে কত তীক্ষ্ণতা তাহা আমরা ভুলিয়া গেছি। আমি তাহার সেই সংস্কৃত ঘোমটা খুলিয়া দিবার কিছু সাধনা করিয়াছি তাহাতে সাধু লোকেরা ছি ছি করিয়াছে। সাধু লোকেরা জরির আঁচলাটা দেখিয়া তাহার দর যাচাই করুক; আমার কাছে চোখের চাহনিটুকুর দর তাহার চেয়ে অনেক বেশি; সে যে বিনামূল্যের ধন, সে ভট্টাচার্যপাড়ার হাটে বাজারে মেলে না।

জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

২

সম্মুখসমরে পড়ি বীরচূড়ামণি
বীরবাহু—

এই বাক্যটি আবৃত্তি করিবার সময়ে আমরা 'সম্মুখ' শব্দটার উপরে ঝোঁক দিয়া সেই এক ঝোঁকে একেবারে 'বীরবাহু' পর্যন্ত গড় গড় করিয়া চলিয়া যাইতে পারি। আমরা

নিশ্বাসটার বাজে-খরচ করিতে নারাজ, এক নিশ্বাসে যতগুলা শব্দ সারিয়া লইতে পারি ছাড়ি না।

আপনাদের ইংরাজি বাক্যে সেটা সম্ভব হয় না, কেননা, আপনাদের শব্দগুলা বেজায় রোখা মেজাজের। তাহারা প্রত্যেকেই চুঁ মারিয়া নিশ্বাসের শাসন ঠেলিয়া বাহির হইতে চায়। She was absolutely authentic, new, and inexpressible —এই বাক্যে যতগুলি বিশেষণপদ আছে সব কটাই উঁচু হইয়া উঠিয়া নিশ্বাসের বাতাসটাকে ফুটবলের গোলার মতো এক মাথা হইতে আর-এক মাথায় ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া চালান করিয়া দিতেছে।

প্রত্যেক ভাষারই একটা স্বাভাবিক চলিবার ভঙ্গি আছে। সেই ভঙ্গিটারই অনুসরণ করিয়া সেই ভাষার নৃত্য অর্থাৎ তাহার ছন্দ রচনা করিতে হয়। এখন দেখা যাক, আমাদের ভাষার চাল-চলনটা কী রকম।

আপনি বলিয়াছেন, বাংলা বাক্য -উচ্চারণে বাক্যের আরম্ভে আমরা ঝোঁক দিয়া থাকি। এই ঝোঁকের দৌড়টা যে কতদূর পর্যন্ত হইবে তাহার কোনো বাঁধা নিয়ম নাই, সেটা আমাদের ইচ্ছা। যদি জোর দিতে না চাই তবে সমস্ত বাক্যটা একটানা বলিতে পারি, যদি জোর দিতে চাই তবে বাক্যের পর্বে পর্বেই ঝোঁক দিয়া থাকি। 'আদিম মানবের তুমুল পাশবতা মনে করিয়া দেখো'— এই বাক্যটা আমরা এমনি করিয়া পড়িতে পারি যাহাতে উহার সকল শব্দই একেবারে মাথায় মাথায় সমান হইয়া থাকে। আবার উত্তেজনার বেগে নিম্নলিখিত-মত করিয়াও পড়া যাইতে পারে—

।　　।　　।　　।　　।

আদিম মানবের তুমুল পাশবতা মনে করিয়া দেখো।

এই বাংলা শব্দগুলির নিজের কোনো বিশেষ দাবি নাই, আমাদের মর্জির উপরেই নির্ভর। কিন্তু, Realize the riotous animality of primitive man— এই বাক্যে প্রায় প্রত্যেক শব্দই নিজ নিজ এক্‌সেন্টের ধ্বজা গাড়িয়া বসিয়া আছে বলিয়া নিশ্বাস তাহাদিগকে খাতির করিয়া চলিতে বাধ্য।

বাংলা ছন্দে যে পদবিভাগ হয় সেই প্রত্যেক পদের গোড়াতেই একটি করিয়া ঝোঁকালো শব্দ কাপ্তেনি করে এবং তাহার পিছন পিছন কয়েকটি অনুগত শব্দ সমান তালে পা ফেলিয়া কুচ করিয়া চলিয়া যায়। এইরূপ এক-একটি ঝোঁক-কাপ্তেনের অধীনে কয়টা করিয়া মাত্রা-সিপাই থাকিবে ছন্দের নিয়ম-অনুসারে তাহার বরাদ্দ হইয়া থাকে।

পয়ারের রীতিটা দেখা যাক। পয়ারটা চতুষ্পদ ছন্দ। আমার বিশ্বাস, পয়ার

শব্দটা পদ-চার শব্দের বিকার। ইহার এক-একটি পদ এক-একটি ঝোঁকের শাসনে চলে।

মহাভারতের কথা | অমৃতসমান।
কাশীরামদাস কহে | শুনে পুণ্যবান্।

'অমৃতসমান' ও 'শুনে পুণ্যবান্' এই দুই অংশে ছয়টি অক্ষর দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু মাত্রাগণনায় ইহারা আট। ওইখানে লাইন শেষ হয় বলিয়া দুটি মাত্রা-পরিমাণ জায়গা ফাঁক থাকে। যাহারা সুর করিয়া পড়ে তাহারা 'মান' এবং 'বান' শব্দের আকারটিকে দীর্ঘাকার করিয়া ওই ফাঁক ভরাইয়া দেয়।

এক-একটি ঝোঁকে কয়টি করিয়া মাত্রা আগলাইতেছে তাহা দেখিয়াই ছন্দের বিচার করিতে হয়। নতুবা যদি মোটা করিয়া বলি যে, এক-এক লাইনে চোদ্দটা করিয়া অক্ষর থাকিলে তাহাকে পয়ার বলে তবে নানা ভিন্নপ্রকারের ছন্দকে পয়ার বলিতে হয়। নিম্নলিখিত ছন্দে প্রত্যেক লাইনে চোদ্দটা অক্ষর আছে—

ফাগুন যামিনী, প্রদীপ জ্বলিছে ঘরে।
দখিন-বাতাস মরিছে বুকের 'পরে।

ইহাকে যে পয়ার বলি না তাহার কারণ ইহার এক-একটি ঝোঁকের দখলে ছয়টি করিয়া মাত্রা। ইহার ভাগ নীচে লিখিলাম—

ফাগুন যামিনী,| প্রদীপ জ্বলিছে | ঘরে— ।

চোদ্দ-অক্ষরী লাইনের আরো দৃষ্টান্ত আছে—

পুরব-মেঘমুখে | পড়েছে রবিরেখা।
অরুণ-রথচূড়া | আধেক গেল দেখা।

এখানে স্পষ্টই এক-এক ঝোঁকে সাতটি করিয়া মাত্রা। সুতরাং পয়ারের তুলনায় প্রত্যেক পদে ইহার এক মাত্রা কম।

তবেই দেখা যাইতেছে, আট মাত্রার ছন্দকেই পয়ার বলে। আট মাত্রাকে দুখানা করিয়া চার মাত্রায় ভাগ করা চলে, কিন্তু সেটাতে পয়ারের চাল খাটো করা হয়। বস্তুত লম্বা নিশ্বাসের মন্দগতি চালেই পয়ারের পদমর্যাদা। চার-চার মাত্রায় পা ফেলিয়া পয়ার যখন দুলকি চালে চলে তখন তাহার পায়ে পায়ে মিল থাকে। যেমন—

বাজে তীর, পড়ে বীর ধরণীর 'পরে।

এরূপ ছন্দ হালকা কাজে চলে; ইহা যুক্ত-অক্ষরের ভার সয় না এবং সাতকাণ্ড বা অষ্টাদশ পর্ব জুড়িয়া লম্বা দৌড় ইহার পক্ষে অসাধ্য। চৌপদীটা পয়ারের সহোদর

বোন। আট মাত্রায় তাহার পা পড়ে, কেবল তাহার পায়ে মিলের মলজোড়ার ঝংকারটা কিছু বেশি।

বাহিরের চেহারা দেখিয়া ছন্দের জাতিনির্ণয় করায় যে প্রমাদ ঘটিতে পারে তাহার একটা দৃষ্টান্ত এইখানে দিই। একদিন আমার মাথায় একটা ছয় মাত্রার ছন্দ আসিয়া হাজির হইয়াছিল। তাহার চেহারাটা এইরকম—

প্রথম শীতের মাসে, শিশির লাগিল ঘাসে,
হুহু করে হাওয়া আসে হিহি করে কাঁপে গাত্র।

গোটা কয়েক শ্লোক যখন লেখা হইয়া গেছে তখন হঠাৎ হুঁশ হইল যে, আকারে-আয়তনে চৌপদীর সঙ্গে ইহার কোনো তফাত নাই, অতএব পাঠকেরা আট মাত্রার ঝোঁক দিয়াই ইহা পড়িবে— তখন আমি হাল ছাড়িয়া দিয়া চৌপদীর দস্তুরেই লিখিতে লাগিলাম। এই ছন্দটিকে ছয় মাত্রার কায়দায় পড়িতে হইলে নিম্নলিখিত-মত ভাগ হয়—

। ।
প্রথম শীতের | মাসে—
। ।
শিশির লাগিল | ঘাসে—

আমাদের দেশের সংগীতের তাল যদি আপনার জানা থাকে তবে এক কথায় বলিলেই বুঝিবেন, চৌপদীতে কাওয়ালির লয়ে ঝোঁক দিতে হয় এবং আমি যে ছন্দটা লক্ষ্য করিয়া লিখিতেছিলাম তাহার তাল একতালা। কাওয়ালি দুইবর্গ মাত্রার তাল, এবং একতালা তিনবর্গ মাত্রার।

ত্রিপদীরও মোটের উপর আট মাত্রার চাল। যথা—

। ।
ভবানীর কটুভাবে | লজ্জা হৈল কীর্তিবাসে,
। ।
ক্ষুধানলে কলেবর | দহে।

তৃতীয় পদে দুটা মাত্রা বেশি আছে; তাহার কারণ, যে চতুর্থ পদটি থাকিলে এই ছন্দের ভারসামঞ্জস্য থাকিত সেটি নাই। 'ক্ষুধানলে কলেবর' পর্যন্ত আসিয়া থামিতে গেলে ছন্দটা কাত হইয়া পড়ে এইজন্য 'দহে' একটা যোগ করিয়া ছোটো একটি ঠেকা দিয়া উহাকে খাড়া রাখা হইয়াছে। চতুষ্পদ জন্তুর পায়ের তেলোটা চওড়া হয় না, কিন্তু মানুষের খাড়া শরীরের টল্‌টলে ভারটা দুই পায়ের পক্ষে বেশি হওয়াতেই তাহার

পদতলটা গোড়ালি ছাড়াইয়া সামনের দিকে খানিকটা বিস্তীর্ণ; সেইটুকুই ত্রিপদীর ওই শেষ দুটো অতিরিক্ত মাত্রা।

এইরূপ অনেকগুলি ছন্দ দেখা যায় যাহাতে খানিকটা করিয়া বড়ো মাত্রাকে একটি করিয়া ছোটো মাত্রা দিয়া বাধা দিবার কায়দা দেখা যায়। দশ মাত্রার ছন্দ তাহার দৃষ্টান্ত। ইহার ভাগ আট+দুই, অথবা চার+চার+দুই—

।　　।　　।
মোর পানে । চাহ মুখ । তুলি,
।　　।　　।
পরশিব ।　চরণের ।　ধূলি।

ছয় মাত্রার ছন্দেও এরূপ বড়ো-ছোটোর ভাগ চলে। সেই ভাগ ছয়+দুই অথবা তিন+তিন+দুই। যেমন—

আঁখিতে । মিলিল । আঁখি।
হাসিল । বদন । ঢাকি।
মরম- বারতা শরমে মরিল
কিছু না রহিল বাকি।

উক্ত ছন্দে তিনের দল বুক ফুলাইয়া জুড়ি মিলাইয়া চলিতেছিল, হঠাৎ মাঝে মাঝে একটা খাপছাড়া দুই আসিয়া তাহাদিগকে বাধা দিয়াছে। এইরূপে গতি ও বাধার মিলনে ছন্দের সংগীত একটু বিশেষ ভাবে বাজিয়া উঠিয়াছে। এই বাধাটি গতির অনুপাতে ছোটো হওয়া চাই। কারণ, বড়ো হইলে সে বাধা সত্য হয়, এবং গতিকে আবদ্ধ করে, সেটা ছন্দের পক্ষে দুর্ঘটনা। তাই উপরের দুইটি দৃষ্টান্তে দেখিয়াছি চারের দল ও তিনের দলকে দুই আসিয়া রোধ করিয়াছে, সেইজন্য ইহা বন্ধনের অবরোধ নহে, ইহা লীলার উপরোধ। দুইয়ের পরিবর্তে এক হইলেও ক্ষতি হয় না। যেমন—

।　　।　　।
প্রতিদিন হায় ।　এসে ফিরে যায় ।　কে।

অথবা—

।　　।　　।
মুখে তার ।　নাহি আর ।　রা।
।　　।　　।
লাজে লীন ।　কাঁপে ক্ষীণ ।　গা।

বাংলা ছন্দকে তিন প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। দুই বর্গের মাত্রা, তিন বর্গের

মাত্রা এবং অসমান মাত্রার ছন্দ।

দুই বর্গ মাত্রার ছন্দ, যেমন পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী। এই-সমস্ত ছন্দ বড়ো বড়ো বোঝা বহিতে পারে, কেননা দুই, চার, আট মাত্রাগুলি বেশ চৌকা। এইজন্য পৃথিবীতে পা-ওয়ালা জীবমাত্রেরই, হয় দুই, নয় চার, নয় আট পা। বাংলাসাহিত্যে ইহারাই মহাকাব্যের বাহন।

চাকার গুণ এই যে একবার ধাক্কা পাইলে সেই ঝোঁকে সে গড়াইয়া চলে, থামিতে চায় না। তিন মাত্রার ছন্দ সেই চাকার মতো। দুই সংখ্যাটা স্থিতিপ্রবণ, তিন সংখ্যাটা গতিপ্রবণ।

নবীন | কিশোরী | মেঘের | বিজুরি | চমকি | চলিয়া | গেল।

এখানে তিন মাত্রার শব্দগুলি একটা আর-একটার গায়ের উপর গড়াইয়া পড়িয়া ঠেলা দিয়া চলিয়াছে, থামানো দায়। অবশেষে একটি দুই মাত্রা আসিয়া তাহাকে ক্ষণকালের জন্য ঠেকাইয়াছে।

দুই মাত্রার সঙ্গে তিন মাত্রার মিলনে অসম মাত্রার ছন্দের উৎপত্তি। ৩+২, ৩+৪, ৫+৪ মাত্রার ছন্দ তাহার দৃষ্টান্ত।

৩+২, যথা—

কাঁপিলে পাতা, নড়িলে পাখি
চমকি উঠে চকিত আঁখি।

৩+৪—

তরল জলধর বরিষে ঝরঝর

৫+৪—

বচন বলে আধো-আধো,
চরণ চলে বাধো-বাধো,
নয়ন- তলে কাঁদো-কাঁদো চাহনি।

তিন মাত্রার ছন্দের ন্যায় অসম মাত্রার ছন্দও স্বভাবত চঞ্চল। মাত্রার অসমানতাই তাহাকে কেবল টলাইতে থাকে। প্রত্যেক পদ পরবর্তী পদের উপর ঠেস দিয়া আপনাকে সামলাইতে চেষ্টা করে। বস্তুত তিন মাত্রাও অসম মাত্রা, তাহার উপাদান দুই+এক।

কারণ, ছন্দের মূল মাত্রা দুই, তাহা এক নহে। নিয়মিত গতিমাত্রই দুই সংখ্যাকে অবলম্বন করিয়া। তাই স্তম্ভ, যাহা থামিয়া থাকে, তাহা এক হইতে পারে; কিন্তু

জন্তুর পা বল, পাখির পাখা বল, মাছের পাখনা বল, দুইয়ের যোগে তবে চলে। সেই দুইয়ের নিয়মিত গতির উপরে যদি একটা একের অতিরিক্ত ভার চাপানো যায় তবে সেই গতিতে একটা অনিয়মের বেগ পড়ে, সেই অনিয়মের ঠেলায় নিয়মিত গতির বেগ বাড়িয়া যায় এবং তাহার বৈচিত্র্য ঘটে। মানুষের শরীর তাহার দৃষ্টান্ত। চারপেয়ে মানুষ যখন সোজা হইয়া দাঁড়াইল তখন তাহার কোমর হইতে মাথা পর্যন্ত টলমলে এবং কোমর হইতে পদতল পর্যন্ত মজবুত হওয়াতে এই দুইভাগের মধ্যে অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। এই অসামঞ্জস্যকে ছন্দে সামলাইবার জন্য মানুষের গতিতে মাথা হাত কোমর পা বিচিত্র হিল্লোলে হিল্লোলিত হইতেছে। চার পায়ের ছন্দ ইহার চেয়ে অনেক সরল।

অতএব বাংলা ছন্দকে সম মাত্রা, অসম মাত্রা এবং বিষম মাত্রায় শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে। শুধু বাংলা কেন, কোনো ভাষার ছন্দের আর-কোনোপ্রকার ভাগ হইতে পারে বলিয়া মনে করিতে পারি না। তবে প্রভেদ হয় কিসে। মাত্রাগুলির চেহারায়।

সংস্কৃতভাষায় অসমান স্বর ও ব্যঞ্জনগুলিকে কৌশলে মিলাইয়া সমান মাত্রায় ভাগ করিতে হয়, তাহাতে ধ্বনির বৈচিত্র্য ও গাম্ভীর্য ঘটে। যথা—

। । । ।
বদসি যদি | কিঞ্চিদপি | দন্তরুচি | কৌমুদী
। । ।
হরতি দর | তিমিরমতি | ঘোরম্।

ইহা পাঁচ মাত্রা অর্থাৎ বিষম মাত্রার ছন্দ। বাঙালি জয়দেব তাঁহার গানে সংস্কৃতভাষার যুক্তবর্ণের বেণী যথাসম্ভব এলাইয়া দিতে ভালোবাসিতেন, এইজন্য উপরের উদ্ধৃত শ্লোকাংশটি যথেষ্ট ভালো দৃষ্টান্ত নহে; তবু ইহাতে আমার কথাটি বুঝা যাইবে। ইহার প্রত্যেক ঝোঁকে যে পাঁচ মাত্রা পড়িয়াছে তাহার ভাগ এইরূপ—

১+১+১+১+১ | ২+১+১+১ | ২+১+১+১ | ২+১+২
১+১+১+১+১ | ১+১+১+১+১ | ২+২+—

বাংলাভাষার সাধু ছন্দে একের মাঝে মাঝে দুই বসিবার জায়গা পায় না, এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। উপরের কবিতাটুকু বাংলায় তর্জমা করিতে হইলে নিম্নলিখিত-মত হইবে—

বচন যদি | কহ গো দুটি
দশনরুচি | উঠিবে ফুটি,
ঘুচাবে মোর | মনের ঘোর | তামসী।

একটি ইংরাজি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক—

Ah distinctly | I remember |
It was in the | bleak December. |

এটি চৌপদী ছন্দ। ইহার মাত্রাগুলিকে ছাড়াইয়া দেখা যাক—

১ ২ ৩ ৪
Ah dis tinct ly
১ ২ ৩ ৪
I re mem ber

ইহার এক-একটা ঝোঁকে চারিটি করিয়া মাত্রা, কিন্তু অসমান শব্দগুলিকে ভাগ করিয়া এই মাত্রাগুলি তৈরি হইয়াছে এবং distinct শব্দের tinct এবং remember শব্দের mem অংশটি নিজের একসেণ্টের সড়্‌কি আস্ফালন করিতেছে।

ইহাই সাধু বাংলায় হইবে—

আহা মোর মনে আসে
দারুণ শীতের মাসে।

ইংরেজ কবি ইচ্ছা করিলেও এমনতরো নখদন্তহীন মাত্রায় ছন্দ রচিতেই পারেন না, কারণ, তাঁহাদের শব্দগুলি কোণওয়ালা।

ইচ্ছা করিলে যুক্ত-অক্ষরের আমদানি করিয়া আমরা ওই শ্লোকটাকে শক্ত করিয়া তুলিতে পারি। যেমন—

স্পষ্ট স্মৃতি চিত্তে ভাসে
দুরন্ত অঘ্রান মাসে
অগ্নিকুণ্ড নিবে আসে
নাচে তারি উপচ্ছায়া।

এখানে বাংলার সঙ্গে ইংরাজির প্রধান প্রভেদ এই যে, বাংলা শব্দগুলিতে স্বরবর্ণের টান ইংরাজির চেয়ে বেশি। কিন্তু, আমার প্রথম পত্রেই লিখিয়াছি, সেটা কেবল সাধু ভাষায়; বাংলার চলতি ভাষায় ঠিক ইহার উলটা। চলতি ভাষার কথাগুলি শুচিভাবে পরস্পরের স্পর্শ বাঁচাইয়া চলে না, ইংরাজি শব্দেরই মতো চলিবার সময় কে কাহার গায়ে পড়ে তাহার ঠিক নাই।

পূর্বপত্রেই লিখিয়াছি, বাংলা চলতি ভাষার ধ্বনিটা হসন্তের সংঘাত-ধ্বনি, এইজন্য ধ্বনিহিসাবে সংস্কৃতের চেয়ে ইংরাজির সঙ্গে তাহার মিল বেশি। তাই এই চলতি ভাষার ছন্দে মাত্রাবিভাগ বিচিত্র। বাংলা-প্রাকৃতের একটা চৌপদী নীচে লিখিলাম।—

কই পালঙ্ক, কই রে কম্বল,
কপ্‌নি-টুক্‌রো রইল সম্বল,
এক্‌লা পাগ্‌লা ফির্‌বে জঙ্গল,
মিট্‌বে সংকট ঘুচ্‌বে ধন্দ।

ইহার সঙ্গে Ah distinctly I remember শ্লোকটি মিলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে, ধ্বনির বিশেষ কোনো তফাত নাই।

ইহার সাধু পাঠ এইরূপ—

শয্যা কই বস্ত্র কই,
কী আছে কৌপীন বৈ,
একা বনে ফিরে ওই
নাহি মনে ভয় চিন্তা।

সাধু ও অসাধুর মাত্রাভাগ নীচে নীচে লিখিলাম, মিলাইয়া দেখিবেন।

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
কই | পা | লঙ্‌ | ক ॥ কই | রে | কম্‌ | বল্‌ ॥
শ | য্যা | ক | ই ॥ বস্‌ | ত্র | ক | ই ॥

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
কপ্‌ | নি | টুক্‌ | রো ॥ রই | ল | সম | বল্‌ ॥
কী | আ | ছে | কৌ ॥ পী | ন | ব | ই ॥

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
এক্‌ | লা | পাগ্‌ | লা ॥ ফির্‌ | বে | জঙ্‌ | গল্‌ ॥
এ | কা | ব | নে ॥ ফি | রে | ও | ই ॥

সাধু ভাষার ছন্দটি যেন মোটা মোটা ফাঁকওয়ালা জালের মতো, আর অসাধুটির একেবারে ঠাসবুনানি।

ইংরাজিতে সম মাত্রার ছন্দ অনেক আছে, তাহার একটি দৃষ্টান্ত পূর্বেই দিয়াছি। অসম মাত্রা অর্থাৎ তিন মাত্রার দৃষ্টান্ত। যথা—

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
One | more | un ॥ for | tu | nate ॥

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
Wea | ry | of ॥ breath — — ॥

ইংরেজিতে বিষম মাত্রার একটি উদাহরণ দিতে পারিলেই আপাতত আমার পালা

শেষ হয়। একটি মনে পড়িতেছে।—

১ ২ ৩ ৪ ৫

When | we | two | par | ted |

১ ২ ৩ ৪ ৫

(In) si | lence | and | tears | — |

১ ২ ৩ ৪ ৫

Half | bro | ken | heart | ed |

১ ২ ৩ ৪ ৫

(To) se | ver | for | years | — |

এই শ্লোকটির দুই লাইনকে মিলাইয়া এক লাইন করিয়া পড়িলে ইহার ছন্দকে তিন মাত্রায় ভাগ করিয়া পড়া সহজ হয়। কিন্তু বিষম মাত্রার লয়ে ইহাকে পড়িলে চলে বলিয়াই এই দৃষ্টান্তটি প্রয়োগ করিয়াছি, বোধ করি এরূপ দৃষ্টান্ত ইংরেজি ছন্দে দুর্লভ।

দেখা গিয়াছে ইংরেজি ছন্দে ঝোঁক পদের আরম্ভেও পড়িতে পারে, পদের শেষেও পড়িতে পারে। আরম্ভে, যেমন—

O the dreary | dreary moorland

O the barren | barren shore

পদের শেষে, যেমন—

And are ye sure | the news is true

And are ye sure | he's well |

বাংলায় আরম্ভে ছাড়া পদের আর-কোথাও ঝোঁক পড়িতে পারে না।

| | | |

একলা পাগলা ফিরবে জঙ্গল

কিম্বা—

| |

একলা পাগলা ফিরবে জঙ্গল

এমনটি হইবার জো নাই।

আমার কথাটি ফুরালো। ইংরেজি ছন্দকে আমি বাংলা ছন্দের রীতি-অনুসারে ভাগ করিয়া দেখিয়াছি, সেটা ভালো হইল কি না জানি না। ইংরেজি ছন্দতত্ত্ব আমার একদম জানা নাই বলিয়াই বোধ করি এরূপ দুঃসাহস আমার পক্ষে সহজ হইয়াছে। কারণ, চাণক্য যাহাদিগকে কথা কহিতে বারণ করেন তাহারাই আগেভাগে কথা কহিয়া বসে; আপনারাও জানেন angelরা প্রবেশ করিতে ভয় পান এমন জায়গা আছে, কিন্তু foolদের কোথাও বাধা নাই। এরূপ সতর্কতায় সকল সময়েই যে এঞ্জেলরা জেতেন তাহা নহে, অনেক সময়েই ঠকিয়া থাকেন; অবুঝ হঠকারিতায় অপর পক্ষের কখনো কখনো জিত হইবার সম্ভাবনা আছে, এই আমার ভরসা। আপনার পক্ষে বোঝা সহজ হইতে পারে বলিয়াই আমি ইংরেজি দৃষ্টান্তগুলি ব্যবহার করিয়াছি, ইহাতে আমার বিদ্যা প্রকাশ না হইয়া বিদ্যা ফাঁস হইয়া যাইতে পারে।

১৮ আষাঢ় ১৩২১

শ্রীপ্রমথ চৌধুরীকে লিখিত

চলতি কথায় একটা লম্বা ছন্দের কবিতা লিখেছি। এটা কি পড়া যায় কিম্বা বোঝা যায় কিম্বা ছাপানো যেতে পারে। নাম-রূপের মধ্যে রূপটা আমি দিলুম, নাম দিতে হয় তুমি দিয়ো।...

যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে, এই জীবনের সকল সাদা-কালো
যাদের আলো-ছায়ার লীলা, বাইরে বেড়ায় মনের মানুষ যারা
তাদের প্রাণের ঝরনাস্রোতে আমার পরান হয়ে হাজার ধারা
চলছে বয়ে চতুর্দিকে। কালের যোগে নয় তো মোদের আয়ু—
নয় সে কেবল দিবস-রাতির সাতনলি হার, নয় সে নিশাসবায়ু।
নানান প্রাণের প্রেমের মিলে নিবিড় হয়ে আত্মীয়ে বান্ধবে
মোদের পরমায়ুর পাত্র গভীর ক'রে পূরণ করে সবে।
সবার বাঁচায় আমার বাঁচা আপন সীমা ছাড়ায় বহুদূরে,
নিমেষগুলির ফল পেকে যায় বিচিত্র আনন্দরসে পূরে;
অতীত হয়ে তবুও তারা বর্তমানের বৃন্তদোলায় দোলে—
গর্ভ হতে মুক্ত শিশু তবুও যেমন মায়ের বক্ষে কোলে
বন্দী থাকে নিবিড় প্রেমের বাঁধন দিয়ে। তাই তো যখন শেষে
একে একে আপন জনে সূর্য-আলোর অন্তরালের দেশে

আঁখির নাগাল এড়িয়ে পালায়, তখন রিক্ত শীর্ণ জীবন মম
শুষ্ক রেখায় মিলিয়ে আসে বর্ষাশেষের নির্ঝরিণীসম
শূন্য বালুর একটি প্রান্তে ক্লান্তবারি স্রস্ত অবহেলায়।
তাই যারা আজ রইল পাশে এই জীবনের অপরাহ্ণ-বেলায়
তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাকতে দিনের আলো—
বলে নে ভাই, "এই যা দেখা, এই যা ছোঁওয়া, এই ভালো, এই ভালো।
এই ভালো আজ এ-সংগমে কান্নাহাসির গঙ্গাযমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।
এই ভালো রে প্রাণের রঙ্গে এই আসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে
পুণ্য ধরার ধুলো মাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে।
এই ভালো রে ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান-গাওয়া এই ভাষায়,
তারার সাথে নিশীথ-রাতে ঘুমিয়ে-পড়া নূতন প্রাতের আশায়।"

এই জাতের সাধু ছন্দে আঠারো অক্ষরের আসন থাকে। কিন্তু, এটাতে কোনো কোনো লাইনে পঁচিশ পর্যন্ত উঠেছে। ফার্স্ট ক্লাসের এক বেঞ্চিতে ছ-জনের বেশি বসবার হুকুম নেই কিন্তু থার্ড ক্লাসে ঠেসাঠেসি ভিড়, এ সেইরকম। কিন্তু, যদি এটা ছাপাও তা হলে লাইন ভেঙো না, তা হলে ছন্দ পড়া কঠিন হবে।...

৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্তকে লিখিত

সংস্কৃত কাব্য-অনুবাদ সম্বন্ধে আমার মত এই যে, কাব্যধ্বনিময় গদ্যে ছাড়া বাংলা পদ্যচ্ছন্দে তার গাম্ভীর্য ও রস রক্ষা করা সহজ নয়। দুটি-চারটি শ্লোক কোনোমতে বানানো যেতে পারে, কিন্তু দীর্ঘ কাব্যের অনুবাদকে সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য করা দুঃসাধ্য। নিতান্ত সরল পয়ারে তার অর্থটিকে প্রাঞ্জল করা যেতে পারে। কিন্তু তাতে ধ্বনিসংগীত মারা যায়, অথচ সংস্কৃত কাব্যে এই ধ্বনিসংগীত অর্থসম্পদের চেয়ে বেশি বৈ কম নয়।

মন্দাক্রান্তা ছন্দের আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রবোধ বাঙালির কানের উল্লেখ করেছেন। বাঙালির কান বলে কোনো বিশেষ পদার্থ আছে বলে আমি মানি নে। মানুষের

স্বাভাবিক কানের দাবি অনুসরণ করলে দেখা যায়, মন্দাক্রান্তা ছন্দের চার পর্ব। যথা—

মেঘালোকে | ভবতি সুখিনো | প্যন্যথাবৃৎ | তি চেতঃ।

অর্থাৎ, মাত্রা-হিসাবে আট+সাত+সাত+চার। শেষের চারকে ঠিক চার বলা চলে না। কারণ, লাইনের শেষে এক মাত্রা আন্দাজের যতি বিরামের পক্ষে অনিবার্য। এই ছন্দকে বাংলায় আনতে গেলে এইরকম দাঁড়ায়—

দূরে ফেলে গেছ জানি,
স্মৃতির বীণাখানি,
বাজায় তব বাণী
মধুরতম।
অনুপমা, জেনো অয়ি,
বিরহ চিরজয়ী
করেছে মধুময়ী
বেদনা মম।

সংস্কৃতের অমিত্রাক্ষররীতি অনুবর্তন করা যেতে পারে। যথা—

অভাগা যক্ষ কবে করিল কাজে হেলা, কুবের তাই তারে দিলেন শাপ,
নির্বাসনে সে রহি প্রেয়সী-বিচ্ছেদে বর্ষ ভরি স'বে দারুণ জ্বালা।
গেল চলি রামগিরি-শিখর-আশ্রমে হারায়ে সহজাত মহিমা তার,
সেখানে পাদপরাজি স্নিগ্ধছায়াবৃত সীতার স্নানে পূত সলিলধারা॥

১৩ মার্চ ১৯৩১

শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখিত

গীতাঞ্জলির কয়েকটি গানের ছন্দ সম্বন্ধে কৈফিয়ত চেয়েছ। গোড়াতেই বলে রাখা দরকার গীতাঞ্জলিতে এমন অনেক কবিতা আছে যার ছন্দোরক্ষার বরাত দেওয়া হয়েছে গানের সুরের 'পরে। অতএব, যে পাঠকের ছন্দের কান আছে তিনি গানের খাতিরে এর মাত্রা কম-বেশি নিজেই দুরস্ত করে নিয়ে পড়তে পারেন, যাঁর নেই তাঁকে ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে।

১। 'নব নব রূপে এসো প্রাণে'—এই গানের অন্তিম পদগুলির কেবল অন্তিম দুটি অক্ষরের দীর্ঘহ্রস্ব স্বরের সম্মান স্বীকৃত হয়েছে। যথা 'প্রাণে' 'গানে' ইত্যাদি। একটিমাত্র পদে তার ব্যতিক্রম আছে। এসো দুঃখে সুখে, এসো মর্মে—এখানে 'সুখে'র এ-কারকে অবাঙালি রীতিতে দীর্ঘ করা হয়েছে। 'সৌখ্যে' কথাটা দিলে বলবার কিছু থাকত না। তবু সেটাতে রাজি হই নি, মানুষ চাপা দেওয়ার চেয়ে মোটর ভাঙা ভালো।

২। 'অমল ধবল পা-লে লেগেছে মন্দমধুর হাওয়া'—এ গানে গানই মুখ্য, কাব্য গৌণ। অতএব, তালকে সেলাম ঠুকে ছন্দকে পিছিয়ে থাকতে হল। যদি বল, পাঠকেরা তো শ্রোতা নয়, তারা মাপ করবে কেন। হয়তো করবে না—কবি জোড়হাত করে বলবে, 'তালদ্বারা ছন্দ রাখিলাম, ত্রুটি মার্জনা করিবেন।'

৩। চৌত্রিশ-নম্বরটাও গান। তবুও এর সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য হচ্ছে এই যে, যে ছন্দগুলি বাংলার প্রাকৃত ছন্দ, অক্ষর গণনা করে তাদের মাত্রা নয়। বাঙালি সেটা বরাবর নিজের কানের সাহায্যে উচ্চারণ করে এসেছে। যথা—

বৃষ্টি পড়ে- টাপুর টুপুর, নদেয় এল-বা- ন,
শিবু ঠাকুরের বিয়ে- হবে- তিন কন্যে দা- ন।

আক্ষরিক মাত্রা গুনতি করে একে যদি সংশোধন করতে চাও তা হলে নিখুঁত পাঠান্তরটা দাঁড়াবে এইরকম—

বৃষ্টি পড়ছে টাপুর টুপুর, নদেয় আসছে বন্যা,
শিবু ঠাকুরের বিবাহ হচ্ছে, দান হবে তিন কন্যা।

রামপ্রসাদের একটি গান আছে—

মা আমায় ঘুরাবি কত
যেন | চোখবাঁধা বলদের মতো।

এটাকে যদি সংশোধিত মাত্রায় কেতাদুরস্ত করে লিখতে চাও তা হলে তার নমুনা একটা দেওয়া যাক—

হে মাতা আমারে ঘুরাবি কতই
চক্ষুবদ্ধ বৃষের মতোই।

একটা কথা তোমাকে মনে রাখতে হবে, বাঙালি আবৃত্তিকার সাধুভাষা-প্রচলিত ছন্দেও নিজের উচ্চারণসম্মত মাত্রা রাখে নি বলে ছন্দের অনুরোধে হ্রস্বদীর্ঘের সহজ নিয়মের সঙ্গে রফানিষ্পত্তি করে চলেছে। যথা—

মহাভারতের কথা অমৃতসমান,
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্।

উচ্চারণ-অনুসারে 'মহাভারতের কথা' লিখতে হয় 'মহাভারতের্কথা', তেমনি 'কাশীরাম দাস কহে' লেখা উচিত 'কাশীরাম দাস্কহে'। কারণ, হসন্ত শব্দ পরবর্তী স্বর বা ব্যঞ্জন শব্দের সঙ্গে মিলে যায়, মাঝখানে কোনো স্বরবর্ণ তাদের ঠোকাঠুকি নিবারণ করে না। কিন্তু, বাঙালি বরাবর সহজেই 'মহাভারতে-র্কথা' পড়ে এসেছে, অর্থাৎ 'তে'র এ-কারকে দীর্ঘ করে আপসে মীমাংসা করে দিয়েছে। তার পরে 'পুণ্যবান্' কথাটার 'পুণ্যে'র মাত্রা কমিয়ে দিতে সংকোচ করে নি, অথচ 'বান্' কথাটার আক্ষরিক দুই মাত্রাকে টান এবং যতির সাহায্যে চার মাত্রা করেছে।

৪। 'নিভৃত প্রাণের দেবতা'— এই গানের ছন্দ তুমি কী নিয়মে পড় আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে। 'দেবতা' শব্দের পরে একটা দীর্ঘ যতি আছে, সেটা কি রাখ না। যদি সেই যতিকে মান্য করে থাক তা হলে দেখবে, 'দেবতা' এবং 'খোলো দ্বার' মাত্রায় অসমান হয় নি। এ-সব ধ্বনিগত তর্ক মোকাবিলায় মীমাংসা করাই সহজ। লিখিত বাক্যের দ্বারা এর শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব হবে কি না জানি নে। ছাপাখানা-শাসিত সাহিত্যে ছন্দোবিলাসী কবির এই এক মুশকিল— নিজের কণ্ঠ স্তব্ধ, পরের কণ্ঠের করুণার উপর নির্ভর। সেইজন্যেই আমাকে সম্প্রতি এমন কথা শুনতে হচ্ছে যে, আমি ছন্দ ভেঙে থাকি, তোমাদের স্তুতিবাক্যের কল্লোলে সেটা আমার কানে ওঠে না। তখন আকাশের দিকে চেয়ে বলি, 'চতুরানন, কোন্ কানওয়ালাদের 'পরে এর বিচারের ভার।'

৫। 'আজি গন্ধবিধুর সমীরণে'— কবিতাটি সহজ নিয়মেই পড়া উচিত। অবশ্য, এর পঠিত ছন্দে ও গীতছন্দে প্রভেদ আছে।

৬। 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানটায় যে মাত্রাধিক্যের কথা বলেছ সেটা অন্যায় বল নি। ওই বাহুল্যের জন্যে 'পঞ্জাব' শব্দের প্রথম সিলেব্‌লটাকে দ্বিতীয় পদের গেটের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখি—

পন্ | জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা ইত্যাদি।

'পঞ্জাব'কে 'পঞ্জব' করে নামটার আকার খর্ব করতে সাহস হয় নি, ওটা দীর্ঘকায়াদের দেশ। ছন্দের অতিরিক্ত অংশের জন্যে একটু তফাতে আসন পেতে দেওয়া রীতি বা গীতি-বিরুদ্ধ নয়।

এই গেল আমার কৈফিয়তের পালা।

তোমার ছন্দের তর্কে আমাকে সালিস মেনেছ। 'লীলানন্দে'র যে লাইনটা নিয়ে তুমি অভিযুক্ত আমার মতে তার ছন্দঃপতন হয় নি। ছন্দ রেখে পড়তে গেলে কয়েকটি কথাকে অস্থানে খণ্ডিত করতে হয় বলেই বোধ হয় সমালোচক ছন্দঃপাত কল্পনা করেছেন। ভাগ করে দেখাই—

নৃত্য | শুধু বি | লানো লা | বণ্য ছন্দ।

আসলে 'বিলানো' কথাটাকে দুভাগ করলে কানে খটকা লাগে।

নৃত্য শুধু লাবণ্যবিলানো ছন্দ

লিখলে কোনোরকম আপত্তি মনে আসে না, অর্থহিসাবেও স্পষ্টতর হয়। ওই কবিতায় যে লাইনে তোমার ছন্দের অপরাধ ঘটেছে সেটা এই—

সংগীতসুধা নন্দনে(র) সে আলিম্পনে।

ভাগ করে দেখো—

সংগী | ত সুধা | নন্দ | নের সে আ | লিম্পনে।

যদি লিখতে—

সংগীতসুধা নন্দনেরি আলিম্পনে

তা হলে ছন্দের ত্রুটি হত না।

যাক। তার পরে 'ঐকান্তিকা'। ওটা প্রাকৃত ছন্দে লেখা। সে ছন্দের স্থিতিস্থাপকতা যথেষ্ট। মাত্রার ওজনের একটু-আধটু নড়চড় হলে ক্ষতি হয় না। তবুও নেহাত ঢিলেমি করা চলে না। বাঁধামাত্রার নিয়মের চেয়ে কানের নিয়ম সূক্ষ্ম; বুঝিয়ে বলা বড়ো শক্ত, কেন ভালো লাগল বা লাগল না। 'ঐকান্তিকা'র ছন্দটা বন্ধুর হয়েছে সে কথা বলতেই হবে। অনেক জায়গায় দুরান্বয়ের জন্যে এবং ছন্দের বিভাগে বাক্য বিভক্ত হয়ে গেছে বলে অর্থ বুঝতে কষ্ট পেয়েছি। তন্ন তন্ন আলোচনা করতে হলে বিস্তর বাক্য ও কাল -ব্যয় করতে হয়। তাই আমার কান ও বুদ্ধি অনুসরণ করে তোমার কবিতাকে কিছু কিছু বদল করেছি। তুমি গ্রহণ করবে এ আশা করে নয়, আমার অভিমতটা অনুমান করতে পারবে এই আশা করেই।

১ কার্তিক ১৩৩৬

২

তুমি এমন করে সব প্রশ্ন ফাঁদ যে দু-চার কথায় সেরে দেওয়া অসম্ভব হয়, তোমার সম্বন্ধে আমার এই নালিশ।

১। 'আবার এরা ঘিরেছে মোর মন'— এই পঙ্‌ক্তির ছন্দোমাত্রার সঙ্গে 'দাহ

আবার বেড়ে ওঠে ক্রমে'র মাত্রার অসাম্য ঘটেছে এই তোমার মত। 'ক্রমে' শব্দটার 'ক্র'র উপর যদি যথোচিত ঝোঁক দাও তা হলে হিসাবের গোল থাকে না। 'বেড়ে ওঠেক্‌রমে'— বস্তুত সংস্কৃত ছন্দের নিয়মে 'ক্র' পরে থাকাতে 'ওঠে'র 'এ' স্বরবর্ণে মাত্রা বেড়ে ওঠা উচিত। তুমি বলতে পার, আমরা সাধারণত শব্দের প্রথম বর্ণস্থিত র-ফলাকে দুই মাত্রা দিতে কৃপণতা করি। 'আক্রমণ' শব্দের 'ক্র'কে তার প্রাপ্য মাত্রা দিই, কিন্তু 'ওঠে ক্রমে'র 'ক্র' হ্রস্বমাত্রায় খর্ব করে থাকি। আমি সুযোগ বুঝে বিকল্পে দুইরকম নিয়মই চালাই।

২। ভক্ত | সেথায় | খোলো দ্বা | ০০র্‌ | এইরকম ভাগে কোনো দোষ নেই। কিন্তু, তুমি যে ভাগ করেছিলে | র০০ | এটা চলে না; যেহেতু 'র' হসন্ত বর্ণ, ওর পরে স্বরবর্ণ নেই, অতএব টানব কাকে।

৩। 'জনগণ' গান যখন লিখেছিলেম তখন 'মারাঠা' বানান করি নি। মরাঠিরাও প্রথমবর্ণে আকার দেয় না। আমার ছিল 'মরাঠা'। তার পরে যাঁরা শোধন করেছেন তাঁরাই নিরাকারকে সাকার করে তুলেছেন, আমার চোখে পড়ে নি।

৪। 'জাগিয়ে' ও 'রটিয়ে' শব্দের 'গিয়ে' ও 'টিয়ে' প্রাকৃত-বাংলার মতে এক মাত্রাই। আমি যদি পরিবর্তন করে থাকি সেটাকে স্বীকার করবার প্রয়োজন নেই।

১০ নভেম্বর ১৯২৯

৩

তুমি যে 'ম্লান' শব্দটিকে হসন্তভাবে উচ্চারণ কর এ আমার কাছে নতুন লাগল। আমি কখনোই 'ম্লান্‌' বলি নে। প্রাকৃত-বাংলায় যে-সব শব্দ অতিপ্রচলিত তাদেরই উচ্চারণে এইরকম স্বরলুপ্তি সহ্য করা চলে। 'ম্লান' শব্দটা সে-জাতের নয় এবং ওটা অতি সুন্দর শব্দ, ওকে বিনা দোষে জরিমানা করে ওর স্বরহরণ কোরো না, তোমার কাছে এই আমার দরবার।

যতি বলতে বোঝায় বিরাম। ছন্দ জিনিসটাই হচ্ছে আবৃত্তিকে বিরামের বিশেষ বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা।

ললিত ল | বঙ্গ ল | তা পরি | শীলন।

প্রত্যেক চার মাত্রার পরে বিরাম।

বদসি যদি | কিঞ্চিদপি।

পাঁচ-পাঁচ মাত্রার শেষে বিরাম। তুমি যদি লেখ 'বদসি যদ্যপি' তা হলে এই ছন্দে যতির যে পঞ্চায়তি বিধান আছে তা রক্ষা হবে না। এখানে যতিভঙ্গ ছন্দোভঙ্গ একই কথা।

প্রত্যেক পদক্ষেপের সমষ্টি নিয়ে নৃত্য, কিন্তু একটিমাত্র পদপাতে যদি চ্যুতি ঘটে তা হলে সে ত্রুটি পদবিক্ষেপের ত্রুটি, সুতরাং সমস্ত নৃত্যেরই ত্রুটি।

৯ শ্রাবণ ১৩৩৮

৪

'তোমারই' কথাটাকে সাধু ভাষার ছন্দেও আমরা 'তোমারি' বলে গণ্য করি। এমন একদিন ছিল যখন করা হত না। আমিই প্রথমে এটা চালাই। 'একটি' শব্দকে সাধু ভাষায় তিন মাত্রার মর্যাদা যদি দেও তবে ওর হসন্ত হরণ করে অত্যাচারের দ্বারা সেটা সম্ভব হয়। যদি হসন্ত রাখ তবে দ্বৈমাত্রিক বলে ওকে ধরতেই হবে। যদি মাছের উপর কবিতা লেখার প্রয়োজন হয় তবে 'কাৎলা' মাছকে কা-ত-লা উচ্চারণের জোরে সাধুত্বে উত্তীর্ণ করা আর্যসমাজি শুদ্ধিতেও বাধবে। তুমি কি লিখতে চাও—

পাতলা করিয়া কাটো কাতলা মাছেরে,
উৎসুক নাতনী যে চাহিয়া আছে রে।

আর আমি যদি লিখি—

পাৎলা করি কাটো প্রিয়ে কাৎলা মাছটিরে
টাট্‌কা করি দাও ঢেলে সর্ষে আর জিরে,
ভেট্‌কি যদি জোটে তাহে মাখো লঙ্কাবাঁটা,
যত্ন করে বেছে ফেলো টুক্‌রো যত কাঁটা।

আপত্তি করবে কি। 'উষ্ট্র' যদি দুই মাত্রায় পদক্ষেপ করতে পারে তবে 'একটি' কী দোষ করেছে।

'জনগণমন-অধিনায়ক' সংস্কৃত ছন্দে বাংলায় আমদানি।

৭ ভাদ্র ১৩৩৮

ছন্দ সম্বন্ধে তুমি অতিমাত্র সচেতন হয়ে উঠেছ। শুধু তাই নয়, কোনোমতে নতুন ছন্দ তৈরি করাকে তুমি বিশেষ সার্থকতা বলে কল্পনা কর। আশা করি, এই অবস্থা একদিন তুমি কাটিয়ে উঠবে এবং ছন্দ সম্বন্ধে একেবারেই সহজ হবে তোমার মন। আজ তুমি ভাগবিভাগ করে ছন্দ যাচাই করছ, প্রাণের পরীক্ষা চলছে দেহ-ব্যবচ্ছেদ করে। যারা ছান্দসিক তাদের উপর এই কাটাছেঁড়ার ভার দাও, তুমি যদি

ছন্দরসিক হও তবে ছুরিকাঁচি ফেলে দিয়ে কানের পথ খোলসা রাখো যেখান দিয়ে বাঁশি মরমে প্রবেশ করে। গীতার একটা শ্লোকের আরম্ভ এই—

অপরং ভবতো জন্ম,

ঠিক তার পরবর্তী শ্লোক—

বহূনি মে ব্যতীতানি।

দ্বিতীয়টির সমান ওজনে প্রথমটি যদি লিখতে হয় তা হলে লেখা উচিত 'অপারং ভাবতো জন্ম'। কিন্তু, যাঁরা এই ছন্দ বানিয়েছিলেন তাঁরা ছান্দসিকের হাটে গিয়ে নিক্তি নিয়ে বসেন নি। আমি যখন 'পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা' লিখেছিলুম তখন জানতুম, কোনো কবির কানে খটকা লাগবে না, ছান্দসিকের কথা মনে ছিল না।

১৩ মাঘ ১৩৩৯

৬

ছন্দ নিয়ে যে কথাটা তুলেছ সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্যটা বলি। বাংলার উচ্চারণে হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণভেদ নেই, সেইজন্যে বাংলাছন্দে সেটা চালাতে গেলে কৃত্রিমতা আসেই।

। ।   । ।   । ।
হেসে হেসে হল যে অস্থির,
। । ।   ।   ।
মেয়েটা বুঝি ব্রাহ্মণবস্তির।

এটা জবরদস্তি। কিন্তু—

হেসে কুটিকুটি এ কী দশা এর,
এ মেয়েটি বুঝি রায়মশায়ের।

এর মধ্যে কোনো অত্যাচার নেই। রায়মশায়ের চঞ্চল মেয়েটির কাহিনী যদি বলে যাই লোকের মিষ্টি লাগবে, কিন্তু দীর্ঘে হ্রস্বে পা ফেলে চলেন যিনি তাঁর সঙ্গে বেশিক্ষণ আলাপ চলে না। যেটা একেবারে প্রকৃতিবিরুদ্ধ তার নৈপুণ্যে কিছুক্ষণ বাহবা দেওয়া চলে, তার সঙ্গে ঘরকরা চলে না।

'জনগণমনঅধিনায়ক'— ওটা যে গান। দ্বিতীয়ত, সকল প্রদেশের কাছে যথাসম্ভব সুগম করবার জন্যে যথাসাধ্য সংস্কৃত শব্দ লাগিয়ে ওটাকে আমাদের পাড়া থেকে জয়দেবীয় পল্লীতে চালান করে দেওয়া হয়েছে। বাংলা শব্দে একসেণ্ট দিয়ে বা

ইংরেজি শব্দে না দিয়ে কিম্বা সংস্কৃত কাব্যে দীর্ঘহ্রস্বকে বাংলার মতো সমভূম করে যদি রচনা করা যায় তবে কেবলমাত্র ছন্দকৌশলের খাতিরে সাহিত্যসমাজে তার নতুন মেলবন্ধন করা চলবে না। বিশেষত, চিহ্ন উঁচিয়ে চোখে খোঁচা দিয়ে পড়াতে চেষ্টা করলে পাঠকদের প্রতি অসৌজন্য করা হয়।

| | |

Autumn flaunteth in his bushy bowers

এতে একটা ছন্দের সূচনা থাকতে পারে, কিন্তু সেইটেই কি যথেষ্ট। অথবা—

| | | |

সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি বীরবাহু।

এক্‌সেন্ট-এর তাড়ায় ধাক্কা মেরে চালালে এইরকম লাইনের আলস্য ভেঙে দেওয়া যায় যদি মানি, তবু আর কিছু মানবার নেই কি।

৬ জুলাই ১৯৩৬

দীর্ঘহ্রস্ব ছন্দ সম্বন্ধে আর-একবার বলি। ও এক বিশেষ ধরনের লেখায় বিশেষ ভাষারীতিতেই চলতে পারে। আকবর বাদশার যোধপুরী মহিষীর জন্যে তিনি মহল বানিয়েছিলেন স্বতন্ত্র, সমগ্র প্রাসাদের মধ্যে সে আপন জাত বাঁচিয়ে নির্লিপ্ত ছিল। বাংলার উচ্চারণরীতিকে মেনে চলে যে ছন্দ তার চলাফেরা সাহিত্যের সর্বত্র, কোনো গণ্ডির মধ্যে নয়। তা পণ্ডিত-অপণ্ডিত সকল পাঠকের পক্ষেই সুগম। তুমি বলতে পার, সকল কবিতাই সকলের পক্ষে সুগম হবেই এমনতরো কবুলতিনামায় লেখককে সই দিতে বাধ্য করতে পারি নে। সে তর্ক খাটে ভাবের দিক থেকে, চিন্তার দিক থেকে, কিন্তু ভাষার সর্বজনীন উচ্চারণরীতির দিক থেকে নয়। তুমি বেলের শরবতই করো, দইয়ের শরবতই করো, মূল উপাদান জলটা সাধারণ জল— ভাষার উচ্চারণটাও সেইরকম। My heart aches— কোনো ধ্বনিসৌষ্ঠবের খাতিরেই বা বাঙালির অভ্যাসের অনুরোধে heartএর আ এবং achesএর এ-কে হ্রস্ব করা চলবে না। এই কারণে বাংলায় বিশুদ্ধ সংস্কৃত ছন্দ চালাতে গেলে দীর্ঘ স্বরধ্বনির জায়গায় যুক্তবর্ণের ধ্বনি দিতে হয়। সেটার জন্যে বাংলাভাষা ও পাঠককে সর্বদা ঠেলা মারতে হয় না। অথবা দীর্ঘস্বরকে দুই মাত্রার মূল্য দিলেও চলে। যদি লিখতে—

হে অমল চন্দনগন্ধিত, তনু রঞ্জিত
হিমানীতে সিঞ্চিত স্বর্ণ

তা হলে চতুষ্পাঠীর বহির্বর্তী পাঠকের দুশ্চিন্তা ঘটাত না।

৮ জুলাই ১৯৩৬

বাংলায় প্রাক্‌হসন্ত স্বর দীর্ঘায়ত হয় এ কথা বলেছি। জল এবং জলা, এই দুটো শব্দের মাত্রাসংখ্যা সমান নয়। এইজন্যেই 'টুমুস্ টুমুস্ বাদ্যি বাজে' পদটাকে ত্রৈমাত্রিক বলেছি। টু-মু দুই সিলেব্‌ল্, পরবর্তী হসন্ত স্-ও এক সিলেব্‌ল্‌এর মাত্রা নিয়েছে পূর্ববর্তী উ স্বরকে সহজেই দীর্ঘ ক'রে। 'টুমু টুমু বাজা বাজে' এবং 'টুমুস্ টুমুস্ বাদ্যি বাজে' এক ছন্দ নয়। 'রণিয়া রণিয়া বাজিছে বাজনা' এবং 'টুমুস্ টুমুস্ বাদ্যি বাজে', এক ওজনের ছন্দ। দুটোই ত্রৈমাত্রিক। আমি প্রচলিত ছড়ার দৃষ্টান্তও দেখিয়েছি।

২৫ জুলাই ১৯৩৬

শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

যখন কবিতাগুলি পড়বে তখন পূর্বাভ্যাসমত মনে কোরো না ওগুলো পদ্য। অনেকে সেই চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে রুষ্ট হয়ে ওঠে। গদ্যের প্রতি গদ্যের সম্মানরক্ষা করে চলা উচিত। পুরুষকে সুন্দরী রমণীর মতো ব্যবহার করলে তার মর্যাদাহানি হয়। পুরুষেরও সৌন্দর্য আছে, সে মেয়ের সৌন্দর্য নয়— এই সহজ কথাটা বলবার প্রয়াস পেয়েছি পরবর্তী পাতাগুলিতে।

২৬ আশ্বিন ১৩৩৯

২

'পুনশ্চ'র কবিতাগুলোকে কোন্ সংজ্ঞা দেবে। পদ্য নয়, কারণ পদ নেই। গদ্য বললে, অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। পক্ষিরাজ ঘোড়াকে পাখি বলবে না ঘোড়া বলবে? গদ্যের পাখা উঠেছে এ কথা যদি বলি, তবে শত্রুপক্ষ বলে বলবে, 'পিপিড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে।' জলে স্থলে যে সাহিত্য বিভক্ত, সেই সাহিত্যে এ জিনিসটা জল নয়, তাই বলে মাটিও নয়। তা হলে খনিজ বলতে দোষ আছে কি। সোনা বলতে

পারি এমন অহংকার যদি বা মনে থাকে মুখে বলবার সাহস নেই। না হয় তাঁবাই হল। অর্থাৎ, এমন কোনো ধাতু যাতে মূর্তি-গড়ার কাজ চলে। গদাধরের মূর্তিও হতে পারে, তিলোত্তমারও হয়। অর্থাৎ, রূপরসাত্মক গদ্য, অর্থভারবহ গদ্য নয়। তৈজস গদ্য।

সংজ্ঞা পরে হবে, আপাতত প্রশ্ন এই— ওতে চেহারা গড়ে উঠেছে কি না। যদি উঠে থাকে তা হলেই হল।

৭ কার্তিক ১৩৩৯

৩

গানের আলাপের সঙ্গে 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের গদ্যিকারীতির যে তুলনা করেছ সেটা মন্দ হয় নি। কেননা আলাপের মধ্যে তালটা বাঁধনছাড়া হয়েও আত্মবিস্মৃত হয় না। অর্থাৎ, বাইরে থাকে না মৃদঙ্গের বোল, কিন্তু নিজের অঙ্গের মধ্যেই থাকে চলবার একটা ওজন।

কিন্তু সংগীতের সঙ্গে কাব্যের একটা জায়গায় মিল নেই। সংগীতের সমস্তটাই অনির্বচনীয়। কাব্যে বচনীয়তা আছে সে কথা বলা বাহুল্য। অনির্বচনীয়তা সেইটেকেই বেষ্টন করে হিল্লোলিত হতে থাকে, পৃথিবীর চার দিকে বায়ুমণ্ডলের মতো। এপর্যন্ত বচনের সঙ্গে অনির্বচনের, বিষয়ের সঙ্গে রসের গাঁঠ বেঁধে দিয়েছে ছন্দ। পরস্পরকে বলিয়ে নিয়েছে, যদেতদ্‌ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব। বাক্‌ এবং অবাক্‌ বাঁধা পড়েছে ছন্দের মাল্যবন্ধনে। এই বাক্‌ এবং অবাক্‌ -এর একান্ত মিলনেই কাব্য। বিবাহিত জীবনে যেমন কাব্যেও তেমনি, মাঝে মাঝে বিরোধ বাধে, উভয়ের মাঝখানে ফাঁক পড়ে যায়, ছন্দও তখন জোড় মেলাতে পারে না। সেটাকেই বলি আক্ষেপের বিষয়। বাসরঘরে এক শয্যায় দুই পক্ষ দুই দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকার মতোই সেটা শোচনীয়। তার চেয়ে আরো শোচনীয়, যখন 'এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান'। যথাপরিমিত খাদ্যবস্তুর প্রয়োজন আছে, এ কথা অজীর্ণ রোগীকেও স্বীকার করতে হয়। কোনো কোনো কাব্যে বাগ্‌দেবী স্থূলখাদ্যাভাবে ছায়ার মতো হয়ে পড়েন। সেটাকে আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ বলে উল্লাস না করে আধিভৌতিকতার অভাব বলে বিমর্ষ হওয়াই উচিত।

'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে আধিভৌতিককে সমাদর করে ভোজে বসানো হয়েছে। যেন জামাইষষ্ঠী। এ মানুষটা পুরুষ। একে সোনার ঘড়ির চেন পরালেও অলংকৃত করা হয় না। তা হোক, পাশেই আছেন কাঁকনপরা অর্ধাবগুণ্ঠিতা মাধুরী, তিনি তাঁর

শিল্পসমৃদ্ধ ব্যঞ্জনিকার আন্দোলনে এই ভোজের মধ্যে অমরাবতীর মৃদুমন্দ হাওয়ার আভাস এনে দিচ্ছেন। নিজের রচনা নিয়ে অহংকার করছি মনে করে আমাকে হঠাৎ সদুপদেশ দিতে বোসো না। আমি যে কীর্তিটা করেছি তার মূল্য নিয়ে কথা হচ্ছে না, তার যেটি আদর্শ, এই চিঠিতে তারই আলোচনা চলছে। বক্ষ্যমাণ কাব্যে গদ্যটি মাংসপেশল পুরুষ বলেই কিছু প্রাধান্য যদি নিয়ে থাকে তবু তার কলাবতী বধূ দরজার আধখোলা অবকাশ দিয়ে উঁকি মারছে, তার সেই ছায়াবৃত কটাক্ষ-সহযোগে সমস্ত দৃশ্যটি রসিকদের উপভোগ্য হবে বলেই ভরসা করেছিলুম। এর মধ্যে ছন্দ নেই বললে অত্যুক্তি হবে, ছন্দ আছে বললেও সেটাকে বলব স্পর্ধা। তবে কী বললে ঠিক হবে ব্যাখ্যা করি। ব্যাখ্যা করব কাব্যরস দিয়েই।

বিবাহসভায় চন্দনচর্চিত বর-কনে টোপর মাথায় আল্‌পনা-আঁকা পিঁড়ির উপর বসেছে। পুরুত পড়ে চলেছে মন্ত্র, ও দিকে আকাশ থেকে আসছে সাহানা-রাগিণীতে সানাইয়ের সংগীত। এমন অবস্থায় উভয়ের যে বিবাহ চলেছে সেটা নিঃসন্দিগ্ধ, সুস্পষ্ট। নিশ্চিত-ছন্দ-ওয়ালা কাব্যে সেই সানাই বাজনা সেই মন্ত্রপড়া লেগেই আছে। তার সঙ্গে আছে লাল চেলি, বেনারসির জোড়, ফুলের মালা, ঝাড়লণ্ঠনের রোশনাই। সাধারণত যাকে কাব্য বলি সেটা হচ্ছে বচন-অনির্বচনের সম্মিলনের পরিভূষিত উৎসব। অনুষ্ঠানে যা যা দরকার সযত্নে তা সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু, তার পরে? অনুষ্ঠান তো বারোমাস চলবে না। তাই বলেই তো নীরবিত সাহানা-সংগীতের সঙ্গে সঙ্গেই বরবধূর মহাশূন্যে অন্তর্ধান কেউ প্রত্যাশা করে না। বিবাহ-অনুষ্ঠানটা সমাপ্ত হল, কিন্তু বিবাহটা তো রইল, যদি না কোনো মানসিক বা সামাজিক উপনিপাত ঘটে। এখন থেকে সাহানা-রাগিণীটা অশ্রুত বাজবে, এমন-কি, মাঝে মাঝে তার সঙ্গে বেসুরো নিখাদে অত্যন্তশ্রুত কড়া সুরও না-মেশা অস্বাভাবিক, সুতরাং একেবারে না-মেশা প্রার্থনীয় নয়। চেলি-বেনারসিটা তোলা রইল, আবার কোনো অনুষ্ঠানের দিনে কাজে লাগবে। সপ্তপদীর বা চতুর্দশপদীর পদক্ষেপটা প্রতিদিন মানায় না। তাই বলেই প্রাত্যহিক পদক্ষেপটা অস্থানে পড়ে বিপদজনক হবেই এমন আশঙ্কা করি নে। এমন কি বাম দিক থেকে রুনুঝুনু মলের আওয়াজ গোলমালের মধ্যেও কানে আসে। তবু মোটের উপর বেশভূষাটা হল আটপৌরে। অনুষ্ঠানের বাঁধারীতি থেকে ছাড়া পেয়ে একটা সুবিধে হল এই যে, উভয়ের মিলনের মধ্যে দিয়ে সংসারযাত্রার বৈচিত্র্য সহজ রূপ নিয়ে স্থূল সূক্ষ্ম নানা ভাবে দেখা দিতে লাগল। যুগলমিলন নেই অথচ সংসারযাত্রা আছে এমনও ঘটে। কিন্তু, সেটা লক্ষ্মীছাড়া। যেন খবুরে-কাগজি সাহিত্য। কিন্তু, যে সংসারটা প্রতিদিনের, অথচ সেই প্রতিদিনকেই লক্ষ্মীশ্রী চিরদিনের করে তুলছে, যাকে

চিরন্তনের পরিচয় দেবার জন্যে বিশেষ বৈঠকখানায় অলংকৃত আয়োজন করতে হয় না তাকে কাব্যশ্রেণীতেই গণ্য করি। অথচ চেহারায় সে গদ্যের মতো হতেও পারে। তার মধ্যে বেসুর আছে, প্রতিবাদ আছে, নানাপ্রকার বিমিশ্রতা আছে, সেইজন্যেই চারিত্রশক্তি আছে। যেমন কর্ণের চারিত্রশক্তি যুধিষ্ঠিরের চেয়ে অনেক বড়ো। অথচ, একরকম শিশুমতি আছে যারা ধর্মরাজের কাহিনী শুনে অশ্রুবিগলিত হয়। রামচন্দ্র নামটার উল্লেখ করলুম না সে কেবল লোকভয়ে, কিন্তু আমার দৃঢ়বিশ্বাস, আদিকবি বাল্মীকি রামচন্দ্রকে ভূমিকাপত্তনস্বরূপে খাড়া করেছিলেন তার অসবর্ণতায় লক্ষ্মণের চরিত্রকে উজ্জ্বল করে আঁকবার জন্যেই, এমন-কি, হনুমানের চরিত্রকেও বাদ দেওয়া চলবে না। কিন্তু, সেই একঘেয়ে ভূমিকাটা অত্যন্ত বেশি রঙফলানো চওড়া বলেই লোকে ওইটের দিকে তাকিয়ে হায়-হায় করে। ভবভূতি তা করেন নি। তিনি রামচন্দ্রের চরিত্রকে অশ্রদ্ধেয় করবার জন্যেই কবিজনোচিত কৌশলে 'উত্তররামচরিত' রচনা করেছিলেন। তিনি সীতাকে দাঁড় করিয়েছেন রামভদ্রের প্রতি প্রবল গঞ্জনারূপে।

ওই দেখো, কী কথা বলতে কী কথা এসে পড়ল। আমার বক্তব্য ছিল এই— কাব্যকে বেড়াভাঙা গদ্যের ক্ষেত্রে স্ত্রীস্বাধীনতা দেওয়া যায় যদি, তা হলে সাহিত্যসংসারের আলংকারিক অংশটা হালকা হয়ে তার বৈচিত্র্যের দিক তার চরিত্রের দিক অনেকটা খোলা জায়গা পায়। কাব্য জোরে পা ফেলে চলতে পারে। সেটা সযত্নে নেচে চলার চেয়ে সব সময়ে যে নিন্দনীয় তা নয়। নাচের আসরের বাইরে আছে এই উঁচুনিচু বিচিত্র বৃহৎ জগৎ, রূঢ় অথচ মনোহর, সেখানে জোরে চলাটাই মানায় ভালো, কখনো ঘাসের উপর, কখনো কাঁকরের উপর দিয়ে।

রোসো। নাচের কথাটা যখন উঠল, ওটাকে সেরে নেওয়া যাক। নাচের জন্য বিশেষ সময়, বিশেষ কায়দা চাই। চারি দিক বেষ্টন করে আলোটা মালাটা দিয়ে তার চালচিত্র খাড়া না করলে মানানসই হয় না। কিন্তু, এমন মেয়ে দেখা যায় যার সহজ চলনের মধ্যেই বিনা ছন্দের ছন্দ আছে। কবিরা সেই অনায়াসের চলন দেখেই নানা উপমা খুঁজে বেড়ায়। সে মেয়ের চলনটাই কাব্য, তাতে নাচের তাল নাই-বা লাগল; তার সঙ্গে মৃদঙ্গের বোল দিতে গেলে বিপত্তি ঘটবে। তখন মৃদঙ্গকে দোষ দেব না তার চলনকে? সেই চলন নদীর ঘাট থেকে আরম্ভ করে রান্নাঘর বাসরঘর পর্যন্ত। তার জন্যে মালমসলা বাছাই করে বিশেষ ঠাট বানাতে হয় না। গদ্যকাব্যেরও এই দশা। সে নাচে না, সে চলে। সে সহজে চলে বলেই তার গতি সর্বত্র। সেই গতিভঙ্গি আবাধা। ভিড়ের ছোঁওয়া বাঁচিয়ে পোশাকি-শাড়ির-প্রান্ত-তুলে-ধরা

আধাঘোমটা-টানা সাবধান চাল তার নয়।

এই গেল আমার 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের কৈফিয়ত। আরো-একটা পুনশ্চ-নাচের আসরে নাট্যাচার্য হয়ে বসব না, এমন পণ করি নি। কেবলমাত্র কাব্যের অধিকারকে বাড়াব মনে করেই একটা দিকের বেড়ায় গেট বসিয়েছি। এবারকার মতো আমার কাজ ওই পর্যন্ত। সময় তো বেশি নেই। এর পরে আবার কোন্ খেয়াল আসবে বলতে পারি নে। যাঁরা দৈবদুর্যোগে মনে করবেন, গদ্যে কাব্যরচনা সহজ, তাঁরা এই খোলা দরজাটার কাছে ভিড় করবেন সন্দেহ নেই। তা নিয়ে ফৌজদারি বাধলে আমাকে স্বদলের লোক বলে স্বপক্ষে সাক্ষী মেনে বসবেন। সেই দুর্দিনের পূর্বেই নিরুদ্দেশ হওয়া ভালো। এর পরে মৎরচিত আরো একখানা কাব্যগ্রন্থ বেরবে, তার নাম 'বিচিত্রিতা'। সেটা দেখে ভদ্রলোকে এই মনে করে আশ্বস্ত হবে যে, আমি পুনশ্চ প্রকৃতিস্থ হয়েছি।…

দেওয়ালি ১৩৩৯

৪

সম্প্রতি কতকগুলো গদ্যকবিতা জড়ো করে 'শেষসপ্তক' নাম দিয়ে একখানি বই বের করেছি। সমালোচকরা ভেবে পাচ্ছেন না ঠিক কী বলবেন। একটা কিছু সংজ্ঞা দিতে হবে, তাই বলছেন আত্মজৈবনিক। অসম্ভব নয়, কিন্তু তাতে বলা হল না, এগুলো কবিতা কিম্বা কবিতা নয় কিম্বা কোন্ দরের কবিতা। এদের সম্বন্ধে মুখ্য কথা যদি এই হয় যে, এতে কবির আত্মজীবনের পরিচয় আছে, তা হলে পাঠক অসহিষ্ণু হয়ে বলতে পারে, আমার তাতে কী। মদের গেলাসে যদি রঙকরা জল রাখা যায় তা হলে মদের হিসাবেই ওর বিচার আপনি উঠে পড়ে। কিন্তু, পাথরের বাটিতে রঙিন পানীয় দেখলে মনের মধ্যে গোড়াতেই তর্ক ওঠে, ওটা শরবত না ওষুধ। এরকম দ্বিধার মধ্যে পড়ে সমালোচক এই কথাটার 'পরেই জোর দেন যে, বাটিটা জয়পুরের কি মুঙ্গেরের। হায় রে, রসের যাচাই করতে যেখানে পিপাসু এসেছিল সেখানে মিলল পাথরের বিচার। আমি কাব্যের পসারি, আমি শুধোই— লেখাগুলোর ভিতরে ভিতরে কি স্বাদ নেই, ভঙ্গি নেই, থেকে থেকে কটাক্ষ নেই, সদর দরজার চেয়ে এর খিড়কির দুয়ারের দিকেই কি ইশারা নেই, গদ্যের বকুনির মুখে রাস টেনে ধরে তার মধ্যে কি কোথাও দুল্‌কির চাল আনা হয় নি, চিন্তাগর্ভ কথার মুখে কোনোখানে অচিন্ত্যের ইঙ্গিত কি লাগল না, এর মধ্যে ছন্দোরাজকতার নিয়ন্ত্রিত শাসন না থাকলেও আত্মরাজকতার অনিয়ন্ত্রিত সংযম নেই কি। সেই সংযমের গুণে থেমে-যাওয়া কিম্বা

হঠাৎ-বেঁকে-যাওয়া কথার মধ্যে কোথাও কি নীরবের সরবতা পাওয়া যাচ্ছে না। এই-সকল প্রশ্নের উত্তরই হচ্ছে এর সমালোচনা। কালিদাস 'রঘুবংশে'র গোড়াতেই বলেছেন, বাক্য এবং অর্থ একত্র সম্পৃক্ত থাকে ; এমন স্থলে বাক্য এবং অর্থাতীতকে একত্র সম্পৃক্ত করার দুঃসাধ্য কাজ হচ্ছে কবির, সেটা গদ্যেই হোক আর পদ্যেই হোক তাতে কী এল গেল।

৩ জুন ১৯৩৫

৫

অন্তরে যে ভাবটা অনির্বচনীয় তাকে প্রেয়সী নারী প্রকাশ করবে গানে নাচে, এটাকে লিরিক বলে স্বীকার করা হয়। এর ভঙ্গিগুলিকে ছন্দের বন্ধনে বেঁধে দেওয়া হয়েছে ; তারা সেই ছন্দের শাসনে পরস্পরকে যথাযথভাবে মেনে চলে বলেই তাদের সুনিয়ন্ত্রিত সম্মিলিত গতিতে একটি শক্তির উদ্ভব হয়, সে আমাদের মনকে প্রবল বেগে আঘাত দিয়ে থাকে। এর জন্যে বিশেষ প্রসাধন, আয়োজন, বিশেষ রঙ্গমঞ্চের আবশ্যক ঘটে। সে আপনার একটি স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করে, একটি দূরত্ব।

কিন্তু, একবার সরিয়ে দাও ওই রঙ্গমঞ্চ, জরির-আঁচলা-দেওয়া বেনারসি শাড়ি তোলা থাক পেটিকায়, নাচের বন্ধনে তনুদেহের গতিকে মধুর নিয়মে নাই-বা সংযত করলে— তা হলেই কি রস নষ্ট হল। তা হলেও দেহের সহজ ভঙ্গিতে কান্তি আপনি জাগে, বাহুর ভাষায় যে বেদনার ইঙ্গিত ঠিকরে ওঠে সে মুক্ত বলেই যে নিরর্থক এমন কথা যে বলতে পারে তার রসবোধ অসাড় হয়েছে। সে নাচে না বলেই যে তার চলনে মাধুর্যের অভাব ঘটে কিম্বা সে গান করে না বলেই যে তার কানে-কানে কথার মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনা থাকে না, এ কথা অশ্রদ্ধেয়। বরঞ্চ এই অনিয়ন্ত্রিত কলায় একটি বিশেষ গুণের বিকাশ হয়, তাকে বলব ভাবের স্বচ্ছন্দতা, আপন আন্তরিক সত্যেই তার আপনার পর্যাপ্তি। তার বাহুল্যবর্জিত আত্মনিবেদনে তার সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত কাছের সম্বন্ধ ঘটে। অশোকের গাছে সে আলতা-আঁকা নূপুরশিঞ্জিত পদাঘাত নাই করল ; নাহয় কোমরে আঁট আঁচল বাঁধা, বাঁ হাতের কুক্ষিতে ঝুড়ি, ডান হাত দিয়ে মাচা থেকে লাউশাক তুলছে, অযত্নশিথিল খোঁপা ঝুলে পড়েছে আলগা হয়ে ; সকালের রৌদ্রজড়িত ছায়াপথে হঠাৎ এই দৃশ্যে কোনো তরুণের বুকের মধ্যে যদি ধক্ করে ধাক্কা লাগে তবে সেটাকেই কি লিরিকের ধাক্কা বলা চলে না, নাহয় গদ্য-লিরিকই হল।

এ রস শালপাতায় তৈরি গদ্যের পেয়ালাতেই মানায়, ওটাকে তো ত্যাগ করা চলবে না। প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে একটি স্বচ্ছতা আছে, তার মধ্যে দিয়ে অতুচ্ছ পড়ে ধরা— গদ্যের আছে সেই সহজ স্বচ্ছতা। তাই বলে এ কথা মনে করা ভুল হবে যে, গদ্যকাব্য কেবলমাত্র সেই অকিঞ্চিৎকর কাব্যবস্তুর বাহন। বৃহতের ভার অনায়াসে বহন করবার শক্তি গদ্যছন্দের মধ্যে আছে। ও যেন বনস্পতির মতো, তার পল্লবপুঞ্জের ছন্দোবিন্যাস কাটাছাঁটা সাজানো নয়, অসম তার স্তবকগুলি, তাতেই তার গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য।

প্রশ্ন উঠবে, গদ্য তা হলে কাব্যের পর্যায়ে উঠবে কোন্ নিয়মে। এর উত্তর সহজ। গদ্যকে যদি ঘরের গৃহিণী বলে কল্পনা কর তা হলে জানবে, তিনি তর্ক করেন, ধোবার বাড়ির কাপড়ের হিসাব রাখেন, তাঁর কাশি সর্দি জ্বর প্রভৃতি হয়, 'মাসিক বসুমতী' পাঠ করে থাকেন— এ-সমস্তই প্রাত্যহিক হিসেব, সংবাদের কোঠার অন্তর্গত, এই ফাঁকে ফাঁকে মাধুরীর স্রোত উছলিয়ে ওঠে, পাথর ডিঙিয়ে ঝরনার মতো। সেটা সংবাদের বিষয় নয়, সে সংগীতের শ্রেণীয়। গদ্যকাব্যে তাকে বাছাই করে নেওয়া যায় অথবা সংবাদের সঙ্গে সংগীত মিশিয়ে দেওয়া চলে। সেই মিশ্রণের উদ্দেশ্য সংগীতের রসকে পরুষের স্পর্শে ফেনায়িত উগ্রতা দেওয়া। শিশুদের সেটা পছন্দ না হতে পারে, কিন্তু দৃঢ়দন্ত বয়স্কের রুচিতে এটা উপাদেয়।

আমার শেষ বক্তব্য এই যে, এই জাতের কবিতায় গদ্যকে কাব্য হতে হবে। গদ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কাব্য পর্যন্ত পৌঁছল না, এটা শোচনীয়। দেবসেনাপতি কার্তিকেয় যদি কেবল স্বর্গীয় পালোয়ানের আদর্শ হতেন তা হলে শুম্ভনিশুম্ভের চেয়ে উপরে উঠতে পারতেন না। কিন্তু, তাঁর পৌরুষ যখন কমনীয়তার সঙ্গে মিশ্রিত হয় তখনই তিনি দেবসাহিত্যে গদ্যকাব্যের সিংহাসনের উপযুক্ত হন। (দোহাই তোমার, বাংলাদেশের ময়ূরে-চড়া কার্তিকটিকে সম্পূর্ণ ভোলবার চেষ্টা কোরো।)

১৭ মে ১৯৩৫

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষকে লিখিত

গদ্যের চালটা পথে চলার চাল, পদ্যের চাল নাচের। এই নাচের গতির প্রত্যেক অংশের মধ্যে সুসংগতি থাকা চাই। যদি কোনো গতির মধ্যে নাচের ধরনটা থাকে অথচ সুসংগতি না থাকে তবে সেটা চলাও হবে না, নাচও হবে না, হবে খোঁড়ার

চাল অথবা লম্ফঝম্প। কোনো ছন্দে বাঁধন বেশি, কোনো ছন্দে বাঁধন কম; তবু ছন্দমাত্রের অন্তরে একটা ওজন আছে। সেটার অভাব ঘটলে যে টলমলে ব্যাপার দাঁড়ায় তাকে বলা যেতে পারে মাতালের চাল, তাতে সুবিধাও নেই, সৌন্দর্যও নেই।

২২ জুলাই ১৯৩২

২

গদ্যকে গদ্য বলে স্বীকার করেও তাকে কাব্যের পঙ্‌ক্তিতে বসিয়ে দিলে আচারবিরুদ্ধ হলেও সুবিচারবিরুদ্ধ না হতেও পারে, যদি তাতে কবিত্ব থাকে। ইদানীং দেখছি, গদ্য আর রাশ মানছে না, অনেক সময় দেখি তার পিঠের উপর সেই সওয়ারটিই নেই যার জন্যে তার খাতির। ছন্দের বাঁধা সীমা যেখানে লুপ্ত সেখানে সংগত সীমা যে কোথায় সে তো আইনের দোহাই দিয়ে বোঝাবার জো নেই। মনে মনে ঠিক করে রেখেছি, স্বাধীনতার ভিতর দিয়েই বাঁধন ছাড়ার বিধান আপনি গড়ে উঠবে— এর মধ্যে আমার অভিরুচিকে আমি প্রাধান্য দিতে চাই নে। নানারকম পরীক্ষার ভিতর দিয়ে অভিজ্ঞতা গড়ে উঠছে। সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা আদর্শ ক্রমে দাঁড়িয়ে যাবে। আধুনিক ইংরেজি কাব্যসাহিত্যে এই পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে।

তুমি যে রচনাটি পাঠিয়েছ তাকে কবিতা বলে মেনে নিতে দ্বিধা করি নে, যদিও তুমি অসংকোচে তাকে গদ্যের পুরুষবেশ পরিয়েছ। একটুও বেমানান হয় নি। গদ্য-সওয়ারি কবিতার শাড়িশেমিজ নেই-বা রইল।

২৮ আশ্বিন ১৩৪৩

মোটকথা

পদ্যছন্দ

দুই মাত্রা বা দুই মাত্রার গুণক নিয়ে যে-সব ছন্দ তারা পদাতিক; বোঝা সামলিয়ে ধীরপদক্ষেপে তাদের চাল। এই জাতের ছন্দকে পয়ারশ্রেণীয় বলব। সাধারণ পয়ারে প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে দুটি করে ভাগ, ধ্বনির মাত্রা ও যতির মাত্রা মিলিয়ে প্রত্যেক ভাগে আটটি করে মাত্রা, সুতরাং সমগ্র পয়ারের ধ্বনিমাত্রাসংখ্যা চোদ্দ এবং তার সঙ্গে মিলেছে যতিমাত্রাসংখ্যা দুই, অতএব সর্বসমেত ষোলো মাত্রা।

বচন নাহি তো মুখে | তবু মুখখানি • •
হৃদয়ের কানে বলে | নয়নের বাণী • •।

আট মাত্রার উপর ঝোঁক না রেখে প্রত্যেক দুই মাত্রার উপর ঝোঁক যদি রাখি তবে সেই দুল্‌কি চালে পয়ারের পদমর্যাদার লাঘব হয়।

কেন | তার | মুখ | ভার | বুক | ধুক | ধুক | • •,
চোখ | লাল | লাজে | গাল | রাঙা | টুক | টুক • •।

অথবা প্রত্যেক চার মাত্রার ঝোঁক দিয়ে পয়ার পড়া যেতে পারে। যেমন—

সুনিবিড় | শ্যামলতা | উঠিয়াছে | জেগে • •
ধরণীর | বনতলে | গগনের | মেঘে • •।

ছন্দের দুটি জিনিস দেখবার আছে— এক হচ্ছে তার সমগ্র অবয়ব, আর তার সংঘটন। পয়ারের অবয়বের মাত্রাসমষ্টি ষোলো সংখ্যায়। এই ষোলো মাত্রা সংঘটিত হয়েছে দুই মাত্রার অংশযোজনায়। ধ্বনিরূপসৃষ্টিতে দুই সংখ্যার একটি বিশেষ প্রভাব আছে, তিন সংখ্যা থেকে তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দৃষ্টান্ত দেখাই—

শ্রাবণধারে সঘনে
কাঁদিয়া মরে যামিনী,
ছোটে তিমিরগগনে
পথহারানো দামিনী।

এই ছন্দটির সমগ্র অবয়ব ষোলো মাত্রায়। সেই ষোলো মাত্রাটি সংঘটিত হচ্ছে তিন-দুই-তিন মাত্রার যোগে, এইজন্যেই পয়ারের মতো এর চাল-চলন নয়। যে আট মাত্রা

দুইয়ের অংশ নিয়ে সে চলে সোজা সোজা পা ফেলে, কিন্তু যে আট মাত্রা তিন দুই-তিনের ভাগে সে চলছে হেলতে দুলতে মরালগমনে।

চেয়ে থাকে মুখপানে,
সে চাওয়া নীরব গানে মনে এসে বাজে,
যেন ধীর ধ্রুবতারা
কহে কথা ভাষাহারা জনহীন সাঁঝে।

যতিমাত্রাসমেত চব্বিশ মাত্রায় এই ত্রিপদীর অবয়ব। এই চব্বিশ মাত্রা দুই মাত্রা-খণ্ডের সমষ্টি, এইজন্যেই একে পয়ারশ্রেণীতে গণ্য করব।

রিমি ঝিমি বরিষে শ্রাবণধারা,
ঝিল্লি ঝনকিছে ঝিনি ঝিনি ;
দুরু দুরু হৃদয়ে বিরামহারা
তাকায়ে পথপানে বিরহিণী।

এ ছন্দেরও অবয়ব চব্বিশ মাত্রায়। কিন্তু, এর গড়ন স্বতন্ত্র, এর অংশগুলি দুই-তিনের মিশ্রিত মাত্রা।

পয়ার ছন্দের বিশেষ গুণ এই যে, তার বুনোনি ঠাসবুনোনি নয়, তাকে বাড়ানো-কমানো যায়। সুর করে টেনে টেনে পড়বার সময় কেউ যদি যতির যোগে পয়ারের প্রথম ভাগে দশ ও শেষ ভাগে আট মাত্রা পড়ে তবু পয়ারের প্রকৃতি বজায় থাকে। যেমন—

মহাভারতের কথা • ০ | অমৃতসমান • • ।
কাশীরাম দাস ভনে • • | শুনে পুণ্যবান্ • ০.।

অথবা—

মহা •• ভারতের কথা •• | অমৃত • • সমা ০ • ন।
কাশীরা • • ম দাস ভনে • ০ | শুনে ০ • পুণ্যবা ০ • ন্।

পয়ার ছন্দ স্থিতিস্থাপক বলেই এটা সম্ভব, আর সেই গুণেই বাংলা কাব্যসাহিত্যকে সে এমন করে অধিকার করেছে।

যেমন দুই মাত্রামূলক পয়ার তেমনি তিন মাত্রামূলক ছন্দও বাংলাদেশে অনেককাল

থেকে প্রচলিত। পয়ারের ব্যবহার প্রধানত আখ্যানে রামায়ণ-মহাভারত-মঙ্গলকাব্য প্রভৃতিতে। তিন মাত্রামূলক ছন্দ গীতিকাব্যে, যেমন বৈষ্ণব-পদাবলীতে।

পূর্বেই বলেছি পয়ারের চাল পদাতিকের চাল, পা ফেলে ফেলে চলে।

অভিসারযাত্রাপথে হৃদয়ের ভার
পদে পদে দেয় বক্ষে ব্যথার ঝংকার।

এই পা ফেলে চলার মাঝে মাঝে যতি পাওয়া যায় যথেষ্ট, ইচ্ছা করলে তাকে বাড়ানো-কমানো চলে। কিন্তু, তিন মাত্রার তালটা যেন গোল গড়নের, গড়িয়ে চলে, পরস্পরকে ঠেলে নিয়ে দৌড় দেয়।

চলিতে চলিতে চরণে উছলে
চলিবার ব্যাকুলতা,
নূপুরে নূপুরে বাজে বনতলে
মনের অধীর কথা।

এইজন্যে মাত্রা যদি কোথাও তিনের মাপের একটু বেশি হয় এ ছন্দ তাকে প্রসন্নমনে জায়গা দিতে পারে না। দায়ে পড়ে এই অত্যাচার কখনো করি নি এমন কথা বলতে পারব না।

প্রভু বুদ্ধ লাগি আমি ভিক্ষা মাগি,
ওগো পুরবাসী, কে রয়েছ জাগি,
অনাথপিণ্ডদ কহিলা অম্বুদ-
নিনাদে।

এ কথা বোঝা শক্ত নয় যে, 'অনাথপিণ্ডদ' নামটার খাতিরে নিয়ম রদ করেছিলেম। গার্ড্ এসে গাড়ির কামরায় বরাদ্দর বেশি মানুষকে ঠেসে ঢুকিয়ে দিয়েছে, ঘুষ খেয়ে থাকবে কিম্বা আগন্তুক ভারী দরের।

সে কালে অক্ষরগনতি-করা তিন মাত্রামূলক ছন্দে যুক্তধ্বনি বর্জন করে চলতুম। কিন্তু, তাতে রচনায় অতিলালিত্যের দুর্বলতা এসে পৌঁছত। সেটা যখন আমার কাছে বিরক্তিকর হল তখন যুক্তধ্বনির শরণ নিলুম। ছন্দটা একদিন ছিল যেন নবনী দিয়ে গড়া—

বরষার রাতে জলের আঘাতে
পড়িতেছে যূথী ঝরিয়া,
পরিমলে তারি সজল পবন
করুণায় উঠে ভরিয়া।

এই দুর্বলতার মধ্যে যুক্তবর্ণ এসে দেখা দিল—

নববর্ষার বারিসংঘাতে
পড়ে মল্লিকা ঝরিয়া,
সিক্তপবন সুগন্ধে তারি
কারুণ্যে উঠে ভরিয়া।

তিন-তিন মাত্রায় যার গ্রন্থিযোজনা এমন আর-একটি ছন্দের দৃষ্টান্ত দেখাই—

আঁখির পাতায় নিবিড় কাজল
গলিছে নয়ন সলিলে।

অক্ষরসংখ্যা সমান রেখে এই দুটো পদে যুক্তবর্ণ যদি চড়াই তা হলে সেটা কেমন হয়— যেমন এক-এক সময়ে দেখা যায়, জোয়ান পুরুষ ক্ষীণ স্ত্রীর ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে পথে চলে নির্মমভাবে। প্রমাণ দিই—

চক্ষুর পল্লবে নিবিড় কজ্জল
গলিছে অশ্রুর নির্ঝরে।

কিন্তু, এই বোঝা পয়ারজাতীয় পালোয়ানের স্কন্ধে চাপালে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকবে না। প্রথমে বিনা-বোঝার চালটা দেখানো যাক—

শ্রাবণের কালো ছায়া নেমে আসে তমালের বনে
যেন দিক্-ললনার গলিত কাজল-বরিষনে।

এটিকে গুরুভার করে দিই—

বর্ষার তমিস্রচ্ছায়া ব্যাপ্ত হল অরণ্যের তলে
যেন অশ্রুসিক্ত চক্ষু দিগ্‌বধূর গলিত কজ্জলে।

এতটা ভারবৃদ্ধি যে সম্ভব হয় তার কারণ পয়ার স্থিতিস্থাপক।

ধ্বনির দুই মাত্রা এবং তিন মাত্রা বাংলা ছন্দের আদিম এবং রূঢ়িক উপাদান। তার পরে এই দুই এবং তিনের যোগে যৌগিকমাত্রার ছন্দের উৎপত্তি। তিন+দুই, তিন+চার, তিন+দুই+চার প্রভৃতি নানাপ্রকার যোগ চলেছে আধুনিক বাংলা ছন্দে। তিন+দুই মাত্রামূলক ছন্দের দৃষ্টান্ত—

আঁধার রাতি জেলেছে বাতি
অযুতকোটি তারা,
আপন কারা-ভবনে পাছে
আপনি হয় হারা।

দেখা যাচ্ছে, এখানে পদশেষের অংশটিকে খর্ব করা হয়েছে। যদি লেখা যেত—

আঁধার রাতি জ্বেলেছে বাতি
আকাশ ভরি অযুত তারা

তা হলে ছন্দের কাছে দেনা বাকি থাকত না। কিন্তু, পূর্বোক্ত প্রথম শ্লোকটির পদশেষে পাঁচ মাত্রার থেকে তিন মাত্রাকে জবাব দেওয়া হয়েছে। তা হলে বুঝতে হবে, সেই তিন মাত্রা দেহত্যাগ করে ওইখানেই বসে আছে যতিকে ভর করে।

কিন্তু, এই কৈফিয়তটা সম্পূর্ণ হল বলে মনে হয় না, আরো কথা আছে। প্রকৃতির কাজের অলংকরণতত্ত্বটা আলোচ্য। দুই পা দুই হাত নিয়ে দেহটা দাঁড়ালো, দুই কাঁধে দুটো মুণ্ড বসালেই সম্মিতি অর্থাৎ symmetry ঘটত। তা না করে দুই কাঁধের মাঝখানে একটি মুণ্ড বসিয়ে সমাপ্তিটা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। কৃষ্ণচূড়ার গাছে ডাঁটার দু ধারে দুটি করে পত্রগুচ্ছ চলতে চলতে প্রান্তে এসে থামল একটিমাত্র গুচ্ছে। অলংকরণের ধারা যেখানে পূর্ণ হয়েছে সেখানে একটিমাত্র তর্জনী, ছোটো একটি ইশারা।

সকল ভাষারই যতি আছে, কিন্তু যতিকে বাটখারাস্বরূপ করে ছন্দের ওজন পূরণ বাংলা ছন্দ ছাড়া আর কোনো ছন্দে আছে কি না জানি নে। সংস্কৃত ছন্দে এই রীতি বিরল, তবু একেবারে পাওয়া যায় না তা নয়।

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতি ঘোরম্ • •।

যতিকে কেবল বিরতির স্থান না দিয়ে তাকে পূর্তির কাজে লাগাবার অভ্যাস আরম্ভ হয়েছে আমাদের ছড়ার ছন্দ থেকে। ছড়া আবৃত্তি করবার সময় আপনি যতির জোগান দেয় আমাদের কান।

কাক কালো বটে, পিক সেও কালো,
কালো সে ফিঙের বেশ,
তাহার অধিক কালো যে, কন্যা,
তোমার চিকন কেশ।

এমন করে ছন্দটাকে পুরোপুরি ভরিয়ে দিলে কানের কাছে ঋণী হতে হত না। কিন্তু, এতে ছড়ার জাত যেত। ছড়ার রীতি এই যে, সে কিছু ধ্বনি জোগায় নিজে, কিছু আদায় করে কণ্ঠের কাছ থেকে; এ দুইয়ের মিলনে সে হয় পূর্ণ। প্রকৃতি আমের মধুরতায় জল মিশিয়েছেন, তাকে আমসত্ত্ব করে তোলেন নি; সেজন্যে রসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই

কৃতজ্ঞ। তেমনি যথেষ্ট যতি মিশোল করা হয়েছে ছড়ার ছন্দে, শিশুকাল থেকে বাঙালি তাতে আনন্দ পায়। সে সহজেই আউড়েছে—

কাক কালো, কোকিল কালো,
কালো ফিঙের বেশ,
তাহার অধিক কালো, কন্যে,
তোমার চিকন কেশ।

কিম্বা—

টুমুস টুমুস বাদ্যি বাজে,
লোকে বলে কী,
শামুকরাজা বিয়ে করে
ঝিনুকরাজার ঝি।

১৩৪১

গদ্যছন্দ

গদ্য বলতে বুঝি যে ভাষা আলাপ করবার ভাষা; ছন্দোবদ্ধ পদে বিভক্ত যে ভাষা তাই পদ্য। আর, রসাত্মক বাক্যকেই আলংকারিক পণ্ডিত কাব্য সংজ্ঞা দিয়েছেন। এই রসাত্মক বাক্য পদ্যে বললে সেটা হবে পদ্যকাব্য আর গদ্যে বললে হবে গদ্যকাব্য। গদ্যেও অকাব্য ও কুকাব্য হতে পারে, পদ্যেও তথৈবচ। গদ্যে তার সম্ভাবনা বেশি, কেননা ছন্দেরই একটা স্বকীয় রস আছে—সেই ছন্দকে ত্যাগ করে যে কাব্য, সুন্দরী বিধবার মতো তার অলংকার তার আপন বাণীদেহেই, বাইরে নয়। এ কথা বলা বাহুল্য যে, গদ্যকাব্যেও একটা আবাঁধা ছন্দ আছে। আন্তরিক প্রবর্তনা থেকে কাব্য সেই ছন্দ চলতে চলতে আপনি উদ্ভাবিত করে, তার ভাগগুলি অসম হয় কিন্তু সবসুদ্ধ জড়িয়ে ভারসামঞ্জস্য থেকে সে স্খলিত হয় না। বড়ো-ওজনের সংস্কৃত ছন্দে এই আপাতপ্রতীয়মান মুক্তগতি দেখতে পাওয়া যায়। যেমন—

মেঘৈর্ মেদুর | মম্বরং বনভুবঃ | শ্যামাস্তমা | লদ্রুমৈঃ।

এই ছন্দ সমান ভাগ মানে না, কিন্তু সমগ্রের ওজন মেনে চলে। মুখের কথায় আমরা যখন খবর দিই তখন সেটাতে নিশ্বাসের বেগে ঢেউ খেলায় না। যেমন—

তার চেহারাটা মন্দ নয়।

কিন্তু ভাবের আবেগ লাগবামাত্র আপনি ঝোঁক এসে পড়ে। যেমন—

কী সুন্দর তার চেহারাটি।

একে ভাগ করলে এই দাঁড়ায় : কী সুন্ | দর তার | চেহারাটি।

মরে যাই তোমার বালাই নিয়ে।

এত গুমর সইবে না গো, সইবে না— এই বলে দিলুম।

কথা কয় নি তো কয় নি
চলে গেছে সামনে দিয়ে,
বুক ফেটে মরব না তাই বলে।

এ-সমস্তই প্রতিদিনের চলতি কথার সহজ ছন্দ, গদ্য, কাব্যের গতিবেগে আত্মরচিত। মনকে খবর দেবার সময় এর দরকার হয় না, ধাক্কা দেবার সময় আপনি দেখা দেয়, ছান্দসিকের দাগ-কাটা মাপকাঠির অপেক্ষা রাখে না। ইতি ২২ মে ১৯৩৫

গ্রন্থপরিচয়

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ ও রচনাসংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত হইল।

খাপছাড়া

'খাপছাড়া' ১৩৪৩ সালের মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি বহু রঙিন ছবিতে ও রেখাচিত্রে কবি নিজেই চিত্রিত করিয়াছিলেন।

স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে 'খাপছাড়া'র নূতন সংস্করণ ১৩৭২ বৈশাখে প্রকাশিত। ইহার 'সংযোজন' অংশে ২, ৩, ৫, ১০ ও ১১ -সংখ্যক কবিতা বাদে রবীন্দ্র-রচনাবলীর 'সংযোজন'-ধৃত সব কবিতাই দেওয়া হইয়াছে। কারণ শিশুপাঠ্য চিত্রবিচিত্র গ্রন্থে প্রথমাবধি (শ্রাবণ ১৩৬১) উহার চারিটি ও পরে (ভাদ্র ১৩৬২) ২-সংখ্যক কবিতাটি সংকলিত।

বর্তমান গ্রন্থপরিচয়ে 'খাপছাড়া'র ৮২ ও ৯৪ -সংখ্যক কবিতার যে-কয়টি পূর্বপাঠ দেওয়া হইয়াছে তাহার অতিরিক্ত এক-একটি পাঠ স্বতন্ত্র খাপছাড়া গ্রন্থের (১৩৭২) গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত। ৭-সংখ্যক সংযোজনের একটি মাত্র পূর্বপাঠ এ স্থলে মুদ্রিত, স্বতন্ত্র গ্রন্থের গ্রন্থপরিচয় অংশে দুইটি মুদ্রিত আছে।

রবীন্দ্রনাথের বহু পাণ্ডুলিপি (বিশেষত শেষ বয়সের রচনা) শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত। এ-সকলের পর্যালোচনায় রবীন্দ্র-রচনা সংক্রান্ত বহু নূতন তথ্য ক্রমশ আবিষ্কৃত এবং পাঠভেদ সংগ্রহ করা হইতেছে।

পাঠভেদের নিদর্শনরূপে দুইটি কবিতার পূর্বপাঠ পাণ্ডুলিপি হইতে নিম্নে মুদ্রিত হইল—

৮২-সংখ্যক কবিতা

প্রথম পাঠ

বাদশার ফরমাসে সন্দেশ বানাতে
খুব কষে মাখে চিনি কুঁকড়োর ছানাতে।
সর্দার খোঁজে পাড়া— আজো কি রয়েছে ছাড়া
সাধু কেউ— বাদশাকে হয় তাই জানাতে।
ডাকাতেরা মারে পাছে, রাখে জেলখানাতে।

দ্বিতীয় পাঠ

বাদশার ফরমাসে সন্দেশ বানাতে
ছানা ছেড়ে মাখে চিনি কুঁকড়োর ছানাতে।
সর্দার খুঁজে খুঁজে ফিরিতেছে পাড়া পাড়া,
এখনো কি কোনোখানে কোনো সাধু আছে ছাড়া—
বাদশাকে সে-খবর হয় তারে জানাতে।
ডাকাতেরা মারে পাছে, রাখে জেলখানাতে।

তৃতীয় পাঠ

মহারাজা লুকিয়েছে পুলিসের থানাতে।
চোরকে সে পারে নাই আদালত মানাতে।
সর্দার খুঁজে খুঁজে ফিরিতেছে পাড়া পাড়া,
আজো যদি কোনোখানে কোনো সাধু থাকে ছাড়া—
রাজাকে সে খবরটা হয় তারে জানাতে।
অসাধুর ভয়ে তারে রাখে জেলখানাতে।

৯৪-সংখ্যক কবিতা

প্রথম পাঠ

বিড়ালে মাছেতে হল সখ্য—
বিড়াল কহিল, "ভাই, ভক্ষ্য
বিধাতাই কন তোরে—
বন্ধুর অন্তরে
পশিয়া নিজেরে তুমি রক্ষ।
ওই দেখো উঁচু ডাঙা,
আছে বক মাছরাঙা—
কেন হবে উহাদের লক্ষ্য।"

দ্বিতীয় পাঠ

বিড়ালে মাছেতে হল সখ্য—
বিড়াল কহিল, "ভাই, ভক্ষ্য
বিধাতা স্বয়ং জেনো কন তোরে—
ঢোকো গিয়ে বন্ধুর অন্তরে,
সেখানে নিজেরে তুমি রক্ষ।

ওই দেখো পুকুরের ধারে ডাঙা,
ওইখানে শয়তান মাছ-রাঙা—
কেন মিছে হবে ওর লক্ষ্য।”

সংযোজন-অংশের কবিতাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্র, কবির ‘ছন্দ’ গ্রন্থ এবং রবীন্দ্রসদনের পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত হইল। ‘পাবনায় বাড়ি হবে’, ‘বালিশ নেই সে ঘুমোতে যায়’, ‘পাঁচদিন ভাত নেই’, এই কবিতা তিনটি ‘প্রহাসিনী’ (১৩৪৫) গ্রন্থের ‘খাপছাড়া’ অংশ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে; উক্ত গ্রন্থের রচনাবলী সংস্করণে (খণ্ড ২৩) কবিতা তিনটি বর্জিত হইয়াছে। এই অংশের ৪-২০-সংখ্যক কবিতা কয়টি ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই। সংযোজনের ৭-সংখ্যক কবিতার পাণ্ডুলিপিতে-প্রাপ্ত পূর্বপাঠ এখানে মুদ্রিত হইল—

ধীরু কহে শূন্যেতে মজো রে,
নিরাধার সত্যেরে ভজো রে।
এত বলি ঘোড়াটারে
দুই পায়ে গুঁতো মারে,
চাবুক লাগায় তারে সজোরে।
যত ছোটে সারাদিন
কিছুতেই ঘোড়াহীন
আপনারে নাহি পড়ে নজরে॥

ছড়ার ছবি

‘ছড়ার ছবি’ ১৩৪৪ সালের আশ্বিন মাসে ‘নন্দলাল বসু -কর্তৃক চিত্রাঙ্কিত’ আকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৭ সালের গ্রীষ্মে (মে-জুন মাসে) আলমোড়া বাসকালে রবীন্দ্রনাথ ‘বিশ্বপরিচয়’ ও এই গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা রচনা করেন।

রবীন্দ্রসদনে-রক্ষিত পাণ্ডুলিপির সাহায্যে বর্তমান সংস্করণে কয়েকটি কবিতার রচনার তারিখ এবং স্থান -সম্বন্ধীয় নির্দেশ সংশোধিত বা সংযোজিত হইল।

‘বুধু’ কবিতাটির শেষে সাময়িকপত্রে (সোনার কাঠি : আশ্বিন ১৩৪৪) এবং পাণ্ডুলিপিতে নিম্নমুদ্রিত অতিরিক্ত অংশটুকু পাওয়া যায়—

পাছে কোথাও হারিয়ে সে যায় দৃষ্টি দেয় বা কেহ
সর্বদা সন্দেহ।

একদিন কোন্ ছেলে ওকে মেরেছিল ঢেলা,
সেদিন থেকে কারো সঙ্গে পায় না করতে খেলা।
আনন্দ নেই, উৎসাহ নেই, শখ মেটে না কিছু—
ফেরে কেবল বুড়োর পিছু পিছু।
উড়ন গেল, নাচন গেল, সাহস না রয় বাকি।
স্নেহের খাঁচার পাখি।
সবাই বলে, ভাগ্যি ভালো, জমছে টাকা দানের—
হায়, ছেলেটির অভাব কেবল দুর্লভ এই প্রাণের।

'কাশী' কবিতার ১৫-১৬শ ছত্রের পূর্বপাঠ পাণ্ডুলিপি হইতে উদ্ধৃত হইল—

হাসছ শুনে, কী জানি বা সত্যি পিঠেই হবে,
কিন্তু মুখে দাও যদি তো কাঁঠাল-বিচিই কবে।

'বালক' কবিতাটি 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে প্রথম সংস্করণ (১৩৪৭) হইতেই পুনর্মুদ্রিত আছে। ইহার ১৩শ ছত্রে 'কঙ্কালী চাটুজ্জে' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে তথা ছেলেবেলা গ্রন্থে পূর্বপাঠ পাওয়া যায় 'কিশোরী চাটুজ্জে'।

এই প্রসঙ্গে 'যোগীন্দা' কবিতার আরম্ভাংশের পাণ্ডুলিপিতে-প্রাপ্ত পূর্বপাঠ উল্লেখযোগ্য—

যোগেন্দ্র হালদার
দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে কাল কেটেছে তার।
ইত্যাদি।

'রিক্ত' কবিতাটির সংক্ষিপ্ত প্রথম পাঠ পাণ্ডুলিপিতে এরূপ পাওয়া যায়—

মরুর মতো ডাঙা,
চোখ-ভোলানো রঙের নেশা-ভাঙা।
শস্যনিঃস্ব মাঠে
মধ্যদিনের বিজন লীলা রুদ্ররসের নাটে।
রুক্ষ হাওয়ায় ধরার বুকে সূক্ষ্ম কাঁপন কাঁপে,
শুকনো পাতা ঘুর খাচ্ছে কিসের অভিশাপে।
মনে হচ্ছে, ধরাতলের এই মহাশূন্যতায়
আকাশ যেন কান পেতে রয় আপনি আপন কথায়।
তারি সঙ্গে মিশ খেয়ে যায় আমার চেয়ে থাকা
ব্যাপ্ত করে পাণ্ডুবরন ফাঁকা।

কোথাও কোনো শব্দ যে নাই, তারি শব্দ বাজে
বক্ষোগুহার মাঝে।
আকাশ যাহার একলা অতিথ শুষ্ক বালুর স্তূপে
স্তব্ধ থাকি সেই ধরণীর বৈরাগিনীর রূপে।

আলমোড়া
১০।৬।৩৭

তপতী

'তপতী' ১৩৩৬ সালের ভাদ্র মাসে প্রথম গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। নাটকটির রচনা-পরিচয় 'ভূমিকা'তে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বিশদভাবে লিখিয়াছেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 'রাজা ও রানী' রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে, উক্ত নাটকের গ্রন্থপরিচয় অংশ এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

'পথে ও পথের প্রান্তে' গ্রন্থের ৩৯-সংখ্যক পত্রে তপতী নাটকটি সদ্য রচিত হইবার সংবাদ আছে। পত্রটির প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্‌ধৃত হইল—

পুত্রসন্তান লাভ হলে সে সংবাদ খুব উৎসাহ করে প্রচার করা হয়। গতকল্য আমার লেখনী একটি সর্বাঙ্গসুন্দর নাটককে জন্ম দিয়েছে— দশমাস তার গর্ভবাস হয় নি— বোধ করি দিন-দশেকের বেশি সময় নেয় নি। 'সর্বাঙ্গসুন্দর' বিশেষণটা পড়ে হয়তো তোমার ওষ্ঠাধর হাস্যকুটিল হয়ে উঠবে। ওর মধ্যে একটুখানি সাইকলজির খেলা আছে। বাক্যটা যখন মনের মধ্যে রচিত হয়েছিল তখন কথাটা ছিল 'সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ' কিন্তু যখন লেখা হল তখন দেখি, কথাটা বদলে গেছে। কেটে সংশোধন করা অসম্ভব ছিল না কিন্তু ভেবে দেখলুম, যেটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করি সেইটেই লেখা হয়ে গেছে। বিনয়টাকে তখনই সদ্‌গুণ বলতে রাজি আছি যখন সেটা অসত্য নয়।··· নিজের লেখা খারাপ লাগতে যার বাধে না, এবং সেটাকে অকুণ্ঠিত ভাষায় স্বীকার করতে যার বেদনা নেই, নিজের লেখার প্রশংসা করা তার পক্ষে অহংকার নয়। অতএব খুব জোরের সঙ্গেই বলব, নাটকটা সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে।··· যাক গে। বিষয়টা ছিল, আমার নতুন নাটক রচনা। রাজা ও রানীর রূপান্তরীকরণ। সেই নাম রইল; সেই রূপ রইল না। বিশ্বভারতীর কর্মসচিবকে খাজনা দিতে হবে না। যদি সাবেক নামটার জন্যে ভাড়ার দাবি করেন সেটাকে বদলাতে কতক্ষণ। 'সুমিত্রা' নামই

ঠিক করেছি।[১] প্রশান্ত[২] মাঝে মাঝে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, যেন আমি নেড়াছন্দে ব্ল্যাঙ্কভার্সে নাটক লিখি। আমি স্পষ্টই দেখলুম, গদ্যে তার চেয়ে ঢের বেশি জোর পাওয়া যায়। পদ্য জিনিসটা সমুদ্রের মতো, তার যা বৈচিত্র্য তা প্রধানত তরঙ্গের; কিন্তু, গদ্যটা স্থলদৃশ্য, তাতে নানা মেজাজের রূপ আনা যায়— অরণ্য, পাহাড়, মরুভূমি, সমতল, অসমতল, প্রান্তর, কান্তার ইত্যাদি ইত্যাদি।… ২৩ শ্রাবণ ১৩৩৬

১৩৩৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে "দ্বিতীয় সংস্করণে 'তপতী' কিছু পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত" হয়। রচনাবলী সংস্করণে সেই পরিবর্তিত শেষ পাঠ মুদ্রিত হইল।

ভূমিকায় নাটকটি অভিনয়ের চেষ্টার যে উল্লেখ আছে সে অভিনয় কবির জোড়াসাঁকো বাড়িতে ১৯৩৬ সালে হইয়াছিল। বিক্রমের ভূমিকা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গল্পগুচ্ছ

গল্পগুচ্ছের যে সাতটি গল্প রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত হইল সেগুলি ১৩০৫ সালে ভারতীতে প্রথম প্রকাশিত হয়; এই বৎসর রবীন্দ্রনাথ ভারতীর সম্পাদক ছিলেন। নিম্নে প্রকাশকাল দেওয়া হইল—

দুরাশা	বৈশাখ	১৩০৫
পুত্রযজ্ঞ	জ্যৈষ্ঠ	১৩০৫
ডিটেক্‌টিভ	আষাঢ়	১৩০৫
অধ্যাপক	ভাদ্র	১৩০৫
রাজটিকা	আশ্বিন	১৩০৫
মণিহারা	অগ্রহায়ণ	১৩০৫
দৃষ্টিদান	পৌষ	১৩০৫

'পুত্রযজ্ঞ' গল্পটির লেখকের নাম ভারতীর সূচীপত্রে 'শ্রীসমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর' মুদ্রিত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে লিখিত শ্রীসমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রের নিম্নমুদ্রিত অংশটুকু প্রণিধানযোগ্য—

'পুত্রযজ্ঞ' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের লিখিত, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আমি কেবলমাত্র উহার আখ্যান বস্তুটি আমার কাঁচা ভাষায় লিখিয়া 'খামখেয়ালি' সভায়

১ রবীন্দ্রসদনে-রক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপিতেও নাটকটির নাম 'সুমিত্রা' রহিয়াছে।

২ শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ।

পাঠের জন্য তাঁহাকে দেখাইয়াছিলাম, তিনি উহা দেখিয়া তাহার আমূল সংশোধন করিয়া ও নিজের অতুলনীয় ভাষায় লিখিয়া সেই সভায় আমার লিখিত বলিয়া পাঠ করেন ; বোধ হয় সেই কারণে গল্পটি আমার লিখিত বলিয়া সেই সময় উক্ত মুদ্রণপ্রমাদ ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, পরে পুনর্মুদ্রণের সময় গল্পগুচ্ছে সে ভ্রম সংশোধিত হইয়াছে শুনিয়া আশ্বস্ত ও সুখী হইলাম। ২১ ফাল্গুন ১৩৫১

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় প্রকাশিত বিশ্বভারতীসংস্করণ (১৯২৬) গল্পগুচ্ছে 'পুত্রযজ্ঞ' গল্পটি প্রথম রবীন্দ্রগ্রন্থভুক্ত করা হয়। বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত অন্য ছয়টি গল্প মজুমদার এজেন্সি হইতে প্রকাশিত (১৯০১) গল্পগুচ্ছের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথম গ্রন্থাকারে বাহির হয়।

'দুরাশা' ও 'মণিহারা' গল্পের রচনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশ প্রণিধানযোগ্য—

কেশরলালের গল্পটা পেয়েছি মগজ থেকে। চতুর্মুখের মগজ আছে কিনা জানি নে। কিন্তু, তিনি কিছু-না থেকে কিছুকে যেভাবে গড়ে তোলেন এও তাই। অনেককাল পূর্বে একবার যখন দার্জিলিঙ গিয়েছিলুম, সেখানে ছিলেন কুচবিহারের মহারানী[৩]। তিনি আমাকে গল্প বলতে কেবলই জেদ করতেন। তাঁর সঙ্গে দার্জিলিঙের রাস্তায় বেড়াতে মুখে মুখে এই গল্পটা বলেছিলুম। মাস্টারমশায় গল্পের ভুতুড়ে ভূমিকা-অংশটা এবং মণিহারা গল্পটিও এমনি করে তাঁরই তাগিদে মুখে মুখে রচিত।

—পত্রধারা। প্রবাসী। শ্রাবণ ১৩৩৯, পৃ. ৪৫১

ছন্দ

ছন্দ ১৩৪৩ সালের আষাঢ় মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

রচনাবলী সংস্করণে প্রবন্ধগুলি সাময়িকপত্রে প্রকাশের কালানুক্রমে মুদ্রিত হইয়াছে। নিম্নমুদ্রিত সূচীক্রমে প্রবন্ধগুলি সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল—

ছন্দের অর্থ : 'ছন্দ', সবুজ পত্র, চৈত্র ১৩২৪

ছন্দের হসন্ত হলন্ত :

১. 'বাংলা ছন্দ', বিচিত্রা, পৌষ ১৩৩৮

২. 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত', পরিচয়, মাঘ ১৩৩৮

৩ সুনীতি দেবী।

ছন্দের মাত্রা :

১. 'নবছন্দ' (শেষার্ধ), পরিচয়, কার্তিক ১৩৩৯

২. 'ছন্দের মাত্রা', উদয়ন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১

বাংলা ছন্দের প্রকৃতি[৪] : 'ছন্দ', উদয়ন, বৈশাখ ১৩৪১

গদ্য ছন্দ[৪] : 'ছন্দ', বঙ্গশ্রী, বৈশাখ ১৩৪১

১৩২৪ সালের ভাদ্র মাসে সবুজপত্রে প্রকাশিত 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধটির সম্পূর্ণ পাঠ প্রথম সংস্করণে মূল গ্রন্থের অন্তর্গত ছিল। প্রবন্ধটির প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে নিম্নরূপ মুখবন্ধ করা হইয়াছিল, "মুখ্যত এই লেখাটি সংগীতসম্বন্ধীয়। তালের আলোচনা কালে আপনা থেকে এর শেষ দিকে ছন্দের কথা এসে পড়েছে। সেই কারণেই একে 'ছন্দ' গ্রন্থে গ্রহণ করা গেল।"

বর্তমান সংস্করণে প্রবন্ধটির উক্ত শেষাংশটুকু, 'সংগীত ও ছন্দ' নামে পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল। সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি রচনাবলীর পরবর্তী কোনো-এক খণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

পরিশিষ্ট

প্রথমসংস্করণ ছন্দ গ্রন্থে জে. ডি. এণ্ডার্সনকে লিখিত একখানি পত্র ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত তিনখানি পত্র, মোট চারখানি পত্রের প্রাসঙ্গিক অংশ, এবং 'পদ্যছন্দ' ও 'গদ্যছন্দ' সম্বন্ধে আলোচনা-সংবলিত একটি 'মোটকথা' পরিশিষ্ট অংশে মুদ্রিত হয়। ১৩৪৩ সালে বা তাহার পূর্বে লিখিত এবং প্রথমসংস্করণ ছন্দ গ্রন্থে অসংকলিত রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছন্দবিষয়ক রচনা একত্র মুদ্রিত করিয়া বর্তমান সংস্করণে উক্ত পরিশিষ্ট অংশটিকে পূর্ণতর আকার দেওয়া হইল। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন সম্প্রতি ছন্দ গ্রন্থের যে পূর্ণাঙ্গ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছেন রচনাবলী-সংস্করণে উক্ত গ্রন্থ হইতে প্রচুর সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

আলোচ্য অংশে সংকলিত প্রবন্ধ কয়টির প্রকাশসূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল। বোধসৌকর্যার্থে কয়েক ক্ষেত্রে প্রবন্ধের নূতন নামকরণ প্রয়োজন হইয়াছে।

বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ : 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা : সিন্ধু-দূত', ভারতী, শ্রাবণ ১২৯০

বাংলা শব্দ ও ছন্দ : 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা', সাধনা, শ্রাবণ ১২৯৯

৪ প্রবন্ধ দুইটি ১৩৪০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হয়।

সংগীত ও ছন্দ[৫] : 'সংগীতের মুক্তি', সবুজ পত্র, ভাদ্র ১৩২৪

সংস্কৃত-বাংলা ও প্রাকৃত-বাংলার ছন্দ : 'ছন্দবিতর্ক', পরিচয়, শ্রাবণ ১৩৩৯

ছন্দে হসন্ত : 'নবছন্দ' (প্রথমার্ধ), পরিচয়, কার্তিক ১৩৩৯

'ছন্দে হসন্ত' প্রবন্ধাংশটির আরম্ভের দুইটিমাত্র অনুচ্ছেদ প্রথম সংস্করণে 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত ১' প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। রচনাবলী-সংস্করণে উক্ত আলোচনার পূর্ণতর পাঠ পরিশিষ্টে স্বতন্ত্র আকারে মুদ্রিত হইল।

'চিঠিপত্র' অংশে মুদ্রিত কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা অধ্যাপক জে. ডি. এণ্ডার্সন মহাশয়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের অধুনাদুষ্প্রাপ্য পত্র দুইটি ১৩২১ সালের সবুজ পত্রের জ্যৈষ্ঠ ও শ্রাবণ সংখ্যা হইতে মূলপাঠ-অনুযায়ী সংকলিত হইয়াছে। চিঠি দুইখানি পত্রিকায় 'বাংলা ছন্দ' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের এই পত্র ভারতী পত্রিকায় প্রকাশের প্রস্তাবে এণ্ডার্সন সাহেব কেম্ব্রিজ হইতে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া যে চিঠি লেখেন তাহা প্রণিধানযোগ্য—

It would be a thousand pities if the charming and most interesting letter which our Kavivar has been so good as to address to me were not published. Will you kindly present my respects to Mr. Tagore's distinguished sister[৬] and assure her that, so far as I am concerned, the letter is very much at her disposal. I wonder if you would be so kind as to send me the copy of the *Bharati* in which it appears?

The letter seems to me to be a marvel of poetic wit and wisdom, the metaphorical illustrations being especially delightful and illuminating. I have only read it through, and have not had time to think out the various problems it discusses. But it has been a sheer delight to read matter so suggestive and original. The critical work of poets in England (Dryden was a remarkable exception) is often not so interesting as their verses. But Mr. Tagore's letter is as full of matter for thought as one of Victor Hugo's prefaces, and I am not a little proud that he should have addressed his remarks to a [n] old গুরুমহাশয় like me.

এণ্ডার্সনকে লিখিত দ্বিতীয় পত্রটির শেষাংশের দু-একটি উদাহরণের সমালোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে যে পত্র লেখেন তাহা মূল পত্রের পরিপূরক রূপে মুদ্রিত হইল—

সত্যেন্দ্র, তুমি যদি 'কই' শব্দের শেষ 'ই'টির মাত্রা বাজেয়াপ্ত করতে চাও তবে

৫ সবুজ পত্রে প্রকাশিত সাধুভাষায় লিখিত পাঠ সংকলিত হইয়াছে।

৬ স্বর্ণকুমারী দেবী।

অন্যায় হবে না ? আমার দৃষ্টান্তে দৈবক্রমে 'কই' কথাটা পদের শেষে পড়ে গেছে। তাই ফাঁক পেয়ে সেই ফাঁকির উপর দিয়ে মাত্রাটা চালিয়েছ কিন্তু যদি "কই শয্যা, কই বস্ত্র" হত তা হলে কী রকম করে এমন অবৈধাচরণ করতে পারতে ? বস্তুত ইকারের পরে ফাঁক্ নেই— ক-এর অ-টাকে দীর্ঘ করে ই-এর হ্রস্বতা পূরণ করা হয়। সে তো সকল হসন্ত বর্ণের সম্বন্ধেই খাটে— "কোথা জল, কোথা স্থল"— এখানে মাত্রার ওজন যদি দেখ তবে দেখবে 'জ' যত বড়ো 'ল্' তত বড়ো নয়— সেইজন্যে জ-টাকে দেড় মাত্রা করতে হয়েছে। তোমার বিধি অনুসারে 'জল্'-কে এক মাত্রা করে ফাঁকের উপরে আর-এক মাত্রা ফেলতে হয়। কিন্তু সেটা সাধু ছন্দের নিয়মবিরুদ্ধ। "সেইত বহিছে বায়ু", এখানে তুমি 'সেই'-এর 'ই'-টিকে কি বিমাত্র বলে গণ্য করবে।

"When we two parted" কবিতাটির সম্বন্ধে অনেক দ্বিধা আমার মনে উদয় হয়েছিল কিন্তু শেষকালে অন্য কোনো দৃষ্টান্ত মনে না পড়াতে ওটাকে ত্যাগ করি নি— আমার অভিপ্রায় এই ছিল, যদি কেবলমাত্র প্রথম লাইনটা পড়া যায় তা হলে সম-অসম মাত্রার ছন্দের লয়টা ইংরেজের কানে পরিচিত হতে পারে— মনে কর যদি এমন হত—

When we two parted
Silence and tears

তা হলে তো ছন্দভঙ্গ হত না— এমন অবস্থায় 'In' টাকে ফাল্‌তো বলে ধরবার অধিকার আছে। বস্তুত ছন্দের মধ্যে ফাল্‌তো অংশের লক্ষণই এই যে, সেটাকে বাদ দিলে মূল ছন্দের তাল কাটে না— ও জিনিসটা ফাঁকের মধ্যে ঢুকে পড়ে, আসলে ওর স্থান নেই। তথাপি আমার প্রবন্ধটার মধ্যে একটু বদল করে দেওয়া গেল— কিন্তু আমার বোধ হয় যে সেটা অনাবশ্যক।

অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত তৃতীয় ও পঞ্চম পত্রদ্বয় 'কাব্যে গদ্যরীতি' নামে ১৩৫০ সালে 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। চিঠিপত্র-অংশের পূর্ণতাসাধনের উদ্দেশ্যে পত্র দুইটি পরিশিষ্টে সংকলিত হইল।

'মোটকথা'র 'পদ্যছন্দ' অংশটি বস্তুত ১৩৪০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত ও ১৩৪১ বৈশাখের 'উদয়ন' মাসিকপত্রে 'ছন্দ' নামে প্রকাশিত প্রবন্ধের একাংশ। উক্ত প্রবন্ধটির এতদতিরিক্ত প্রধান অংশ 'বাংলা-ছন্দের প্রকৃতি' নামে মূলগ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে।

'মোটকথা'র 'গদ্যছন্দ' অংশটি কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে ১৯৩৫ সালের ২২ মে তারিখে পত্রাকারে লিখিত হইয়াছিল।

ভাষা ও সাহিত্য -বিষয়ক নানা রচনায় রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গত ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। সেই-সব রচনার অধিকাংশই ইতিপূর্বে রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। 'সাহিত্যের পথে' (১৩৪৩), 'বাংলাভাষা পরিচয়' (ইং ১৯৩৮) ও 'সাহিত্যের স্বরূপ' (১৩৫০) গ্রন্থ তিনখানি ও রবীন্দ্র-রচনাবলীর পরবর্তী বিভিন্ন খণ্ডে যথাক্রমে সংকলিত হইতেছে। ছন্দ প্রসঙ্গে 'মানসী', 'পুনশ্চ' ও 'ছড়ার ছবি'র ভূমিকা তিনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মানসীর প্রথম সংস্করণের ভূমিকা রচনাবলীর সপ্তম খণ্ডে 'কথা ও কাহিনী'র গ্রন্থপরিচয়ে মুদ্রিত হইয়াছে। 'পুনশ্চ'র ভূমিকা ষোড়শ খণ্ডে এবং 'ছড়ার ছবি'র ভূমিকা বর্তমান খণ্ডে যথাস্থানে মুদ্রিত আছে।

বর্ণানুক্রমিক সূচী